মন্মথ রায়

নাট্য গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

পূর্ণাঙ্গ

(প্রথম পর্ব)

মনমথন প্রকাশন
২২৯সি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

Anthology of full length Plays by Manmatha Ray

গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখকদের জন্য আর্থিক প্রকল্প অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় প্রকাশিত।

প্রকাশিকা ঃ শ্রীমতী চিত্রলেখা রায়

তত্ত্বাবধায়ক ঃ শ্রীচন্দন রায়

॥ মনমথন ॥

২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন—৩৫-৯৯৭৭

প্রাপ্তিস্থান ঃ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩/১/১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬

আনন্দ পাবলিশার্স

১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

নবগ্রন্থ কুটির

৫৪/৫এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ জগদ্ধাত্রী পূজা. ১৩৫৮। ২৫শে নভেম্বর ১৯৫১

প্রচ্ছদপট ঃ বিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রক ঃ শ্রীমুদ্রণ।

১নং খাসমহল রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬



৭৩ বৎসর জন্মোৎসবে

আলোকচিত্র : চন্দন রায

নিবেদন

বেলা শেষের সম্ভাষণ।

না বলে পারছি না, আমার নাটকের বইগুলির বেশির ভাগই বেশ কিছুকাল আগে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। পুনর্মুদ্রণ সম্ভব ছিল না। আজ কয়েক বছর আমার কিছু নাটক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ ও এম. এ ক্লাসের পাঠ্য। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার নাটকাবলী নিয়ে গবেষণাও চলছে। কিন্তু আমার নাট্যরচনাবলী দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। তা ছাড়া নাট্যানুরাগী বন্ধুদের আক্ষেপ তো রয়েছেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে নিবেদন করছি সরকারী আর্থিক সহযোগিতায় আমার নাট্যগ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড—'একাঙ্ক' প্রথম পর্ব গত বৎসর প্রকাশিত হয়েছে। এ বৎসর প্রকাশিত হচ্ছে, আমার নাট্যগ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড—'পূর্ণাঙ্গ'—প্রথম পর্ব। এতে ৮টি পূর্ণাঙ্গ নাটক রয়েছে। এইভাবেই আমার একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাটকের খণ্ডগুলি প্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছে। সব আমি দেখে যেতে পারব কিনা জানিনা।

এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশনে আমার পুত্র শ্রীমান চন্দন রায়ের অক্লান্ত কর্ম তৎপরতা, শ্রীমুদ্রণ প্রেসের মালিক শ্রীমান তপন চক্রবর্তী এবং মুদ্রণকলাবিশারদ শ্রীসমর সাহার অপরিসীম যত্ন আমাকে অভিভূত করেছে। আমি তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক আশীর্বাদ জানাচ্ছি। যাঁদের আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে আমার আজীবন নাট্য সাধনা, এক্ষণে তাঁরা তৃপ্ত হলেই আমার সাধনা হবে সিদ্ধ, জীবন হবে ধন্য। নমস্কার।

মন্মথ রায়

সূচীপত্র

১। সেমিরেমিস ১

২। কারাগার ৩৫

৩। সাবিত্রী ১২৩

৪। মহাভারতী ১৮৯

৫। ধর্মঘট ২৫৭

৬। বন্দিতা ২৯৬

৭। অমৃত অতীত ৩৪৫

৮। লালন ফকির ৪০৪

[সংযোজন]

৯। বাঙলার সাধারণ মঞ্চ ও আমি [প্রবন্ধ] ৪৫২

সেমিরেমিস

॥ বাসন্তিকা, জগন্নাথ হল ও আমি ॥

"মুক্তির ডাক" [১৩৩০ সালের দোল-পূর্ণিমায় সমাপ্ত, ঐ বৎসরই (১৯২৩ সালের) বড় দিনে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত]

"সেমিরেমিস" [১৩৩০ সালে "মুক্তির ডাকের" পরেই রচিত], "দেবদাসী [১৯২৩ সালে নভেম্বর মাসে জগন্নাথ হল ড্রামাটিক এসোসিয়েসনে অভিনীত], "ইলা" [দ্বিতীয় বার্ষিক "বাসন্তিকায়" প্রকাশিত], "রাজপুরী" ["ভারতবর্ষ" শ্রাবণ; ১৩৩২], "মাধুরী" ["সবুজপত্র", আশ্বিন ; ১৩৩২], "যজ্ঞফল" ["সবুজপত্র", অগ্রহায়ণ, ১৩৩২], "রথচক্র" ["ভারতবর্ষ", মাঘ ; ১৩৩২] এবং "কালরাত্রি" ["ভারতবর্ষ", ফাল্গুন ; ১৩৩২] লইয়া আমার জগন্নাথহল জীবনের নবনাটক গ্রথিত হইল।

"সেমিরেমিস" এতদিন প্রকাশিত হয় নাই, কারণ, কলিকাতার কোন সম্পাদক ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। "বাসন্তিকার" সম্পাদক আজ ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়া আমাকে 'উৎসাহ দান করিলেন বটে ; কিন্তু, ভালো করিলেন কিনা তাহা কলিকাতার সম্পাদকগণই বলিবেন।

"মুক্তির ডাক" এবং "সেমিরেমিস" আমি প্রায় এক সঙ্গেই লিখি। "সবুজপত্র" সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় "মুক্তির ডাক'কে 'একখানি যথার্থ Drama' বলিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার এই সৌভাগ্যের পূর্বেই ঐ দুইখানি নাটকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া আমার নিকট আশার বাণী এবং সার্থকতার বারতা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া, আমার সতীর্থবন্ধু সাহিত্য-রস-রসিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরিমল রায়, এম, এ, অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীযুক্ত রামসেবক ভট্টাচার্য্য, এম, এ, এবং শ্রদ্ধেয় সর্বাধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম, এ, ডি এল। ডাঃ সেনগুপ্ত মহাশয় আমাকে সাহিত্য-সমাজে পরিচিত হইবার প্রথম সুযোগ দেন। তাহার পর হইতে আমাদের বর্তমান সর্বাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম, এ, পি আর, এস, পি, এইচ, ডি, মহাশয় আমাকে শুধু উৎসাহ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি উপদেশ দিয়াছেন, লাইব্রেরী হইতে বই আনাইয়া দিয়াছেন। শুধু এও তো নয়, "রাজপুরী"র Plotও তিনিই দিয়াছিলেন। ইহাদের ঋণ শোধের নহে, সে দুঃসাহসও যেন আমার কোনদিন না হয়।

জগন্নাথ হলের খাতা হইতে আমার নাম উঠিয়া যাইবার দিন আসিয়াছে। কিন্তু, আমার জীবনের খাতায় জগন্নাথ হলের নাম অক্ষয়-অক্ষরে লেখা রহিয়াছে। আমার প্রথম পাঁচখানি নাটক এই হলের বন্ধুগণের উৎসাহের উৎস হইতেই উৎসারিত হইয়াছে। "সেমিরেমিস" প্রকাশ করিতে বিশেষ করিয়া উদ্যোগী হইয়াছিলেন জগন্নাথ হলের মূর্তিমান উৎসাহ, তরুণ-সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার অধিকারী বি, এ। কিন্তু, ধন্যবাদ দেওয়া ঋণস্বীকারের প্রকৃষ্ট পন্থা মনে করি না বলিয়াই আজ তাহা হইতে নীরব রহিলাম।

"সেমিরেমিস" Historians' History of the world-এর একটি আখ্যায়িকার অতি অস্পষ্ট ছায়াচিত্র। কল্পনাই ইহাকে বর্ধিত এবং পুষ্ট করিয়াছে।

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬।
জগন্নাথ হল। ঢাকা।

মন্মথ রায়

সেমিরেমিস

প্রথম প্রকাশ, বাসন্তিকা, জগন্নাথ হল, ঢাকা, ১৩৩২

নাইনাস—	এসিরিয়ান সম্রাট।
মেনন—	এসিরিয়ান সাম্রাজ্যভুক্ত সিরিয়া দেশের শাসনকর্তা।
ষ্টেব্রবেটস—	নাইনাসের পালিত পুত্র [ভারতীয় নাম সত্যব্রত]।
হাইডাসপেস—	এসিরিয়ান সৈন্যাধ্যক্ষ।
সুসানা—	নাইনাসের কন্যা।
সেমিরেমিস—	মেননের স্ত্রী।

প্রথম অঙ্ক

[সময় সন্ধ্যা। ব্যাকট্রিয়ার রাজপ্রাসাদে আলোকসমুজ্জ্বল দরবার গৃহ। ব্যাকট্রিয়ার সিংহাসন এসিরিয়ান সম্রাট নাইনাস কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। আজ তাঁহার বিজয়োৎসব। এসিরিয়ান সম্রাট নাইনাসের আশ্রিত ভারতবর্ষীয় রাজপুত্র ষ্টেব্রবেটস ('সত্যব্রত') এসিরিয়ান সেনাপতি হইলেও, এই ব্যাকট্রিয়া জয়ে, সম্রাট নাইনাসের অধীনস্থ শাসনকর্তা মেননের তথাকথিত এক অন্তরঙ্গ বন্ধুরই কৃতিত্ব পুরস্কারমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে সম্রাট নাইনাস এই দরবার আহ্বান করিয়াছেন।

ঐশ্বর্য ও কারুকার্যে দরবার গৃহে রাজোচিত মর্যাদা এবং বিশিষ্টতা সম্যকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুবিশাল স্তম্ভ শ্রেণীর ধারে ধারে এক একজন আপাদমস্তক সুসজ্জিত অস্ত্রধারী রক্ষী মূকমূর্তির মতো দণ্ডায়মান।

সম্রাটকন্যা সুসানা এবং ষ্টেব্রবেটস (সত্যব্রত) দরবারে উপস্থিত হইয়া দেখেন তখনো সেখানে বিশিষ্ট আর কেহ উপস্থিত হয় নাই। ষ্টেব্রবেটস যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। তাহার চিহ্ন তখনো তাঁহার অঙ্গের নানাস্থানে সুস্পষ্ট রহিয়াছে। সুসানা তাহার শুশ্রূষার ভার লইয়াছিলেন।]

ষ্টেব্রবেটস ॥ আমরাই দেখ্‌ছি সবার আগে এসে পড়লাম!

সুসানা ॥ সম্রাটও এখুনি এসে পড়বেন। [ষ্টেব্রবেটসকে সযত্নে একখানা কৌচের সম্মুখে আনিয়া] তুমি এখানে হেলান দিয়ে বসো। [ষ্টেব্রবেটস বসিলে পরে সুসানা তাঁহার পার্শ্বস্থ আরেকখানা আসনে বসিয়া ষ্টেব্রবেটসের হাত দুখানি নিজের মুঠোয় ভরিয়া] ব্যথা আজ রাত্রেই কমে যাবে। ওষুধটা খুব ভালো···

ষ্টেব্রবেটস ॥ ব্যথা আমার কোনদিনই কমবেনা।

সুসানা ॥ না কমেই পারেনা।

ষ্টেব্রবেটস ॥ তুমি আমার ব্যথা কি বুঝবে সুসানা?

সুসানা ॥ কবে না বুঝেছি?

ষ্টেব্রবেটস ॥ সেদিন আজ নেই—

সুসানা ॥ কেন নেই?

ষ্টেব্রবেটস ॥ যদি ব্যথার দরদীই আমার কেউ হতো তবে সে আমাকে আজ এই দরবার কক্ষে কখনই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে নিয়ে আসতো না।

সুসানা ॥ বেশ, তবে চলো…ফিরে চলো—

ষ্টেব্রবেটস ॥ কোথায় ?

সুসানা ॥ চিকিৎসা কক্ষে।

ষ্টেব্রবেটস ॥ তোমায় ছুঁয়ে বলছি, ক্ষতের এতটুকু ব্যথাও আর আমার নেই।

সুসানা ॥ তবে ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ আমিও তাই ভাবি আমার এ অশান্তি কেন ? কিসের জন্য ?

সুসানা ॥ অশান্তি ? তোমার অশান্তি ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ অশান্তি নয়, আগুন। আমার [বুকে হাত দিয়ে] এখানে আগুন জ্বলছে।

সুসানা ॥ হ্যাঁ, বিরহানলের কথা কাব্যে পাঠ করেছি বটে।

ষ্টেব্রবেটস ॥ তুমি পরিহাস করছো, কিন্তু আজ তোমার সাথে কথা বলতে আমার কান্না পাচ্ছে।

সুসানা ॥ এ বুঝি এক নতুন ধরনের প্রেমালাপ ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ [অর্ধোত্থিত হইয়া] আমাকে ক্ষমা কর তুমি। দরবারে এখনও কেউ আসেনি। যদি আমাকে আর লজ্জায় ফেলতে না চাও, তবে আমাকে এই অবসরে পালিয়ে যেতে দাও।

সুসানা ॥ [ষ্টেব্রবেটসকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া] এসো, উঠে এসো। [সুবৃহৎ বাতায়নের পার্শ্বে যাইয়া তাহার পর্দা সরাইয়া দিলেন। বাহিরে বিজয়োৎসবের বাজী পোড়ান হইতেছিলো] ঐ দেখো [অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন]

ষ্টেব্রবেটস ॥ কি ও ?

সুসানা ॥ বিজয়োৎসব।

ষ্টেব্রবেটস ॥ আগুনের ফুলকি ! জ্বলে উঠে নিজেই পুড়ে মরছে।

সুসানা ॥ তারাবাতি…ফুলঝুরি…উঃ কি সুন্দর !

ষ্টেব্রবেটস ॥ সুসানা, সুসানা, তুমি কি আমাকে পুড়িয়ে মারতে চাও ? না সহ্য হয়না—[পর্দা টানিয়া দিলেন] আগুন ! আগুন ! আমি জ্বলে পুড়ে মরছি—

সুসানা ॥ কি হয়েছে তোমার ষ্টেব্রবেটস ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ জ্বলে উঠে নিজেই পুড়ে মরেছি ! হাঃ হাঃ হাঃ

সুসানা ॥ ষ্টেব্রবেটস—

ষ্টেব্রবেটস ॥ হিংসা—হিংসা—হিংসা…আমি লুকিয়ে থাকি…আমি পালিয়ে যাই—

সুসানা ॥ এই তুমি বীর ! এই তুমি যোদ্ধা ! কার ভয়ে তুমি পালাতে চাও ব্যাকৃট্রিয়া বিজয়ী বীর।

ষ্টেব্রবেটস ॥ কে ব্যাক্‌ট্রিয়া বিজয়ী বীর ?

সুসানা ॥ তুমি ! কেন, নতুন করে শুনতে চাও নাকি ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ আমি ব্যাকট্রিয়া বিজয়ী বীর ?—বিদ্রূপ ? হ্যাঁ, তা তো আজ করবেই ?

সুসানা ॥ আমি তোমায় বিদ্রূপ করছি ! কি বিদ্রূপ আমি তোমায় করলাম এসিরিয়ান সেনাপতি ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ এসিরিয়ান সেনাপতি !—এককালে ছিলাম বটে, কিন্তু আজ নয়।

সুসানা ॥ আজ নয় ? তবে আজ কে সেনাপতি ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ অদৃষ্ট চক্রে ব্যাক্‌ট্রিয়া বিজয়ের জয়-গৌরব যে লাভ করেছে সেই তরুণ যুবক···সেই অজ্ঞাত কুলশীল তরুণ যুবক আজ এসিরিয়ান সেনাপতি। আমি পদচ্যুত হয়েছি।

সুসানা ॥ তুমি পদচ্যুত হয়েছো ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ [চিৎকার করিয়া] হ্যাঁ, হয়েছি। আর কতবার সে কথা বলব ?

সুসানা ॥ শুনেছি সেই তরুণ যুবক সিরিয়ার শাসনকর্তা মেননের বন্ধু। কিন্তু তিনি যে সেনাপতি হয়েছেন, তা তো শুনিনি—

ষ্টেব্রবেটস ॥ আমি আরও কিছু শুনেছি—[তীব্র হাস্যে] তুমি কি তা শোনিনি ?···শুনবে ? বলবো ?

সুসানা ॥ কি ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ তা শুনলে তুমি চমকে উঠবে।

সুসানা ॥ চমকে উঠব ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ —না, না, আনন্দে নেচে উঠবে।

সুসানা ॥ খুলে বল ষ্টেব্রবেটস।

ষ্টেব্রবেটস ॥ বেশ, আগে তুমি বলো আমাকে এ দরবারে জোর করে নিয়ে এলে কেন ?

সুসানা ॥ এনেছি আজ এই বিজয়োৎসবে সম্রাট যখন তোমার অলৌকিক বীরত্বকে যথাযোগ্য পুরস্কারে অলঙ্কৃত করতে চাইবেন, তখন তুমি তোমার কাম্য কি অলঙ্কার, প্রার্থনা ক'রে তোমার বক্ষে বরণ কর তাই দেখতে।

ষ্টেব্রবেটস ॥ তার আর সুযোগ হবেনা। আমার পূর্বেই আমার সেই মাণিক আর একজনের সুপ্রসন্ন ভাগ্যাকাশে ঐ সন্ধ্যা তারার মত ঝিলিক হানবে।

সুসানা ॥ ষ্টেব্রবেটস, এর অর্থ ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ অতি সহজ।

সুসানা ॥ কিরূপ ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ এসিরিয়ান সেনাপতি···

সুসানা ॥ সে তো তুমি—

ষ্টেব্রবেটস ॥ (রুক্ষস্বরে) আমি নই—আমি নই। সেনাপতি সেই যুবক।

সুসানা ॥ আমি তাকে মানিনা। আমি তাকে চিনিনা, কেউ তাকে জানেনা।

ষ্টেব্রবেটস ॥ কিন্তু সম্রাট তাকে জেনেছেন। সৈন্যগণ তাকে চিনে রেখেছে। সে সিরিয়ার শাসনকর্তা মেননের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

সুসানা ॥ হোক সে। তাতে আমার কি ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ তাতে তোমার কি ?—সে সম্রাটের মনোনীত ভাবী জামাতা। তোমার ভাবী স্বামী।

সুসানা ॥ সে কি! ষ্টেব্রবেটস, সে কি ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ চমকে উঠোনা। সেই কথা ঘোষণা করবার জন্যই আজ এই দরবার আহ্বান!

সুসানা ॥ এ কি সত্য বলে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ সুসানা, তুমি জানো আমি ভারতের এক নির্বাসিত রাজার অনাথ পুত্র। তোমার পিতার আশ্রয়ে লালিত পালিত হয়ে আমার সত্যিকার নাম "সত্যব্রত" আজ তোমাদের ভাষায় 'ষ্টেব্রবেটস' রূপে রূপান্তরিত হলেও আমার নামের অর্থকে কোনদিন কলঙ্কিত করিনি।

সুসানা ॥ [নতমুখে কি ভাবিতেছিলেন]

ষ্টেব্রবেটস ॥ সুসানা—

সুসানা ॥ [মুখ তুলিয়া, আবেগে] ষ্টেব্রবেটস—

ষ্টেব্রবেটস ॥ [বাহিরে ভেরী বাদ্য] ঐ সম্রাট আসছেন…

[সম্রাট নাইনাস ও সিরিয়ার শাসনকর্তা মেনন তাঁহাদের পার্শ্বচরগণ সহ দরবার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রক্ষীবর্গ তাঁহাদিগকে যথারীতি সম্মাননা করিল। সুসানা ও ষ্টেব্রবেটস সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিলেন। সম্রাট ধীর পদে আসিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলে অন্যান্য সকলে যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিলেন। বাহিরে বিজয় বাদ্য বাজিয়া উঠিল]

নাইনাস ॥ মা সুসানা, পুত্র-প্রতিম ষ্টেব্রবেটস, শাসনকর্তা মেনন, আজ আমাদের বিজয়োৎসব। আজ আমার ব্যাক্‌ট্রিয়া বিজয়ের সুখস্বপ্ন সফল। আজ এই বিজয়োৎসব তোমাদের বীরত্বের যথাযোগ্য পুরস্কারে তোমাদের জীবনে চিরস্মরণীয় হোক। মহামতি মেনন, তোমার সেই বন্ধু কোথায় যার অপূর্ব বীরত্ব ও রণচাতুর্যে আজ বিজয়লক্ষ্মী সম্পূর্ণ, অপ্রত্যাশিতভাবে আমার করতলগত ?

মেনন ॥ [চঞ্চল হইয়া] বলেছিতো সম্রাট…সে অসুস্থ।

নাইনাস ॥ তার অনুপস্থিতিতে আমার এই জয়োৎসব ম্লান মনে হচ্ছে মেনন। আমি তাঁকে সমগ্র এসিরিয়ান সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিত্বে বরণ করেছি। আজ দরবারে উপস্থিত হবার জন্য আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করে পুনরায় তাঁর নিকট দূত প্রেরণ করেছিলাম। এইমাত্র খবর পেলাম—

মেনন ॥ [উৎকণ্ঠিত হইয়া] কি খবর সম্রাট ?

নাইনাস ॥ সে দরবারে উপস্থিত হবার জন্য রওনা হয়েছে।

মেনন ॥ [আগ্রহে] আমি তাকে এগিয়ে নিয়ে আসি।

নাইনাস ॥ প্রয়োজন নেই। তুমি বরং রাজপুরোহিতকে সসম্ভ্রমে এই দরবারে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসো।

মেনন ॥ সম্রাট ? [ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন]

নাইনাস ॥ তোমার বন্ধু এখানে আসা মাত্র আমার পুরোহিতের প্রয়োজন আছে। তুমি যাও মেনন—আর বিলম্ব করোনা [মেনন ইতস্ততঃ করিয়া পরে অভিবাদনান্তে প্রস্থান করিলেন]

নাইনাস ॥ ষ্টেব্রবেটস [ষ্টেব্রবেটস অভিবাদন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন] যুদ্ধে আমি তোমার একাগ্রচিত্ততা দেখে খুশি হয়েছি। তাঁর নিদর্শন স্বরূপ আমি তোমাকেও পুরস্কৃত করতে চাই···

[ষ্টেব্রবেটস নীরব রহিলেন। সুসানা ব্যগ্রভাবে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন]

নীরব রইলে কেন ষ্টেব্রবেটস ? যথাযোগ্য পুরস্কার প্রার্থনা কর।

সুসানা ॥ ষ্টেব্রবেটস—ষ্টেব্রবেটস—এ সুযোগ হেলায় হারিয়োনা তুমি।

ষ্টেব্রবেটস ॥ আমি—আমি কি চাইব সম্রাট ?

নাইনাস ॥ তোমার যোগ্যতা অনুসারে তোমার যা অভিরুচি—

ষ্টেব্রবেটস ॥ আপনি আপনার ভারত অভিযানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন। আপনি আমার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে দিন···এই আমার প্রার্থনা।

সুসানা ॥ [ষ্টেব্রবেটসে প্রতি পরিপূর্ণ ব্যগ্রতায়]—আর কিছু,—আর কিছু—তার পূর্বে আর কিছু ?

নাইনাস ॥ আর কি সুসানা ?

সুসানা ॥ ষ্টেব্রবেটস, সম্রাট জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি আর কি প্রার্থনা কর !

নাইনাস ॥ ষ্টেব্রবেটস !—তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা না করা আমাদের নতুন সেনাপতির পরামর্শ ও অনুমোদন সাপেক্ষ। তোমার দ্বিতীয় প্রার্থনা কি শুনি ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ সুসানা আমি পারব না···আমি পারছিনা···তুমি ভাবে পার, ভাষায় পার, ইঙ্গিতে পার···আমার হয়ে তুমি তোমার পিতাকে তা বুঝিয়ে দাও !

সুসানা ॥ [কি ভাবিলেন, ইতস্ততের পর, ষ্টেব্রবেটসের হাত ধরিয়া তাহাকে সম্রাটের সম্মুখে আনিয়া দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া] পিতা, আমাদের দুজনকে আশীর্বাদ করুন—[দুজনেই নতজানু হইলেন]।

নাইনাস ॥ [স্তম্ভিত হইলেন। গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—] সুসানা—

সুসানা ॥ বাবা ?

নাইনাস ॥ এ হয়না···এ হতে পারেনা···এ হবেনা···।

সুসানা ॥ [নতমুখে] কেন হবেনা—বাবা ?

নাইনাস ॥ [রুক্ষস্বরে] তুমি আমার কাছে উঠে এসো—এসো।

[সুসানা নখ খুঁটিতে খুঁটিতে নাইনাসের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সঙ্গে ষ্টেব্রবেটসও তাহার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন]

নাইনাস ॥ [সুসানার প্রতি কোমলস্বরে] ষ্টেব্রবেটস আর তুমি, ভ্রাতা-ভগ্নীর মত শৈশব হ'তে একত্রে লালিত পালিত হয়েছো…মনে রেখো ষ্টেব্রবেটস তোমার ভাই। এতে তোমার দুঃখ করবার কিছু নেই…আমি তোমার জন্য রূপে গুণে যোগ্যতর স্বামী মনোনীত করেছি।…এই যে—[দরবার কক্ষে এই সময়ে মেননের বন্ধু ব্যাকট্রিয়া বিজয়ী সেই বীর যুবক সস্মিত মুখে প্রবেশ করিয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন। সম্রাট সিংহাসন হইতে উঠিয়া সাদর অভ্যর্থনায় তাহাকে সিংহাসনের পার্শ্বে লইয়া আসিয়া] সুসানা, ইনিই ব্যাক্‌ট্রিয়া বিজয়ী সেই বীরশ্রেষ্ঠ যাঁকে এশিয়ার সেনাপতিত্ব দান করেও আমি পরিতৃপ্ত হতে পারছিনা- -

মেননের বন্ধু ॥ এ শুধু সম্রাটের অপূর্ব বিনয় অসাধারণ মহানুভবতা। ব্যাকট্রিয়া জয়ে ঐ বীরশ্রেষ্ঠ ষ্টেব্রবেটসের কৃতিত্ব কিছু কম নয় সম্রাট। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে উনি আমায় রক্ষা করেছেন—

নাইনাস ॥ তোমাকে রক্ষা করতে ষ্টেব্রবেটসের রক্তদান সার্থক হয়েছে। তরুণ যুবক! তুমি আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছ। তুমি কি যাদুকর, তুমি কি ইন্দ্রজাল জানো?

মেননের বন্ধু ॥ আপনার কি মনে হয় সম্রাট?

নাইনাস ॥ তুমি জানো। তোমার ঐ তরুণ বাহুতে তুমি সম্মোহন অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলে…সে তীরের আঘাতে দুর্ধর্ষ ব্যাকট্রিয়ানরা ঘুমিয়ে পড়েছিল—

মেননের বন্ধু ॥ কিন্তু সে ঘুম তো তাদের ভাঙ্গেনি সম্রাট।

নাইনাস ॥ আমি দেখেছি। কিন্তু আমার হাতেও নাগপাশ আছে—মায়াবী তুমি? আমাদের মায়া কাটিয়ে যাতে পালিয়ে যেতে না পারো আমি সেইজন্য—[সুসানার হাতের সহিত তাঁহার হাত যুক্ত করিয়া ধরিয়া] আজ তোমাকে সেই নাগপাশে বাঁধলাম—

[রাজপুরোহিত সহ মেননের প্রবেশ। মেনন সিংহাসনের পার্শ্বে ঐ মিলনদৃশ্য দেখিয়া প্রবেশ পথেই থমকিয়া দাঁড়াইলেন]

সুসানা ॥ [ষ্টেব্রবেটসের দিকে আকুল নেত্রে তাকাইয়া] ষ্টেব্রবেটস! ষ্টেব্রবেটস! [ষ্টেব্রবেটস দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন।]

মেননের বন্ধু ॥ [সহাস্যে] মেনন! মেনন! দ্বারে থমকে দাঁড়ালে কেন? ভয় নেই। আমার কাছে এসে এ মিলন উৎসবে যোগ দাও।

নাইনাস ॥ কুলপুরোহিত! আপনি এ মিলনকে মন্ত্রপূত করুন।

[পুরোহিত অগ্রসর হইলেন]

সুসানা ॥ [মেননের বন্ধুর প্রতি মিনতিপূর্ণ স্বরে] আমার মনপ্রাণ যে পূর্ব হতেই আর একজনকে উৎসর্গ করেছি?

নাইনাস ॥ [ভ্রূকুটি সহ] সু—সা—না—

মেননের বন্ধু ॥ (সুসানার প্রতি হাস্যমুখে) তবু আমি তোমাকে ত্যাগ করতে পারিনা।

মেনন ॥ (দূর হইতে নতমুখে) সম্রাট! আ—মি—অসুস্থ…আমাকে বিদায় দিন—

মেননের বন্ধু ॥ সম্রাটের সম্মুখে মিথ্যা কথা বলো না বন্ধু।—সম্রাট! আমার এই সৌভাগ্য আপনার ঐ শাসনকর্তার ঈর্ষা হচ্ছে।—হচ্ছে কিনা মেনন?

নাইনাস ॥ যোগ্যতমের সঙ্গে যোগ্যতমের মিলন—এতে ঈর্ষা হতে পারেনা। সভ্যগণ! আপনারা মঙ্গল কামনা করুন! পুরোহিতবর আপনি মন্ত্রপাঠ করুন…

সুসানা ॥ ষ্টেব্রবেটস! ষ্টেব্রবেটস! তুমি কি কাঁদছ?

নাইনাস ॥ (ষ্টেব্রবেটসের প্রতি তাকাইয়া দেখেন ষ্টেব্রবেটস পরিচ্ছদের অগ্রভাগ দিয়া চোখের জল মুছিতেছেন) ষ্টেব্রবেটস। এই মুহূর্তে তুমি এ দরবার কক্ষ পরিত্যাগ কর—

[ষ্টেব্রবেটস নত মুখে প্রস্থান করিতেছিলেন]

সুসানা ॥ ষ্টেব্রবেটস—শুনে যাও… দাঁড়াও… (ষ্টেব্রবেটস দাঁড়াইলেন) মনের চেয়ে মন্ত্র বড় নয়। পুরোহিতের ঐ মন্ত্র মানুষের কথা মাত্র…ও আমাদের অন্তরের সত্যকে স্পর্শও করতে পারবে না। তুমি নির্ভয়ে চলে যাও ষ্টেব্রবেটস।

মেননের বন্ধু ॥ সাবাস! সাবাস!

নাইনাস ॥ কলঙ্কিনী! এতদূর! (প্রদীপ্ত রোষে তৎক্ষণাৎ তরবারী কোষ বিমুক্ত করিয়া সুসানাকে হত্যা করিতে উঠিলেন—)

মেননের বন্ধু ॥ (সেই উদ্যত তরবারির সম্মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ সুসানাকে সরাইয়া নিজে তৎস্থলে নতজানু হইয়া বসিয়া)—ওকে ক্ষমা করুন সম্রাট।

নাইনাস ॥ ও শুধু আমারই অপমান করেনি—আমাদের ধর্মেরও অপমান করেছে …আমি কিছুতেই ওকে ক্ষমা করতে পারবোনা…তুমি সরে যাও যুবক।

মেননের বন্ধু ॥ (মুহূর্ত মধ্যে শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিয়া বিনির্মুক্ত ছদ্মবেশে এক অলোক-সামান্যা রূপসীর মূর্তিতে সম্রাটের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া) আমি যুবক নই সম্রাট!

(সকলে স্তম্ভিত হইলেন)

নাইনাস ॥ একি! কে তুমি! তুমি যাদুকরী?

মেননের বন্ধু ॥ আমি সেমিরেমিস।

নাইনাস ॥ মেননের বন্ধু……

সেমিরেমিস ॥—মেননের স্ত্রী।

নাইনাস ॥ মেনন, এর অর্থ?

সেমিরেমিস ॥ এর অর্থ; আপনার ঐ স্ত্রৈণ শাসনকর্তাটি তার স্ত্রীর-বিরহ ক্ষণেকের জন্যও সহ্য করতে পারেন না বলে তাকে পুরুষের ছদ্মবেশে শিবিরে এনে রেখেছিলেন।

নাইনাস ॥ আমায় তুমি অবাক করেছ মেনন! (সেমিরেমিসকে) ততোধিক অবাক করেছ তুমি…তোমা-রি নাম সেমিরেমিস?

সেমিরেমিস ॥ তাইতো জানি সম্রাট।

নাইনাস ॥ তবে তুমিই কি সেই দেশ বিখ্যাত কৃষক-কন্যা যার অপরূপ সৌন্দর্যশ্রীতে সমগ্র এসিরিয়া মাতাল হয়ে উঠেছিল।

সেমিরেমিস ॥ সেই যদি হতাম সম্রাট তবে আপনিও তো এখন মাতাল হয়ে উঠতেন।

নাইনাস ॥ হয়েছি, হয়েছি…আমিও মাতাল হয়েছি!—কে না হয়েছে? শোন মেনন, তবে এই রূপসীই সেই সেমিরেমিস যাকে গত বৎসর দস্যুদল বলপূর্বক এর পিত্রালয় হতে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল? তুমি না তোমার সমস্ত ফৌজ নিয়ে রাজ্যশুদ্ধ তোলপাড় করেও এর সন্ধান সম্রাটকে এনে দিতে পারনি?

মেনন ॥ (সম্পূর্ণ অপ্রতিভাবে) আমি—আ-মি…

সেমিরেমিস ॥ আমাকে বলতে দাও মেনন। সম্রাট? ভুলে যাবেন না আমি আমার শৌর্য বীর্য প্রভাবে এই ব্যাক্‌ট্রিয়া জয় করে আজ আপনার নিকট হতে এসিরিয়ার সেনাপতিত্ব লাভ করেছি।…দস্যুদল কি ব্যাক্‌ট্রিয়ান সৈন্যবাহিনীর চাইতেও পরাক্রান্ত ছিল?

নাইনাস। বুঝলাম সে মিথ্যা জনশ্রুতি…আর তোমার সেই অগৌরবের অপবাদ রটিয়েছে তোমার ঐ…(মেননের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে গিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সভাসদগণের প্রতি শান্ত স্বরে) বন্ধুগণ! আপনারা প্রমোদভবনের জয়োৎসবে যোগদান করুন। ব্যাক্‌ট্রিয়ান নর্তকীগণ আপনাদের প্রতীক্ষা করছে…যান… (সভাসদগণ অভিবাদনান্তে প্রস্থান করিলেন।) সুসানা! আজকের মত তোমার উচ্ছৃঙ্খলতা আর অবাধ্যতা ক্ষমা করলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধান। যাও।

সুসানা ॥ এসো ষ্টেব্রবেটস… (ষ্টেব্রবেটসের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন)।

সেমিরেমিস ॥ ষ্টেব্রবেটস! বন্ধু! তুমি আমার জীবনরক্ষা করেছিলে… তোমাকে আমার ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি…একটু দাঁড়াও না তুমি…

সুসানা ॥ ষ্টেব্রবেটস! তোমার ঔষধ লেপনের সময় হয়েছে—

সেমিরেমিস ॥ (সুসানার প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া) পুরুষের মত যুদ্ধ করতে শিখেছি বটে কিন্তু নারীর সেবাধর্ম সেই সঙ্গে একেবারে ভুলে যাইনি বোন।

সুসানা ॥ বেশ…তবে আমি আসি ষ্টেব্রবেটস। [প্রস্থান]

নাইনাস ॥ ষ্টেব্রবেটস! তুমি মনে রেখো সুসানার সঙ্গে তোমার বিবাহ কিছুতেই হ'তে পারেনা—কোন ক্রমেই নয়। স্মরণ রেখো সে তোমার ভগিনী…

ষ্টেব্রবেটস ॥ সম্রাট ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন…ভ্রাতাভগিনীর সম্বন্ধ ভিন্ন কি সংসারে আর কোন প্রীতিময় সম্বন্ধ রচিত হতে পারে না?

নাইনাস ॥ (ভ্রূকুটি সহ)—মূর্খ তুমি ! যাও আজ আমাকে আর বিরক্ত ক'রো না। অবিলম্বে এস্থান ত্যাগ কর—(ষ্টেব্রবেটস উদ্ধতভাবেই চলিয়া গেলেন।)

সেমিরেমিস ॥ ষ্টেব্রবেটস বীর। ষ্টেব্রবেটস যুবক। ষ্টেব্রবেটস সুন্দর ! অতি সুন্দর ! আপনি ওকে অপমান করে আপনার জয়োৎসব ম্লান করলেন সম্রাট !

নাইনাস ॥ আজ তোমাকে পেয়ে জয়োৎসব শত জ্যোৎস্নার জোয়ারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এস সেমিরেমিস সুরা সৌন্দর্য আর সঙ্গীত দিয়ে আজ এই জয়োৎসব মর্মে মর্মে অনুভব করি…[দেহরক্ষীকে ইঙ্গিত—সে চলিয়া গেল]…সেমিরেমিস—

সেমিরেমিস ॥ সম্রাট।

নাইনাস ॥ তুমি ঐ মেননের স্ত্রী ?

সেমিরেমিস ॥ কেন সম্রাট, তাতে ক্ষতি কি ?

নাইনাস ॥ লাভই বা কি,—যখন সিংহাসন তোমাকে ক্রোড়ে ধারণ করবার জন্য আকুল আগ্রহে কাঁদে…যখন রাজমুকুট তোমার শিরে স্থান পেয়ে শত সূর্যের দীপ্তিতে ঝলমল করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে…তখন…

[রক্ষী সুরা ও তাহার সাজ সরঞ্জাম আনিয়া নাইনাসের সম্মুখে স্থাপন করিল]

সেমিরেমিস ॥ তখন…কি সম্রাট ?

নাইনাস ॥ [সুরাপাত্রে সুরা ঢালিয়া তাহা সেমিরেমিসের অধরে ধরিয়া] তখন এই আনন্দ মদিরা চুম্বন ক'রে তাদের আকুল আগ্রহ ব্যাকুল বাসনা সার্থক কর…

সেমিরেমিস ॥ [সুরাপাত্র সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করিয়া] মেনন ! স্বামী ! তোমার স্ত্রীর এই রাজসম্মান তুমি সগর্বে গ্রহণ করে আমার রাজ্যজয়ের—বিশ্ব বিজয়ের আনন্দ সার্থক কর—[ত্রস্ত ত্রস্ত মেনন তাহা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু পান করিতে সাহস পাইলেন না—]

নাইনাস ॥ [মেননের প্রতি ঈর্ষা] মেনন ! আমি জানতে চাই তুমি কি স্পর্ধায় এক দস্যুদলের আবরণ রচনা করে নিজে এই নারীকে তার পিতৃগৃহ হ'তে লুণ্ঠন করেছ ?

সেমিরেমিস ॥ আমার পিতা স্বেচ্ছায় আমাকে মেননের হাতে তুলে দিয়েছেন। মেননের স্বর্ণমুদ্রায় তিনি আজ গ্রামের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনবান গৃহস্থ।

নাইনাস ॥ ভালো,…কিন্তু মেনন, সম্রাট আমি…যা সাহস পাইনি…তুমি আমাদের সেই অভিজাত কুলে জন্মগ্রহণ করে এক হীন কুলোদ্ভবা কৃষক-কন্যাকে বিবাহ করেছ কোন সাহসে ?

সেমিরেমিস ॥ আমি কৃষক-কন্যা নই সম্রাট ! গ্রামের পুরোহিত তার সাক্ষ্য দেবেন। আমি সেই কৃষকের পালিতা কন্যা মাত্র।

নাইনাস ॥ থাক্—থাক্ আর শুনতে চাই না। তুমি তো এ তুচ্ছ তর্কের জন্য আজ আমার সম্মুখে উদয় হওনি ? তুমি এসেছ এক রহস্যময় স্বপ্নের মত ! কি অপরূপ মাধুরী তোমার চোখে মুখে ! সর্বাঙ্গে তোমার আনন্দের জোয়ার। বিশ্বের সৌন্দর্য তিল তিল-করে তোমার ঐ যৌবনশ্রী উদ্ভাসিত করেছে। হে বিশ্ববাঞ্ছিতা !

আজ এই বিজয়োৎসবে, ভুলে যাও…একটি রাত্রির জন্য ভুলে যাও…তুমি ঐ মেননের স্ত্রী।—মনে কর আজ আমরা নিখিলের বন্ধনহীন চির স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী নরনারী। মনে কর আজ যেন সৃষ্টির আদিম বসন্ত নিশীথ। এসো মেনন, নরনারীর এই প্রথম মিলন মেলায় তুমিও এসে অবাধে আমাদের সঙ্গে যোগ দাও। আজ ভাবো আনন্দ আমাদেরই প্রতিমূর্তি, সৌন্দর্য আমাদেরই রূপ, সুরা আমাদেরই বক্ষ সুধা। [মদ্যপান] হে নারী! তোমার ঐ পাগল করা আঁখিতে আমার পানে চাও… তোমার ঐ ব্যাকুল বক্ষের আকুল নর্তনের তালে তালে তুমি নৃত্য কর…আর তোমার ঐ পেয়ালা ভরা জীবনমধু আমার অধরে ধর—[সিংহাসনে আবেশে হেলিয়া পড়িলেন]

মেনন ॥ [ভয় চকিত স্বরে] সেমিরেমিস!

সেমিরেমিস ॥ কি?

মেনন ॥ এই সময় আমাদের বিদায় প্রার্থনা কর।

সেমিরেমিস ॥ একি আমার জীবনের স্বপ্ন? না স্বপ্নের জীবন? না মেনন! এসো…ঐ আবেশে, ঐ স্বপ্নলোকে আমরাও ভেসে যাই…আমার যুদ্ধ জয়ের ক্লান্তি আজ জীবনের সুধা-সমুদ্রে ডুবে যাক্…আজ দুনিয়ার সকল মধু এসো নিঃশেষে পান করি। কিসের সংসার! কিসের বন্ধন! মুক্ত! মুক্ত! আজ আমি মুক্ত। আজ তোমাকে চিনিনা, সম্রাটকে চিনিনা…কাউকে জানিনা! জানি শুধু সৃষ্টির অগাধ অনন্ত সৌন্দর্য রহস্য…মেনন! মেনন! মানুষের অনন্ত তৃষ্ণা অনুভব করেছ? প্রকৃতির সেই আদিম আহ্বান শুনেছ? [কি যেন কান পাতিয়া শুনিলেন] ঐ…শোন…

নাইনাস ॥ [মুদ্রিত চক্ষে, আবেশে] নারী! তুমি যে আমার চোখে ধরা পড়ছ না আর!

সেমিরেমিস ॥ [ছুটিয়া তাহার সম্মুখে যাইয়া] যুগে যুগে আমি যে তোমার মাঝেই লুকিয়ে রয়েছি।

নাইনাস ॥ তোমার কথা যে আর কানে যায় না—

সেমিরেমিস ॥ তবে আমার গান শোন…

[সেমিরেমিসের নৃত্যগীত। সে নৃত্যগীতে নাইনাস ক্রমে ক্রমে সচেতন হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং মুগ্ধনেত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। নৃত্যগীত শেষ হইলে সেমিরেমিস সম্রাটকে অপূর্ব ভঙ্গীতে অভিবাদন করিয়া ক্লান্তিজনিত অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন।]

নাইনাস ॥ [সিংহাসন হইতে উঠিয়া সোজা মেননের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া] মেনন, আমি সম্রাট…তুমি প্রজা…আমি ঐ নারীকে তোমার নিকট উপঢৌকন রূপে দাবি করি।

মেনন ॥ সে কি সম্রাট!

নাইনাস ॥ প্রতিদানে তুমি যা চাও, গ্রহণ কর…রাজ্য বল, ঐশ্বর্য বল…

মেনন ॥ আমার আশঙ্কা দেখছি অবিকল সত্য ! হায় সেমিরেমিস। আমি তোমাকে এ দরবারে আসতে নিষেধ করেছিলাম।

নাইনাস ॥ [সপদদাপে] বল দেবে কিনা ?

মেনন ॥ ক্ষমা করুন…ক্ষমা করুন সম্রাট।

নাইনাস ॥ এর বিনিময়ে তুমি আমার অপরূপ রূপসী কন্যা সুসানাকে গ্রহণ কর।

মেনন ॥ না।

নাইনাস ॥ এসিরিয়ার সিংহাসন গ্রহণ কর।

মেনন ॥ না।

নাইনাস ॥ না ?

মেনন ॥ না—না—না—।

নাইনাস ॥ অগ্নি স্পর্শ করে তুমি আমার দাসত্ব গ্রহণ করেছিলে।

মেনন ॥ অস্বীকার করি না সম্রাট।

নাইনাস ॥ জীবনে কখনো আমার বিদ্রোহাচরণ করবে না তরবারি স্পর্শ করে শপথ করে সেনানায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছো…মনে আছে ?

মেনন ॥ আছে।

নাইনাস ॥ আমি এই নারীকে গ্রহণ করছি…দেখি তুমি কেমন করে আমায় বাধা দাও। [অগ্রসর হইলেন]

মেনন ॥ [সেমিরেমিসকে লইয়া চকিতে এক পা সরিয়া গিয়া] ক্ষণেক অপেক্ষা।

নাইনাস ॥ অপেক্ষা করার ক্ষমতা নেই—

মেনন ॥ প্রতিজ্ঞার কথা আমার মনে আছে… কিন্তু আপনারও বোধ হয় স্মরণে আছে যে আমিও একদিন আপনার জীবনরক্ষা করেছিলাম ?

নাইনাস ॥ স্মরণ আছে…কিন্তু সে জন্য এই নারীর আশা ত্যাগ করতে পারিনা—

মেনন ॥ পারেন না ?

নাইনাস ॥ না, কিছুতেই না।

মেনন ॥ তবে আপনার সম্পদ বিপদের বিশ্বস্ততম ভৃত্যের আশা ত্যাগ করুন। সম্রাট, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যেমন আপনার বশ্যতা স্বীকার করেছি, আজ তেমনি মৃত্যুবরণ করে আমার সকল ধর্ম বজায় রাখছি—

[আত্মহত্যা করিয়া ভূপতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠলগ্না সেমিরেমিস পড়িয়া যাইতে যাইতে নিদ্রোত্থিতার মত ঠিক দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মেননের আর্তনাদময় সেই মুমূর্ষু অবস্থা দেখিলেন। ক্রমে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। পরে সেই বিস্ফারিত নেত্রে সম্রাটের পানে তাকাইলেন—দেখিলেন সম্রাট নির্বাক বিস্ময়ে মেননের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন।]

নাইনাস ॥ [সেমিরেমিসের সহিত তাহার দৃষ্টি বিনিময় হইতেই শিহরিয়া ·উঠিয়া] উঃ! সুরা। সুরা!

[দেহরক্ষী ছুটিয়া আসিযা মদ্য দান কবিল—সম্রাট পান করিলেন—পরে সেইখানে একখানা কোচের উপর সহসা সশব্দে হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া একধারে হেলিয়া পডিলেন—তাহার চোখ দুটি উর্ধ্ব দৃষ্টিতে বহিল। মুহূর্ত পরে ডাকিলেন]

—সেমিরেমিস! যাদুকরী!

সেমিরেমিস ॥ [ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে সেইখানেই নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া]—কি সম্রাট!

নাইনাস ॥ তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য···

সেমিরেমিস ॥ (তখন মেননের দেহ অসাড় হইয়াছে। নাইনাসের কথা শুনিয়া মেননের মৃতদেহের প্রতি শেষ দৃষ্টিপাত করিয়া দ্রুত পদক্ষেপে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া) ···আমার জন্য?

নাইনাস ॥ তবে আর কার জন্য!

সেমিরেমিস ॥ ঐ সিংহাসন আমাকে ক্রোড়ে ধারণ করবার জন্য আকুল আগ্রহে কাঁপছিল—ঐ রাজমুকুট আমার মাথায় উঠবার জন্য ব্যাকুল আবেগে দুলছিল —না?

নাইনাস। সেমিরেমিস! সেমিরেমিস! দয়া কর—

সেমিরেমিস ॥ আমার আপত্তি নেই···হ্যাঁ, কিন্তু···যাক্

নাইনাস ॥ (উঠিয়া দাঁড়াইয়া আলিঙ্গনোদ্যত বাহুতে) কোথায় তুমি! এই জমাট রক্তের অন্ধকারের মাঝে কোথায় তুমি? অগ্নিশিখার মত তোমার রূপের সে দীপ্ত আলো কই?

সেমিরেমিস ॥ (শূন্য দৃষ্টিতে) নিভে গেছে—

নাইনাস ॥ না—না—তোমার সে আগুন আবার জ্বলে উঠুক।

সেমিরেমিস ॥ (বিজয়দৃপ্তার মত সিংহাসনের পাশে আসিয়া মহীয়সী সম্রাজ্ঞীর মত দাঁড়াইয়া) বেশ—তবে তাই হোক। কিন্তু শোন···বিজয়ী হয়ে যেমন এই রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছিলাম···তেমনি বিজয়িনীর মতই যদি এখানে আমার রাজত্বের অধিকার দাও—আমার জীবনের জয় পরাজয়ের লীলা-ক্ষেত্র এই ব্যাকৃট্রিয়ায়, যদি আমার স্বেচ্ছাচারীর মত রাজদণ্ড পরিচালনার ক্ষমতা দিতে প্রতিশ্রুত হও—যদি আমার শাসন···আমার আদেশ···বিধান অক্ষুণ্ণ চিত্তে মাথা পেতে নিতে স্বীকৃত হও—তবে উঠে এসে এই বিজয়িনী সম্রাজ্ঞীর হাত ধর।

[বাহু প্রসারণ করিয়া দিলেন···নাইনাস ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া তাহার হস্ত ধারণ করিয়া সেই করপদ্মে নতজানু হইয়া সশ্রদ্ধ চুম্বনরেখা অঙ্কিত করিলেন।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[ব্যাক্ট্রিয়ান রাজপ্রাসাদ মধ্যস্থিত সিংহাসন সমন্বিত নাট-মন্দির। সম্মুখের প্রাঙ্গণে কুঞ্জবীথি। মাঝে মাঝে ফোয়ারা। প্রাঙ্গণে তৎকালীন বহু চেয়ার, শোফা ও টেবিল স্তরে স্তরে সজ্জিত। টেবিলের উপর পুষ্পাধারে পুষ্প, মদ্যাধারে মদ্য। প্রত্যেকটি বসিবার আসন ব্যাক্ট্রিয়া-বিজয়ী এসিরিয়ান রাজপুরুষগণ কর্তৃক অধিকৃত।

পূর্ণিমা রাত্রি হইলেও আলোক-সজ্জার মহাসমারোহ। আজ এসিরিয়ান সম্রাট নাইনাস কর্তৃক ব্যাকট্রিয়া বিজয়ের শেষ উৎসব আয়োজন। বিলাসের সকল উপকরণ সুসজ্জিত।

নাটমন্দিরে নর্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিলেন। রাজপুরুষগণ মদ্যপান করিতেছিলেন এবং পরিপূর্ণভাবে সুরা সৌন্দর্য ও সঙ্গীতে মত্ত ছিলেন। সহসা ঘন্টাধ্বনি হইতে লাগিল। সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। নৃত্যগীত থামিয়া গেল, রাজপুরুষগণ সংযত হইলেন। সকলেই অস্ফুটস্বরে গুঞ্জন করিতে লাগিলেন— 'সম্রাট"। "সম্রাট"। অবশেষে নাটমন্দিরের পশ্চাতের দিকের একটি দরজা খুলিয়া গেল। সম্রাট নাইনাস ও তাহার পশ্চাতে ষ্টেব্রবেটস প্রবেশ করিলেন। ষ্টেব্রবেটস উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, "বন্ধুগণ। আপনারা অবিলম্বে এসিরিয়া প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হন। আজিকার মত উৎসব শেষ।" তৎক্ষণাৎ প্রত্যেক দীপ নির্বাপিত হইল। ক্রমে ক্রমে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না আত্মপ্রকাশ করিল, তখন দেখা গেল সম্রাট নাইনাস ও ষ্টেব্রবেটস ভিন্ন নাটমন্দির ও প্রাঙ্গণ জনশূন্য। তাঁহারা দুইজনে জ্যোৎস্না-স্নাত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট তাঁহার জন্য রক্ষিত আসনে উপবেশন করিলেন। ক্রীতদাসীরা আসিয়া মদ্য ও পুষ্পগুচ্ছ রাখিয়া গেল।]

নাইনাস ॥ (ষ্টেব্রবেটসকে) সব প্রস্তুত ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ হ্যাঁ, সব প্রস্তুত। একশত রথ এই প্রাসাদের অঙ্গনে এখনই যাত্রার জন্য সুসজ্জিত।

নাইনাস ॥ এখন রওনা হলে এসিরিয়াতে কখন আমরা পৌঁছাব ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ পরশু রাত্রে।

নাইনাস ॥ সম্রাজ্ঞী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে গেছেন—তুমিও প্রস্তুত হয়ে এসো।

ষ্টেব্রবেটস ॥ আমি…না আমি তো যাব না—

নাইনাস ॥ সে আবার কি ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ আমাকে বিদায় দিন সম্রাট…

নাইনাস ॥ এর অর্থ ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ এসিরিয়ায় আমার ফিরে গিয়ে লাভ ?

নাইনাস ॥ বুঝলাম তোমার অভিমান হয়েছে…কিন্তু শোন…(মদ্যপান) দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?…বসো…

ষ্টেব্রবেটস ॥ আমার উপর যে কাজের ভার দিয়েছিলেন তার একটু বাকী আছে—

নাইনাস। (মদ্যপান করিতে করিতে) সে থাক এখন। তোমাকে এ বিজয়োৎসবে মন খুলে যোগদান করতে দেখলাম না। আজ তুমি আমার অনুরোধে

এই শেষ সময়ে উৎসবে যোগ দাও—বসো ষ্টেব্রবেটস—এসো…গল্প করা যাক্।
তোমার অভিমান আমাকে আজ দূর করতেই হবে (ষ্টেব্রবেটসকে হাত ধরিয়া আসনে বসাইলেন) গল্প শুনবে?

ষ্টেব্রবেটস॥ (নিরুপায় হইয়া) বলুন।

নাইনাস॥ কি গল্প তুমি ভালবাসো?

ষ্টেব্রবেটস॥ (বিপদে পড়িয়া) আপনার যা ভালো লাগে বলুন?

নাইনাস॥ যুবক তোমরা…নারী চরিত্রের একটা গল্পই তবে বলি, কি বল?

ষ্টেব্রবেটস॥ বলুন…

নাইনাস॥ দাঁড়াও—(মদ্যপান) হ্যাঁ, এইবার শোন—এসিরিয়ার এক নীল পাহাড়ের ধারে এক হ্রদের পাশে এক দেবমন্দির ছিল। দেবমন্দিরের পূজারিণী ছিল এক তরুণী…দেবকন্যার মত ছিল তার রূপ…লোকে তাকে হ্রদের পরী বল্‌তো। দেবতাকে পূজা দিতে মনে থাক আর না থাক্…লোকে তাকে প্রীতির অর্ঘ দিতে ভুলতো না। সেই দেশের রাজা একদিন সেই মন্দিরে পূজা দিতে গেছেন…গিয়ে দেখেন মন্দিরের অঙ্গনে এক বিদেশী পুরুষ,সঙ্গে তার সুন্দরী স্ত্রী আর তাদের শিশুপুত্র।—তিনজনেই অনাহারে মুমূর্ষুপ্রায়।—তারপর কি হ'ল বলতো? (মদ্যপান)

ষ্টেব্রবেটস॥ আমি কি ক'রে জানব!

নাইনাস॥ তারপর কি হ'লে তুমি সুখী হও?

ষ্টেব্রবেটস॥ যাই হোক না কেন! গল্প তো।

নাইনাস॥ তবু ষ্টেব্রবেটস…তবু—

ষ্টেব্রবেটস॥ যদি ঐ মুমূর্ষুরা বেঁচে ওঠে, তবে আমি কেন, সকলেই খুশী হয়।

নাইনাস॥ সকলেই?

ষ্টেব্রবেটস॥ হ্যাঁ, তা—ই বই কি।

নাইনাস॥ আমি গল্পের শেষ দিকটা জানি…জেনে শুনে আমি বলছি…যদি তারা তখনই মরে যেত, তবে আমি শুধু খুশি হতাম না…হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। উঃ! শেষের দিকটা…সে কি ভয়ঙ্কর! —না, আজ এই পর্যন্তই থাক।

ষ্টেব্রবেটস॥ কেন, শেষে কি হলো?

নাইনাস॥ না, সে আর তোমার শুনতে হবে না…বরং চল আমরা ওখানে গিয়ে গান শুনি—

ষ্টেব্রবেটস॥ গল্পটা শেষই করে নিন।

নাইনাস॥ না না না, শেষের দিকটা তুমি সহ্য করতে পারবে না—সে শক্তি তোমার নেই।

ষ্টেব্রবেটস॥ [তাচ্ছিল্যপূর্ণস্বরে]—বলছিলেন তো মাত্র একটা ঘুম-পাড়ানী গল্প।

নাইনাস॥ যা-ই বলি না কেন, এর শেষ অংশ তোমার ধারণার অতীত…

তোমার সহ্যেরও অতীত। যদি সহ্য করতে পারতে তবে···না···বৃথা কেন বাজে বকছি! তুমি পারবে না—

ষ্টেব্রবেটস ॥ হাঃ হাঃ হাঃ!

নাইনাস ॥ তুমি হাসছো? ষ্টেব্রবেটস! তুমি হাসছো? বেশ···যদি তুমি পার সহ্য করতে তবে—

ষ্টেব্রবেটস ॥ তবে··· ?

নাইনাস ॥ আমি প্রতিজ্ঞা করছি···

ষ্টেব্রবেটস ॥ [বিস্ময়ে] প্রতিজ্ঞা করছেন?

নাইনাস ॥ হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা করছি যে আমার কন্যা সুসানাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করবো।

ষ্টেব্রবেটস ॥ [পরিপূর্ণ বিস্ময়ে···পরিপূর্ণ আবেগে] সম্রাট,—সম্রাট আপনি প্রতিজ্ঞা করছেন?

নাইনাস ॥ [প্রতি কথায় জোর দিয়া···সুস্পষ্টস্বরে] হ্যাঁ আমি প্রতিজ্ঞা করছি··· ঈশ্বরের নামে আমি শপথ করছি···কিন্তু, এক শর্তে। যদি তুমি আমার গল্পের শেষাংশ সহ্য করতে না পার তাহলে শুধু যে তুমি সুসানার আশা পরিত্যাগ করবে—তা নয়···তোমাকে তখনি অস্ত্র ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হতে হবে···যেহেতু ধৈর্যধারণের ক্ষমতার উপর বীরত্বের নিদর্শন—অস্ত্রধারণের যোগ্যতা নির্ভর করে। কেমন, এতে তুমি সম্মত?

ষ্টেব্রবেটস ॥ [সোল্লাসে]—নিশ্চয় সম্মত।

নাইনাস ॥ তবে আর আমার দোষ নেই—[মদ্যপান]—বলব?

ষ্টেব্রবেটস ॥ বলুন—বলুন -শীঘ্র বলুন···

নাইনাস ॥ হ্যাঁ শীঘ্রই বলছি। তারপর···তারপর মরণের দুয়ার হতে সেই তিন মুমূর্ষু প্রাণীকে ফিরিয়ে নিয়ে এল, মন্দিরের সেই পূজারিণী। পুরুষটি সুস্থ হয়ে রাজার নিকট পত্নীপুত্র নিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করল—সেই পূজারিণীও তাদের দুর্দশায় কাতর হয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে তাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য রাজাকে অনুরোধ করল—কিন্তু ঐ বিদেশীদের পশ্চাতে শত্রু রয়েছে জেনে রাজা অনর্থক এই বিপদকে বরণ করতে প্রথমে অনিচ্ছুক হলেও, শেষে রমণীর অশ্রুভারাবনত মুখশ্রী রাজাকে জয় করল···

ষ্টেব্রবেটস ॥ রাজাও বোধ হয় সেই পূজারিণীর পূজারী ছিলেন—

নাইনাস ॥ পূজারী হ'লেন···কিন্তু তার নয়—সেই আশ্রিতা বিদেশিনীর অনিন্দ্য রূপ রাশির। কিন্তু, সে ছিল সতী। তাঁর মধ্যে সতীত্বের এমন একটা দীপ্ত তেজ ছিল যে রাজা তাঁর চোখে চোখ রাখতেও সাহস পেতেন না।

ষ্টেব্রবেটস ॥ তারপর?

নাইনাস ॥ বলছি—[মদ্যপান]—তুমিও আজ একটু পান কর না ষ্টেব্রবেটস?

ষ্টেব্রবেটস ॥ পান করছি—কিন্তু, আপনি গল্প শেষ করুন—[মদ্যপান]

নাইনাস ॥ ষ্টেব্রবেটস! জানি না কেন, এই গল্পও শেষ হয়ে আসছে—

আর আমার চোখের সম্মুখে গাঢ় অন্ধকার জমাট হয়ে [সহসা] ষ্টেব্রবেটস—আজ কি অমাবস্যা ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ আজ পূর্ণিমা। আপনি বলুন, শীঘ্র শেষ করুন।

নাইনাস ॥ তোমার প্রতিশ্রুতির কথা মনে আছে ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ আপনার প্রতিশ্রুতির কথা মনে আছে ?

নাইনাস ॥ আছে।

ষ্টেব্রবেটস ॥ আমারও আছে।

নাইনাস ॥ তারপর প্রায় এক বৎসর পর রাজার পক্ষে এক সুযোগ উপস্থিত হলো। সেই বিদেশী পুরুষটি আর মন্দিরের সেই পূজারিণী গুপ্ত প্রেমের নাগ-পাশে ধরা দিয়েছিল। রাজপ্রাসাদে স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়লে পুরুষটি গভীর রাত্রে স্ত্রীর অজ্ঞাতে চুপি চুপি শয়ন কক্ষ ত্যাগ করে পূজারিণীর নিকট সেই মন্দিরে চলে যেত। রাজা সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে কিছুদিন পর এই ফাঁক দেখতে পেলেন—শেষে এক রাত্রে··· ষ্টেব্রবেটস, মদে কি নেশা হয় ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ আপনিই জানেন—

নাইনাস ॥ আমার বোধ হয়, হয় না। আমার মনে হচ্ছে সেই বিচিত্র রজনীর অভূতপূর্ব পাপাচার আমি তোমার কাছে শুধু গল্পে বলছি না— ···আজ আমি স্বচক্ষে দেখছি···আর শিউরে উঠছি।

ষ্টেব্রবেটস ॥ আপনি থামবেন না—

নাইনাস ॥ শেষে এল এক অমাবস্যা রাত্রি, ঠিক আজকের মত গাঢ় অমাবস্যা।

ষ্টেব্রবেটস ॥ আজ পূর্ণিমা।

নাইনাস ॥ হোক পূর্ণিমা। সেই অমাবস্যা রাত্রে সেই আশ্রিতা বিদেশিনীর স্বামী যখন অভিসারে গেল, তখন—

ষ্টেব্রবেটস ॥ হ্যাঁ তখন···

নাইনাস ॥ তখন সেই বিদেশিনী জেগে উঠলেও অনুভব করত সে বুঝি তার স্বামীর পাশেই শুয়ে আছে—

ষ্টেব্রবেটস ॥ [সবিস্ময়ে] তার অর্থ— ?

নাইনাস ॥ ···হ্যাঁ, শুধু সেই অমাবস্যার এক রাত্রি নয়···তারপর বহু রাত্রি··· তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে সেই আশ্রিতা বিদেশিনী তার সেই অন্ধকার কক্ষে নীরব এক শয়তান কর্তৃক প্রবঞ্চিতা হয়ে মনে করেছে, সে তার স্বামীর গাঢ় আলিঙ্গনেই রাত্রি যাপন করেছে।

ষ্টেব্রবেটস ॥ এ গল্প কে রচনা করেছে সম্রাট ?

নাইনাস ॥ [সহসা অট্টহাস্যে] হাঃ হাঃ হাঃ—আমি। এখনো বল ষ্টেব্রবেটস ···এইখানেই থামব···না শেষ পর্যন্তই শুনবে ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ শেষ—শেষ—শেষ চাই—

নাইনাস ॥ বেশ্। দাঁড়াও, শ্রান্ত হয়েছি···একটু পান করে নি [মদ্য পান] হ্যাঁ তারপর, তারপর একদিন প্রাতে সেই মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত রাজার কাছে শশব্যস্তে উপস্থিত। খবর দিলেন, প্রত্যুষে উঠে মন্দিরের প্রভাতী আরতি শুনতে না পেয়ে কারণ অনুসন্ধানে গিয়ে দেখেন মন্দিরের প্রাঙ্গণে সেই বিদেশী পুরুষ রক্ত শয্যায় চিরনিদ্রিত—তার বুকে শাণিত এক ছুরিকা আমূল বিদ্ধ। আর সবার চাইতে যা আশ্চর্য সে হচ্ছে মৃতদেহের পাশে এক সদ্যোজাত শিশুকন্যা—অগণ্য শ্বেত-পারাবত ঠোঁটে করে জল এনে তার মুখে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। পুরোহিত সেই শিশুর বুকের মাঝে এক পারাবত চিহ্ন উল্কি দিয়ে এঁকে তাকে ভগবানের দয়ার উপর রেখে দিয়ে ছুটে এসেছেন রাজার কাছে—তাঁকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখাতে—

ষ্টেব্রবেটস ॥ আর সেই পূজারিণী ?

নাইনাস ॥ পরে জানা গেল লোক লজ্জার ভয়ে সেই রাক্ষসী সন্তান প্রসবের সেই রাত্রিতেই তার ঐ বিদেশী গুপ্ত প্রণয়ীকে হত্যা করে সদ্যজাত শিশুকে নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যাগ করে সেই হ্রদে ডুবে মরেছে।

ষ্টেব্রবেটস ॥ তারপর ?

নাইনাস ॥ তারপর···এদিকে রাজপ্রাসাদে সেই বিদেশিনী জানত সে তার স্বামীর পাশেই ছিল। কিন্তু, সে নিজে যখন সেই মৃতদেহ দেখে এল, তখন গত রাত্রিতে তার ধর্মনাশের ক্ষোভে, লজ্জায় সে আত্মহত্যা করতে উঠেছে এমন সময় তার বালক পুত্র কেঁদে উঠল...সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের ছুরি মাটিতে পড়ে গেল—

ষ্টেব্রবেটস ॥ উঃ কি মর্মান্তিক ! কি করুণ !

নাইনাস ॥ ষ্টেব্রবেটস ! ষ্টেব্রবেটস ! এখনো শেষ হয়নি...এরই মধ্যে কাতর হচ্ছো ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ [সপ্রতিভ হইয়া] না—না—না—আমার কিছুই হয়নি। আমি প্রাণ খুলে হাসতে পারি—আমি এখনো মদ খেয়ে স্ফূর্তি করতে পারি।

নাইনাস ॥ এই নাও...মদ খাও...

ষ্টেব্রবেটস ॥ দিন [মদ্য গ্রহণ ও পান]—তারপর ?

নাইনাস ॥ তারপর দশমাস পরে সেই মনে প্রাণে শুদ্ধা সতী এক কন্যা প্রসব করে তার শুদ্ধতার গৌরব নিয়ে চিরকালের জন্য পরমাত্মার মাঝে শান্তি লাভ করলো।

ষ্টেব্রবেটস ॥ [সোল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া] সম্রাট...এইবার আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন। [উচ্চৈস্বরে] সুসানা—সুসানা—সুসানা কোথায় সম্রাট ?

নাইনাস ॥ [ধীর গম্ভীর স্বরে] প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার সময় এখনো কার-ই আসেনি।...গল্প এখনো শেষ হয়নি—।

ষ্টেব্রবেটস ॥ [অধীর ভাবে] আর কি বাকী ? আর কত বাকী ?—আমি সুসানাকে ডেকে নিয়ে আসি সম্রাট...

নাইনাস ।। [ধীর গম্ভীর স্বরে] এত অধীর তুমি ! ছিঃ ! লজ্জা করে না যে তুমি সুসানার ভাইএর মত প্রতিপালিত হয়েও তাকেই বিবাহ করবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছ ?

ষ্টেব্রবেটস ।। [উন্মত্তবৎ] তা আমি জানিনা—সে আমি বুঝিনা—। আপনি গল্প শেষ করে আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন ।

নাইনাস ।। তবে শোন ষ্টেব্রবেটস !—এ মিথ্যা গল্প নয়...এ সত্য...আমি যা বলেছি, ঈশ্বরের দিব্য করে বলছি তা সম্পূর্ণ সত্য ।

ষ্টেব্রবেটস ।। —সত্য ?

নাইনাস ।। প্রত্যেকটি অক্ষর সত্য ।

ষ্টেব্রবেটস ।। বেশ তো···ভালো কথা !—সেই রাজার নাম কি ছিল ?

নাইনাস ।। 'নাইনাস' ।

ষ্টেব্রবেটস ।। [চমকিয়া উঠিয়া]...আপনি ?

নাইনাস ।। আমি । ষ্টেব্রবেটস চমকে উঠলে কেন ?...ঠিক আছো তো ?

ষ্টেব্রবেটস ।। [বিচলিত হইয়াও] ঠিক আছি সম্রাট !...তারপর ?

নাইনাস ।। এই গল্পের যারা জীবিত আছে শুধু তাদের পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হবে । সেই পূজারিণীর সদ্যজাত কন্যাকে মন্দিরে ফিরে গিয়ে আর দেখতে পাইনি —কারা তাকে এরই মধ্যে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল...উল্কি দিয়ে তার বুকে পারাবত চিহ্ন আঁকা আছে, এইমাত্র তার সন্ধান জানি—

ষ্টেব্রবেটস ।। তারপর ?

নাইনাস ।। প্রতিশ্রুতির কথা মনে আছে ষ্টেব্রবেটস ?

ষ্টেব্রবেটস ।। বেশ আছে সম্রাট । আপনি শেষ করুন—আমি সুসানাকে আজ সারাটি দিন দেখিনি ।

নাইনাস ।। আশ্চর্য হচ্ছি ভগ্নীকে বিবাহ করবার তোমার অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখে ।

ষ্টেব্রবেটস ।। আমি তাকে আর ভগ্নীর চোখে দেখিনা—সে আমার ভগ্নী নয় ।

নাইনাস ।। ষ্টেব্রবেটস...সেই তোমার ভগ্নী । আমি বলছি সেই তোমার ভগ্নী ।

ষ্টেব্রবেটস ।। আমি তা মানিনা—

নাইনাস ।। তুমি না মানতে পারো...কিন্তু, আজ যদি তোমার মা বেঁচে থাকতেন ...তিনি মানতেন । তুমি আর সুসানা একই মায়ের গর্ভে জন্মলাভ করেছ । তোমার পিতা আমার আশ্রিত ভারতের সেই বেদেশী রাজা ; ভারতবর্ষ হতে তুমি তাঁদের সঙ্গেই এসেছিলে...আর সুসানার জন্ম আমার রাজপ্রাসাদে—তোমারই মায়ের গর্ভে, কিন্তু তার পিতা তোমার পিতা নন—

ষ্টেব্রবেটস ।। তবে ?

নাইনাস ।। অন্ধকার কক্ষে নীরব এক শয়তান !—তাকে কি চেনা যায় ?

ষ্টেব্রবেটস ।। বল···সুসানার পিতা—?

নাইনাস ॥ আমি। হাঃ হাঃ হাঃ…[বিরাট হাস্য]

ষ্টেব্রবেটস ॥ [তৎক্ষণাৎ অসি কোষমুক্ত করিয়া নাইনাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া] শয়তান !—সুসানার জন্মের কলঙ্ক নিশান !—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও—

নাইনাস ॥ ষ্টেব্রবেটস তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর—অবিলম্বে অস্ত্র পরিত্যাগ কর—তুমি আমার গল্প সহ্য করতে পারনি।

[ষ্টেব্রবেটসের উদ্যত অসি কাঁপিতে লাগিল—তাঁহার মুখ চোখ বিবর্ণ হইয়া গেল। কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার হাত নামিয়া পড়িল।]

নাইনাস ॥ যাক্…সত্যব্রতের মতই তুমি সত্য রক্ষা করেছ। তোমার উদ্যত তরবারি নমিত করে তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছ। কিন্তু তবে কি আমার গল্পের শেষাংশ সহ্য করে, সুসানার জন্মের ইতিহাসও অনায়াসে হজম করে তার পাণি গ্রহণই স্থির করলে নরাধম ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ [এই খোঁচা খাইয়া পুনরায় নাইনাসকে লক্ষ্য করিয়া তরবারি উত্তোলন করিয়া] কুক্কুর তোর ঐ পাপ রসনা জন্মের মত স্তব্ধ হোক।

নাইনাস ॥ [আত্মরক্ষার্থ এক পা সরিয়া গিয়া] তুমি তবে আমার বর্ণিত কাহিনী সহ্য করতে পারছ না—

ষ্টেব্রবেটস ॥ কোন সন্তানই সহ্য করতে পারেনা।

নাইনাস ॥ তবে এই মুহূর্তে প্রতিশ্রুতি মত অস্ত্র ত্যাগ কর।

ষ্টেব্রবেটস ॥ হ্যাঁ অস্ত্র ত্যাগ করছি—[অতি উত্তেজনায় অস্ত্র ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন—কিন্তু বেগ সামলাইতে না পারিয়া নিজেও ভূতলশায়ী হইলেন—পড়িয়া যাইতে যাইতে—] কিন্তু নিরস্ত্র হলেও এর প্রতিশোধ একদিন নেবই—নেব।

[নাইনাস কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন। স্থান ত্যাগ করিতে গিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলেন প্রত্যেকটি দীপ জ্বলিয়া উঠিল। নাটমন্দিরের পার্শ্বে সম্রাজ্ঞী সেমিরেমিস দাঁড়াইয়া তাঁহার পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছেন। নাইনাস দ্রুতগতিতে সেমিরেমিসের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে আভূমিনত হইয়া অভিবাদন করিলেন।]

সেমিরেমিস ॥ [শির ঈষৎ নত করিয়া হাস্যমুখে নাইনাসের অভিবাদন গ্রহণ করিয়া।] কে ঐ অসম সাহস স্পর্ধিত যুবক…তোমার পানে অস্ত্র নিক্ষেপ করে "প্রতিশোধ নেব" বলে চীৎকার করে উঠল ?

নাইনাস ॥ দুরাত্মা ষ্টেব্রবেটস। মদ্যপানে আজ তার উচ্ছৃঙ্খলতা চরমে উঠেছে।

সেমিরেমিস ॥ কিন্তু ওর চোখে মুখে কি একটা জ্বলন্ত জ্যোতি দেখলাম যা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে ঐ প্রবেশ পথে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম।—সে জ্যোতি তো আমি তোমাতে দেখিনি—নাইনাস !

নাইনাস ॥ আমার দুর্ভাগ্য প্রেয়সী !—কিন্তু, এসিরিয়া যাত্রার বড় বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে ! এদিকে যাত্রার সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত।

সেমিরেমিস ॥ দাঁড়াও নাইনাস। আজ আমার ব্যাকট্রিয়া রাজত্বের শেষ রজনী। আজ আমাকে আমার মহিমার পূর্ণ গৌরবে উদ্ভাসিত হতে দাও…এসো…ঐ সিংহাসন তলে এসো।

[বিজয়িনীর মত সিংহাসনে হেলান দিয়া গ্রীবা উন্নত করিয়া দাঁড়াইলেন। নাইনাস বেদীতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

সেমিরেমিস ॥ নাইনাস! এমন রূপ কখন দেখেছ? এমন প্রতিভা কখন দেখেছ?

নাইনাস ॥ বিশ্ববিজয়িনী হয়ে তুমি জন্মেছ নারী!

সেমিরেমিস ॥ নাইনাস! নাইনাস! অথচ আমার তৃপ্তি নেই! তৃপ্তি নেই! পূজা পেয়ে অবসাদ এসেছে…এখন পূজা করবার উন্মাদনায় আমি মরছি নাইনাস! [হস্তস্থিত দর্পণ সম্মুখে ধরিয়া] কিন্তু পূজা করব কাকে? আত্মসমর্পণ করব কার কাছে? আমারও চাইতে সুন্দর…সে কে? নাইনাস বলতো সে কে?

নাইনাস ॥ কেউ নয়। কেউ নাই।

সেমিরেমিস ॥ কিন্তু আমি যেন কাউকে দেখছি। আমার এই দর্পণে আমার যে ছবি পড়ে…আজ যদি এখনি সেই জীবন্ত মূর্তি আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াতো তবে আমার এই সৌন্দর্য নিবেদন করে সার্থকতার তৃপ্তি লাভ করতে পারতাম। নাইনাস! নাইনাস! সম্মুখে এসে দাঁড়াও দেখি তুমি কি আমার সেই দেবতা? নাইনাস! কে সে? কোথায় সে?

নাইনাস ॥ সে এখনো জন্মগ্রহণ করেনি। তুমি শুধু দয়া করে আমাকে তোমার দাসানুদাস করেছ—

সেমিরেমিস ॥ দয়া করে! [কুটিল হাস্য] নাইনাস! নাইনাস! এই চোখে কি দয়ার রেখা কখনও চকিতেও কি বিদ্যুৎ রেখার মত ঝলসে উঠতে দেখেছ? ঠিক বল…সত্যি করে বল?

নাইনাস ॥ দেখেছি।

সেমিরেমিস ॥ [রাগিয়া] মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা!

নাইনাস ॥ [ভয় পাইয়া] সেমিরেমিস! সেমিরেমিস!

সেমিরেমিস ॥ সেমিরেমিস মরে গেছে। সে আত্মহত্যা করেছে। বুঝলে নাইনাস! সেমিরিমিস সেদিন আত্মহত্যা করেছে। আজ আমি শুধু বিশ্ব-বিজয়িনী সম্রাজ্ঞী মাত্র। আমি বিচার করব—

নাইনাস ॥ কার বিচার করবে?

সেমিরেমিস ॥ তোমার।

ষ্টেব্রবেটস ॥ [তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বিচারের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসিয়া সেমিরেমিসের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া] হ্যাঁ, সম্রাজ্ঞী! বিচার কর—

নাইনাস ॥ সাবধান ষ্টেব্রবেটস—

সেমিরেমিস ॥ সাবধান নাইনাস—আমার সম্মুখে চোখ রাঙিয়ো না—। কিন্তু, একি ! ষ্টেব্রবেটস ! উঠে দাঁড়াও দেখি—

[ষ্টেব্রবেটস উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেমিরেমিস একবার দর্পণে তাহার নিজের মুখ দেখিতে লাগিলেন আবার ষ্টেব্রবেটসকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন]

ষ্টেব্রবেটস ! ষ্টেব্রবেটস। আর একটু কাছে এসো—[ষ্টেব্রবেটস দুই পা অগ্রসর হইলেন। এই দর্পণ নাও [ষ্টেব্রবেটস সসম্ভ্রমে দর্পণ গ্রহণ করিলেন] এই দর্পণে তোমার মুখ দেখে আমার দিকে তাকাও দেখি—[ষ্টেব্রবেটসের তথা করণ] তুমি কে ষ্টেব্রবেটস ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ সম্রাজ্ঞীর দাসানুদাস—

সেমিরেমিস ॥ সম্রাজ্ঞীর দর্পণ। তোমার ঐ মুখে তোমার ঐ চোখে আমার প্রতিবিম্ব দেখছি মনে হচ্ছে। তুমি কি সুন্দর ষ্টেব্রবেটস !

ষ্টেব্রবেটস ॥ [দর্পণে তাহার প্রতিবিম্ব ও সেমিরেমিসের মুখ চোখ স্থির সংবদ্ধ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে সেমিরেমিসের দিকে অগ্রসর হইলেন—পরে, হঠাৎ তাহার পার্শ্বে গিয়া] তোমার বুকের বসনখানি একবার খোলো দেখি—

সেমিরেমিস ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] নাইনাস ! এই মুহূর্তে এই বর্বরকে হত্যা কর—

[নাইনাস ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত ছুটিয়া আসিয়া ষ্টেব্রবেটসের হাত ধরিয়া তাহাকে এক টানে বেদীতলে আনিয়া তাহার তরবারি উত্তোলন করিলেন।]

ষ্টেব্রবেটস ॥ [সেমিরেমিসের প্রতি চাহিয়া]—এই কি বিচার ?

সেমিরেমিস ॥ ও···হ্যাঁ, বিচার !—নাইনাস, তরবারি নামাও—[নাইনাস তরবারি নামাইলেন।] বিচার ! বিচার !—আমার বিচার ? [সহসা ষ্টেব্রবেটসকে] ষ্টেব্রবেটস !—তোমার অস্ত্র কোথায় ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ এই নাইনাস আমাকে নিরস্ত্র করেছে সম্রাজ্ঞী !

সেমিরেমিস ॥ [তাঁহার কটিদেশ হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া ষ্টেব্রবেটসের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া] তুলে নাও [ষ্টেব্রবেটস অস্ত্র তুলিয়া নিলেন] [বাহিরে ভেরী বাজিয়া উঠিল]

নাইনাস ॥ প্রাসাদ ত্যাগ করে যাত্রা করবার মঙ্গল-মুহূর্ত উপনীত। বিলম্ব হলে আজ আর যাত্রা করা হবেনা সম্রাজ্ঞী !

সেমিরেমিস ॥ তার প্রয়োজনও নেই। ঐ ভেরী আমার বিচার-কাহিনী বিশ্বভুবনে প্রচার করুক। [সহসা] ষ্টেব্রবেটস ! নাইনাসের বুকে আমার স্বামী মেননের ঐ বিষাক্ত ছুরিকা অবিলম্বে বিদ্ধ কর।

[আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল—নাইনাস আর্তনাদ করিয়া ভূপতিত হইলেন]

সেমিরেমিস ॥ [সিংহাসন হইতে বেদী তলে উন্মত্তবৎ লাফাইয়া পড়িয়া নাচিতে নাচিতে নাইনাসের সম্মুখে আসিয়া তাহার মৃত্যু-মলিন নেত্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া] হাঃ হাঃ হাঃ—

তৃতীয় অঙ্ক

[সিন্ধুতটে এসিরিয়ান শিবিরশ্রেণী। উহাদের মধ্যস্থলে সম্রাজ্ঞী সেমিরেমিসের বৃহৎ বিচিত্র শিবির। তাহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত গালিচা বিস্তৃত। তদুপরি উপবেশন উদ্দেশ্যে তৎকালীন আসনশ্রেণী সন্নিবিষ্ট। সূর্যাস্তের বিলম্ব নাই। তাহার কনককিরণ আভা সিন্ধুতটকে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া সিন্ধুবক্ষে ঝলমল করিতেছে। সম্রাজ্ঞী সেমিরেমিসও ষ্টেব্রবেটস সেই শিবির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া অস্তায়মান সূর্যের অপূর্ব দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। শুক্লপক্ষের চন্দ্র ইতিমধ্যেই আকাশে দেখা দিয়াছে। রক্ষীদল চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান। দৃশ্যের একধারে সিন্ধুতটে পল্লীবালাগণ কলসী লইয়া জল লইতে আসিয়াছিল। নদীতটে কলসী রাখিয়া তাহারা প্রদীপ জ্বালাইল—ও গাহিতে গাহিতে একযোগে সেই প্রদীপের আলো নদীবক্ষে ভাসাইয়া দিয়া কলসীতে জল ভরিয়া লইয়া যেদিক দিয়া আসিয়াছিল সেই দিকেই চলিয়া গেল।]

সেমিরেমিস ॥ ষ্টেব্রবেটস! সোনার ভারত তোমার এই দেশ আমার হবে! এই কল্পনার স্বর্গ জয় করেছি, কেন, জানো তুমি?

ষ্টেব্রবেটস ॥ আমার সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ভাষা খুঁজে পাই না সম্রাজ্ঞী।

সেমিরেমিস ॥ তোমাকে তোমার পিতৃরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে—এই কথা তো ষ্টেব্রবেটস?—কিন্তু শুধু তাই নয়। প্রথমে হয়ত সেই উদ্দেশ্যই ছিল—কিন্তু এখন যে নিজেরই লোভ হচ্ছে ষ্টেব্রবেটস।

ষ্টেব্রবেটস ॥ রাজত্ব তো তুমিই করবে সম্রাজ্ঞী।

সেমিরেমিস ॥ ভুল-ভুল! আমি এদেশে রাজত্বের তৃষ্ণা নিয়ে আসিনি, সে তৃষ্ণা নিয়ে এসেছো তুমি, আমি এসেছি কেন জানো?

ষ্টেব্রবেটস ॥ তুমিই বল সম্রাজ্ঞী?

সেমিরেমিস ॥ আমি এসেছি ভোগের পিপাসা নিয়ে।—কি ভোগ করবো জানো?

ষ্টেব্রবেটস ॥ কি সম্রাজ্ঞী?

সেমিরেমিস ॥ ঐ সিন্ধুবক্ষে অস্তায়মান সূর্যের রক্ত রাঙা আলো···। ওকি শুধু আলো? ওকি শুধু রং? বল দেখি ষ্টেব্রবেটস?

ষ্টেব্রবেটস ॥ তোমার মুখেই শুনি সেমিরেমিস।

সেমিরেমিস ॥ ও আলো প্রেমের সেই সোনালী আলো,—ও রং, আকাঙ্ক্ষার রক্তরাগ। অনুভব করতে পার ষ্টেব্রবেটস?

ষ্টেব্রবেটস ॥ এখন হয়ত পারছি···

সেমিরেমিস ॥ না, তুমি পারো না। আমি পারি কেন জানো?

ষ্টেব্রবেটস ॥ কেন?

সেমিরেমিস ।। ও ছবি আমি এঁকেছি। আমি ওতে রং দিয়েছি। আর কি উপভোগ করবো জানো ?

ষ্টেব্রবেটস ।। তোমার যা খুশি সম্রাজ্ঞী।

সেমিরেমিস ।। আমার যা খুশি !—দিতে পারবে ষ্টেব্রবেটস ?

ষ্টেব্রবেটস ।। সম্রাজ্ঞীকে দানের স্পর্ধা রাখি না আমি।

সেমিরেমিস ।। সে স্পর্ধা তবে কে রাখে ষ্টেব্রবেটস ?

ষ্টেব্রবেটস ।। আমি তোমায় শুধু আমার পূজার অর্ঘ নিবেদন করতে পারি—

সেমিরেমিস ।। [বিরক্ত হইয়া] পূজা ! অর্ঘ ! নিবেদন !—ষ্টেব্রবেটস, আমি যেন আর কখনও তোমার নিকট এ স্তুতি গাথা শুনতে না পাই—সাবধান !

ষ্টেব্রবেটস ।। তবে আমি আর কি দিতে পারি ?

সেমিরেমিস ।। একজন সম্রাট তার তুল্য একজন সম্রাজ্ঞীকে যা দিতে পারে…

ষ্টেব্রবেটস ।। কিন্তু, আমি কি সম্রাট, সেমিরেমিস ?

সেমিরেমিস ।। যদি আমি সম্রাজ্ঞী, তবে তুমিও সম্রাট। তা কি—হয় না ষ্টেব্রবেটস ?

ষ্টেব্রবেটস ।। [হাসিয়া] কি রূপ ?

সেমিরেমিস ।। কেন—তোমার পিতৃশত্রু সিন্ধুরাজ কি আজ প্রভাতে বশ্যতা স্বীকার করে যাননি ?

ষ্টেব্রবেটস ।। তা গেছেন বটে…

সেমিরেমিস ।। কাল প্রভাতে আমি প্রকাশ্য দরবারে—তোমাকে পারস্য ও পাঞ্জাবের অধীশ্বররূপে অভিষিক্ত করব, আর আজ এই গোধূলি লগ্নে, দিবস-রজনীর এই শুভ মিলন মুহূর্তে, তার সূচনা স্বরূপ এই অঙ্গুরীয়ক আর এই মুক্তাহার দিয়ে তোমাকে অভিনন্দিত করছি।

[ষ্টেব্রবেটসকে অঙ্গুরীয়ক ও হার পড়াইয়া দিলেন]

ষ্টেব্রবেটস ।। সেমিরেমিস ! সেমিরেমিস !—তুমি আমার কে ?

সেমিরেমিস ।। বল—বল—আমি তোমার কে ?

ষ্টেব্রবেটস ।। দেবতা।

সেমিরেমিস ।। [উত্তর শুনিয়া পুনরায় বিরক্ত হইয়া] না ষ্টেব্রবেটস ! বল আমি তোমার কে ?

ষ্টেব্রবেটস ।। তুমি আমার স্নেহময়ী ভগিনী।

সেমিরেমিস ।। [আরো বিরক্ত হইয়া] মূর্খ ! [পরে শান্ত কোমল স্বরে, আবেগে] বোঝ নাকি ষ্টেব্রবেটস ! কিসের জন্য কোন সুদূর ব্যাকট্রিয়া হতে—কত সহস্র বিপদকে তুচ্ছ করে—কত রক্ত নদী পার হয়ে আমি এসেছি এই শান্ত শীতল ভারতের কুঞ্জ কাননে ?

ষ্টেব্রবেটস ।। তুমি আমার মহামাহমাময়ী অতিথি—যদি অনুমতি কর—

সেমিরেমিস ॥ [স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর না দেখিয়া] বেশ তবে আমি অতিথি-ই। আতিথেয়তার জন্য ভারত চিরপ্রসিদ্ধ। কি শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিয়ে তুমি আমাকে অভ্যর্থনা করছ ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ যদি অনুমতি কর, তবে পাঞ্জাবের-রাজকোষের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নহার তোমাকে দক্ষিণা দেব।

সেমিরেমিস ॥ ষ্টেব্রবেটস ! তুমি এত অবোধ !—ভাল, [রক্ষীকে ইঙ্গিত। সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল]···সেনাপতি হাইডাসপেস। [রক্ষী অভিবাদনান্তে চলিয়া গেল] ষ্টেব্রবেটস ! তুমি কি জানো না যে মানুষের নিজস্ব কি শ্রেষ্ঠদান ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ [নীরব রহিলেন।]

সেমিরেমিস ॥ [ক্রুর হাস্য] বুঝেছি ষ্টেব্রবেটস !—তুমি জেনেও তা মুখ ফুটে বলবে না··· হয়ত···কেন ···হুঁ ···আচ্ছা, দাঁড়াও—[সেনাপতি হাইডাসপেস প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন।] সেনাপতি হাইডাসপেস ! নাইনাস নন্দিনী সুসানাকে এইখানে নিয়ে এস—[সেনাপতির প্রস্থান]

ষ্টেব্রবেটস ॥ বিদ্রোহিনী সুসানা বন্দিনী ?—কখন সে ধরা পড়েছে সম্রাজ্ঞী ?

সেমিরেমিস ॥ কাল রাত্রে—

ষ্টেব্রবেটস ॥ আমি তো তার কিছুই জানিনা !

সেমিরেমিস ॥ ইচ্ছাকরেই আমি তা তোমার নিকট গোপন রেখেছি। জানালে হয়ত তার মুক্তির জন্য আবেদন শুনতে শুনতে আমাকে অস্থির হয়ে উঠতে হতো···

ষ্টেব্রবেটস ॥ [শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন, পরে ক্ষুব্ধচিত্তে কহিলেন] সম্রাজ্ঞী ! —যে ষ্টেব্রবেটস শুধু তোমার একটিমাত্র অঙ্গুলি হেলনে সম্রাট নাইনাসের বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে দৃকপাত করেনি···যে জন্য তার কন্যা বিদ্রোহিনী হয়ে দস্যু সৈন্যসহ গুপ্তভাবে এসিরিয়ান সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করলে···তোমার জীবন নিরাপদ করতে গিয়ে যে ষ্টেব্রবেটস তোমার দেহরক্ষীর দায়িত্ব আনন্দে বরণ করে নিয়েছে··· তুমি কি তাকে লক্ষ্য করে তোমার ঐ শ্লেষপূর্ণ কটাক্ষপাত করলে ?

সেমিরেমিস ॥ তা এখনি বোঝা যাবে ষ্টেব্রবেটস।

[সেনাপতি হাইডাসপেস কর্তৃক পরিচালিত হইয়া সুসানার প্রবেশ। সুসানা অভিবাদন করিলেন না···সেমিরেমিস ও ষ্টেব্রবেটসকে একসঙ্গে দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন।]

সেমিরেমিস ॥ নাইনাস-নন্দিনী সুসানা ! আমি নিতান্ত দুঃখিত যে আজ তোমাকে আমার নিকট বন্দিনীর সাজে আসতে হ'ল—তুমি আমার স্নেহের পাত্রী··· স্নেহের পাত্রী কেন···একদিন তুমি আমার বিবাহের বধূ হয়েছিলে !

সুসানা ॥ ব্যঙ্গের কোন প্রয়োজন দেখি না সেমিরেমিস—পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি বিদ্রোহ করেছিলাম···আজ ধরা পড়েছি। শাস্তি দিতে হয়— শাস্তি দাও, ব্যঙ্গের কি প্রয়োজন ?

সেমিরেমিস ॥ বেশ…তবে বিচারই হোক। অপরাধ তুমি নিজেই স্বীকার করেছ…এ অপরাধের কি যোগ্য দণ্ড সেটাও না হয় তোমার নিজের মুখেই শুনি…

সুসানা ॥ আমার মুখে শুনে লাভ ?

সেমিরেমিস ॥ আমি দেখব তুমি আমার নিকট হতে কিরূপ শাস্তি প্রত্যাশা কর। এ আমার একটা খেয়াল মাত্র! জীবনটাই যে শুধু খেয়ালের উপর চালিয়ে এল তার পক্ষে এ বিচিত্র নয়।

সুসানা ॥ এখানে আমি তোমার সাথে খেলতে আসিনি সেমিরেমিস্।

সেমিরেমিস ॥ সম্রাজ্ঞী সেমিরেমিসের খেয়াল তুচ্ছ নয়। তোমাকে আমি শাস্তি দিতে চাই—আমার শুধু দেখতে ইচ্ছা…তার গুরুত্ব, তার ভীষণত্ব…তুমি আমার নিকট হতে যে শাস্তি প্রত্যাশা কর…তারও উপরে ওঠে কিনা। অস্ত্র ধরতে আমিও জানি…তুমিও জানো…। আমিও যুদ্ধ করেছি তুমিও যুদ্ধ করেছ…নারী হয়েও নরহত্যা কেউ বাদ রাখিনি। আজ এখন কল্পনার শক্তি পরীক্ষা হোক। এসো… দুইজনে দুই বিভিন্ন কাগজে দুইজনের কল্পিত শাস্তি বিধান লিপিবদ্ধ করি [রক্ষীকে ইঙ্গিত…রক্ষী লিখিবার উপকরণ আনিল] আমি সম্রাজ্ঞী সেমিরেমিস প্রতিজ্ঞা করছি…তোমার দণ্ডদান সম্বন্ধে যদি আমাদের দুইজনের বিধান বিভিন্ন হয়… তবে এই ষ্টেব্রবেটস যার লিখিত শাস্তি অনুমোদন করবে…তোমাকে তাই বরণ করে নিতে হবে!

সুসানা ॥ এই তুমি প্রতিজ্ঞা করছ ?

সেমিরেমিস ॥ হ্যাঁ, আমি এই প্রতিজ্ঞা করছি…

সুসানা ॥ তবে দাও লিখবার উপকরণ [সুসানা ও সেমিরেমিসকে রক্ষী লিখিবার উপকরণ দিল।]

[সুসানা একবার ষ্টেব্রবেটসের প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া পরে লিখিতে লাগিলেন। সেমিরেমিসও লিখিতে লাগিলেন। উভয়ের লেখা শেষ হইল।]

সেমিরেমিস ॥ [সুসানাকে] লেখা হয়েছে ?

সুসানা ॥ হয়েছে—

সেমিরেমিস ॥ ঐ ষ্টেব্রবেটসের হাতে দাও—[সুসানা নিশ্চল রহিলেন—তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল] হুঁ আচ্ছা, বেশ…আমার হাতে দাও—[সুসানার লেখা গ্রহণ ও দুখানা কাগজই ষ্টেব্রবেটসের হাতে প্রদান।] ষ্টেব্রবেটস!—সুসানা তার অপরাধের জন্য কি রূপ শাস্তি প্রত্যাশা করে তা সে নিজে তার ঐ কাগজে লিখেছে— তুমি পাঠ কর।

[ষ্টেব্রবেটস মনে মনে পড়িলেন—পড়িয়াই চমকিত হইলেন…তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।]

সেমিরেমিস ॥ পাঠ কর ষ্টেব্রবেটস…

[ষ্টেব্রবেটস পড়িতে সমর্থ হইলেন না।]

সেমিরেমিস ॥ ষ্টেব্রবেটস—তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছনা ?—পড়, অবিলম্বে পড়—

ষ্টেব্রবেটস ॥ [কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িলেন] সেমিরেমিসের আদেশে ষ্টেব্রবেটস সুসানাকে বুকে ছুরিকাঘাত করিয়া হত্যা করিবে—[পড়া শেষ হইতে না হইতেই তাঁহার হাত হইতে দুইখানি কাগজই পড়িয়া গেল। ভীত কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন···] আমি পারবোনা সম্রাজ্ঞী, আমি কিছুতেই পারবোনা।

সুসানা ॥ সম্রাট নাইনাসের বুকের চেয়ে আমার বুক কঠিন নয়, ষ্টেব্রবেটস! তোমার ক্ষুধার্ত ছুরিকা সহজেই তাতে আমূল বিদ্ধ হবে। তবে আর তোমার আপত্তি কেন বল!

ষ্টেব্রবেটস ॥ (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রহিলেন)

সেমিরেমিস ॥ তবে তুমি বন্দিনীর লিখিত বিধান অনুমোদন করনা ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ না, করিনা।

সেমিরেমিস ॥ কথা আছে যদি আমাদের দুইজনের লিখিত বিধান একরূপ না হয়, তবেই তোমার যে কোনটা অনুমোদন বা অননুমোদনের ক্ষমতা—কিন্তু ষ্টেব্রবেটস! যদি দুইজনের বিধান এক হয় তবে তোমাকে অবশ্যই আমার বিচার মান্য করতে হবে। সেনাপতি হাইডাসপেস! রক্ষীবর্গ! আমার প্রতিজ্ঞা যাতে রক্ষা হয়, তার জন্য প্রস্তুত থাক। এইবার সুসানার অপরাধের জন্য আমি তার কি শাস্তি বিধান করেছি—আমার ঐ কাগজে তা লেখা রয়েছে—পাঠ কর ষ্টেব্রবেটস···

[ষ্টেব্রবেটস নিশ্চল রহিলেন]

সেমিরেমিস ॥ [গম্ভীর স্বরে] প-ড়।

[ষ্টেব্রবেটস ভয়-কম্পিত হস্তে সেমিরেমিসের কাগজখানা তুলিয়া নিলেন। পড়িতে গিযা আবার নামাইলেন—আবার তুলিলেন—আবার নামাইলেন।]

সেমিরেমিস ॥ [সপদদাপে চীৎকার] ষ্টেব্রবেটস,—অবিলম্বে পড়।

ষ্টেব্রবেটস ॥ [পড়িলেন] এতদ্বারা সম্রাজ্ঞী সেমিরেমিস অদ্য নাইনাস নন্দিনী সুসানাকে পারস্য ও পাঞ্জাব ভিন্ন সমগ্র এসিরিয়ান সাম্রাজ্য দান করিলেন।

[এই পর্যন্ত পড়িতেই বিস্ময়ে ষ্টেব্রবেটসের হাত হইতে কাগজখানি পড়িয়া গেল—বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তিনি বলিয়া উঠিলেন—]

সেমিরেমিস! সেমিরেমিস! এ স্বপ্ন না সত্য ?

সুসানা ॥ সেমিরেমিস! এ বুঝি তোমার পর্বত প্রমাণ পাপের যৎকিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান—তবে বিবেকের দংশনে অনুতাপ আরম্ভ হয়েছে তোমার ?

সেমিরেমিস ॥ [সহাস্যে] ভুল—ভুল—ভুল বুঝেছ সুসানা—আমি পাপ করিনি। এই বুকে হাত দিয়ে বলছি—আমি বিচার করেছি।

সুসানা ॥ সেমিরেমিস, তবে ইণ্ডিয়ার প্রেমে পড়ে এসিরিয়া ত্যাগ করছ! কিন্তু, শোন···আমি তোমার প্রদত্ত এসিরিয়া আমার দেহ মনের সমস্ত অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করছি। ইণ্ডিয়া কে না ভালবাসে সেমিরেমিস ?

সেমিরেমিস ॥ তুমি তবে আমার এ দান প্রত্যাখ্যান করছ ?

সুসানা ॥ হ্যাঁ, করছি।

সেমিরেমিস ॥ বুঝে দেখ—বেশ ভাল করে বুঝে দেখ—

সুসানা ॥ আমি বেশ ভাল করেই বুঝে দেখলাম···

সেমিরেমিস ॥ ষ্টেব্রবেটস! আমার কাগজখানা তুলে নাও—তুলে নাও··· [ষ্টেব্রবেটস কাগজ তুলিয়া নিলেন] তুমি ওর প্রথমাংশ মাত্র পড়েছ। এখন দ্বিতীয়াংশ পাঠ কর—

[ষ্টেব্রবেটস এক নিঃশ্বাসে মনে মনে কাগজখানি পাঠ করিয়া নীরব রহিলেন]

সেমিরেমিস ॥ ষ্টেব্রবেটস!—নীরব কেন ?—পাঠ কর···[ষ্টেব্রবেটস তবু নীরব রহিলেন।] বিলম্ব করলে চলবে না— [সপদদাপে] পাঠ কর—

ষ্টেব্রবেটস ॥ [পাঠ করিলেন···] যদি সুসানা এসিরিয়ার সিংহাসন গ্রহণ না করে, তবে সম্রাজ্ঞী সেমিরেমিসের বিধান—তার অন্যতর শাস্তি প্রাণদণ্ড—[সকলেই ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন—পরে, সেমিরেমিস সেই নীরবতা ভঙ্গ করিলেন]

সেমিরেমিস ॥ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও নাইনাস নন্দিনী।

সুসানা ॥ আমি প্রস্তুত হয়েই এখানে এসেছি।

ষ্টেব্রবেটস ॥ সম্রাজ্ঞী। দয়া কর—দয়া কর তুমি—

সেমিরেমিস ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—নাইনাসকে হত্যা করবার সময় তো তোমার এ দয়ার কথা মনে ছিল না ষ্টেব্রবেটস! এখন বুঝে দেখ সুসানাকে বন্দী করতে পেরেও···সে সংবাদ তোমার নিকট গোপন রেখেছিলাম কেন! [সহসা] ঘাতক— [ঘাতকের প্রবেশ ও অভিবাদন]—ঐ নারীকে অবিলম্বে হত্যা কর—

[ঘাতক সুসানার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।]

সুসানা ॥ [পরিপূর্ণ আবেগে] ষ্টেব্রবেটস। তুমি আমায় হত্যা কর—

ষ্টেব্রবেটস ॥ [চমকিয়া উঠিয়া]—আমি ?

সুসানা ॥ হ্যাঁ, তুমি! তবেই আমার এ মৃত্যুতে সান্ত্বনা থাকবে। ষ্টেব্রবেটস—ষ্টেব্রবেটস—[ষ্টেব্রবেটস নীরব রহিলেন] ষ্টেব্রবেটস [নতজানু হইয়া] তুমি আমায় নিরাশ করো না—

ষ্টেব্রবেটস ॥ [মুহূর্তকাল কি ভাবিলেন, পরে সুসানাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন।] ঘাতক···ছুরি দাও··· [ঘাতকের হাত হইতে ছুরি লইলেন] [সুসানাকে] এসো নারী [সুসানাকে হাতে ধরিয়া লইয়া প্রাঙ্গণের পার্শ্বদেশে গেলেন।]

[সেমিরেমিস বিস্মিত ভাবে তাহার কার্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। ষ্টেব্রবেটস সহসা সুসানাকে একহাতে জড়াইয়া ধরিয়া এক লম্ফে তাহার অশ্বে উঠিয়া পলায়ন করিলেন—চক্ষের নিমেষে এই কাণ্ড ঘটিল।]

সেমিরেমিস ॥ [তাঁহার চমক ভাঙ্গিলে সেনাপতি হাইডাসপেসকে লক্ষ্য করিয়া] ছবির মত দাঁড়িয়ে দেখছ কি অকর্মণ্যের দল ?—পশ্চাদ্ধাবন কর—সমগ্র

অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তীরের মত ছোট···এক ঘণ্টার মধ্যে আমি দুজনকে আমার সম্মুখে শৃঙ্খলিত দেখতে চাই—যদি পার রাজ্যখণ্ড পুরস্কার, আর যদি না পারো—

সেনাপতি হাইডাসপেস ॥ নিজের ছিন্ন শির তোমার নিকট পাঠিয়ে দেব সম্রাজ্ঞী। [দ্রুত প্রস্থান]

[মুহূর্ত পরে দামামা বাজিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে শত অশ্বের ক্ষুরোত্থিত শব্দ শোনা গেল। দামামা ধ্বনি সিন্ধুতটে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেমিরেমিস বিচলিত হৃদয়ে চঞ্চল চরণে এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন···উৎকর্ণ হইয়া কি শুনিতে লাগিলেন। আবার পরক্ষণেই মাটির দিকে তাকাইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।]

সেমিরেমিস ॥ [হঠাৎ হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করিলেন—এক দেহরক্ষী তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল]—ভেরী বাজাও—প্রাণপণে বাজাও—ঐ ভেরীর শব্দ দামামা ধ্বনিকে স্তব্ধ করে দিক্—বাজাও—প্রাণপণে বাজাও যদি আমার কার্যসিদ্ধ হয়,—শত স্বর্ণমুদ্রা তোমার পুরস্কার—

[রক্ষী তৎক্ষণাৎ ভেরী বাজাইল—আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া ভেরীর শব্দ বাজিয়া উঠিল। সেমিরেমিস পুনরায় চঞ্চলভাবে চতুর্দিকে চাহিয়া ভেরী বাদ্যের ফলাফল পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই সেনাপতি হাইডাসপেস অশ্বারোহণে ছুটিয়া আসিয়া অশ্ব হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সেমিরেমিসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। সেমিরেমিস হাইডাসপেসকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া, উন্মত্তের মত বিজয় নৃত্যে সেনাপতির সম্মুখে আসিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।]

সেমিরেমিস ॥ ভেরীর শব্দে তোমাকে অবিলম্বে আমার এখানে ফিরে আসবার জন্য সঙ্কেত করেছিলাম—আমার হস্ত চুম্বনের সৌভাগ্য অর্জন করেছ হাইডাসপেস—

[সেনাপতি সশ্রদ্ধায় তাঁহার হস্ত চুম্বন করিলেন]

ঐ ভেরীবাদককে শত স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিয়ো—

হাইডাসপেস ॥ অনুসরণ করে তাদের বন্দী করে আনবার আদেশ দিয়ে পুনরায় ভেরী সঙ্কেতে আমায় প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন কেন সম্রাজ্ঞী ? নাইনাস নন্দিনীর পক্ষীয় বিদ্রোহী সৈন্যদল আমাদিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করেছে— [নেপথ্যে—'রাণী সুসানার জয়']—ঐ শুনুন তাদের জয়ধ্বনি—

সেমিরেমিস ॥ করুক আক্রমণ। আমি যুদ্ধ করবো না।

হাইডাসপেস ॥ যুদ্ধ হবে না ? সে কি ?

সেমিরেমিস ॥ হ্যাঁ যুদ্ধ হবে না। যুদ্ধ করে লাভ কি হাইডাসপেস ? যুদ্ধ কি আমি করিনি ? আর কোন যুদ্ধে আমি জয়লাভ না করেছি ?

হাইডাসপেস ॥ তবে আজই বা এই অভিনব ব্যবস্থা কেন সম্রাজ্ঞী ? সেই বিদ্রোহিনী আর সেই বিশ্বাসঘাতককে ধরতে যখন মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব ছিল—তখন আপনি আমাদের ফিরিয়ে আনলেন—আবার এখন তাদের আক্রমণকেও প্রতিহত করতে নিষেধ করছেন—এর অর্থ কি সম্রাজ্ঞী ?

সেমিরেমিস ॥ [ম্লান হাস্যে] তুমি তা বুঝবে না সেনাপতি !

[নেপথ্যে সুসনার জয়ধ্বনি]

হাইডাসপেস ॥ তবে বিনা যুদ্ধে পরাজয় বরণ করবেন ?

সেমিরেমিস ॥ হ্যাঁ পরাজয় বরণ করবো ! সমগ্র বিশ্ব আমার এ অভূতপূর্ব পরাজয়ে বিস্ময় প্রকাশ করবে…কিন্তু একজন বুঝবে যে, এ পরাজয় অভিমানের পরাজয়…আমি এর বেশী আর কিছু চাইনা, হাইডাসপেস !

[নেপথ্যে সুসানার জয়ধ্বনি]

হাইডাসপেস ॥ কিন্তু—তাদের জয়ধ্বনি ঐ যে আমাদের শিবিরের সম্মুখে বিঘোষিত হচ্ছে।

সেমিরেমিস ॥ হোক…এইখানে…আমার এই চোখ দুটির সম্মুখে…আমার এই মর্মের মাঝখানে হোক না কেন—কিছুমাত্র ক্ষতি নেই। ও জয়ধ্বনিতে তার অধিকার আছে। সে যুদ্ধজয়ের চাইতেও সহস্র গুণে গৌরবময় জয়লাভ করেছে—সে হৃদয় জয় করেছে…আমি তা পারিনি !

হাইডাসপেস ॥ তবে অধীনের ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন—আমি আপনার দেহরক্ষার ভার নিলাম। [রক্ষীবর্গের প্রতি] রক্ষীবর্গ ! তোমরা শিবিরের প্রবেশ পথ রক্ষা কর—এখানে আমি স্বয়ং রইলাম— [রক্ষীদের প্রস্থান]

সেমিরেমিস ॥ [আপন মনে] অথচ…বিশ্ববিজয়িনী আমি ! এক অঙ্গুলী হেলনে, এক কটাক্ষে—[সহসা হাইডাসপেসকে] হাইডাসপেস ! আমার চক্ষু তারকা নিষ্প্রভ হয়েছে ? ঠিক বল, সত্য করে বল ?

হাইডাসপেস ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] কি বললেন সম্রাজ্ঞী ?

সেমিরেমিস ॥ আমার চোখে কি আর বিদ্যুৎ খেলেনা সেনাপতি ?

হাইডাসপেস ॥ আকাশের বিদ্যুৎকেও তুচ্ছ করি—কিন্তু, আজো, ও চোখের বিদ্যুৎকে আমার তরবারিও ভয় করে সম্রাজ্ঞী !

সেমিরেমিস ॥ [কটিদেশ হইতে একখানা ক্ষুদ্র দর্পণ বাহির করিয়া মুখ দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা তীর বাহির হইতে ছুটিয়া আসিয়া ঠিক তাহার বুকে বিদ্ধ হইল।]—হো—হো—হো—[আর্তনাদ করিয়া সেমিরেমিস পার্শ্বস্থ একখানা কৌচে হেলিয়া পড়িয়া গেলেন।]

হাইডাসপেস ॥ গুপ্ত হত্যা ! সম্রাজ্ঞী ! অসহ্য ! আদেশ দিন…এখনো আদেশ দিন—[নতজানু হইয়া বসিয়া যুদ্ধের আদেশ প্রার্থনা করিলেন।]

[অতি সন্নিকটে "সুসানার জয়" ধ্বনি হইল।]

হাইডাসপেস ॥ [ঐ জয়-ধ্বনি শুনিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরে তাকাইয়া] ঐ নাইনাস নন্দিনী ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে…এখনি আপনাকে বন্দী করবে—

সেমিরেমিস ॥ [আর্তনাদ]—ও—হো—হো—[অতিকষ্টে] সঙ্গে ষ্টেব্রবেটস নেই ?

হাইডাসপেস ॥ না—তাকে তো দেখছি না—

সেমিরেমিস ॥ তাকে দেখছ না !—দেখ, ভাল করে দেখ—সঙ্গে আছে কি না—

হাইডাসপেস ॥ [ভাল করিয়া দেখিয়া] না—সে সঙ্গে নেই—

সেমিরেমিস ॥ [অতি কষ্টে হাইডাসপেসের স্কন্ধে ভর করিয়া]—তবে নাইনাস নন্দিনীর হাতে ধরা দিতে আমি জন্মিনি—বিজয়িনী হয়ে জন্মেছিলাম…আজও বিজয়িনীর গৌরব নিয়েই মরবো—চল, শীঘ্র আমাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিয়ে ঐ বিপরীত পথ দিয়ে চল। ষ্টেব্রবেটস ! বিদায় !—ইণ্ডিয়া আমার বড় ভালো লেগেছিলো…কিন্তু ও—হো—হো—[হাইডাসপেস সহ প্রস্থান]

[সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে সুসানার জয়ধ্বনি—কয়েকজন সৈন্যের প্রবেশ ও সেমিরেমিসের অনুসন্ধান। এক হস্তে রক্তপতাকা ও অন্য হস্তে যুদ্ধাস্ত্র সহ সুসানার প্রবেশ]

সুসানা ॥ [প্রবেশ পথেই]—সেমিরেমিস ! সেমিরেমিস !—এইবার—[আসিয়া দেখেন সেমিরেমিস নাই—] একি ! সেমিরেমিস তবে পলায়িত ?

[ষ্টেব্রবেটসের প্রবেশ]

ষ্টেব্রবেটস ॥ —সেমিরেমিস ! সম্রাজ্ঞী !—[সেমিরেমিসের বক্ষ নির্গত রক্তধারা দেখিয়া] একি এত রক্ত কেন…এত রক্ত কেন সুসানা ?

সুসানা ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ! সম্রাজ্ঞীর রক্ত সাধারণের চেয়ে একটু বেশীই হয় ষ্টেব্রবেটস…[তাঁহার সৈন্যগণের প্রতি] বন্ধুগণ…সে…ঐ শিবিরে, সেখানে না হয়, ঐ সিন্ধুবক্ষে কোন নৌকায় নিশ্চয়। অবিলম্বে চলে এস।

[ক্ষুধিত ব্যাঘ্রীর মত সৈন্যগণ সহ সুসানার প্রস্থান]

ষ্টেব্রবেটস ॥ এ রক্ত কার ? [ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই রক্ত স্রোত নিরীক্ষণ করিলেন।] এই রক্ত-স্রোতে ও কার মুখ ? কার ঐ কালো চোখ ?—ওকি আমার…না…তাঁর ?—সেমিরেমিস ! সেমিরেমিস ! ও কি তুমি ?…না, আমি ? ও মুখ তোমার না আমার ? [হঠাৎ উঠিয়া নিকটস্থ কৌচে শিথিল শরীরখানি ছাড়িয়া দিয়া] নাইনাস ! নাইনাস !—তুমি বলতে পার ও রক্ত তাঁর না আমার ?—ও কি একই রক্ত ? [রাজমুকুট হস্তে সিন্ধু-রাজ মন্ত্রীর প্রবেশ]…কে ?

মন্ত্রী ॥ আমি সিন্ধু রাজের মন্ত্রী।

ষ্টেব্রবেটস ॥ [তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বরে] কি প্রয়োজন ?

মন্ত্রী ॥ সম্রাজ্ঞী সেমিরেমিসের আজ্ঞায় সিন্ধুরাজমুকুটে আপনাকে অভিষিক্ত করতে এসেছি—

ষ্টেব্রবেটস ॥ তা এখন এখানে কে আসতে বলল ?

মন্ত্রী ॥ সম্রাজ্ঞী স্বয়ং—সেনাপতি হাইডাসপেসকে দিয়ে ভূতপূর্ব সিন্ধুরাজকে তাঁর এই আদেশ জ্ঞাপন করেছেন।

ষ্টেব্রবেটস ॥ কখন ?

মন্ত্রী ॥ ক্ষণকাল পূর্বে।

ষ্টেব্রবেটস ॥ সম্রাজ্ঞী কোথায় ?

মন্ত্রী ॥ জানিনা। তিনি অজ্ঞাতবাস করছেন।

ষ্টেব্রবেটস ॥ কিন্তু তবে ও কে ? ঐ ঐ……উঃ কি কালো মেঘ ? তারই পাশ দিয়ে,…মন্ত্রী ! যুদ্ধ থেমে গেছে না, না ?

মন্ত্রী ॥ হ্যাঁ মহারাজ !

ষ্টেব্রবেটস ॥ আজ অমাবস্যা ? না পূর্ণিমা ?

মন্ত্রী ॥ পূর্ণিমা ।

ষ্টেব্রবেটস ॥ তবে এত অন্ধকার কেন ?

মন্ত্রী ॥ কালবৈশাখীর পূর্ব লক্ষণ । আকাশে মেঘ করেছে…

ষ্টেব্রবেটস ॥ চাঁদে আর মেঘে লুকোচুরি খেলা চলছে…না ?

মন্ত্রী ॥ হ্যাঁ মহারাজ ।

ষ্টেব্রবেটস ॥ এ লুকোচুরি তো আজ নূতন নয়…ধরি ধরি করেও আমি তাকে ধরতে পারিনি ! ঐ ঐ [সোল্লাসে] মন্ত্রী ! এখন চাঁদ উঠবে না ? হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি ! হ্যাঁ ঐ যে…ঐ জ্যোৎস্না—সমুদ্রে নৌকায় পাল তুলে দিয়ে ঐ শ্বেতবসনা সুন্দরী কে যায় মন্ত্রী ?

মন্ত্রী ॥ মহারাজ ! এই মুকুট আপনার মাথায় রাখি ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ তুমি মুকুট রেখে যাও ।

মন্ত্রী ॥ কিন্তু ?

ষ্টেব্রবেটস ॥ যাও…বিরক্ত ক'রো না…যাও তুমি ।

মন্ত্রী ॥ তাঁর আদেশ ছিল—

ষ্টেব্রবেটস ॥ আমার অবাধ্য হয়ো না মন্ত্রী ।

মন্ত্রী ॥ বেশ্ । এই মুকুট রইল, তবে আমি আসি মহারাজ !

[অভিবাদনান্তে প্রস্থান]

ষ্টেব্রবেটস ॥ ঐ রূপ সাগরে সাঁতার কাটে কে ! ও কি পরীর খেলা ? শ্বেত-পারাবতের মেলা ! কি ও ?…কে সে ? ও বুকের মাঝে কি লুকানো রয়েছে ? ও কি ! ও যে রক্ত ! ও যে রক্তের ফোয়ারা !…[প্রবল চেষ্টায় প্রকৃতিস্থ হইয়া] না, আর পারিনা, আর দেখবো না, আর দেখবো না, আর ভাববো না ।

[পুনরায় কৌচে চক্ষু মুদিয়া হেলিয়া পড়িলেন । আপাদমস্তক শ্বেতবস্ত্র মণ্ডিত এক রমণী মূর্তি ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল]

রমণী-মূর্তি ॥ আমি এসেছি ।

ষ্টেব্রবেটস ॥ [স্বপ্নাবিষ্টভাবে] কে তুমি ?

রমণী-মূর্তি ॥ আমি রাজশ্রী ।

ষ্টেব্রবেটস ॥ কেন এলে ?

রমণী-মূর্তি ॥ ঐ রাজমুকুট তোমার মাথায় তুলে দিতে ।

ষ্টেব্রবেটস ॥ তার আর প্রয়োজন নেই । ঐ যে তার তরী খেয়ায় এসে ভিড়েছে । হ্যাঁ, ঐ যে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে ! কিন্তু, খেয়া যে দূরে…

বহুদূরে! আলো ছায়ার মাঝ দিয়ে পথ! কেমন করে যাবো! রাজশ্রী! লক্ষ্মী!
—আমায় নিয়ে যেতে পারবে তুমি?

রমণী-মূর্তি ॥ সেই জন্যেই তো এসেছি আমি!

ষ্টেব্রবেটস ॥ তবে আমার হাত ধর······

রমণী-মূর্তি ॥ তার পূর্বে এই রাজমুকুট পর···

ষ্টেব্রবেটস ॥ পরিয়ে দাও···

রমণী-মূর্তি ॥ দিলাম।

ষ্টেব্রবেঠস ॥ এইবার চল।

রমণী-মূর্তি ॥ [হাত ধরিয়া] ওঠ··· [ষ্টেব্রবেটস উঠিলেন] কিন্তু, আমার বুকে তীরের ফলাটা বিঁধেই রয়েছে···টান দিয়ে সেটা তোল···

ষ্টেব্রবেটস ॥ [চমকিয়া উঠিলেন। উৎকণ্ঠিত ব্যগ্রতায়] তীরের ফলা! তোমার বুকে?

রমণী-মূর্তি ॥ হ্যাঁ বড় ব্যথা···কিন্তু ব্যথা কি তুমি বোঝ?

[বিদ্যুৎ চমকাইয়া গেল]

ষ্টেব্রবেটস ॥ এ কি!—তুমি?—খোল, তোমার বুকের বসনখানি খোল দেখি···

[আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। ষ্টেব্রবেটস তৎক্ষণাৎ রমণীর বুক নগ্ন করিলে সেই সুতীব্র বিদ্যুতালোকে দেখা গেল রমণীর বক্ষস্থলে তীরবিদ্ধ একটি শ্বেত পারাবত মূর্তি। তখনি তাহার মুখাবরণও উন্মোচন করিয়াই রমণীকে পরিপূর্ণ ভাবে চিনিলেন···এবং বিস্ময়ে এক পা পশ্চাতে সরিয়া আসিয়া]

সেমিরেমিস! সেমিরেমিস! তোমার বুকের ঐ শ্বেত পারাবত আজ তীরবিদ্ধ, মৃত। কিন্তু জীবিত আমার প্রেম।

[সেমিরেমিসকে বাণমুক্ত করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ চমকাইয়া ভীষণ মেঘগর্জন হইল।]

॥ যবনিকা ॥

কারাগার

তৃতীয় সংস্করণে

লেখকের কথা

"কারাগার" এক্ষণে নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর "নাট্যমন্দির" এবং নাট্যনায়ক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহের "নাট্যনিকেতন" এই যুক্ত সম্প্রদায় কর্তৃক "নাট্য নিকেতনে" মহাসমারোহে অভিনীত হইতেছে।

বরদা ভবন
বালুরঘাট, দিনাজপুর। ১লা নভেম্বর, ১৯৩২ } মন্মথ রায়

প্রস্তাবনা

ধরিত্রী—

জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।
কাঁদে ধরিত্রী নিপীড়িতা, কাঁদে ভয়ার্ত নরনারী
ঐ বাজে তব আরতি-বোধন,
কোটী অসহায় কণ্ঠে রোদন।
ব্যথিত হৃদয়ে ফেলিয়া চরণ,
বেদনা-বিহারী এস নারায়ণ,
কংস-কারার অন্ধ-প্রাকার-বন্ধন অপসারি॥

———

কারাগার

পরিচয়

উগ্রসেন	...	ভোজবংশাবতংস মথুরাধিপতি।
কংস	...	ঐ পুত্র।
বসুদেব	...	যদুকুল-শ্রেষ্ঠ।
কীর্তিমান	...	ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র।
বিদূরথ	...	কংস-সেনাপতি (যাদব)।
কঙ্কণ	...	ঐ পুত্র।
রঞ্জন	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
নরক	...	কংসের মন্ত্রী।
দেবকী	...	বসুদেব-পত্নী।
কঙ্কা	...	যাদব কন্যা।
চন্দনা	...	যাদব-তরুণী।
অঞ্জনা	...	বিদূরথ-পত্নী।

নর্তকীগণ, মদিরা, যাদবগণ, সৈন্যগণ, পূজারী, পূজারিণী ও প্রহরিগণ।

প্রথম অঙ্ক

॥ এক ॥

[মথুরানগরী। নারায়ণ মন্দির। বিস্তীর্ণ সোপান-শ্রেণী। সম্মুখে প্রাঙ্গণ।]

[প্রভাত। একদল ভয়ার্ত যাদব। চোখে মুখে আতঙ্ক। কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে,...আশ্রয়প্রার্থী। রুদ্ধ মন্দির-দ্বারে ব্যাকুল করাঘাত।]

যাদবগণ ॥ [সমস্বরে] বসুদেব! বসুদেব! খোল দ্বার—দ্বার খোল—

[দুয়ার খুলিয়া গেল। বসুদেব। শালগ্রামশিলার পূজাবেদী দেখা গেল।]

যাদবগণ ॥ বসুদেব, রক্ষা কর—

বসুদেব ॥ [তাহাদিগকে ঠিক চিনিতে না পারিয়া] তোমরা—

যাদবগণ ॥ যাদব।

১ম যাদব ॥ তোমার স্বজাতি, তোমার স্বগোষ্ঠী।

বসুদেব ॥ কি হয়েছে ?

১ম যাদব ॥ অত্যাচার—

২য় যাদব ॥ অত্যাচার—

যাদবগণ ॥ নিদারুণ অত্যাচার—

বসুদেব ॥ কে অত্যাচার করল ?

যাদবগণ ॥ কংস।

বসুদেব ॥ কি অত্যাচার ?

১ম যাদব ॥ কি অত্যাচার নয় ? সে ঘোষণা করিয়েছে রাজ্যের যত পূজা সব রাজার প্রাপ্য, দেবতার নয়। রাজ্যে রাজার পূজা ভিন্ন দেবতার পূজা নিষেধ।

বসুদেব ॥ তোমরা তা মেনে নিয়েছ।...এ মন্দিরের নারায়ণ পূজায় বহুদিন তোমরা যোগদান কর না...

১ম যাদব ॥...হ্যাঁ, করি না, প্রাণভয়েই করি না, কিন্তু ঘরে ঘরে গোপনে আমরা নারায়ণ পূজা করতাম,—কিন্তু সে কথাও...

বসুদেব ॥ কংস জেনেছে, তোমাদেরই কারো মুখে। তোমরাই আজ কংসের সৈন্য, তোমরাই তার গুপ্তচর, অনুচর, সহায়সম্পদ !

১ম যাদব ॥ অস্বীকার করবার উপায় নাই।...কিন্তু এত করেও তো প্রভুর মন পেলাম না। অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

বসুদেব ॥ যেহেতু অত্যাচার সইবার ক্ষমতাও তোমাদের বেড়ে চলেছে।

১ম যাদব ॥ আমাদের ঘরে ঘরে তার সশস্ত্র সৈন্য প্রহরী এল। তারাও যাদব। যাদব হয়েও তারা যদুকুলের আরাধ্য-দেবতা নারায়ণ-বিগ্রহ ধ্বংস করল ! যে বাধা দিতে গেল, সে প্রাণ হারাল। যে বাধা দিল না, সে বেঁচে গেল। আরো অপমান আরো উৎপীড়ন—আরো অত্যাচার কপালে লেখা রয়েছে, তাই আমরা মরতে পারলাম না !...

বসুদেব ॥ যে অত্যাচার সহ্য করে, মৃত্যু তাকে ঘৃণা করে।...মৃত্যু তাকে পদাঘাত করে' পরশ দেয়,...মৃত্যু-যন্ত্রণা দেয়, কিন্তু আলিঙ্গন দিয়ে মুক্তি দেয় না... শান্তি দেয় না—।

১ম যাদব ॥ সে কথা মর্মে মর্মে বুঝ্‌ছি। উৎপীড়ন সহ্য করে প্রাণ বাঁচিয়েই চলেছি, কিন্তু...এতটুকু শান্তি পাচ্ছি না। আমাদেরই একটি মেয়ে, নাম চন্দনা—

বসুদেব ॥ হ্যাঁ, চন্দনা...। সে এই মন্দিরে এসে প্রত্যহ পূজা দেয়, সন্ধ্যায় আরতি করে, প্রভাতে প্রভাতী গায়। কাল সন্ধ্যায়...

১ম যাদব ॥ সে এসেছিল, কিন্তু আজ আর আসবে না। কাল রাত্রে দুর্বৃত্তরা তাকে আমাদেরই চোখের সামনে বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে গেল।...

বসুদেব ॥ আ—হা—হা...পিতৃমাতৃহীনা সেই অনাথাকে ধরে নিয়ে গেল... তোমরা কেউ বাধা দিলে না ?

১ম যাদব ॥ বাধা দেব মনে করে অসিতে হাত দিতে যাচ্ছিলাম...অমনি

তারা রুখে এসে বল্‌ল—"অসি দাও, অস্ত্রধারণে তোমাদের কোন অধিকার নেই, বিশেষ আমাদের বিরুদ্ধে।"

বসুদেব ॥ এত বড় সত্যকথা জগতে আর কেউ কোনদিন বলেছে কিনা সন্দেহ। তোমরা অস্ত্রত্যাগ করলে তো ?

১ম যাদব ॥ [সোৎসাহে] না।

বসুদেব ॥ তবে কি যুদ্ধ হল ?

১ম যাদব ॥ না।

বসুদেব ॥ তবে ?

১ম যাদব ॥ আমরা "দিচ্ছি" বলে ঘরে এসে…খিড়কির দুয়ার দিয়ে পালিয়ে এলাম।—[সকলে সগর্বে বস্ত্রাবরণতল হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া দেখাইল] এই আমাদের অস্ত্র—

বসুদেব ॥ চমৎকার!…আর তবে ভয় নাই…খাপের ভেতর ভরে রাখ… বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওদের অসুখ হতে পারে। কিন্তু তোমাদের স্ত্রী-পুত্র ?

১ম যাদব ॥ —সেই কথা ভেবেই আমরা আকুল হচ্ছি।…আমরা নির্যাতিত, উৎপীড়িত, নিঃসহায় যাদব। আপনার পিতা মহামতি শূরসেনের হাত থেকে যেদিন দুরাত্মা উগ্রসেন রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে মথুরায় ভোজবংশের আধিপত্য স্থাপন করল, সেই দিন থেকেই যদুকুলের এই দুর্দশা। মহামতি শূরসেন আজ নেই, আছেন আপনি…। আপনি আপনার স্বজাতি…স্বগোষ্ঠী রক্ষা করুন!

বসুদেব ॥ এখন এ ক্রন্দন বৃথা! যেদিন উগ্রসেন পিতার হাত হতে রাজদণ্ড কেড়ে নিতে এসেছিল সেদিন তোমরা কোন প্রতিবাদ করনি, বরং ঘরভেদী বিভীষণের মতো তোমরাই হয়েছিলে তার সহায়, তার সৈন্য! ভেবেছিলে প্রতিদানে পাবে প্রচুর পুরস্কার…কিন্তু কি পেয়েছ আজ বুঝ্‌ছ—! শাস্ত্র-বাক্য মিথ্যা নয়—

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥

নিজ হাতে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছ, তার ফলভোগ তুমি না কর…তোমার পুত্র, তোমার পৌত্র, প্রপৌত্র…বংশানুক্রমে করবে…। যদি বল উপায় কি ? উপায়—প্রায়শ্চিত্ত…এক জীবনেও তা শেষ হবে না…এ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে জন্মে জন্মে!

[বাহিরে জয়ধ্বনি : সম্রাট জয়তু! সম্রাট জয়তু! সম্রাট জয়তু!]

যাদবগণ ॥ বসুদেব—বসুদেব—

[সভয়ে সম্রাটের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল]

* * *

[সানুচর উগ্রসেনের প্রবেশ।]

উগ্রসেন ॥ বসুদেব!

বসুদেব ॥ আজ্ঞা করুন।

উগ্রসেন ॥ আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি।…

বসুদেব ॥ পরিহাস কেন রাজা ?

উগ্রসেন ॥ না বসুদেব, পরিহাস নয়। তোমার পিতার হাত হতে যেদিন রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে মথুরায় যাদব-রাজত্বের অবসান করি, সেদিন মনে আশা ছিল, সুশাসনে যাদবের মন হতে তাদের পরাজয়ের গ্লানি মুছে দেব। আশা ছিল—বিজয়ী ভোজবংশ এবং বিজিত যদুবংশ আমার সুশাসনে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখে কালাতিপাত করবে। আমার সে আশা সমূলে নির্মূল করেছে আমারই কুলাঙ্গার পুত্র কংস…, তারই চক্রান্তে, ইঙ্গিতে, আদেশে, ভোজবংশ বিজয়ীর গর্ব নিয়ে বিজিত যদুবংশের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করছে, আমি বহু চেষ্টা করেও তা নিবারণ করতে সমর্থ হইনি।—

বসুদেব ॥ আমরা তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি এবং করছি।

উগ্রসেন ॥ অথচ এই অত্যাচার…এই অনাচার আমারই নামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে… উৎপীড়িত নরনারী আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে…অথচ—অথচ—আমি এর জন্যে এতটুকু দায়ী নই।

বসুদেব ॥ তথাপি আপনি রাজা,—প্রজার ওপর অপরের অত্যাচারের জন্যও রাজাই দায়ী।

উগ্রসেন ॥ ধিক্ এরূপ রাজত্বে। বসুদেব, এই নাও রাজদণ্ড…এই নাও রাজমুকুট। অত্যাচারীকে দমন কর…রাজ্যের ক্রন্দন নিবারণ কর…আমার বিবেক তুষানলে দগ্ধ হচ্ছে…তোমার রাজত্ব তুমি গ্রহণ কর…আমাকে মুক্তি দাও…আমাকে রক্ষা কর।

বসুদেব ॥ এ দান গ্রহণে আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আমি জানি, দান গ্রহণে কখনো স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না। আমরা রাজ্যচ্যুত…অত্যাচারিত…উৎপীড়িত, কিন্তু…ভিক্ষুক নই। আমাদের কোন আবেদন নাই—নিবেদন নাই। আমরা শক্তি-সাধনা করছি…সেই শক্তি…যা এই অত্যাচার-উৎপীড়ন দমন করতে পারে…যা আমাদের হৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে পারে। সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ঐ রাজদণ্ড, ঐ রাজমুকুট অর্জন করব…ভিক্ষা করে নয়, দান গ্রহণেও নয়।

উগ্রসেন ॥ কিন্তু বসুদেব…এ রাজদণ্ড, এ রাজমুকুট আর আমি বহন করতে পারছি না…এরা যেন তপ্ত লৌহ-শলাকা, আমায় নিয়ত দগ্ধ করছে…গ্রহণ কর বসুদেব, গ্রহণ কর! [দানোদ্যত]

[ইতিমধ্যে কংসানুচর বিদূরথ এবং নরক প্রবেশ করিয়াছিলেন।]

নরক ॥ ভৃত্যরা যখন উপস্থিত রয়েছে, তখন ও বোঝা দুটি অপরের স্কন্ধে কেন নিক্ষেপ করছেন ? বিদূরথ…ভার বহন কর।…শুনুন মহারাজ, আপনার ঔষধ সেবনের সময় অতিবাহিত হয়…যুবরাজ মহা চিন্তিত হয়ে রাজবৈদ্য সঙ্গে করে প্রাসাদে আপনারই অপেক্ষায় বসে আছেন।

[বিদূরথ রাজদণ্ড ও রাজমুকুট গ্রহণ করিবার জন্য সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইযাছে]

উগ্রসেন ॥ [বিষম ব্যাকুলতায়] গ্রহণ কর বসুদেব,—গ্রহণ কর !

নরক ॥ মহারাজের ভয়ানক মাথা ধরেছে।···বিদূরথ, মহারাজ রাজমুকুটটি পর্য্যন্ত মাথায় রাখতে পারছেন না···তুমি হাঁ করে চেয়ে দেখছ কি ? এমনি করেই কি রাজসেবা করবে ?

উগ্রসেন ॥ বসুদেব—বসুদেব !

[বিদূরথ রাজদণ্ড ও রাজমুকুট একরূপ কাড়িয়া লইতেই উদ্যত হইল।]

নরক ॥ শিরঃপীড়া তো নয়, শিরঃশূল। ভয় নেই মহারাজ, রাজ-বৈদ্যকে দিয়ে উত্তম মধ্যম নারায়ণ ব্যবস্থা করলেই—

উগ্রসেন ॥ দুর্বৃত্ত পুত্র আমার রাজ্য-সম্পদ কেড়ে নিচ্ছে···রক্ষা কর বসুদেব, রক্ষা কর !

নরক ॥ শিরঃপীড়া থেকে শিরঃশূল···শিরঃশূল থেকে বিকার···

বসুদেব ॥ দিন···[উগ্রসেনের হাত হইতে রাজদণ্ড ও রাজমুকুট লইলেন] নাও ! [বিদূরথের হাতে দিলেন।] যাও···গিয়ে সেই শয়তানকে বল, যদুকুলের এই হৃত রাজমুকুট···এই হৃত রাজদণ্ড···এই হৃত মথুরারাজ্য যদুসন্তান, দান গ্রহণে নয়, স্বকীয় সাধনায় পুনরুদ্ধার করবে। [নরক এবং বিদূরথ বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রস্থান করিল।]

উগ্রসেন ॥ [উহা লক্ষ্য করিয়া] ধর্—ধর্—ওরে ওদের ধর্ !

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান]

বসুদেব ॥ [সমাগত যাদবগণ ও রাজানুচরগণের প্রতি]···ঐ উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মত্ত, হতভাগ্য বৃদ্ধরাজাকে ফিরিয়ে আন···নইলে সেই দুর্বৃত্ত ওকে বধ করতেও কুণ্ঠিত হবে না। [তাহারা উপদেশ পালন করিল] ভগবান—! নারায়ণ—! একটিবার চোখ মেল···চেয়ে দেখ, এ জগৎ হ'তে বেদ অন্তর্হিত, দর্শন অদৃশ্য, উপনিষদ লুপ্ত···! সংসারে আজ আচার নাই, আছে শুধু অত্যাচার, প্রীতি নাই, আছে শুধু দ্বেষ, প্রেম নাই, আছে শুধু হিংসা ! ধরণী রক্তাক্ত ! ধর্ম লুপ্ত !···ভগবান ! নারায়ণ !··· এখনো কি তুমি ঘুমিয়েই রইবে ? এখনো কি তুমি জাগবে না—? জাগবে না ?

[মন্দিরাভ্যন্তরে প্রস্থান]

···[ক্ষণপরে বিদূরথ-পুত্র কঙ্কণের প্রবেশ। তাহার শিরে সেনানায়কের শিরস্ত্রাণ এবং হাতে একটি পুষ্পডালা। সে আসিয়া চাবিদিকে কাহাকে খুঁজিল। তাহাকে না পাইয়া প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে রক্ষিত একটি শিলাবেদীর উপর বসিয়া পুষ্পডালা হইতে পুষ্প প্রভৃতি নামাইয়া রাখিল। তৎপরে পরিচ্ছদান্তরাল হইতে একটি চন্দন-পত্র বাহির করিয়া একটি জলপদ্ম-পাতায় চন্দনাক্ষরে কি লিখিল। লিখিয়া তাহা উঁচু করিয়া ধরিয়া পড়িল। তৎপর তাহা ডালাতে রাখিয়া তদুপরি রাখিল একটি পুষ্পমাল্য। তাহার পর ফুলে ফুলে পুষ্পডালা ভরিয়া ফেলিল। পুষ্পডালাটি বেদীর অন্তরালে লুকাইয়া রাখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই বাহির হইতে ভাসিয়া আসিল মন্দিরের করঙ্কবাহিনী কঙ্কার গীত-লহরী। সে উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল।···

ধূপ দীপ নৈবেদ্য, ফুল ফল, আম্রমুকুল, নবপল্লব, পদ্মপাতা, মৃণালমালা, নবীনধানের

নবমঞ্জরী প্রভৃতি নানাবিধ পূজোপকরণ লইয়া মন্দিরের পূজারী পূজারিণীগণ নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে আসিল। কঙ্কা তাহাদের মধ্যমণি।…

কঙ্কণের এই উৎসব এতই ভালো লাগিল যে, সে তাহার শিরস্ত্রাণ একরূপ জোর করিয়া টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া সেই উৎসবে আর দশজনের মতো যোগদান না করিয়া পারিল না। অন্য সকলের নিকট এই যুবক অজ্ঞাত হইলেও কঙ্কার নিকট সে সুপরিচিত ছিল।—]

জয় জয় জয় ভগবান!
পাথরের মত বুকে, ঝরণার ধারা মত
আনো নব-জীবনের গান।
আঁধারের-ছেলে মোরা খুঁজে মরি শিশু-ঊষা,
শ্যামলী ধরণী ভ'রে চাই অরুণের ভূষা,
মুখে স্বপনের-স্মৃতি, চাই তপতের-গীতি,
চাই চির-আলোকিত প্রাণ।
পাথরের ঘুম ভেঙে জাগো তুমি শিলাময়!
পৃথিবীর খেলাঘরে জাগো, জাগো লীলাময়!
জাগো চোখে, জাগো বুকে, জাগো সব সুখে-দুখে,
অমৃতের বাণী দাও মৃতদের মুখে মুখে,
ঘুমভরা জাগরণে এস মহা-জাগ্রত!
অরূপ-রতন কর দান।

[গাহিতে গাহিতে মন্দিরের প্রতি সোপানের দুই পার্শ্বে এক একজন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নারায়ণোদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া প্রণাম করিল। কঙ্কণ স্বপ্নাবিষ্টের মত মধ্য-সোপান বাহিয়া একেবারে মন্দিরের দ্বারদেশে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলে যখন সমস্বরে—

ভগবন্ জাগৃহি! ভগবন্ জাগৃহি! ভগবন্ জাগৃহি!

ধ্বনি করিয়া উঠিল, তখন তাহার চমক ভাঙিল। সে একবার নীচে নামিল, আবার উপরে উঠিল, আবার তখনি আত্মস্থ হইয়া ছুটিয়া গেল তাহার শিরস্ত্রাণ পরিতে…গিয়া দেখে, কঙ্কা তাহা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।]

কঙ্কণ॥ আমার শিরস্ত্রাণ কঙ্কা?

কঙ্কা॥ আমার পুষ্পডালা?

কঙ্কণ॥ এনেছি, তোমার পুষ্পডালা ফুলে ফুলে ভরে এনেছি কঙ্কা—এই নাও!

কঙ্কা॥ আগে কৈফিয়ৎ চাই। তুমি গত রাত্রে মন্দিরে এসে আরতির অবসরে আমার পুষ্পডালা নিয়ে পালিয়েছিলে কেন?

কঙ্কণ॥ তোমার সেই শূন্যডালাটি আমার মালঞ্চের ফুলে ভরে দেব বলে। এই সামান্য অধিকারটুকুও কি আমার নেই? মনে করে দেখ, তোমার স্বর্গীয়

পিতার ইচ্ছা ছিল, তুমি আমার বধূ হও। আমার নাম "কঙ্কণ", তাই তিনি তোমারও নাম রেখেছিলেন "কঙ্কা"।

কঙ্কা ॥ সুখের বিষয় তিনি সে বিবাহ দেন নি। দুঃখের বিষয় আজ তিনি বেঁচে নেই,···থাকলে, তিনি আমার এই কলঙ্কিত নাম পরিবর্তন করতেন।

কঙ্কণ ॥ আমি জানি, আমার প্রতি তোমার ঘৃণা—

কঙ্কা ॥ সে ঘৃণা কি অকারণ? তুমি আমাদেরই স্বজাতি, স্বগোষ্ঠী. পুণ্য যদুবংশে তোমার জন্ম।···কিন্তু—

কঙ্কণ ॥ কিন্তু?

কঙ্কা ॥ ভোজবংশের দাসত্ব বরণ করে' তুমি এবং তোমার পিতা এই যদুবংশের উপরই অমানুষিক অত্যাচার করতে কুণ্ঠিত হও নি। মনুষ্যত্ব হারিয়েছ, ধর্মও হারিয়েছ। আজ তোমার সাধ্য নেই—তুমি আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিশিয়ে শুধু এইটুকু বল—

ভগবন্ জাগৃহি!

কঙ্কণ ॥ ভগবানের আবাহন আমার প্রভুর নিষেধ। আমার প্রভুর দেবতা ভগবান নয়, শয়তান।

অন্যান্য সকলে ॥ কে তোমার প্রভু?

কঙ্কণ ॥ মহামহিম কংস!

কঙ্কা ॥ ধিক্ সেই ক'টি স্বর্ণমুদ্রা যা মানুষের মনুষ্যত্ব ক্রয় করে। শত ধিক্ তাকে, যে ঐ স্বর্ণমুদ্রার লোভে তার আ[illegible]···তার ধর্ম···তার বিবেক বিক্রয় করে!

কঙ্কণ ॥ [দীর্ঘশ্বাসে] পিতাপুত্রে যেদিন ভোজবংশের দাসত্বগ্রহণ করেছি, পিতা বলেন, সেইদিনই জাতি-ধর্ম বিবেক সব জ[illegible]ঞ্জলি দিয়েছি।

অন্যান্য সকলে ॥ কে তোমার পিতা?

কঙ্কা ॥ দানবদাস যাদব-সেনাপতি বিদূরথ!

সকলে ॥ কুলাঙ্গার।

কঙ্কা ॥ আমার ঘৃণা কি অকারণ কঙ্কণ?···যাক্, দাও আমার পুষ্পডালা!

কঙ্কণ ॥ [ছুটিয়া পুষ্পডালা আনিয়া অস্বা[illegible]বিক আগ্রহে] নাও—নাও—! দুঃসহ ব্যঙ্গ, অসহনীয় উপহাস সইতে হবে জেনেও আমি ছুটে এসেছি তোমাকে এই পুষ্পডালা—তোমার মন্দিরের এই পুণ্যপ্রাঙ্গণে প্রত্যর্পণ করতে।— [নতজানু হইয়া] নাও দেবী, নাও!

কঙ্কা ॥ [হাসিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া] তোমার এই চৌর্যবৃত্তিতে নূতনত্ব আছে কঙ্কণ।···

কঙ্কণ ॥ হ্যাঁ, এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে·আমার অন্তরের কামনা, ওরই মধ্যে লুকিয়ে আছে আমার কামনা পূরণের শেষ সাধনা।···ঐ পুষ্পডালায় লেখা আছে আমার ললাট-লিপি। সেই ললাট-লেখা তুমি পাঠ করবে, সেই আশায় আমি এই

মন্দিরে লাঞ্ছিত হয়েও পড়ে থাকব, পদাহত হলেও পড়ে থাকব।...তুমি আমার শিরস্ত্রাণ দাও!

কঙ্কা॥ শিরস্ত্রাণ?

কঙ্কণ॥ হ্যাঁ, শিরস্ত্রাণ...। শিরস্ত্রাণ ত্যাগ করে আমি আমার পদমর্যাদার অবমাননা করেছি—

কঙ্কা॥ বটে! যদি এ শিরস্ত্রাণ আর না দি—?

কঙ্কণ॥ আমি পদচ্যুত হব।

কঙ্কা॥ পদচ্যুত হবে?

কঙ্কণ॥ পদচ্যুত হব।

কঙ্কা॥ এ কথা জেনেও তবে শিরস্ত্রাণ ত্যাগ করেছিলে কেন?

কঙ্কণ॥ রক্তের ডাকে! রক্তের ডাকে! বহুকাল পর যখন জাতীয় উৎসব দেখলাম, আত্মবিস্মৃত হলাম। শিরস্ত্রাণ ত্যাগ করে, আমাদের ঐ আর সবার মতো কখন যে উৎসবে মত্ত হয়েছি, নিজেই জানি না।...

কঙ্কা॥ পাপ! এই পাপীদের সঙ্গে মেশা মহাপাপ হয়েছে! তা যখন পাপ করেইছ, তখন তার দণ্ড নিয়ে যাও। তোমার এই ফুলগুলি ঐ আর সব পাপীদের বিলিয়ে দি...উৎসবের এই যন্ত্রণাটুকু সহ্য করলে তবে শিরস্ত্রাণ পাবে।

কঙ্কণ॥ তাই হোক্—তাই হোক্—আমিও তাই চাই কঙ্কা!

[বামহস্তে কঙ্কণের শিরস্ত্রাণ লইল এবং দক্ষিণ হস্তে পুষ্পডালা হইতে এক একটি ফুল লইয়া তাহা সোপানাবস্থিত সকলকে একে একে বিতরণ করিয়া চলিল—সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিল—

ফুল-বাড়ীতে ফুট্‌ল যে ফুল, খায় মধু তার ফুলটুকি,
ভোমর-বঁধু পালিয়ে গেছে মধুহারীর মুখ শুঁকি!
সেই ফুলে আজ ভরলে ডালা
কেমন করে, গাঁথব মালা,
চোখের জলেই ভিজিয়ে তারে করবে মধুর বন্ধু কি?
বুক-শুকানো ফুলের বাটায়
ছেয়ে দিলেম চোরা-কাঁটায়,
ধরায় সে ফুল ছড়িয়ে দিতে হয় না আমার মন দুখী।

[যখন মন্দিরের দুয়ারে গিয়া উঠিল, তখন গান শেষ হইল, ফুলও শেষ হইল, রহিল শুধু একটি মালা।]

কঙ্কা॥ এখন অবশিষ্ট এই মালা, এ মালা নেবে কে?

কঙ্কণ॥ [বিষম আগ্রহে] ঐ মালার তলে রয়েছে পদ্মপত্র, তাতে চন্দন-লেখা; সেই চন্দন-লেখা তোমার ঐ প্রশ্নের উত্তর দেবে। পাঠ কর সেই চন্দন-লেখা।

কঙ্কা ॥ তাই ত! কি যেন লেখা! তুমি লিখেছ?

কঙ্কণ ॥ ঐ চন্দন-লেখা আমার ভাগ্য-লেখা। তুমি পাঠ কর…তুমি পাঠ কর।

কঙ্কা ॥ [পাঠ করিল] "ধর্ম সাক্ষী, আমার স্বামী—[শেষ কথাটি আর পাঠ করিল না—]

কঙ্কণ ॥ থেমো না…থেমো না আর আছে মাত্র একটি কথা, পাঠ কর। —ধর্ম সাক্ষী, তোমার স্বামী?

কঙ্কা ॥ [পাঠ—] "—কঙ্কণ।"

কঙ্কণ ॥ [শয়তানের মতো হাসিয়া উঠিল] হাঃ হাঃ হাঃ—

কঙ্কা ॥ [অবাক হইয়া] সে কি?

কঙ্কণ ॥ তোমার নারায়ণের এই পুণ্য-পূত মন্দিরে ধর্মসাক্ষী করে তুমি উচ্চারণ করেছ—আমি তোমার স্বামী।

কঙ্কা ॥ [একবার কঙ্কণের দিকে তীব্র কটাক্ষে তাকাইল। কিন্তু তখনি সপ্রতিভ হইয়া পার্শ্বস্থ দেবদাসীর হস্তে রক্ষিত প্রদীপের অগ্নিশিখায় কঙ্কণের শিরস্ত্রাণ ধরিল]—ধর্ম সাক্ষী, নারায়ণ সাক্ষী…সবার ওপর প্রত্যক্ষ এই অগ্নিদেব সাক্ষী, আমার স্বামী পদচ্যুত…দাসত্বমুক্ত—ঐ কঙ্কণ। [শিরস্ত্রাণ ভস্মীভূত হইয়া গেল।]

কঙ্কণ ॥ [পরমোল্লাসে] মুক্ত আমি! মুক্ত আমি! আমার শয়তান প্রভু… আমার শয়তান মন, আমার দাসত্ববন্ধন…ধর্ম সাক্ষী…নারায়ণ সাক্ষী…ঐ কল্যাণী অগ্নিশিখায় আজ ভস্ম হলো। [ছুটিয়া কঙ্কার কাছে যাইতে যাইতে] ভগবন্ জাগৃহি—ভগবন্ জাগৃহি! [কঙ্কার সম্মুখে গিয়া] এইবার দাও তোমার মালা!

[কঙ্কা কঙ্কণের গলায় মালা দিল। দেবদাসীগণ উলুধ্বনি করিল। মন্দিরে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। বসুদেব ও দেবকী মন্দির-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

বসুদেব ॥ ঘরের ছেলে আজ ঘরে ফিরে এলো। তোমাদের এই নবজীবনে আশীর্বাদ করি—

"গম্যতামর্থলাভায় ক্ষেমায় বিজয়ায় চ।
শত্রুপক্ষ নিরাশায় পুনরাগমনায় চ।"

[মন্দিরাভ্যন্তরে সকলের প্রস্থান। সর্বশেষে ছিলেন, দেবকী ও বসুদেব। এমন সময় বিদূরথের প্রবেশ।]

বিদূরথ ॥ বসুদেব!

[বসুদেব ও দেবকী দাঁড়াইলেন]

বিদূরথ ॥ রাজাজ্ঞা অবহিত হও—

বসুদেব ॥ কার আজ্ঞা?

বিদূরথ ॥ ভোজ-সম্রাট মহামহিম কংসের আজ্ঞা।

দেবকী ॥ সে কি? পিতৃব্য উগ্রসেন এখনো জীবিত—

বিদূরথ ॥ হ্যাঁ, জীবিত, কিন্তু সিংহাসনচ্যুত। তাঁর সুযোগ্য পুত্র মহামহিম কংস এই সদ্য রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।

দেবকী ॥ কিন্তু কোন্ অধিকারে ?

বসুদেব ॥ সে আলোচনা আমাদের নিষ্প্রয়োজন দেবকী। বিদূরথ, তোমার রাজাজ্ঞা ঘোষণা কর।

বিদূরথ ॥ আজ হতে এ মন্দিরে নারায়ণ পূজা নিষেধ। এ রাজ্যে পূজা পাবার অধিকার একমাত্র রাজার। এখন হতে প্রতি প্রজাকে ঘরে ঘরে কংস মহারাজার মূর্তি বা প্রতিকৃতি রক্ষা করতে হবে এবং নিয়মিত ভাবে প্রতি প্রভাতে এবং প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ দীপ আরতি সহকারে পূজা করতে হবে।

দেবকী ও বসুদেব ॥ [এক সঙ্গে] বটে !

বিদূরথ ॥ হ্যাঁ,—এবং আজই এই বিধান এই মন্দিরে অবিলম্বে প্রতিপালিত হয় আমি তার ব্যবস্থা করব···আমার প্রতি এইরূপ আদেশ।

বসুদেব ॥ আমার দেবতা নারায়ণ। আমি অন্য দেবতা মানি না।

বিদূরথ ॥ রাজা প্রত্যক্ষ দেবতা।

বসুদেব ॥ তর্ক নিষ্প্রয়োজন।

বিদূরথ ॥ বসুদেব, আমিও যাদব, বন্ধুভাবেই বলছি। আমাদের জাতীয় দেবতা মূক···, মূর্তিমাত্র। চোখে তাকে কেউ দেখেনি। তার পূজায় লাভ কি ? বরং—

বিদূরথ ॥ বটে ? এতকাল তোমাকে শাসন করা হয়নি বলে···স্পর্ধা হয়েছে তোমার গগনস্পর্শী ! জানো, যে তোমাকে এতকাল প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, সেই অকর্মণ্য বৃদ্ধ উগ্রসেনই আজ লৌহ-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত ? জানো, আমার ওপর আদেশ আছে তোমার চোখের ওপর তোমার ঐ শালগ্রাম শিলা ধ্বংস করে ওখানে আমার মহিমময় প্রভুর রাজ-প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করতে ?—এবং আমি তা করব— এখনি—এই মুহূর্তে।

বসুদেব ॥ সাধ্য থাকে, কর !

বিদূরথ ॥ —বুঝেছি, তুমি বাধা দিতে বদ্ধ-পরিকর। তোমার এই মন্দিরে আমি এখনি জয়ধ্বনি হতে শুনেছি। বুঝেছি, তুমি আজ জনবল ও অস্ত্রবলে বলী। উত্তম, আমিও উপযুক্তভাবে সজ্জিত এবং প্রস্তুত হয়ে আসি।— [প্রস্থান।]

[মন্দিরাভ্যন্তর হইতে পূজার্থী যুবকগণ সশস্ত্র হইয়া উপস্থিত]

১ম পূজার্থী ॥ ওরা পশুবলে আমাদের আক্রমণ করবে। ধর্মরক্ষার জন্য আমরা প্রাণ দেব, কিন্তু ওদের শির নিয়ে তবে শির দেব।

বসুদেব ॥ বলে, আমার দেবতা মৌন···মূক···শুধু একখণ্ড শিলাস্তূপ···জাগো ভগবান্···তুমি আজ জাগো !

সকলে ॥ ভগবন্ জাগৃহি ! ভগবন্ জাগৃহি ! ভগবন্ জাগৃহি !

দেবকী ॥ আমি মা।···নিদ্রিত সন্তানকে জাগ্রত করতে মা যেমন জানে, আর

কেউ জানে না। সশস্ত্র যখন সশস্ত্রের উপর অত্যাচার করে ভগবান তখন জাগেন না; ভগবান জাগেন তখন, যখন সশস্ত্র নিরস্ত্রের উপর অত্যাচার করে। ...যাদবগণ, আমার আদেশ প্রতিপালন কর।...ঐ শালগ্রামশিলা পদতলে সকলে সকল অস্ত্র পরিত্যাগ কর। [সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আদেশ পালন করিল। [এইবার নতজানু হয়ে সকলে ঐ ঘুমন্ত দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন কর...হে দেবতা, আমাদের অস্ত্র আজ তোমার হাতে। আমরা নিরস্ত্র...সশস্ত্র শয়তান নিরস্ত্র আমাদের ওপর অত্যাচার করছে...এইবার তুমি রুদ্ররূপে জেগে ওঠ... [সকলে অস্ত্রত্যাগ করিয়া সোপানে লুটাইয়া পড়িল।]

[সসৈন্য বিদূরথের প্রবেশ]

বিদূরথ ॥ এইবার..., একি! তোমরা এখনো প্রস্তুত নও! ধর অস্ত্র। যুদ্ধ কর। মূর্খ যাদব...ঐ শিলাখণ্ডের জন্য এইবার প্রাণ দাও।

বসুদেব ॥ [সম্মুখে আসিয়া প্রসারিত বক্ষে দাঁড়াইয়া] আমরা অস্ত্র ত্যাগ করেছি।...বধ কর।

বিদূরথ ॥ অস্ত্র ধর...নিরস্ত্রের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করতে এখনো অভ্যস্ত হইনি, ধর অস্ত্র।

বসুদেব ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—অস্ত্র ধরব না, আর অস্ত্র ধরব না। আমাদের অস্ত্র আমাদের দেবতার হাতে তুলে দিয়েছি ; চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে...শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, দৈত্য-নিসূদন মধুসূদনের বরাভয় মূর্তি...নিরস্ত্রের উপর সশস্ত্রের অত্যাচারে ঐ পাষাণেই তাঁর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে। হাসিমুখে, আনন্দে, উল্লাসে তোমার অস্ত্রাঘাত সহ্য করব...কর আঘাত!

বিদূরথ ॥ হ্যাঁ, করব। [কিন্তু তাহার চোখের সম্মুখে যেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্তি ভাসিয়া উঠিল। অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হইয়াই কি এক দুর্বলতায় তাঁহার হাত কাঁপিয়া উঠিল।] না—না—[হাত হইতে অসি পড়িয়া গেল।]

বসুদেব ॥ হাঃ হাঃ হাঃ!

দ্বিতীয় অঙ্ক

।। এক ।।

নৃত্যশালা

[সারি সারি পিতলের দীপবৃক্ষ, তার ডালে ডালে অভ্রের আবরণে ঢাকা দীপ জ্বলছে। দেওয়ালের মাথার কাছে চারিদিকে মৃণালবাহী মরালশ্রেণী আঁকা রয়েছে, তার নীচে কিন্নর-দম্পতি বীণা বাজাতে বাজাতে যেন শূন্যমার্গে চলেছে। তার নীচে তরঙ্গ লেখা। রাগরাগিণীর মূর্তি। এক পাশে একটা কাঞ্চন দণ্ডে একটা মণিময় ময়ূর। চীনাংশুকে ঢাকা আসন্দিকা নামক আসন। পাশে আরো সব আসন। পিছনে চামরধারিণী ও পানের বাটা নিয়ে তাম্বুলবাহিনী। মৃদঙ্গ, বেণু, বীণা প্রভৃতি যন্ত্র ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে। দ্বারে দ্বারে যবনী প্রহরিণী। নর্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল।]

রূপ-সায়রের সোনার কমল, আমরা আনি পরাগ তার
ফুলের গলায় দি পরিয়ে ভ্রোমর-বঁধুর গানের হার !
বৌ কথা কও ডাকলে পাখী,
আমরা যে তার কাছেই থাকি,
চখা-চখীর অশ্রু মুছাই ভুলিয়ে রাতের অন্ধকার।
আমোদ করে' কামোদ গেয়ে
ধরার ধূলায় স্বপন ছেয়ে,
গুন্‌ছি মোরা সুখের লহর, বইছে জীবন পারাবার।

[গীত শেষে নৃত্যশালায় সম্রাট কংসের শুভাগমন হইল। তাহার পশ্চাতে সুরার সরঞ্জাম লইয়া সুরা-বাহিনী "মদিরা"। তৎপশ্চাৎ নবক, তৎপশ্চাৎ নতশিরে ম্লানমুখে বিদূরথ। কংস প্রবেশ করা মাত্র নর্তকীগণ যে যেখানে ছিল সেখানেই লুটাইয়া পড়িয়া তাহাকে প্রণাম করিল।]

কংস ।। তোদের এ প্রণাম কে পেল ?

[নর্তকীগণ একে একে উঠিয়া তাহার উত্তর দিতে লাগিল।]

প্রথমা ।। শ্রীমান—

কংস ।। শ্রীমান !

দ্বিতীয়া ।। ধীমান—

কংস ।। ধীমান !

তৃতীয়া ।। মহীয়ান—

কংস ।। বটে !

চতুর্থা ।। গরীয়ান—

কংস ।। বাঃ !

পঞ্চমী ॥ কীর্তিমান—

কংস ॥ হ্যাঁ ?

ষষ্ঠী ॥ শৌর্য্যবান্—

কংস ॥ [সকৌতুকে শৌর্য্যবানের ভঙ্গী]

সপ্তমী ॥ বীর্য্যবান—

কংস ॥ নিশ্চয়—[বীর্য্যবানের ভঙ্গী]

[বাকী যাহারা ছিল তাহারা আর ভাষা খুঁজিয়া পাইল না, এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল, বিপদেই পড়িল।]

কংস ॥ তারপর—তারপর [যেন তাহাদের বিপদমুক্ত করিতেই ভাষা যোগাইয়া দিল। সকৌতুকে—]—শয়তান। [প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল, হঠাৎ নরক ও বিদূরথের প্রতি] ভগবানও হতে পারতাম, কিন্তু, [মদিরার হাত হইতে পানপাত্র লইয়া ঢক্‌ঢক্ করিয়া খানিকটা মদ্যপান করিয়া]···কিন্তু ভগবান কি মদ খান ?

নরক ॥ [মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে] ভগবান মদ খান কিনা···কোনো শাস্ত্রে···দেখেছি বলে, [হঠাৎ] ওহে বিদূরথ তোমার তো তোমাদের ধর্মশাস্ত্রগুলি বেশ পড়া আছে, তুমি কি বল ?

বিদূরথ ॥ আমাদের পুরাণে আছে, দেবতারা অমৃত পান করেন। আমাদের শাস্ত্রে মদ্যপান মহাপাপ।

কংস ॥ দেবতাদের কখনো চোখেই দেখতে পেলাম না। একবার পেলে না হয় তাঁদের সেই পুণ্যবান-পানীয় অমৃত সেবনের ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু, হে নরক, মদ্যপানরূপ পাপে তোমার কিরূপ রুচি ? [পানপাত্র তাহার সম্মুখে ধরিল।]

নরক ॥ [নতজানু হইয়া সশ্রদ্ধভাবে তাহা গ্রহণ করিয়া]···যেরূপ সম্রাটের অনুগ্রহ !

কংস ॥ হ্যাঁ বিদূরথ, সে মহাপাপের শাস্তি ?

বিদূরথ ॥ মৃত্যুর পর অনন্ত নরক-বাস।

কংস ॥ নরক-বাস ! হোঃ হোঃ হোঃ [প্রাণ খুলিয়া হাস্য] তাই বুঝি তুমি খাও না ?

[বিদূরথ মাথা নীচু করিয়া রহিল]

নরক ॥ [মদ্যপান শেষ করিয়া কংসের প্রশ্নের উত্তর সে-ই দিল।] হ্যাঁ সম্রাট !

কংস ॥ [নরকের দিকে দৃষ্টি পড়িল, দেখিল নরক মদ্যপান সদ্য শেষ করিল] তোমার অনন্ত নরক-বাস নরক ! [বলিয়াই নিজেও মদ্যপান করিল]

নরক ॥ নামেই তা সুপ্রকাশ সম্রাট !

কংস ॥ বেশ ! বেশ ! [নর্তকীদের প্রতি চাহিয়া]···তোদেরও···চলে তো ? [নর্তকীগণ সলজ্জ মৃদুহাস্যে মাথা নীচু করিল।] বাকী শুধু বিদূরথ।···[সহসা গম্ভীরভাবে] বিদূরথ !—

বিদূরথ ॥ প্রভু !

কংস ॥ হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল !

বিদূরথ ॥ কি প্রভু ?

কংস ॥ তোমার নামে একটা গুরুতর অভিযোগ শুনলাম—

বিদূরথ ॥ [বজ্রপতনে চমকিতের ন্যায় ।] আমার নামে অভিযোগ ?

কংস ॥ হ্যাঁ, তোমার নামে ! শুনে এত দুঃখিত হয়েছি যে কাল রাত্রে ভালো ঘুমাতেই পারিনি বিদূরথ !

বিদূরথ ॥ প্রভু, আপনার সেবায় দেহ-মন-বুদ্ধি-বিবেক সমস্ত নিয়োগ করেছি, তবু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ?

কংস ॥ তাই আমি আরো বেশী বিস্মিত হয়েছি···যখন শুনলাম কাল নারায়ণ-মন্দিরে বসুদেবকে অস্ত্রাঘাত-কালে তোমার হাত কেঁপেছিল ! [বিদূরথের প্রতি তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ।]

বিদূরথ ॥ [ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কম্পমান কণ্ঠে]···কেঁপেছিল ।

কংস ॥ শালগ্রাম শিলাও চূর্ণ হয়নি—

[বিদূরথ নীরবে তাহার দোষ স্বীকার করিলেন ।]

কংস ॥ হাত একটু কাঁপা অস্বাভাবিক নয়, যখন বসুদেব তোমার জ্ঞাতি ভাই, এবং কতদিন ঐ হাতেই সেই শালগ্রাম শিলায়ও তিল-তুলসী দিয়েছে তো ।··· কিন্তু, তবু—

বিদূরথ ॥ [কংসের দুর্নিবার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া] হাত কাঁপা উচিত নয়, যখন আমি প্রভুর দাস, এবং শালগ্রাম শিলা, যে ভাবেই হোক্ ধ্বংস করা প্রভুর আদেশ—

কংস ॥ [সহজ ভাবে] এই অচলা প্রভুভক্তি তোমাদের আছে বলেই আমি আমার স্ববংশ জ্ঞাতিদের চাইতেও রাজ্য শাসন-সংরক্ষণ বিষয়ে তোমাদের উপরই বেশী নির্ভর করি— । আমার স্ববংশ জ্ঞাতিদের মধ্যে এই নির্বিকার প্রভুভক্তির অভাব আছে, কি বল নরক— ?

নরক ॥ সে কথা আর বল্‌তে ! যদুবংশের মধ্যে যারা প্রভুর দাসত্ব-গৌরব বরণ করেছে, তাদের প্রধান গুণই এই যে, তারা যেন প্রভুর পায়ের পাদুকা, পায়ে দেওয়াও চলে, আবার পা থেকে খুলে নিয়ে বিদ্রোহী অবাধ্য যাদবগণের পিঠে মারাও চলে···সর্ব অবস্থাতেই সমান নির্বিকার !

কংস ॥ ওরা যে আমার পায়ের পাদুকা, এ কথা কুলোকে বলে । আমি বলি, ওরাই আমার মাথার মণি । আমার জন্য ওরা ধর্ম ছেড়েছে—

নরক ॥ না সম্রাট, ঐখানে একটু "কিন্তু" আছে । ধর্ম ছেড়েছে বটে, কিন্তু একেবারে ছাড়েনি । হাত একটু কেঁপেছিল—

কংস ॥ [সপদদাপে] কাঁপেনি । কাঁপলেও সে মুহূর্তের দুর্বলতা মাত্র ।··· বিশ্বাস করছনা ?···দেখবে ?···সুরাপান মহাপাপ । কিন্তু আমি যদি বলি, বিদূরথ,

সুরাপান কর [পানপাত্র বিদূরথের দিকে প্রসারণ] দেখ দেখি, ওর হাত কাঁপে কিনা—···দেখ—দেখ—[বিদূরথের সে মহাপরীক্ষা। আজন্ম সে সুরাপান করে নাই, কিন্তু আজ তাহার প্রভুভক্তির পরীক্ষা। পরীক্ষায় সে জয়ী হওয়াই ঠিক করিল। সে সুরাপান করিল। বিদূরথের প্রতি কংসের তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্রমে সস্মিত দৃষ্টিতে পরিণত হইল···বিদূরথকে সকৌতুকে বলিল]···মৃত্যুর পর অনন্ত নরক বাস—[বিদূরথ চমকাইয়া উঠিল। কংস তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল] ভয় কি ? আমি মদ খাই, ম'রে নরকে যাবো। একা ? [নরকের দিকে তাকাইল।]

নরক ॥ [সেই মুহূর্তে তাহার আর একপাত্র পান শেষ হইয়াছে।] আমি তো পা বাড়িয়েই আছি সম্রাট ! চলুন—

কংস ॥ দাঁড়াও। আর কে যাবে ? আমার বংশের সবাই খায়, না ? তাহলে তারা যাবে। সৈন্য সামন্ত সভাসদ···

নরক ॥ তারাও—তারাও—

কংস ॥ ব্যস। তারাও যাবে। বাকী রইল···[নর্তকীদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরে নরকের দিকে চাহিল]

নরক ॥ সম্রাট ! আমাদের চলে গেলাসে গেলাসে, ওদের চলে কলসে কলসে !

কংস ॥ [মহোল্লাসে] ওরে, তবে তোরাও—তোরাও।···বিদূরথ, তবে আর দুঃখ কি ? আমি যাব, তুমি যাবে, নরক যাবে, সৈন্য সামন্ত মন্ত্রী সভাসদ সব যাবে—নর্তকীরাও যাবে ! আমরাই নরক গুলজার করব···হো—হো—হো···যাক্, নরকের দুঃখ ঘুচ্‌ল,—ঘুচ্‌ল কিনা বিদূরথ ?

[বিদূরথ নীরব রহিল]

কংস ॥ বিদূরথ শালগ্রামশিলা চূর্ণ করতে পারেনি বলে আমার নিকট লজ্জিত হয়ে আছে।···একবার না হয় নাই পেরেছ, কিন্তু এবার—

বিদূরথ ॥ —অবশ্য।···[অভিবাদন করিয়া প্রস্থান।]

কংস ॥ যাক্, নিশ্চিন্ত।···[যবনী প্রহরিণীকে ইঙ্গিত]--সেই যাদব-তরুণী। [প্রহরিণী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। [নর্তকীদের প্রতি] ওরে, তবে তাই তো ঠিক ? তোরা কেউ স্বর্গে যাবি না তো ? [নর্তকীগণ হাসিয়া নৃত্যগীত শুরু করিল। মদিরা কংসকে মদ্য দিতে লাগিল।]

নৃত্যগীত

কেউ যাবনা স্বর্গে, রাজা !
নরক-ভরা হাজার মজা, স্বর্গে যাওয়া বেজায় সাজা।
ব্রহ্মা আছেন বিষ্ণু আছেন—আদ্যিকালের বৃদ্ধ !
নারদ মুনির্ পক্ক দাড়ী চক্ষু করে দিগ্ধ,
ভুঁড়ির ওপর ভস্ম মেখে মহাদেব ঐ টানছে গাঁজা !

বৃদ্ধদের ঐ স্বর্গ ভুলে খোল্ বারুণীর উৎস আজ,
ঢাল্ বারুণী শুক্‌নো বুকে, ভোল্ ধরণীর কুৎসা আজ !
নরক থেকে ডাক্‌ছে মোদের সখা সখীর দৃষ্টি,
সবাই মিলে হবে সেথায় নতুন সুখের সৃষ্টি ।
মুখ ফুটে আর বলব কি যে, মনেই আছে করব যা' যা' !

[নৃত্যগীত শেষে যবনী প্রহরিণী সহ চন্দনার প্রবেশ ।]

কংস ।। [চন্দনাকে] তোমার ভয় ভাঙ্‌ল চন্দনা— ?

চন্দনা ।। কিসের ভয় ?

কংস ।। আমার ! শুনেছ আমি শয়তান, আমি দানব, আমি রাক্ষস···আরো কত কি ! এও হয়ত শুনেছ···আমি বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে সিংহাসনে আরোহণ করেছি, আমি মাতার বুক থেকে সন্তান ছিনিয়ে নিয়ে পাথরের ওপর আছড়ে মেরেছি, আমি মানুষের তাজা রক্ত পান করি, আমি মদ খাই···আমি কী না করতে পারি—হ্যাঁ, তোমাকেই বা আমি কি না করতে পারতাম !

চন্দনা ।। স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ হচ্ছেনা, আমি বিস্মিতই হয়েছি—

কংস ।। কেন ?

চন্দনা ।। এ প্রাসাদে আমার ওপর এতটুকু অত্যাচার হ'ল না ।

কংস ।। কিন্তু অত্যাচার যে হবেনা, তা কি করে জানলে ?

চন্দনা ।। না, তা জানিনা । হয়ত হবে । কিন্তু এতক্ষণও যে হয়নি কেন, তাই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি ।

কংস ।। হয় তো তোমাকে আমার ভালো লেগেছে !

চন্দনা ।। যদি তা সত্য হয়, তাহলে যে অত্যাচার এতক্ষণ হয়নি···এখন সেই অত্যাচার শুরু হ'ল—

কংস ।। তা হ'লে তোমার ও কথায় এই বুঝছি···তোমাকে আমার ভালো লাগলেও আমাকে তোমার ভালো লাগেনি । তাই—যদি আমি তোমায় চাই, তোমার কাছে সেটা অত্যাচার বলেই মনে হবে । তুমি তা অত্যাচারই মনে করবে—

চন্দনা ।। সত্য ।

কংস ।। আমার কিছুই কি তোমার ভালো লাগল না ? এই সম্পদ, এই বিভব, এই ঐশ্বর্য্য···এই মণিময় রাজপ্রাসাদ···ঐ অগণিত দাসদাসী···

চন্দনা ।। আমি ঘৃণা করি—

কংস ।। এখন তোমার অভিপ্রায় ?

চন্দনা ।। তোমার কি অভিপ্রায় ?

কংস ।। আমার কোন অভিপ্রায় নাই । তোমার কি ইচ্ছা, স্বেচ্ছায় বল—

চন্দনা ।। আমি আমার পল্লী-কুটীরে ফিরে যাব—

কংস ।। [নরকের প্রতি] রথ সজ্জিত করে দাও—

[নরকের প্রস্থান]

চন্দনা ॥ [বিস্মিতভাবে] তার অর্থ ?

কংস ॥ অর্থ অতি সহজ। রথারোহণে তুমি তোমার গৃহে ফিরে যাবে—

চন্দনা ॥ তবে আমাকে বলপূর্বক ধরে এনেছিলে কেন ?

কংস ॥ আমি আনিনি। এনেছিল আমার অনুচরগণ। ভেবেছিলাম, তাদের দণ্ড দেব। কিন্তু তোমায় দেখে তাদের দিয়েছি পুরস্কার। আমার প্রাসাদে সব আছে, সব ছিল…শুধু নাই এই উত্তপ্ত ললাটের অগ্নিদাহ দূর করতে পারে এমন একখানি প্রিয় হাতের চন্দন-পরশ !

[নরকের প্রবেশ]

নরক ॥ রথ প্রস্তুত।

কংস ॥ কেন ?

নরক ॥ [বিস্মিত হইল…চন্দনাকে দেখাইয়া] উনি যাবেন—

কংস ॥ [মরিয়া হইয়া—তথাপি আবেগ যথাসম্ভব দমন করিয়া] তুমি যাবে ?

চন্দনা ॥ [মুহূর্ত-কাল ভাবিয়া]…যাব।

কংস ॥ এস—

[চন্দনা একবার কংসের দিকে তাকাইল, কিন্তু চলিয়া গেল। নরকের ইঙ্গিতে এক যবনী প্রহরিণী তাহার পথ-প্রদর্শিকা হইল]

নরক ॥ সম্রাট, এর অর্থ ?

কংস ॥ যে স্বেচ্ছায় আসে, সে ভালবেসে আসে, কিন্তু যে তা আসে না, তাকে আমি ধরে রাখিনে। কিন্তু এ কথাও সত্য নরক, জীবনে এই প্রথম দেখলাম যে তৃষ্ণার্তকে দেখে নদী শুকিয়ে যায়, পিপাসায় যখন ছাতি ফেটে যায়, তখন সম্মুখের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়—এই উত্তপ্ত ললাট যখন নিদারুণ জ্বালায় চন্দন-পরশ চায়…তখন…তখন ঐ চন্দনা—[বোধ হয় কাঁদিয়াই ফেলিল !…]

———

॥ দুই ॥

পল্লীপথ।

যাদবগণ।

১ম যাদব ॥ মূর্খতা—মূর্খতা—নিছক মূর্খতা।

২য় যাদব ॥ রাজদণ্ড হাতে পেয়ে যে ফিরিয়ে দেয়…আমি তাকে মূর্খও বলি না, সে রীতিমত উন্মাদ !

৩য় যাদব ॥ মূর্খ আমরা, যে, এই উন্মাদের কাছে আশ্রয় চাইতে গিয়েছিলাম !

১ম যাদব ॥ আর ওর এখন ক্ষমতাই বা কি রইল…যে ক'দিন উগ্রসেন রাজা ছিলেন…সে ক'দিন রাজ-জামাতা বলে ওর একটু খাতির ছিল।…কিন্তু—

২য় যাদব ॥ এখন রাজা হচ্ছেন কংস…বংশদণ্ড নিয়ে বোনাইকে শিক্ষা দেবেন—

৩য় যাদব ॥ খুব প্রাণ বাঁচিয়ে আসা গেছে যা হোক্‌…আর একটু থাক্‌লেই—

১ম যাদব ॥ ঘরের ছেলেকে আর ঘরে ফিরে আসতে হ'ত না। এইবার ঘরে ফিরে…টুশব্দটি আর করো না—

২য় যাদব ॥ যত মার-ধরই হোক না কেন, শুধু হাসবে…বলবে…বেশ সুখে আছি—!

৩য় যাদব ॥ গিয়েই কংস রাজার পূজা শুরু করে দেওয়া যাক্‌…রাখলেও তিনিই রাখবেন…মারলেও তিনিই মারবেন।

১ম যাদব ॥ যা বলেছ ভাই। এইবার চল—

২য় যাদব ॥ [অদূরে চন্দনাকে দেখিয়া] ওহে—ওহে—দেখছ ?

৩য় যাদব ॥ [দেখিয়া] চন্দনা !

১ম যাদব ॥ চন্দনা ?

২য় যাদব ॥ হ্যাঁ, চন্দনা—

৩য় যাদব ॥ ছাড়া পেয়েছে, এ দিকেই আসছে।

১ম যাদব ॥ রাত ভোর হয়েছে, ফুল বাসি হয়েছে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে—

২য় যদব ॥ আঃ তবু তো ফুল !

৩য় যাদব ॥ যাক্‌, এত দিনে যদি আমাদের কপাল ফেরে !

১ম যাদব ॥ কিরূপ ?

২য় যাদব ॥ ঘরে ফিরছে।

৩য় যাদব ॥ ঘরে আর ঠাঁই হবে না। বুঝলে ভাই ?…ঠাঁই হলে, কে কোনদিন চিলের মত ছোঁ দিয়ে বিয়ে করে নিয়ে পালাবে—

১ম যাদব ॥ [সোৎসাহে] আমি বুঝেছি—আমি বুঝেছি। ঘরে ঠাঁই না হলে, ও ফুলের মধু আমরা সবাই লুটতে পারব…

৩য় যাদব ॥ চুপ—চুপ—। শুধু শাস্ত্র আর সমাজ…এই দুটির দোহাই দিয়ে কাজ হাঁসিল করতে হবে—, এই যে, চন্দনা যে—

[চন্দনার প্রবেশ]

১ম যাদব ॥ কি গো, দৈহিক কুশল তো ?

২য় যাদব ॥ সঙ্গে দাসদাসী কই ?

৩য় যাদব ॥ [প্রথম ও দ্বিতীয় যাদবকে] ওহে ভুলে যাচ্ছ, ওর ছায়াস্পর্শও গুরুপাতক……[তাহাদিগকে টানিয়া সরাইয়া আনিয়া] শাস্ত্রে ওর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হচ্ছে চান্দ্রায়ণ…গোবর খেয়ে শুদ্ধ হতে হবে। পারবে ?

চন্দনা ॥ তার মানে আমি অস্পৃশ্যা ?

১ম যাদব ॥ ধর্ষিতা তো—!

২য় যাদব ॥ তা'হলেই পতিতা—

৩য় যাদব ॥ শাস্ত্রে পতিতা অস্পৃশ্যা।

চন্দনা ॥ [স্তম্ভিত হইল।] আমি পতিতা ! অস্পৃশ্যা !

১ম যাদব ॥ ধর্ষিতা কি না? বল—

চন্দনা ॥ দানব-দস্যু তোমাদের চোখের সামনে আমাকে বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে যায়…যদি তার নাম নারী-ধর্ষণ হয়, আমি ধর্ষিতা নারী, কিন্তু…ধর্ম সাক্ষী, আমি ধর্ম হারাইনি—

২য় যাদব ॥ ঐ ধর্ষিতা হলেই পতিতা হতে হয়।…কি করবে বল সনাতন ধর্মের সনাতন ব্যবস্থা, না মেনে উপায় নেই!

৩য় যাদব ॥ কাজেই গৃহধর্মে আর তোমার অধিকার নাই।…তোমাকে আমরা বড় স্নেহ করি চন্দনা, কিন্তু সমাজের চাইতে তো আর কেউ বড় নয়!

১ম যাদব ॥ গেছে তো সবই, এখন ঐ সমাজটুকু নিয়েই বেঁচে আছি যে!

চন্দনা ॥ সমাজ? সমাজ? কেমন সেই সমাজ—যে সমাজ—তার কুল-নারীকে রাক্ষসের গ্রাস হতে রক্ষা করতে একপদ অগ্রসর হয় না? আজ সমাজের ধ্বজা ধারণ করে আমার পর্ণকুটীরে যাবার পথটুকু রুদ্ধ করছ, কিন্তু কোথায় পালালে তখন…যখন দানব-দস্যুর করাল-কবল হতে মুক্ত হবার জন্য সর্বচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে কাতর ক্রন্দনে তোমাদের সাহায্য ভিক্ষা চেয়ে আমার কণ্ঠের শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ করেও হতাশ হলাম?

১ম যাদব ॥ সমাজ তখন ঘুমিয়ে ছিল না। সমাজ তখন তোমার মনের বল পরীক্ষা করছিল।

২য় যাদব ॥ সমাজ দেখতে চেয়েছিল নারীমর্য্যাদা রক্ষার জন্য তুমি বিষপান কর কিনা—

৩য় যাদব ॥ কিম্বা উদ্বন্ধনে তনুত্যাগ কর কিনা—

চন্দনা ॥ রাক্ষসের গ্রাস হতে মুক্ত হবার জন্য নারী আত্মহত্যা করে কিনা, পুরুষ তাই দাঁড়িয়ে দেখবে…! তাহলে হে দণ্ডায়মান পুরুষ, দণ্ড দাও ত্রিভুবন-বন্দিতা সীতা দেবীকে, কেন তিনি রাবণ-কর-কবলিতা হয়ে আত্মহত্যা করেননি, কেন তিনি এই আশা…এই প্রার্থনা নিয়ে স্বর্ণলঙ্কায় বেঁচেই ছিলেন, যে, একদিন না একদিন সহায়হীন সম্পদহীন শ্রীরামচন্দ্রই দুর্বৃত্তের বক্ষোরক্ত পান করে অত্যাচারীকে সবংশে নিধন করে তার নারীমর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন!

১ম যাদব ॥ সে রামও নেই…

২য় যাদব ॥ সে অযোধ্যাও নেই!

৩য় যাদব ॥ তে হি নো দিবসা গতাঃ।

চন্দনা ॥ তোমরা আমার পথ ছাড়।

১ম যাদব ॥ তুমি সমাজচ্যুতা—

২য় যাদব ॥ সমাজে তোমার স্থান নাই—

৩য় যাদব ॥ তুমি একঘরে।

চন্দনা ॥ বটে! উত্তম। তোমরা আমার ছায়াস্পর্শ করেছ বলে প্রায়শ্চিত্ত করবে বলছিলে।…তোমরা কর না কর, কিন্তু আমি প্রায়শ্চিত্ত করব—

১ম যাদব ॥ করাই উচিত—

চন্দনা ॥ হ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্ত করব, ধর্ষিতা হয়েছি বলে নয়, মনুষ্যত্বহীন এই পঙ্কিল পঙ্গু সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি বলে।...আমি চললাম...বিষপান করতে নয়, কিম্বা উদ্বন্ধনে তনুত্যাগ করতেও নয়, চললাম সমাজেই আশ্রয় নিতে...তোমাদের এই অমানুষের সমাজে নয়...মানুষের মতো মানুষের সমাজে—[প্রস্থান—]

২য় যাদব ॥ তবে ঐ নারায়ণ-মন্দিরে—

৩য় যাদব ॥ কখনো নয়। দেখি কে ওকে আশ্রয় দেয়—

সকলে ॥ —পালাল...ধর—ধর—মার—মার—

[সকলে চন্দনার পশ্চাদ্ধাবন করিল।]

॥ তিন ॥

নারায়ণ-মন্দির।

[উন্মুক্ত দ্বার-পথে দেখা যাইতেছে পূজা-বেদীর উপর নারায়ণের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্তি। মন্দিরের পূজারী পূজারিণীগণ সোপান-শ্রেণীর উপর দুই সারিতে দাঁড়াইয়া আছে। মন্দির দ্বারে বসুদেব ও দেবকী।]

দেবকী ॥ যাদবগণ, দানবগণ আমাদের শালগ্রাম শিলা চূর্ণ করেছে, তাতে আমাদের এই লাভ হয়েছে যে পাষাণে আজ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আমার নিদ্রিত নারায়ণ জাগ্রত হয়েছেন!

বসুদেব ॥ ঐ তার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী দৈত্য-নিসূদন বরাভয় মূর্ত্তি! যখন জগতে ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন দুষ্কৃতের দমনের জন্য, সাধুদের পরিত্রানের জন্য যুগে যুগে ভগবান জন্মগ্রহণ করেন। আজ জগতের সেই দুর্দিন। এই দুর্দিনে সেই অনাগত দেবতাকে আবাহন কর, প্রার্থনা কর,—

"আবিরাবির্ম এধি!" "অনাগত দেবতা, স্বাগতম্!"

সকলে ॥ "অনাগত দেবতা স্বাগতম্!"

বসুদেব ॥ "অনাগত দেবতা স্বাগতম্!"

সকলে ॥ "অনাগত দেবতা স্বাগতম্!"

বসুদেব ॥ "অনাগত দেবতা স্বাগতম্!"

সকলে ॥ "অনাগত দেবতা স্বাগতম্!"

—সমবেত সঙ্গীত—

অচেতন নারায়ণ? কভু নয়, কভু নয়!
এস আজ মানবক! গেয়ে চল জয় জয়!
প্রলয়-পয়োধি জলে অনাগত দেবতা গো!
কোথা যাবে ভেসে তুমি? ধরার মাটিতে জাগো।
শঙ্খের নাদে দাও পৃথিবীকে বরাভয়!

নৃত্যতি কাল নিশা—রাহু-ভীত সূর্য্য যে !
ধর্মের হিয়া কাঁপে, বাজে পাপ-তূর্য্য যে !
যাত্রীরা পথহারা বল আর কত সয় ?
মৃত্যুর ইঙ্গিতে, হত্যার সঙ্গীতে,
পাতকীর কোলাহলে সাধু গেছে কোন্ ভিতে !
মানবের নাটশালে দানবের অভিনয় !
যুগে যুগে তাই মোরা গাই তব আগমনী,
যুগে যুগে ধরা শোনে তোমারি চরণ-ধ্বনি,
যুগে যুগে আসিয়াছ, এস হে জ্যোতির্ময় ।

[গীতান্তে সকলের প্রস্থান ; গেল না শুধু কঙ্কা ও কঙ্কণ ।]

কঙ্কণ ॥ এইবার তবে বিদায় কঙ্কা !

কঙ্কা ॥ সত্যি তুমি মাকে এখানে আনবে ?

কঙ্কণ ॥ আনবো । পৈশাচিক দাসমনোভাবে অনুপ্রাণিত পিতা—আমার হতভাগিনী মাকে গৃহিণীর সম্মান থেকে বঞ্চিত করে ক্রীতদাসী করে রেখেছেন । তুমি আমার মুক্তি অর্জন করেছ, এইবার আমি তাঁর মুক্তি অর্জন করব । পিতার অত্যাচার হতে মাতার উদ্ধার এবং দানবীয় মোহ হতে পিতার উদ্ধার বর্তমানে আমার একমাত্র কামনা, একমাত্র সাধনা ।

কঙ্কা ॥ তোমার সাধনা জয়যুক্ত হোক । মাকে ব'লো আমি তাঁর পথ চেয়ে আছি । আর শোনো, পূজার এই মঙ্গলঘটটি আমি নিজ হাতে গড়েছি, নিজ হাতে রং করেছি । এইটি আমার মাকে দিয়ে আমার প্রণাম দিয়ো—

কঙ্কণ ॥ —দাও । আমাদের অনাগত দেবতা যেদিন স্বাগত হবেন, মা সেদিন এই মঙ্গল-ঘটের মঙ্গলবারিতে তাঁর অভিষেক করবেন ।···বিদায়—

কঙ্কা ॥ —বিদায়—

[উভয়ে আলিঙ্গনোদ্যত হইল, কিন্তু কঙ্কণ কি ভাবিয়া তখনি প্রতিনিবৃত্ত হইল ।]—না, আজ নয় । পিতা আমার দাস, মাতা আমার দাসী, আমি দাসীপুত্র··· আজ আমাদের অশৌচ, আলিঙ্গন আজ নয়, আলিঙ্গন সেইদিন যেদিন আমরা সবাই দাসত্ব-মুক্ত ।—[প্রস্থান ।]

[অন্য দিক দিয়া বসুদেব-দেবকীর শিশুপুত্র কীর্তিমান কঙ্কার তাম্বুলাধারটি হাতে লইয়া লাফাইতে লাফাইতে আসিল ।]

কীর্তিমান ॥

"পানবুড়ী পানবুড়ী তোর পান খাই ।
টুকটুকে ঠোঁট হবে তাই তাই তাই ।।"

[হাততালি দিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া নাচিতে লাগিল ।]

কঙ্কা ॥ [দেখিল মহা সর্বনাশ] আরে দস্যু ছেলে···পূজার পান···পূজার পান ···নষ্ট করিস্ না ভাই, নষ্ট করিস্ না—

কীর্তিমান ॥ আমার যে ক্ষিদে পেয়েছে ! [আবার লাফাইতে লাফাইতে]

"পান খুলে এলাচ খাব, খয়ের দেব ফেলে।
লঙ্গ খাবে কঙ্কা বুড়ী, চুণ মেখে গালে ॥"

কঙ্কা ॥ লক্ষ্মী ভাই, তোর পায়ে পড়ি···ও ভাই পূজার পান, ও নিতে নেই খেতে নেই—

কীর্তিমান ॥ আমার খিদে পেয়েছে। কি খেতে দিবি ?

কঙ্কা ॥ মধু দেব—

কীর্তিমান ॥ [কঙ্কাকে তাম্বুলাধারটি দিয়া]—দে—

কঙ্কা ॥ কিন্তু সে বড় মুস্কিলের কথা। মৌমাছিরা মৌচাকের ত্রিসীমানায়ও মানুষকে যেতে দেয় না, মানুষ গেলেই হুল ফুটিয়ে দেয়—

কীর্তিমান ॥ [ভ্যা করিয়া কাঁদিয়া দিল] আমি মধু খাব—আমি মধু খাব—

কঙ্কা ॥ খাবে বই কি ! কিন্তু সেখানে মানুষের চেহারা নিয়ে গেলে চলবে না, তোমাকে ভূত সেজে যেতে হবে—

কীর্তিমান ॥ [কাঁদিতে কাঁদিতে] আমি ভূত সাজব—

কঙ্কা ॥ তবে চোখ বোঁজ। এইবার হাত তোল। না—না, হাত নামাও। দুহাতে দু কান ধ'রো—জীব বের কর। পা ফাঁক কর। হ্যাঁ, কিছুতেই চেনা যাচ্ছে না যে এ আমাদের কীর্তিমান। হ্যাঁ, এইবার ঠিক এমনি ভাবে পা ফাঁক করেই হাঁট।···আমার পিছে পিছে এস—[বলাবাহুল্য কীর্তিমান কঙ্কার সব অনুশাসনগুলিই বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করিয়া কঙ্কার পিছনে পিছনে চলিল। কঙ্কা ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি ছড়া গান গাহিতে লাগিল এবং কীর্তিমান তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল।]

।। কঙ্কার ছড়াগান ।।

আয় উড়ে আয় মৌমাছি বৌ
মৌচাকেতে ঝরছে যে মৌ
ফুলপরীরা চুল দুলিয়ে
যায় নেচে ঐ মন ভুলিয়ে
কমলা-ফুলি গন্ধ পেয়ে
ভোম্‌রা কোথায় উঠ্‌বে গেয়ে
পারিজাতের পরাগ লুটে
প্রজাপতি পালায় ছুটে
সুখ-সায়রের তীরে তীরে
দুলছে কত মাণিক-হীরে

ওপার থেকে আসছে বধূ
খোকন খাবে ফুলের মধু

[বসুদেবের প্রবেশ]

বসুদেব ॥ এ আবার কি ?

কীর্তিমান ॥ [পিতার স্বর শুনিয়া চোখ মেলিল এবং কাঁদ কাঁদ স্বরে ডাকিল] —বাবা !

বসুদেব ॥ কি বাবা— !

কীর্তিমান ॥ আমি ভূত—!

বসুদেব ॥ ভূত কি রে !

কীর্তিমান ॥ ভূত হয়ে মধু খেতে যাচ্ছি—

কঙ্কা ॥ আবার চোখ মেলেছ ? তাহলেই আর হলো না—

কীর্তিমান ॥ না—না, আমি চোখ বুঁজেছি।

কঙ্কা ॥ জীব্ বের কর। হ্যাঁ, এখন এস—

[কীর্তিমান কঙ্কার পেছনে চলিল। হঠাৎ কঙ্কা কীর্তিমানকে বুকে তুলিয়া নিয়া] মৌমাছিরা সব ভয়ে পালিয়েছে, এইবার তুমি তাদের মধু খাবে, আমি তোমায় চুমু খাব···[চুম্বন করিয়া তাহাকে লইয়া প্রস্থান।]

বসুদেব ॥ ও শুধু আমাদের চোখের মণি নয়, ওদের সবারই বুকের ধন !

[দেবকীর প্রবেশ]

দেবকী ॥ কীর্তিমান্—

বসুদেব ॥ দেখলে না দেবকী, কীর্তিমানের কীর্তি ?

দেবকী ॥ আবার কি কীর্তি ? মন্দির ও পাগল করে তোলে। কোথায় সে পাগল ?

বসুদেব ॥ ভূত সেজে মৌমাছি তাড়িয়ে কঙ্কার সঙ্গে মৌমাছির মৌ খেতে গেল !

দেবকী ॥ কিন্তু সে যে আজ সারাদিন দুধ খায় নি। দুধ খাব বলে কতবার আমার কাছে কেঁদে গিয়েছে, আমার অবসর হয় নি !

বসুদেব ॥ কিন্তু আর যে হবে সে আশাও দেখছি না !

দেবকী ॥ ছিঃ ও কি কথা প্রভু ?

বসুদেব ॥ হ্যাঁ দেবকী, কংস খবর পাঠিয়েছে, সে তার ভাগিনেয় দর্শন মানসে এখনি এখানে শুভাগমন করবে।

দেবকী ॥ বটে ! সে তবে আজ নিজেই আসছে ! আসুক সে। শৈশবে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি, কৈশোরে এক সঙ্গে কত মান, অভিমানের খেলা খেলেছি, যৌবনেই না হয় ভিন্ন সংসারে এসেছি, আজ তার সঙ্গে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে বোঝা-পড়া করব—কেমন করে সে এমন নিষ্ঠুর হল !

বসুদেব ॥ সে বোঝাপড়ার অবসরটুকুও তোমার মিলবে না দেবকী। সে এসেই আমাদের বুকের ধন কীর্তিমানকে বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে আমাদের চোখের সামনে হত্যা করবে…তুমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে…আমি হয়ত উন্মাদ হব…বোঝা-পড়া করবে কে!

দেবকী ॥ হত্যা করবে! কেন? কেন?

বসুদেব ॥ —আমায় জিজ্ঞাসা ক'রো না…আমায় জিজ্ঞাসা ক'রো না…এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে…নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়—

দেবকী ॥ [চীৎকার করিয়া উঠিল—] কীর্তিমান! কীর্তিমান! সে যে আজ দুধটুকুও খেতে পায় নি!…ওরে, কঙ্কা…কোথায় আমার কীর্তিমান—?

[সানুচর কংসের প্রবেশ।]

কংস ॥ হ্যাঁ, আমি তাকে দেখতে এলাম। পিতার মুখে শুনেছি সে নাকি ভারি সুন্দর হয়েছে দেখতে। চর মুখে শুনেছি সে নাকি ভারি দুষ্টু হয়েছে, আর লোকমুখে শুনেছি সে নাকি তোমাদের চোখের মণি, বুকের মাণিক। এমন কীর্তিমান ভাগ্‌নে আর ক'দিন না দেখে থাকতে পারি! [দেবকীকে] কি বোন, আমায় চিনতে পারছ না? আমি তোমার বংশ-দুলাল কংস—

[দেবকী নীরব রহিলেন]

কংস ॥ অনেক কাল পরেই না হয় দেখা হল, তাই বলে বোন ভাইকে চিনবে না, [বসুদেবকে] একি কথা বল দেখি বোনাই মশাই? [বসুদেব নীরব রহিলেন।] বাঃ এ তো বেশ দেখছি, কেউ কথা কয় না! [ঠিক সেই মুহূর্তে কীর্তিমান কঙ্কার তাম্বুলাধারটি পুনরায় চুরি করিয়া সেখানে ছুটিয়া আসিল, এবং তাম্বুলাধারটি এক হাতে মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়া চোরের মতো নেপথ্যে চাহিয়া দেখিতে লাগিল কঙ্কা আসিতেছে কি না—] এ খোকাটি কে?…দেখতে তো বেশ! তবে রংটি একটু কালো, কিন্তু হাতের ঐ পানের ডিবাটি ভারী চমৎকার! [কীর্তিমানেন সম্মুখে গিয়া] একটি পান দাও না খোকা।—…[কীর্তিমান কংসকে দেখিবামাত্র ভয়ে বিস্ময়ে প্রকাণ্ড একটি 'হাঁ' করিল, কিন্তু তখনি সেই অবস্থাতে, এমন কি তাম্বুলাধারটি যে ভাবে মাথার উপর তুলিয়া ধরা ছিল, সেই অবস্থাতেই যেদিক হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকে ছুটিয়া পালাইল—] এ খোকাও যে পালাল! একটা মস্ত 'হাঁ' করল বটে, কিন্তু, এ-ও কথাটী কইল না…ওটা বোধ হয় চোর, কারো পানের ডিবা চুরি করে পালিয়ে এসেছিল, আমাকে দেখেই আবার পালাল। …বাঃ এ তো বড় মজাই দেখছি, কুটুম্ববাড়ী এসেছি, আমি শুধু ব'কে যাচ্ছি, বোনও চুপ, বোনাই মশায়ও চুপ! এখন আমার কীর্তিমান ভাগনেটি কোথায়? সেটিও যদি বোবা হয় তবেই গেছি! …দেখা যাক্…[মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল।—]

বসুদেব ॥ —দাঁড়াও—, কি চাও তুমি?

কংস ॥ [ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া] এ্যাঁ, বোনাইমশায় তবে বোবা নন !

দেবকী ॥ পরিহাস রাখ কংস—

কংস ॥ এবং বোনটীও নয় !

বসুদেব ॥ কি উদ্দেশ্যে তোমার আগমন ?

কংস ॥ এবং এখন শুধু কথাই নয়, জেরাও চলেছে ! তা এই এলাম, কুটুম্-বাড়ী লোকে আসে কেন ?

বসুদেব ॥ তোমার উদ্দেশ্য আমাদের অবিদিত নয় । পিতাকে বন্দী করে—

কংস ॥ [তৎক্ষণাৎ দেবকীকে] তুমি শোননি বোন ? পিতাকে বিশ্রাম দিয়েছি । উপযুক্ত পুত্র বর্তমানে বৃদ্ধ পিতা খেটে-খুটে খাবেন সে কি কথা বল দেখি ?

দেবকী ॥ স্তব্ধ হও শয়তান । বিজিত যদুকুলের ওপর তোমার ইচ্ছামত অত্যাচার, নির্য্যাতন, নিপীড়নের পথে তোমার পিতাই ছিলেন একমাত্র অন্তরায় । তুমি তাকে কারারুদ্ধ করেই যদুকুলেয় শেষ-সম্পদ এই নারায়ণ-মন্দির লুণ্ঠন করিয়েছ, যদুকুলের পরমারাধ্যতম দেবতা শালগ্রাম শিলা ধ্বংস করিয়েছ—

কংস ॥ [অতি সহজ ভাবে] হ্যাঁ, করিয়েছি । বিদূরথ আমায় বললো সম্রাট, আপনার ভগিনী শালগ্রাম শিলা পূজা করেন । জিজ্ঞাসা করলাম শালগ্রাম শিলা, সে কি ! সে বলল এতটুকু একখানা পাথর ! সভাশুদ্ধ লোকের মাঝে সে যে কি নিদারুণ লজ্জা পেলাম……

নরক ॥ তা বলবার নয় !…সম্রাট তখনি বিদূরথকে আদেশ দিলেন সম্রাটের ভগিনী, ভাগ্যদোষে না হয় গরীবের ঘরণী, তাই বলে সে যে এতটুকু একখানা পাথর পূজা করবে সেটা ভাই-বোন দুজনেরই কলঙ্কের কথা ! সম্রাটের ভগিনী—হয় হিমালয়, না হয় বিন্ধ্য, না হয় নিদেন ঐ গোবর্ধন-পাহাড় পূজা করবে…তা না হলে পূজা আদৌ করবেই না ।

কংস ॥ অন্যায় বলেছি বোন ?

দেবকী ॥ বোনের ওপর তোমার অসীম অনুগ্রহ । এখন দয়া করে—

কংস ॥ দয়ার কথা কি বলছ ভগিনী ? মায়ার কথা বল । তুমিই না হয় মায়া-মমতা ত্যাগ করেছ, কিন্তু আমি তো পারলাম না । আমি ছুটে এলাম ভাগ্‌নেকে দেখতে !

বসুদেব ॥ তুমি তাকে হত্যা করতে এসেছ—

কংস ॥ ভগিনীকে যেদিন তোমার হাতে সম্প্রদান করি, সেদিন কিন্তু দৈববাণী শুনেছিলাম অন্যরূপ । সে কথা, হ্যাঁ, মনে পড়েছে । দৈববাণী হ'ল…কি দৈববাণী হ'ল নরক ?

নরক ॥ "ভগিনী-নন্দন হতে কংসের নিধন !"

কংস ॥ দৈববাণীর ছন্দটি বেশ । "ভগিনী-নন্দন হতে কংসের নিধন !" কাণ জুড়িয়ে যায়…কাণে যেন মধু ঢেলে দেয়…[বসুদেবকে] না ?

নরক ॥ দেবতাদের মধ্যে সব বড় বড় কবি রয়েছেন যে! সেই যে ঢেঁকিবাহন না কি ওর নাম—

কংস ॥ নারদ।…হ্যাঁ, নারদের মুখেও একথা শুনেছি, [বসুদেবকে] আর তুমিও সে দৈববাণী ভোলনি নিশ্চয় ?

বসুদেব ॥ কেমন করে ভুলব! …যে মুহূর্তে দৈববাণী হ'ল সেই মুহূর্তেই, সেই বিবাহ-বাসরেই তুমি দেবকীর শিরচ্ছেদ করতে উদ্যত হলে। আমি তখনি তোমাকে নিবৃত্ত করলাম, দেবকীর অসাক্ষাতে, তোমাকে এক গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে…

কংস ॥ মনে আছে ? হাঃ হাঃ হাঃ

দেবকী ॥ [বসুদেবের প্রতি বিষম ব্যাকুলতায়] কি সে প্রতিশ্রুতি। কি সে প্রতিশ্রুতি ?

বসুদেব ॥ হায় দেবকী, তখন জানতাম না যে পুত্র কি! তখন জানতাম না যে পুত্র ইহলোকের আশা পরলোকের ভরসা। তখন শুধু তোমার প্রেমলুব্ধ মুখখানিই ছিল আমার স্বপ্ন, আমার ধ্যান, আমার কামনা, আমার প্রার্থনা—

দেবকী ॥ তুমি বল নাথ, কি সে প্রতিশ্রুতি ?

কংস ॥ সামান্য একটা কথা বোনাইমশায় হয় তো ভুলেই গেছেন বোন—

দেবকী ॥ তুমিই বল—তুমি বল নাথ,—তুমি বল—

বসুদেব ॥ হৃদয় দৃঢ় কর দেবকী—

দেবকী ॥ করেছি, তুমি বল—তুমি বল—

বসুদেব ॥ সে প্রতিশ্রুতি আজ পুনরুচ্চারণ করতে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে… নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়…

কংস ॥ থাক—থাক—আমি বলি—

দেবকী ॥ [বসুদেবকে] তুমি বল—

বসুদেব ॥ ঐ দৈববাণী ব্যর্থ করবার জন্য আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হল তোমার সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই কংসের হাতে সমর্পণ করব।

কংস ॥ [পৈশাচিক অট্টহাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ—

দেবকী ॥ [সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন]—কীর্তিমান…[যেদিকে কীর্তিমান গিয়েছিল সেই দিকে ছুটিয়া প্রস্থান।]

কংস ॥ [পুনরায় পৈশাচিক উল্লাস—] হাঃ হাঃ হাঃ [দেবকীর প্রতি হস্ত প্রসারণ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, অন্য দিক দিয়া ঠিক এই মুহূর্তে কীর্তিমান ছুটিয়া প্রবেশ করিল। ঠিক পূর্বের মতো সেই তাম্বুলাধারটি মাথার উপরই রহিয়াছে—]

কীর্তিমান ॥ [বসুদেবের নিকট গিয়া] বাবা—বাবা—এইটে লুকিয়ে রাখ তো—

কংস ॥ হাঃ হাঃ হাঃ, তবে ঐ চোরই হল আমার ভাগ্‌নে! ওহে নরক, দেখছ—?

নরক ॥ সময় বুঝে, চোরের ওপর বাটপাড়ি সুরু না করলে, পরে পাল্লা দিয়ে পারবেন না সম্রাট !

বসুদেব ॥ [মরিয়া হইয়া, কীর্তিমানকে কংসের সম্মুখে লইয়া যাইতে যাইতে] এই অবসরে…এই অবসরে…হে দস্যু…হে ঘাতক, তুমি আমার পুত্র গ্রহণ কর…ঐ হতভাগিণীর চোখের সামনে তার হৃদয়-দুলালকে হত্যা করো না—

কংস ॥ [কীর্তিমানকে অবলীলাক্রমে এক হাতে শূন্যে তুলিয়া ধরিয়া বসুদেবের প্রতি] হত্যা ?…[নরকের প্রতি] চোরের কি শাস্তি নরক ?

নরক ॥ ঐ শিলাস্তুপে নিক্ষেপ এবং বধ। নইলে ঐ গুণধর ভাগ্নে মামার বাড়ীতে সিঁধ কেটে…বুঝতেই পারছেন—

কংস ॥ অতএব—[কীর্তিমানকে ঝাঁকি দিল]

নরক ॥ ও পাপ অঙ্কুরেই বিনাশ—

কীর্তিমান ॥ [ভয় পাইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল] বাবা গো !

বসুদেব ॥ ওরে ওরে [শুধু আকুলি বিকুলি। কি করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না ।

[ছুটিয়া দেবকীর প্রবেশ]

দেবকী ॥ [কীর্তিমানকে দেখিয়া] ঐ ! আমার হৃদয়-দুলাল ঐ—বুকে আয় বাপ, বুকে আয় [গ্রহণ করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন]

কীর্তিমান ॥ মাগো—মা—

কংস ॥ এ চোরের মনে এখনো ভয় আছে ! [হঠাৎ তাহাকে নামাইয়া দেবকীর প্রসারিত ব্যগ্র বাহুতে ঠেলিয়া দিয়া] অতএব আপাততঃ আমার কোন ভয় নেই !

কীর্তিমান ॥ মা !

দেবকী ॥ বাবা !

নরক ॥ চোরের শাস্তিবিধান করে ও অমঙ্গল অঙ্কুরেই বিনাশ করা উচিত ছিল সম্রাট ।

কংস ॥ ওটা যে এখনো কাঁদে ! তাও যদি বা তুচ্ছ করতে পারতাম, কিন্তু [দেবকীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া] ওকে…কোনদিনই পারি নি…আজও পারলাম না !

নরক ॥ হুঁ ।

কংস ॥ [দেবকীকে] বেশ বোন্ বেশ ! ছেলে কোলে পেয়ে ভাইকে যে একেবারে ভুলেই গেলে !…কিন্তু তাতো চলবে না…আমার যে ক্ষিদে পেয়েছে… এসো নরক, দিদির ভাঁড়ার লুট করি—[নরক ও বিদূরথসহ অন্দরে প্রস্থান ।]

দেবকী ॥ হয়ত আবার কোন নতুন মতলব…দেখি…[কীর্তিমানসহ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রস্থান ।]

** [বসুদেবও মন্দিরে যাইবেন ভাবিতেছিলেন…এমন সময় বাহিরে কোলাহল ; "ধর্—ধর্—"মার্—মার্—ব্যাধ-তাড়িতা হরিণীর মতো ছুটিয়া চন্দনার প্রবেশ। প্রবেশমাত্র বাহিরের একটি লোষ্ট্রাঘাতে চন্দনা আহত হইয়া সোপানে লুটাইয়া পড়িল——]

চন্দনা ॥ বাবা [আর্তনাদ ।]

বসুদেব ॥ কি মা ! একি মা !

চন্দনা ॥ [বাহিরের দিকে হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া] ওরা আমায় মেরে ফেল্‌ল !

[ছুটিয়া যাদবগণের প্রবেশ]

যাদবগণ ॥ [বসুদেবের প্রতি] খবরদার ওকে ছুঁয়ো না—

বসুদেব ॥ কেন ? ও যে চন্দনা—

১ম যাদব ॥ হ্যাঁ, পতিতা—

২য় যাদব ॥ সুতরাং অস্পৃশ্যা—

বসুদেব ॥ কেন ? কেন ?

৩য় যাদব ॥ কংসের অনুচরেরা ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল—ওর জাতিনাশ হয়েছে—

বসুদেব ॥ হ্যাঁ তোমাদের সম্মুখেই ধরতে এসেছিল···তোমাদের সম্মুখ থেকেই ধরে নিয়ে গেল···তোমরা ভয়ে কেউ কথাটি বললে না···আজ জাতিনাশ হ'ল ওর !

১ম যাদব ॥ আজ হবে কেন, যে মুহূর্তে পরপুরুষ-স্পর্শদোষ হল সেই মুহূর্তেই নারী ধর্ষিতা হল—

বসুদেব ॥ তাহলে তোমরা ?···তোমাদের তো শুধু স্পর্শদোষ হয়নি ! তোমাদের পিঠে তারা পাদুকা প্রহার করেছে, সেই পাদুকাই আবার তখনি তাদের আদেশে তোমরা লেহন করতে বাধ্য হয়েছ ! ধর্ষিতা হও নি···স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী দানব কি শুধু নারীকেই ধর্ষণ করছে ! তোমাদের করছে না ? তোমাদেরই চোখের সামনে কি তোমাদের পূজাধর্ম বারিত হয় নি ? এই মন্দিরেই কি তোমাদের যুগযুগান্তের শালগ্রাম শিলা চূর্ণিকৃত হয়নি ?···সেও যাক্‌, কোথার গেল তোমাদের গোলাভরা ধান···অঙ্গনভরা গরু ? ধর্ষিত হও নি ? অসুর যখন তোমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তোমারই চোখের সামনে তোমারই মা···তোমারই বোনকে ধর্ষণ করে, সে কি শুধু নারী-ধর্ষণ ? পুরুষ কি তাতে ধর্ষিত নয় ?

১ম যাদব ॥ ও সব বুঝি না। আমরা কিছুতেই দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে পারব না—

২য় যাদব ॥ আমরা ওকে সমাজচ্যুত করেছি—

৩য় যাদব ॥ আমরা ওকে দেশছাড়া করব—

বসুদেব ॥ আমি বেঁচে থাকতে নয়। আয় মা আমার বুকে আয়—চল মা মন্দিরে···আমি পূজা করব···তুই আরতি করবি—

১ম যাদব ॥ খবরদার—, ধর্মের অবমাননা সইব না···ও পতিতা—

বসুদেব ॥ আমরাও পতিত !

২য় যাদব ॥ কিন্তু আমাদের ঐ নারায়ণ···

বসুদেব ॥ তিনি পতিতেরই দেবতা···মূর্খ ! তাই তাঁর নাম পতিতপাবন নারায়ণ—

৩য় যাদব ॥ ও সব বুঝি না। ধর্মের লাঞ্ছনা—

যাদবগণ ॥ [সমস্বরে] সইব না—সইব না—মার—মার—

[বসুদেব চন্দনাকে লইয়া মন্দিরের সোপানপথে পা বাড়াইয়াছিলেন এমন সময় যাদবগণ পুনরায় লোষ্ট্র নিক্ষেপোদ্যত হইল।]

বসুদেব ॥ ভগবান! ভগবান! ওরা জানেনা ওরা কি করছে! ক্ষমা ক'রো…ক্ষমা ক'রো… আমাদের এই মোহান্ধ ভাইদের ক্ষমা ক'রো——

[অদূরে কংস, বিদূরথ ও নরকের প্রবেশ।]

কংস ॥ বাঃ এ আবার কি খেলা হে নরক! দেখেছ?

[সেই মুহূর্তেই একটি লোষ্ট্রাঘাত হইল। তাহাতে চন্দনা পুনরায় আহত হইয়া আর্তনাদ করিয়া সোপানপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। তাহার কপাল কাটিয়া দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল।]

বসুদেব ॥ ও হো হো [চন্দনাকে ধরিলেন।] চন্দনা—চন্দনা—

কংস ॥ [কংসকে দেখিয়াই যাদবগণ লোষ্ট্রাঘাতে নিবৃত্ত হইয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল]…[যাদবদের প্রতি] এ কি খেলা খেলছ হে তোমরা? চমৎকার খেলা! [নরককে] দেখ—দেখ—এ খেলাতে ঐ মেয়েটির কপালে কেমন শোভা হয়েছে! [বিদ্রূপাত্মক হাস্যে যাদবদের প্রতি] ও…কুঙ্কুম খেলছিলে বুঝি?

[যাদবগণ নীরবে নতমুখে অপরাধীর মতো দাঁড়াইয়া রহিল।]

কংস। [চন্দনার দিকে তাকাইয়া] কুঙ্কুমে ঐ কপালে কি সুন্দর শোভা হয়েছে দেখেছ নরক?

বসুদেব ॥ পরিহাস রাখ কংস। এ রক্তপাতও তোমারই কীর্তি। তুমি এই অপাপবিদ্ধা নিষ্কলঙ্কা নারীকে লুণ্ঠন করেছিলে…ঐ মূর্খ জনতা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ নিল তোমার ওপর নয়, এই নারীরই ওপর…যে নারীকে ওরাই একরূপ নিজ হাতে তোমার কামনার আগুণে নিক্ষেপ করেছে!

কংস ॥ আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে…কেন?…ওরা যে আমার [যাদবগণের প্রতি]…কি ?

যাদবগণ ॥ [নতজানু হইয়া] দাসানুদাস।

কংস ॥ কুলোকে ও কথা বলে বটে, কিন্তু তোমরা…ও কথা বললে মনে বড় ব্যথা পাই। দাসানুদাস তো কতই রয়েছে। কেউ কি জানতো যে আমার এই উত্তপ্ত-ললাটে কি নিদারুণ প্রদাহ পুঞ্জীভূত হয়ে আমায় দগ্ধ করছে…কেউ কি চিন্তা ক'রে দেখেছিল কি তার ঔষধ…কার শান্ত-স্নিগ্ধ কল্যাণ-করের চন্দন-পরশে তার শান্তি-প্রলেপ হবে?

১ম যাদব ॥ [তাহাদের অপরাধের কৈফিয়ৎ হইবে মনে করিয়া] সেই জন্যই তো সম্রাট আমরা ওকে আপনার প্রাসাদে পুনঃ প্রেরণের জন্যই এই উৎপীড়ন করেছি—

কংস ॥ সে আমি দেখেই বুঝেছি—কিন্তু

২য় যাদব ॥ [উৎসাহিত হইয়া] ওকে যেতেই হবে আপনার প্রাসাদে—

৩য় যাদব ॥ না গেলে ওকে কি আমরা সহজে ছাড়ব ?

চন্দনা ॥ [ঐরূপ আহত অবস্থাতেও এই নতুন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মরিয়া হইয়া সোপান বাহিয়া মন্দিরে উঠিতে গেল—] আমি যাব না—আমি যাব না—[পড়িয়া গেল—কিন্তু পুনরায় উঠিতে চেষ্টা করিতে করিতে] আমি এই মন্দিরে আঁকড়ে পড়ে থাকব…না হয় এইখানেই মাথা খুঁড়ে মরব…আমি যাব না…আমি যাব না…

বসুদেব ॥ হ্যাঁ, তুমি যাবে না। হওনা কেন তুমি অবলা নারী, হোক্ না কেন দুর্বল তোমার দেহ, কিন্তু, মনের বলে বলী হয়ে একবার যদি তুমি বল আমি যাব না—, নিষ্ফল হবে দানবের কামনা, ব্যর্থ হবে শয়তানের সাধনা। দেহই না হয় বন্দী করবে, কিন্তু মন বাঁধবে কে ? মন বাঁধবে কে ?

কংস ॥ [যাদবগণের প্রতি] হুঁ।…যে স্বেচ্ছায় আসে, সে-ই ভালোবেসে আসে…তারই শুশ্রূষা…শুশ্রূষা। কিন্তু যে তা আসে না…তাকে আমি চাই না—

যাদবগণ ॥ [নিছক চাটুকারের মতো] যথার্থ বলেছেন সম্রাট !

কংস ॥ তখন আমি চাই তাদের, যারা আমার প্রাসাদে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক প্রেরণ করবার জন্য অত্যাচার করেছে, লোষ্ট্রাঘাত করেছে !

নরক ॥ তাদের নিয়ে আপনি কি করবেন সম্রাট ?

কংস ॥ তাদের ছিন্ন শিরের তপ্ত-রক্তে এই উত্তপ্ত ললাটের বিষক্ষয় করব ! কেন, তুমি কি জাননা নরক, বিষস্য বিষমৌষধম !…বিদূরথ—

বিদূরথ ॥ প্রভু—

কংস ॥ [একহাতে ললাট চাপিয়া ধরিয়া যেন বিষম যন্ত্রনায়] কি পাচ্ছি ? চন্দন-পরশ ? না তপ্তরক্ত ?

[বিদূরথ যাদবগণের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল—]

যাদবগণ ॥ [প্রাণভয়ে ছুটিয়া গিয়া সোপানপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া আর্তকণ্ঠে] —দয়া কর দেবী, দয়া কর—দয়া করে তুমি প্রাসাদে যাও—

বসুদেব ॥ [যাদবগণের প্রতি] ধর্ষিতা কি আজ শুধু ঐ নারী, তোমরা ধর্ষিত নও ? তোমরা ধর্ষিত নও ?

চন্দনা ॥ দেবী ! দেবী ! কে দেবী ? আমি তো ধর্ষিতা…পতিতা… ! [কাঁদিয়া ফেলিল।]

যাদবগণ ॥ [পাষাণ সোপানে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে] আমাদের জননী…আমাদের মাতা—! দয়া কর দেবী, দয়া কর মাতা— !

বসুদেব ॥ [যাদবগণের প্রতি] ওরে ভীরু…ওরে কাপুরুষ…ওরে লুপ্ত-মনুষ্যত্বের পিশাচপ্রেত, জননীর নারীধর্ম বিনিময়েও রক্ষা করবি ঐ ক্ষুদ্র…অতি ক্ষুদ্র প্রাণ ?…ওরে…তোরা মর—তোরা মর—

কংস ॥ [হুঙ্কার দিয়া] তপ্ত রক্ত ! তপ্ত রক্ত।

[তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণ তরবারি কোষমুক্ত করিল—]

যাদবগণ ॥ রক্ষা কর মা···রক্ষা কর—

চন্দনা ॥ ও···হো—হো ! আমি কি করি ! আমি কি করি ! [নিদারুণ অন্তর্বিপ্লব ।]

বসুদেব ॥ তুমি যাবে না—

কংস ॥ [হুঙ্কার দিয়া বসুদেবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে] রক্ত—রক্ত—
(সৈন্যগণ উন্মুক্ত অসি হস্তে বসুদেবকে বধ করিতে রুখিল)

চন্দনা ॥ না—না—, আমি যাব—আমি যাব—

[কংসের দিকে ছুটিল]

কংস ॥ [তৎক্ষণাৎ যেন তাহার সমস্ত যন্ত্রণা নিমেষে অন্তর্দ্ধান করিল । চোখে মুখে এক শয়তানি দীপ্তি লইয়া]—স্বেচ্ছায় ?

চন্দনা ॥ —স্বেচ্ছায়···!

[বলিল বটে, কিন্তু এই একটি কথা বলিতে তাহার দেহমন যেন ভাঙিয়া পড়িল ।]

বসুদেব ॥ —চন্দনা—

কংস ॥ হাঃ হাঃ হাঃ !

———

তৃতীয় অঙ্ক

॥ এক ॥

পুষ্পবাটিকা

[একদিকে একটি মালতী লতার গাছ লতাইয়া উঠিয়া চাঁদোয়া রচনা করিয়াছে, তাহারই তলে বসিবার জন্য সুবিস্তৃত সিংহ-পীঠিকা, তাহার পদতলে পাদপীঠিকা। আর একদিকে চতুষ্কোণ একটি পাষাণ ঘর। ইহার বিশেষত্ব এই যে উহার একটি মাত্র পাষাণ-দ্বার, প্রয়োজন হইলে তাহা উপরে উঠাইয়া লওয়া যায়, আবার প্রয়োজন মত উহা নামিয়া আসে। পুষ্পবাটিকার পশ্চাতে ঝিল। ঝিলের উপর সেতু]

[সিংহ পীঠিকায় চন্দনা। নর্ত্তকীগণ চন্দনার সম্মুখে নৃত্যগীত করিতেছিল]

সুন্দরী গো সুন্দরী—
—সুন্দরী
কী বান তুমি রেখেছ ঐ
ডাগর আঁখির তূণ ভরি
—তূণ ভরি।
মঞ্জীরে কি মঞ্জু-গীতি
চঞ্চলিয়া স্বপ্ন-স্মৃতি
চিত্ত-মধুপ নৃত্য করে
গুঞ্জরি আর গুঞ্জরি।

ছন্দ একি অন্তরে, ক্রন্দনহীন মন্তরে
—সন্তরে !
বিশ্ব যেন নিঃস্ব হয়ে তোমায় চাহে গো,
মর্ম-কানন মর্মরিয়া কি গান গাহে গো !
দীপ্ত বালুর তপ্ত-বুকে
পুষ্প উঠে মুঞ্জরি,
—মুঞ্জরি।

[নরকের প্রবেশ]

নরক ॥ সম্রাট আমায় দিয়ে আপনাকে বলে পাটালেন আপনার ধর্মচর্চায় কেউ

কখনো ব্যাঘাত করবে না—। আপনি ইচ্ছা করলে পূজার্চনা করতে পারেন।… বলেন তো তিল-তুলসী আনিয়ে দি—

চন্দনা ॥ বাধিত হলাম। দিন না আনিয়ে—

নরক ॥ যথাজ্ঞা দেবী। [প্রস্থানোদ্যত]

চন্দনা ॥ দাঁড়ান—[নরক দাঁড়াইল।] [পাষাণ-ঘর দেখাইয়া]… ঐ ঘরটা কি বলুন দেখি। [নর্তকীদের দেখাইয়া] ওদের জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা কেউ বলতে পারছে না। ভাব দেখে মনে হচ্ছে ওরা জানে, কিন্তু, বলতে ইতঃস্ততঃ করছে। ব্যাপারটা কি বলুন না—

নরক ॥ ওর মস্ত একটা ইতিহাস আছে। সে শুনবেন এখন।…পূজার্চনার হয়ত বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে—

চন্দনা ॥ পূজার্চনা কখন করতে হবে, কিম্বা আদৌ করতে হবে কি না, সে ভাবনার ভারটা আমার উপর দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে আমার এখানে একটু বসুন দেখি। ব্যাপারটা কি বলুন তো—। ঘরটা যতই দেখছি, আমি ততই হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি…চারদিকে শুধু পাথর আর পাথর…আলো বাতাসের এক তিল পথ নেই… দেখলেই মনে হয় কারো বুঝি বা নাভিশ্বাস উঠেছে—

নরক ॥ যথার্থ বলেছেন। ঐ ঘরে একটি মাত্র পাষাণ দরজা আজে…সে যে কোথায় তা এক সম্রাট ছাড়া আর কেউ জানে না। এক শুধু তাঁর ইঙ্গিতেই সেই দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং রুদ্ধ হয়—!

চন্দনা ॥ কিন্তু আমাকেও সেই ইঙ্গিতটা আয়ত্ত করতে হবে! ঐ ঘর-ই যে হবে আমার গোসাঘর—আচ্ছা সে হবে এখন। আপনার আর কোন প্রয়োজন আছে?

নরক ॥ [বিস্মিত হইয়া] আমার তো কোন প্রয়োজন নেই, দেবীর প্রয়োজনেই দাস এখানে বর্তমান!…এইবার তবে পূজার আয়োজন?

চন্দনা ॥ অবশ্য পূজার কি আয়োজন করবেন?

নরক ॥ তিল তুলসী—

চন্দনা ॥ আমার হয়ে ওগুলো যমুনার জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসুন।

[নরক অবাক হইয়া চন্দনার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল]

চন্দনা ॥ অবাক হয়ে দেখছেন কি? ঐ আমার পূজা। রহস্য নয় …যান্—

নরক ॥ অধমের সঙ্গে পরিহাস কেন দেবী?

চন্দনা ॥ অধমের সঙ্গে কোনকালেই পরিহাস করিনি। পরিহাস করতে পারি আপনার সম্রাটের সঙ্গে…। আপনার সঙ্গে পরিহাস করছি…আপনার এরূপ ধৃষ্টতাময় কল্পনা ভবিষ্যতে আর যেন কখনো আমাকে ক্লিষ্ট না করে…। শুনুন— যমুনার জলে আমার হয়ে তিল তুলসী ভাসিয়ে দিয়ে এসে আমার জন্যে একটি ধুপদানী নিয়ে আসুন…আমি আরতি করব—

নরক ॥ যথাজ্ঞা দেবী—

[প্রস্থানোদ্যত, এমন সময় কংসের প্রবেশ। সকলে তাহাকে অভিবাদন করিল]

কংস ॥ কোথায় যাও নরক ?

নরক ॥ দেবীর পূজায়োজন-ব্যবস্থা করতে—

কংস ॥ এস। [নরকের প্রস্থান।]

[চন্দনার দিকে তাকাইল। দেখিল চন্দনাও তাহার দিকেই তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছে। মুহূর্ত্ত কাল এই ভাবে কাটিল। পরে কংস ঘুরিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্তকাল কি ভাবিল, তাহার পর প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল]

চন্দনা ॥—সম্রাট…

কংস ॥ [তাহার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া]—বল…

চন্দনা ॥ চলে যাচ্ছেন যে …?

কংস ॥ কেউ তো আমায় থাকতে বললো না।

চন্দনা ॥ সাহস ছিল না…, বলিনি। এবার সাহস পেলাম , আসুন। [কংসকে সিংহ-পীঠিকায় লইয়া বসাইলেন।] এর পর কি কর্তব্য তাও তো জানি না! [নর্তকীদের প্রতি] এখন ?

[নর্তকীগণ নৃত্য সুরু করিল]

চন্দনা ॥ তারপর ?

[সুরা বাহিনী "মদিরা" মদ্যের সরঞ্জামাদি লইয়া নাচিতে নাচিতে আসিল— চন্দনা তাহার হাত হইতে পান-পাত্রাদি লইয়া কংসকে পরিবেশন করিতে গেল। মদিরা নৃত্য করিতে লাগিল। চন্দনার এই আচরণে কংস মহা-বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের পানে বিমূঢ়ের মত তাকাইয়া রহিল। পরে চন্দনার এই অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ তাহার পক্ষে যেন এক আকস্মিক সৌভাগ্য…ইহাকে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া বরণ করা আবশ্যক এই কথা তাহার মাথায় খেলায় সে চট্ করিয়া এক নিমেষে চন্দনার হাত হইতে মদ্য লইয়া পান করিয়া ফেলিল। কিন্তু পানের পর চন্দনার দিকে চোখে চোখে চাহিতে চেষ্টা করিয়াও সাহস পাইল না। মদিরার নৃত্য শেষ হইলে নরক ধূপদানী হাতে লইয়া প্রবেশ করিল।]

চন্দনা ॥ তারপর বুঝি আরতি ?

ধূপদানী…আমার ধূপদানি [ছুটিয়া গিয়া নরকের হাত হইতে ধূপদানি লইল এবং কংসের সম্মুখে আসিয়া কংসকেই আরতি সুরু করিল।

কংস ॥ [অস্থির হইয়া উঠিল—]তুমি—তুমি ভুল করছ চন্দনা! আমি—আমি তো তোমার নারায়ণ নই—!

চন্দনা ॥ আমার নারায়ণ? কোনদিন কি ছিল ? যদি থাকতো তবে আজ আমি এখানে কেন ? আমার কিছু নাই, কিছু ছিল না। অথবা যা কিছু ছিল… সব মিথ্যা। মিথ্যাই যদি না হবে, তবে আমি যে পতিতা…এইটেই আমার জীবনের সব চাইতে বড় সত্য হয়ে দাঁড়াল কেন ? কিছু না—সব মিথ্যা…শুধু এইটুকু আজ সত্য যে আমি পতিতা…আমাকে সমাজ পদাঘাতে দূর করে দিয়েছে,

দেবতা চরণে ঠেলেছেন…কিন্তু মাথায় তুলে নিয়েছ তুমি…তুমিই আজ আমার দেবতা…তুমিই আমার আরতি নাও…পূজা নাও—

—চন্দনার গান—

আরতি নাও মরমের, অধমের নাও গো বাণী,
সারথি মনোরথের হবে আজ হবেই জানি।
বিমলিন কুসুম-ডোরে
তুলে নাও আদর ক'রে
গাঁথো আজ নতুন মালা, ভরো মন-কুসুমদানী।
আকাশে অরুণ ডালা, বাতাসে ফুলের আতর,
তরুণ ঐ প্রজাপতি, আলোকের পুলক-কাতর।
আমি এক মধুর প্রাতে
বসে আজ বঁধুর সাথে
বাজাব ভৈরবীতে হৃদয়ের বীণাখানি।

কংস ॥ আমি আজ ধন্য! আমি আজ ধন্য! আজ আমি জয়ী…পরমজয়ী…। দেবতাকে পরাজিত করে তার শ্রেষ্ঠ-সম্পদ আজ আমি লাভ করেছি…সে তুমি!

চন্দনা ॥ কেমন আরতি হল?

কংস ॥ আমার ভাষা নাই—আমার ভাষা নাই—

চন্দনা ॥ খুসী হয়েছ —?

কংস ॥ কেমন করে বোঝাব আমি কত খুসী হয়েছি! নরক…আজ আমি একা খুসী হব না…রাজ্যে আজ উৎসবের ব্যবস্থা কর…এ উৎসবের নাম হবে চন্দনোৎসব…

নরক ॥ যথাজ্ঞা সম্রাট!

[নর্তকীগণ ও নরক চলিয়া গেল।]

চন্দনা ॥ কিন্তু আমার যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে!

কংস ॥ কেন? কেন?

চন্দনা ॥ ঐ পাষাণ-ঘরটি দেখে।…ও কি?…বুদ্ধ কক্ষে আলো নাই, বাতাস নাই…আলো-বাতাস প্রবেশ করে তার তিলমাত্র পথ নাই। কেন?

কংস ॥ [শিহরিয়া উঠিয়া] ও একটা দুঃস্বপ্ন…

চন্দনা ॥ কিন্তু তা কি করে হয়…! ওটা তো জেগে থেকেই দেখতে পাচ্ছি…স্বপ্ন দেখে লোকে ঘুমিয়ে।

কংস ॥ হ্যাঁ চন্দনা, আমি সে দিন একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। নিদ্রাকালের

সেই দুঃস্বপ্নকে জাগ্রত অবস্থায় ব্যর্থ করবার মানসে আমি ঐ পাষাণের অন্ধকূপ রচনা করেছি···আমার দুঃস্বপ্ন ঐ পাষাণকারায় রুদ্ধ হয়ে ব্যর্থ হয়ে আছে !

চন্দনা ।। কি দুঃস্বপ্ন ?

কংস ।। [পরম আগ্রহ এবং কৌতুহল সহকারে, কিন্তু নিম্নস্বরে] আচ্ছা চন্দনা, দুঃস্বপ্ন কি সত্য সত্যই ফলে ?

চন্দনা ।। সুখ-স্বপ্ন বরং ফলে না, কিন্তু দুঃস্বপ্ন ফলবেই ফলবে···আমার জীবনেই দেখেছি—!···কি দুঃস্বপ্ন দেখেছ সম্রাট !

কংস। যে দুঃস্বপ্নই দেখে থাকি আমি তা বিফল করব···ব্যর্থ করব···আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।···এ আমার জীবন-মরণের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে চন্দনা—!

চন্দনা ।। আপনার নাম কি কংস নয় ? কে আপনি ?

কংস ।। কেন ?

চন্দনা ।। বিশ্বের বুকে যে ত্রাস সঞ্চার করেছে শুনতে পাই, সে যদি একটা দুঃস্বপ্ন দেখে এমনই ভীত হয়ে পড়ে যে, সে-দুঃস্বপ্নের কাহিনীটি পর্য্যন্ত বলতে আতঙ্কে শিউরে উঠে,—ও প্রশ্ন কি নিতান্তই অশোভন ?

কংস ।। [দুর্বলতা যথাসম্ভব গোপন করিয়া সপ্রতিভের মতো উত্তর দিবার চেষ্টা সহকারে] না—না—স্বপ্ন-কাহিনী বলব না কেন ?···আমি বলছিলাম কি···ভারী তো একটা স্বপ্ন, তার আবার কাহিনী···কেইবা বলে আর কেইবা শোনে ?

চন্দনা ।। [দৃঢ়তায়] আমি শুনব—

কংস ।। [চন্দনার সহিত না পারিয়া] শোন। ভারী মজার কথা। সেই যে একটুকরো পাথর···যাকে তোমরা শালগ্রাম বলতে···ঐ যা শেষে, আমি নয়, বিদূরথ চুর্ণ বিচূর্ণ করল···তারই পূজাবেদীতে ওরা খুব রং চং করে এক জমকালো মূর্তি গড়ে পূজা সুরু করল।···সে মূর্তির কি বাহার ! চার চারখানা হাত···এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র, এক হাতে গদা, আর এক হাতে পদ্ম !···হাসির কথা নয় চন্দনা ?

চন্দনা ।।···কিন্তু স্বপ্নের কথাটি কি ?

কংস ।। দাঁড়াও, বলি—, ব্যস্ত কেন ? আমার ভারী পিপাসা পেয়েছে। তুমি আমায় একটু জল দাও। না,—যাক গে, শোন—। স্বপ্ন দেখলাম আমারই বোন দেবকী—দেবকী সেই চতুর্ভুজ মূর্তি পূজা করছে। দুচোখ দিয়ে দরদর ধারে অশ্রুর প্রবাহ। দেবকী প্রার্থনা করছে—

চন্দনা ।। কি প্রার্থনা সম্রাট ?

কংস ।। দেবকী প্রার্থনা করছে, হে দেবতা···তুমি বরাভয় মূর্তিতে ধরাতলে জন্ম নাও···জন্ম নিয়ে, সেও ভারী এক হাসির কথা—!

চন্দনা ।। তুমি স্বপ্নের কথা বল—

কংস। বলি।···তুমি আমায় জল দাও।···না—না···জল নয়···। থাক্। ···তারপর—

চন্দনা ।। হ্যাঁ, তারপর ?

কংস ॥ সেই মূর্তির মুখে হাসি ফুট্‌ল···যেমন অন্ধকার রাত্রের পর প্রভাতের হাসি ফোটে।···সেই অচল-মূর্তি সচল হল।···মূর্তি ক্রমে দেবকীর দিকে অগ্রসর হতে লাগল···আমি চোখে ক্রমেই ঝাপ্‌সা দেখতে লাগলাম···শেষটায় মনে হল—ও-হো-হো—[চীৎকার করিয়া উঠিল] সুরা ! সুরা !

চন্দনা ॥ [তৎক্ষণাৎ মদ্যদান করিল। কংস পানান্তে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে···] —শেষটায় ?

কংস ॥ শেষটায় মনে হল কেন, আমি স্বচক্ষে দেখলাম···সেই মূর্তি দেবকীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল,—চন্দনা, চন্দনা, সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীষণ আর্তনাদ···পরে বুঝলাম সে আর্তনাদ আর কারো নয়, আমার। মনে হল আমি শয্যা থেকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত। কোটী শঙ্খ-ধ্বনির মাঝে আমার সে আর্তনাদ অতল তলে ডুবে গেল। নরক ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে উঠ্‌ল—ভূমিকম্প ! ভূমিকম্প ! [ভয়ে আতঙ্কে, আত্মহারার মতো ছুটিয়া যাইতেই পাষাণঘরের দেওয়ালে বাঁধা পাইল—]

চন্দনা ॥ ভূমিকম্প ? স্বপ্ন না সত্য ?

কংস ॥ হোক্ স্বপ্ন···অথবা হোক্ সত্য···কিছুমাত্র আসে যায় না···যখন—হাঃ হাঃ হাঃ [অট্ট হাস্য]

চন্দনা ॥ যখন—?

কংস ॥ [ঊর্ধ্বে চাহিয়া ইঙ্গিত। স ঙ্গ সঙ্গে পাষাণ-ঘরের সম্মুখস্থ পাষাণ-দ্বার ঊর্ধ্বে উঠিয়া গেল। দেখা গে· নারায়ণ-মন্দিরের চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্তি বেদীর উপর রক্ষিত রহিয়াছে—] এখন সেই স্বপ্নদৃষ্ট মন্দির-দেবতা আজ আমার এই পাষাণ-ঘরে চিরতরে বন্দী···এবং—

চন্দনা ॥ —এবং ?

কংস ॥ দেবকী, বসুদেব তাদের অনুচরগণ সহ শতরক্ষী-পরিবেষ্টিত লৌহ-কারাগারে নিক্ষিপ্ত···শুধু এই জন্য যে—

চন্দনা ॥ বল—বল—

কংস ॥ আমি অতিমানব অথবা দানব। যে দুঃস্বপ্ন মানুষকে বিধ্বস্ত করে, আমি সেই দুঃস্বপ্নকে ব্যর্থ করি···ঐখানেই আমার আনন্দ এবং ঐখানেই আমার উল্লাস !

চন্দনা ॥ [আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রতিমা লক্ষ্যে] ঠাকুর—ঠাকুর—[প্রণাম করিতে গিয়াই বিদ্রোহিনীর মতো] না—না—কে ও ! কি ও ! কিছু না···শুধু মাটি, শুধু পাথর—[যেন সেখান হইতে পলায়ন করিতে পারিলে বাঁচে, কংসের হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল—] চল সম্রাট—

কংস ॥ আমি তবে তোমায় পেলাম চন্দনা—[চন্দনার হাত দুখানি বুকে লইয়া —চুম্বনের পূর্বে চন্দনার মুখের পানে তাকাইল]

চন্দনা ॥ [চমকাইয়া উঠিয়া] না—আজ নয়।

কংস ॥ [সাগ্রহে] তবে ?—

চন্দনা ॥ [কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না, হঠাৎ—] আগে তোমার দুঃস্বপ্ন ব্যর্থ হোক্—

কংস ॥ ব্যর্থ হবে—।

চন্দনা ॥ যেদিন হবে, সেদিন তুমি আমায় পাবে।—[ধীরে ধীরে কংসের বাহু-বন্ধন খসাইয়া লইয়া, কংসের সহিত প্রস্থান করিতে গিয়াই ঘুরিয়া পুনরায় প্রতিমা দেখিল…নির্ণিমেষ নেত্রে দেখিল—] শুধু মাটি…শুধু পাথর শুধু রং বেরংএর খেলা…কিন্তু কি সুন্দর…দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়…প্রাণ শীতল হয়… [কংসকে] না ?

কংস ॥ আমার চোখ জ্বলে যায়—ওটাকে…

চন্দনা ॥ চূর্ণ করো না। কে বলে ও ঠাকুর ? কি ওর সাধ্য ? কি ওর ক্ষমতা ? তার চাইতে ও হবে আমার খেলবার পুতুল…ওকে স্নান করাব…খাওয়াব… গয়না পরাব…ভালোবাসব…বন্দী রেখে বন্দনা করব—

কংস ॥ আমার দোষ নাই,—তবে দেখছি সেই সঙ্গে তুমিও আমার বন্দিনী হয়ে গেলে—

[চন্দনাকে লইয়া প্রস্থান।]

[অন্যদিক দিয়া চোরের মত বিদূরথ-পত্নী অঞ্জনার প্রবেশ। সে পূর্বেই এখানে আসিযা অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রহিযাছিল। যে মুহূর্তে কংস এবং চন্দনা চলিযা গেল…সেই মুহূর্তে সে পাষাণ-ঘরের দিকে ছুটিযা গেল। তাহার মস্তকে কঙ্কা-প্রদত্ত চিত্রিত সেই মঙ্গল-কলস।]

অঞ্জনা ॥ [প্রতিমা-সম্মুখে নতজানু হইয়া] ঠাকুর ! ঠাকুর ! দয়াময় প্রভু ! স্বামীর কাছে যেদিন শুনেছি এখানে তোমার শুভাগমন হয়েছে, সেদিন হতে আমি এই সুযোগটুকুরই প্রতীক্ষা করছিলাম, আজ তোমার দয়া হয়েছে…আমার সম্মুখে প্রকাশ হয়েছ ! প্রণাম ঠাকুর, প্রণাম—[প্রণামোদ্যতা হইতেই বিদূরথের প্রবেশ।]

বিদূরথ ॥ অঞ্জনা—

অঞ্জনা ॥ [চমকিয়া উঠিল। তাকাইয়া দেখে স্বামী বিদূরথ। তাহার আর প্রণাম করা হইল না।] প্রভু !

[মাথা নীচু করিয়া অপরাধিনীর মতো দাঁড়াইয়া রহিল।—]

বিদূরথ ॥ কঙ্কণের প্রভুদ্রোহিতা, পিতৃদ্রোহিতা আমি ধরিনা, সে তরলমতি উচ্ছৃঙ্খল যুবক, কিন্তু তোমার এরূপ দুঃসাহস দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। কোন সাহসে তুমি সম্রাট কংসের প্রাসাদে নারায়ণ পূজা করতে এসেছ।

অঞ্জনা ॥ পূজা নয় প্রভু, স্নান। আমার রঞ্জনের কল্যাণে মানত আছে। ঠাকুরের কাছে মনে মনে মানত করেছিলাম আমার খোকা সেরে উঠে যেদিন আরোগ্য-স্নান করবে, সেদিন হে ঠাকুর,—আমি তোমায় দুধ দিয়ে স্নান করাব। রঞ্জন সেরে

উঠল, কিন্তু তুমি আমায় মন্দিরে যেতে দাওনি বলে আজো আমি ঠাকুরকে দুধ দিয়ে স্নান করাতে পারিনি—

বিদূরথ ॥ [ক্রোধে] অঞ্জনা—

অঞ্জনা ॥ প্রভু—

বিদূরথ ॥ যদি আমি তোমার স্বামী হই, তবে—

[কংসের প্রবেশ]

কংস ॥ ব্যাপার কি বিদূরথ ?

বিদূরথ ॥ [অঞ্জনাকে আদেশ-সূচক স্বরে] ঐ মঙ্গলকলসীর দুগ্ধে আমার মহিমাময় প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন কর—

কংস ॥ ইনি কে বিদূরথ ?

বিদূরথ ॥ কঙ্কণের মাতা। পুত্রের প্রভুদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত মানসে প্রভুপাদ প্রক্ষালনের জন্য মঙ্গলকলসে দুগ্ধ এনেছে—যদিও আমি জানি সে গুরুতর অপরাধের এ কিছুমাত্র প্রায়শ্চিত্ত নয়—

কংস ॥ তোমাদের প্রভুভক্তি জগতের ইতিহাসে অমর হয়ে রইবে বিদূরথ! প্রভুভক্তির এই আদর্শ আমার প্রতি-প্রজাকে অনুপ্রাণিত করুক !

বিদূরথ ॥ অগ্রসর হও অঞ্জনা—

বিদূরথ ॥ স্ত্রীজাতি সুলভ লজ্জা। কিন্তু অঞ্জনা, লজ্জা কি ? উনি যে তোমার প্রভুর প্রভু ! অগ্রসর হও অঞ্জনা—

অঞ্জনা ॥ কিন্তু হায় নাথ, যে দুগ্ধ বিশ্ব-নিখিলের প্রভুর স্নান উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে এনেছি তা দিয়ে কি করে অপরের পদ প্রক্ষালন করব ! এতে যে আমার দুধের শিশু চিররুগ্ন রঞ্জনের মহা অকল্যাণ হবে !

কংস ॥ [বিদূরথের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক কটাক্ষে] তাই তো, এতো চরম লজ্জারই কথা বিদূরথ।

বিদূরথ ॥ [ক্রোধে] অঞ্জনা, যদি আমি তোমার স্বামী হই, যদি তুমি আমার স্ত্রী হও…সতী হও…সহধর্মিণী হও—অগ্রসর হও—

অঞ্জনা ॥ [কংসের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে] ভগবান ! ওগো নারায়ণ ! আকাশের বজ্র আমার মাথায় পড়ুক…আমার মৃত্যু হোক্—আমার মৃত্যু হোক্—

[সেতুপথ আলোকিত হইল। দেখা গেল কঙ্কণ অঞ্জনার মস্তকোপরি অবস্থিত মঙ্গলকলস লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপে উদ্যত—]

কঙ্কণ ॥ হ্যাঁ, তাই হোক মা, তাই হোক্—

বিদূরথ ॥ কঙ্কণ…মাতৃহত্যা হবে—

কঙ্কণ ॥ জানি, হয়তো হবে। মাতার…দেবতার…এই পৈশাচিক অপমান-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্য, ওরে আমার হতভাগিনী মা, ঐ মঙ্গল-কলস লক্ষ্য করে যে তীর যোজনা করেছি, যদি তা কলস বিদ্ধ করে পৃথ্বীরূপে নারায়ণ স্নাত হবেন, তোর

মুখ উজ্জ্বল হবে, শয়তান লজ্জায় মুখ ঢাকবে···আর যদি এই তীর আমার অক্ষমতায় লক্ষ্য ভেদে অসমর্থ হয়ে তোকেই বিদ্ধ করে, তবে ওরে আমার অত্যাচারিতা··· নির্যাতিতা···ঘরে-বাইরে লাঞ্ছিতা মা, তুই মৃত্যু চেয়েছিলি, মুক্তি পাবি···।— ছাড়ি তীর ?

অঞ্জনা ॥ [আকুল আগ্রহে চীৎকার করিয়াই উঠিল]—ছাড়ো তীর—

কংস ॥ (কপটতায়) মাতৃহত্যা হবে—আ-হা-হা, মাতৃহত্যা হবে।

কঙ্কণ ॥ —আমার—আমার। সেও ভালো, তবু—

[তীর ক্ষেপণ। তীর কলস ছিদ্র করিল। দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল। কঙ্কণ অট্টহাস্যে হাসিয়া উঠিল। ঊর্ধ্ব হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। স্বর্গে বুঝিবা দুন্দুভি বাজিযা উঠিল। তাহারই মধ্যে কঙ্কণ ছুটিয়া আসিল এবং মাতাকে জড়াইযা ধরিল—]

কঙ্কণ ॥ মা ! আমার মা !

অঞ্জনা ॥ বাবা !

———

॥ দুই ॥

প্রান্তর

ধরিত্রী

মন্দিরে মন্দিরে জাগো দেবতা !
আনো অভয়ঙ্কর শুভ বারতা,
জাগো দেবতা—জাগো দেবতা ॥
শৃঙ্খলে বাজে তব সম্বোধনী,
কারায় কারায় জাগে তব শরণি,
বিশ্ব মূক ভীত, কহ গো কথা ॥
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা।
নিশিদিন শোনে নিপীড়িতা ধরণী,
অশ্রুতে অশ্রুত শঙ্খধ্বনি,
পঙ্গু রুগ্ন নর অত্যাচারে,
ধর্ষিতা নারী আজি দৈত্যাগারে,
জাগো পাষাণ, ভাঙো নীরবতা
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা ॥

॥ তিন ॥

কারাগার

[বহিঃপ্রকোষ্ঠে একটি খট্টার উপর শয্যা—তদুপরি রোগকাতর কীর্তিমান। পার্শ্বে বসুদেব ও দেবকী। দূরে, যথাস্থানে প্রহরী।—]

বসুদেব ॥ কীর্তিমান—কীর্তিমান—

[কোন উত্তর পাইলেন না—।]

দেবকী ॥ বাবা আমার—[কোন উত্তর না পাইয়া, বসুদেবের প্রতি] তবে কি—তবে কি—

বসুদেব ॥ না দেবকী, এখনো জীবন আছে—…কে ?

[ঘাতক সহ বিদূরথের প্রবেশ।]

বিদূরথ ॥ রাজভৃত্য বিদূরথ।

বসুদেব ॥ কি উদ্দেশ্যে আগমন ?

বিদূরথ ॥ [ঘাতকের প্রতি দৃষ্টিপাত।] সে শয্যার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বসুদেব ॥ কার শির চাও—?

বিদূরথ ॥ আমি চাই না…, না,…চাইব-ই বা না কেন, যখন আমার প্রভু চান—

দেবকী ॥ কার শির ?

বিদূরথ ॥ [কীর্তিমানকে দেখাইয়া]—ওর—

বসুদেব ॥ কি দোষ করেছে ও ?

বিদূরথ ॥ তার উত্তর আমি দিতে অক্ষম।

বসুদেব ॥ কিন্তু একটিবার কি তা ভেবেও দেখবে না বিদূরথ—? তুমি আমার জ্ঞাতি…আমার আত্মীয়…এই শিশু তোমাও পর নয়।

বিদূরথ ॥ তুমি আমাকে প্রভুদ্রোহিতা শিক্ষা দিচ্ছ বসুদেব। সাবধান—

দেবকী ॥ আমার এই দুধের শিশু, তাও মুমূর্ষু…তার শির নিয়ে কংসের লাভ—?

বিদূরথ ॥ ওটা বোধ হয় প্রভু-নিন্দা হচ্ছে—[কানে হাত দিয়া]…সে আমি সইব না—সইব না—

বসুদেব ॥ কেন সইবে !…আমার শির নাও—দেবকীর শির নাও—ঐ শিশুরও শির নাও—!…আমাদের সবার শির এক সঙ্গে নাও, আমাদের রক্ষা কর—আমাদের বাঁচাও—

বিদূরথ ॥ সত্যি বলছ ?

বসুদেব ॥ জীবনে মিথ্যা বলিনি বিদূরথ…ঐ আমাদের প্রার্থনা—

দেবকী ॥ আমাদের এই প্রার্থনা—এই কামনা পূর্ণ কর বিদূরথ !

বিদূরথ ॥ প্রভুর কিন্তু সেরূপ আজ্ঞা নয়—

বসুদেব ।। তোমার প্রভুকে না হয় আমাদের এই কামনা জ্ঞাপন করে এইরূপ আদেশই নিয়ে এস—

বিদূরথ ।। আচ্ছা, যাচ্ছি।…তোমাদের সম্বন্ধে কি আদেশ হবে বলতে পারি না, প্রভুই জানেন, কিন্তু…[কীর্তিমানকে দেখাইয়া] ওর সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট আদেশ আছে।…ওকে প্রস্তুত রেখো—

[সানুচর প্রস্থান।—]

দেবকী ।। মুমূর্ষু…মুমূর্ষু আমার এই দুধের শিশু…ঘাতকের মূর্তি চোখে দেখা মাত্র প্রাণটুকু বেরিয়ে যাবে—ওকে আমি কি প্রস্তুত করব স্বামী ?

বসুদেব ।। হ্যাঁ, ওকেও প্রস্তুত করতে হবে দেবকী। জীবনের শেষ শ্বাসে ও জেনে যাক্…কেন…কিসের জন্য…পিতার বুকভরা স্নেহ, মাতার মনভরা মমতা …ধরণীর এই মায়া-মধুর গেহ ছেড়ে অকালে ওকে বিদায় নিতে হ'ল !

দেবকী ।। জানলে, ওর ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস পড়বে—

বসুদেব ।। অত্যাচারীর অত্যাচার যদি সত্য হয়, অত্যাচারিতের দীর্ঘশ্বাসও তেমনি সত্য। যুগে যুগে অত্যাচারও হয়েছে যেমন সত্য…আবার সকল অত্যাচারিতের মিলিত দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হয়ে যে আগুন জ্বেলেছে সেই আগুণে অত্যাচারী দগ্ধ ও ভস্মীভূত হয়েছে, তেমনি সত্য।

কীর্তিমান ।। [চেতনা লাভ করিয়া] মা—মা—

দেবকী ।। বাবা আমার—

কীর্তিমান ।। আমায় একটু মধু দাও মা—

দেবকী ।। মধু তো নেই বাবা…

কীর্তিমান ।। —ছিল তো মা—

বসুদেব ।। হ্যাঁ ছিল। …কিন্তু…সে মধু আমরা আর পাব না বাবা !

কীর্তিমান ।। কেন বাবা ?

বসুদেব ।। আমাদের সকল মধু কেড়ে নিয়েছে—

কীর্তিমান ।। কে নিল বাবা ?

বসুদেব ।। তোমার মামা, কংস।

কীর্তিমান ।। তবে…তবে…মা, একটু দুধ দাও…আমাদের সেই কাজলী গাই… তার দুধ—

বসুদেব ।। তাও নেই।

কীর্তিমান ।। সে কি বাবা ! আমার যে বড় আদরের কাজলী গাই…তার শ্যামলী বাছুর—

বসুদেব ।। কেড়ে নিয়েছে

কীর্তিমান ।। কে ? কে কেড়ে নিল ?

বসুদেব ।। যে আমাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছে—

কীর্তিমান ।। কে সে বাবা ?

বসুদেব ॥ তোমার মামা, কংস।

কীর্তিমান ॥ মা, তবে, তোর বুকের দুধ আমায় দে না···আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে···

দেবকী ॥ তাও নেই—তাও নেই—ওরে আমার অভাগা সন্তান···আজ মায়ের বুকেও দুধ নাই—

বসুদেব ॥ কোথা থেকে থাকবে? ওরা তোমার মাকে কখনো অর্দ্ধাশনে কখনো অনশনে রেখেছে।···ওরে, আমরা আজ পিপাসায় জলটুকুও পাইনে।

কীর্তিমান ॥ তবে কি একটু জলও খেতে পাব না—মা?

দেবকী ॥ —পাবে। দিচ্ছি—

[লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া জল আনিয়া দিলেন—]

বসুদেব ॥ পিপাসার ঐ জলটুকুও তোমার মাকে ভিক্ষা করে সংগ্রহ করতে হয়েছে, অথচ এই কারাগারের বাইরেই, দুকুল প্লাবিত করে বয়ে যায় স্নেহময়ী যমুনা···সহস্র ধারায় উৎসারিত হয়ে ক্ষুধা মেটায়, পিপাসা মেটায়, প্রাণ জুড়ায়!

কীর্তিমান ॥ যমুনা—যমুনা! —তুমি কাঁদছ কেন? আমি ও ভিক্ষার জল খাব না মা···আমি বাইরে যাবো [উঠিবার চেষ্টা] কিন্তু একি মা···আমার মনে হচ্ছে ক্রমেই যেন সব আঁধার হয়ে আসছে [ক্রমিক অবসাদে] এ আমি কোথায় চলেছি মা—? [দেবকীকে আঁকড়িয়া ধরিল]

বসুদেব ॥ বল দেবকী, বল—কীর্তিমান জিজ্ঞাসা করছে সে আজ কোথায় চলেছে···! বল—[সেখান হইতে চোখের জল ঢাকিয়া পার্শ্বস্থ অন্য প্রকোষ্ঠে পালাইলেন]

কীর্তিমান ॥ [ভয়ে] এ আমি কোথায় চলেছি মা?

দেবকী ॥ তুমি—তুমি চলেছ স্বর্গে—ভয় কি বাবা?

কীর্তিমান ॥ স্বর্গ—?

দেবকী ॥ হ্যাঁ, স্বর্গ।···স্বর্গের তো কত গল্পই তোমায় বলেছি···

কীর্তিমান ॥ সেই স্বর্গ···যেখানে হীরার গাছে সোণার ফল—, সোণার ফুলে মণির আলো!···না মা, সে ভালো না—ভালো না—

দেবকী ॥ কেন বাবা?

কীর্তিমান ॥ ভালো লাগে আমাদের সেই সোঁদাল গাছে হলদে ফুল, হলদে ফুলে, হলদে পাখী,···খানিকটা দেখতে পাই···খানিকটা পাই না! ভালো লাগে আমার কড়াই শুটির ক্ষেত, তারই মাঝে প্রজাপতির দল, পাখ্‌নায় তাদের রামধনুকের রং···ধরতে গেলেই ছুটে পালায়···অমনি তার পেছন ছুটি, কি ভালোই না লাগে সেই ছুটোছুটি!

দেবকী ॥ হ্যাঁ ছুটোছুটি, কিন্তু স্বর্গে তারা আপনা হতেই ধরা দেয়···জানো?

কীর্তিমান ॥ আপনা হতেই ধরা দেয়? তবে আর খেলা হল কি?···তার চাইতে ছুটতে আমার লাগে ভালো—কচি রোদের কাঁচা সোণায় নদীর ধারে বালুর

চরে…যখন দেখি নদীর বাঁকে রাজহাঁসের মতো পাল তুলে পান্সী ছোটে! আমিও ছুটি তারই সাথে—শেষে মা আর পারিনা, পাল তুলে হাল বেয়ে পান্সী যায় পালিয়ে।

দেবকী ॥ স্বর্গে আছে সোণার নৌকা—রূপালী তার পাল—

কীর্তিমান ॥ আছে,—থাক্। সোনার নৌকা কি ছুটতে পারে মা? নাই যদি ছুটল…তবে সে কি হল খেলা? সে আমার ভালো লাগেনা মা, আমার লাগে ভালো তোমায় আমি জ্বালাতন করে পাগল করে তুলি…ঠাকুরের ফুল চুরি করে মালা গেঁথে গলায় পরি—পূজার প্রসাদ পূজার আগেই চুরি করে খাই, ভালো লাগে মা, ভালো লাগে, তুমি যখন মা আমায় মারতে এস তেড়ে, একটি লাফে তোমার বুকে উঠি…হাসি মুখে চুমো দিয়ে, কোলে আমায় নাও—। স্বর্গে আমায় কে দেবে মা চুমো?

দেবকী ॥ স্বর্গে রয়েছেন দেবতা…দেবতা দেবেন চুমু—

কীর্তিমান ॥ দেবতা আমি চিনিনা মা, দেবতা আমি চিনিনা।…তুমি শুধু একটি কথা আমায় বল—

দেবকী ॥ কি বাবা—?

কীর্তিমান ॥ স্বর্গে আছে হীরার গাছ…হীরার গাছে সোণার ফুল! সোণার ফুলে মণির আলো…। স্বর্গে আছে চুনির প্রজাপতি…পান্না দিয়ে গড়া তার পাখা। জানি মা জানি, স্বর্গে আছে সোণার নৌকা…রূপালী তার পাল। …স্বর্গে আছে সব… সোণা আছে, রূপা আছে,…রং বেরংএর পাখী আছে…সবই আছে মা সবই আছে… কিন্তু একটি কথা আমায় বল—

দেবকী ॥ কি বাবা—?

কীর্তিমান ॥ [মায়ের মুখের দিকে উন্মুখ হইয়া]… স্বর্গে কি আছে আমার মা? [বলিয়াই মায়ের আঁচল মুঠিতে চাপিয়া ধরিল—]

দেবকী ॥ —ওরে—ওরে—

কীর্তিমান ॥ [মায়ের মুখের কাছে মুখ লইয়া]—নাই? নাই?

দেবকী ॥ [মুখ সরাইয়া লইয়া] না—না—না—[কাঁদিয়া ফেলিলেন—]

কীর্তিমান ॥ আমি যাব না—স্বর্গে আমি যাব না—তোমায় ছেড়ে স্বর্গে আমি যাব না [কাঁদিতে লাগিল]

[ঘাতক-সহ বিদূরথের প্রবেশ—]

বিদূরথ ॥ [কীর্তিমানকে দেখাইয়া] ওকে যেতেই হবে।—[দেবকীকে] তোমরা থাকবে—

কীর্তিমান ॥ [বিদূরথের ঐ কথা শুনিয়া মাকে আরো বেশী আঁকড়াইয়া ধরিয়া]—না—না, আমি যাব না—স্বর্গে আমি যাব না—

বিদূরথ ॥ [কীর্তিমানের দিকে ছুটিয়া গিয়া] রাজাজ্ঞা…প্রভুর আদেশ তোমাকে যেতেই হবে কীর্তিমান—

কীর্তিমান ॥ [শঙ্কিত দৃষ্টিতে বিদূরথের প্রতি একবার চাহিয়াই] না—না—মা—

[সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু তখনি মৃত্যু তাহাকে আলিঙ্গন করিল। তাহার দেহ শ্লথ হইয়া দেবকীর কোলে পড়িয়া গেল।]

দেবকী ॥ বাবা—বাবা—

[বসুদেব ছুটিয়া কীর্তিমানের সম্মুখে আসিলেন।]

বসুদেব ॥ কীর্তিমান—কীর্তিমান—

দেবকী ॥ শেষ! সব শেষ!

বসুদেব ॥ [কীর্তিমানের মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া বিদূরথের প্রসারিত হস্তদ্বয়ে সমর্পণ করিলেন এবং বোধহয় বলিলেন] নাও—নিয়ে যাও—

———

॥ চার ॥

প্রান্তর

ধরিত্রী

গান

কারা পাষাণ ভেদি জাগো নারায়ণ।
কাঁদিছে বেদীতলে আর্ত জনগণ,
বন্ধ-ছেদন জাগো নারায়ণ ॥
হত্যা-যূপে আজি শিশুর বলিদান,
অমৃত-পুত্রেরা মৃত্যু-ম্রিয়মান।
শোণিত-লেখা জাগে, নাহি কি ভগবান?
মৃত্যুক্ষুধা জাগে শিয়রে লেলিহান!
শঙ্কা-নাশন জাগো নারায়ণ ॥

॥ পাঁচ ॥

[সেই পুষ্পবাটিকা। পাষাণঘরের উন্মুক্ত দ্বার। চতুর্ভুজ-নারায়ণ মূর্তি। সম্মুখে ধূপদীপ নৈবেদ্য ইত্যাদি—চন্দনা একাকিনী। আত্মহারা হইয়া সেই মূর্তি-সম্মুখে আরতি-নৃত্য করিতেছে।—নৃত্যশেষে ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়াই চন্দনা শিহরিয়া উঠিল। কেহ দেখিল কিনা দেখিবার জন্য চারিদিকে চাহিবা…দেখিল কঙ্কণ।]

চন্দনা ॥ কে তুমি ?…কঙ্কণ !…তুমি এখানে ?

কঙ্কণ ॥ এ প্রশ্ন তোমায়ও আমি করতে পারি…তুমি এখানে ?

চন্দনা ॥ কোথায় যাবো ? তোমাদের সমাজে আমার ঠাঁই নাই…মানুষ আমাকে পদাঘাতে দূর করে দিয়েছে…দেবতার চরণে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলাম…দেবতাও বিমুখ হলেন।—তাই আজ আমি এখানে।…বেশ আছি।

কঙ্কণ। বেশ আছ ?

চন্দনা ॥ হ্যাঁ, বেশ আছি।…থাকব না ? সম্রাট আমাকে তাঁর মাথার মণি করে রেখেছেন। প্রভূত আমার সম্মান, অসামান্য আমার ক্ষমতা।…ভোগে, বিলাসে আনন্দে, উল্লাসে বেশ আছি !…নাচি গাই…পূজা করি, আরতি করি—

কঙ্কণ ॥ পূজা কর। আরতি কর !…কাকে ?

চন্দনা ॥ [নারায়ণ মূর্তির দিকে চোখ পড়া মাত্র চোখ ফিরাইয়া লইয়া] …যাকে ভালবাসি তাকে…

কঙ্কণ ॥ সেই দুর্বৃত্ত কংসকে—?

চন্দনা ॥ [মরিয়া হইয়া] হ্যাঁ। ভালোবাসি…খুব ভালোবাসি। …তবু মনে শান্তি পাই না…ইচ্ছে হয় যদি আরো—আরো—আরো ভালোবাসতে পারতাম—

কঙ্কণ ॥ নরকে ডুবছ—!

চন্দনা ॥ হ্যাঁ, ডুবছি…দুঃখ এই, এখনো তার তল স্পর্শ করতে পারিনি।…

কঙ্কণ ॥ ছিঃ চন্দনা, যখন দুরাত্মা দানব আমাদের ওপর, দিনের পর দিন, নুতন হতে নতুনতর পৈশাচিক অত্যাচার করছে…যখন আমাদের শালগ্রাম শিলা চূর্ণ বিচূর্ণীকৃত, যখন আমাদের বিগ্রহ মন্দির হতে লুণ্ঠিত…যখন আমাদের যাঁরা মধ্যমণি… সেই বসুদেব…দেবকী সানুচর কারারুদ্ধ, তখন…তখন কিনা তুমি…যাদব-নন্দিনী হয়ে,…কোথায় সেই অত্যাচারের প্রতিকার করবে…তা না করে—

চন্দনা ॥ শয়তানের সেবা করছি ? …কেন করব না ? তোমরা কি করেছ ? তোমরা এই অত্যাচারের মাঝেও কি মধুপান করছ না ? গ্রামে যখন আগুন লেগেছে, তখনও কি ঘরে বসেই শাস্ত্রচর্চা করছ না ? …বেণু-বীণা নিয়ে জ্যোস্না-রাতে সঙ্গীত সেবা করছ না ? সুকুমার কাব্যচর্চা হচ্ছে…কলা-লক্ষীর কলাপূজা হচ্ছে…প্রেম হচ্ছে…বিবাহ হচ্ছে…। উৎসব…বিলাস…কি বন্ধ রয়েছে ? আবার ওদিকে, নারী যখন ধর্ষিতা হচ্ছে…সমাজপতিগণ সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ধর্ষিতা নারীর মনের বল পরীক্ষা করছেন ! পতিতা বলে' তাকে সমাজচ্যুত করে, সমাজ ধর্ম রক্ষা করতেও তাদের কিছুমাত্র ত্রুটি হচ্ছে না—কঙ্কণ আমি করছি দেশদ্রোহিতা, আর এঁরা করছেন দেশসেবা, না ?

কঙ্কণ ॥ এরা ঘুমিয়ে আছে…এদের জাগাতে হবে।

চন্দনা ॥ হ্যাঁ, আমি জাগাবো। কিন্তু, কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে তাদের সম্মুখে নতজানু হয়ে প্রার্থনার স্বরে তাদের জাগতে বলবো না—, আমি তাদের জাগাবো… কেমন করে…সে আমিই জানি… ! কিন্তু তুমি এখানে কেন ?

কঙ্কণ ॥ আমার প্রয়োজন আছে—[পাষাণ ঘরের দিকে তাকাইল—]

চন্দনা ॥ [তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে] আমি বুঝেছি—

কঙ্কণ ॥ [চমকিয়া উঠিল] কি বুঝেছ ?

চন্দনা ॥ ঐ বিগ্রহ এখান হতে অপহরণ, কেমন ?

কঙ্কণ ॥ তুমি আমায় সাহায্য করবে চন্দনা ? মহামতি বসুদেব, মা দেবকী ঐ বিগ্রহ-হারা হয়ে তাঁদের রুদ্ধ-কারাকক্ষের দ্বারে মাথা খুঁড়ে মরছেন···আজ পর্য্যন্তও বিন্দুমাত্র জলস্পর্শ করেন নি—! তার ওপর—

চন্দনা ॥ তার ওপর ?

কঙ্কণ ॥ মা দেবকী এক স্বপ্ন দেখেছেন। ···দেখেছেন ঐ দেবতা তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে আসছেন···জন্মগ্রহণ করে—ধরণীকে অত্যাচার-মুক্ত করবেন···! তাঁরা শুধু সেই আশা নিয়েই আজও প্রাণ ধারণ করে আছেন !···

চন্দনা ॥ আমি জানি—আমি জানি—

কঙ্কণ ॥ তুমি জানলে কি করে ?

চন্দনা ॥ মা দেবকীর ঐ সুস্বপ্ন দুঃস্বপ্ন-রূপে দানবের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে—

কঙ্কণ ॥ সত্যি বলছ চন্দনা—

চন্দনা ॥ সত্যি বলছি !

কঙ্কণ ॥ [পরমোল্লাসে] তবে আর মুহূর্ত বিলম্ব নয়। আমি এখনি—

[বিগ্রহের দিকে ছুটিল]

চন্দনা ॥ [তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।] ···সাবধান··· কখনো নয়—

কঙ্কণ ॥ কেন, কেন চন্দনা ?

চন্দনা ॥ ঐ বিগ্রহ রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার ওপর। চোরের হাতে আমার ঐ নিধি সঁপে দিতে পারিনা। সাধ্য থাকে, সাহস থাকে, এখান হতে ওকে জয় করে নিয়ে যাও···আর তা যদি না পার···চোরের মতো পালিয়ে এসেছ···চোরের মত পালিয়ে যাও—

কঙ্কণ ॥ [স্তম্ভিত হইল।] বটে !

চন্দনা ॥ হ্যাঁ ! জেনো চারিদিকে প্রহরী, আর সে প্রহরীদের অধিপতি, তোমারই পিতা বিদূরথ—! [প্রস্থান]

কঙ্কণ ॥ এখনি তো তবে সবাই এসে পড়বে ! ও···কে ? মা— ?

[দুগ্ধকলস মস্তকে, এবং রুগ্ন শিশু-পুত্র রঞ্জনকে ক্রোড়ে লইয়া অঞ্জনার প্রবেশ।]

অঞ্জনা ॥ কঙ্কণ ? আবার তুই এখানে—পালা—বাবা—পালা—

কঙ্কণ ॥ তুমি এখানে কেন মা ?

অঞ্জনা ॥ তোদেরই জন্য বাবা—আমার যে না এসে উপায় নেই—মানত—মানত—

কঙ্কণ ॥ তবে এই অবসরে মা—এই অবসরে—

[অঞ্জনাকে লইয়া পাষাণ-ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।]

কঙ্কণ ॥ ঐ পিতার কণ্ঠস্বর···পিতা বাধা দিতে আসছেন। তার পূর্বে—তার পূর্বে—

[অঞ্জনাকে লইয়া পাষাণ-ঘরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে সেতু-পথ আলোকিত হইল। দেখা গেল সেতুপথের উপর দণ্ডায়মান কংস]

কংস ॥ হাঃ হাঃ হাঃ [অট্টহাস্য এবং উর্ধ্বে ইঙ্গিত। সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্ব হইতে পাষাণ-দ্বার নামিয়া গেল। নামিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় ভাসিয়া আসিল তাহাদের আলোর জন্য শেষ আকুলি বিকুলি···"আলো ! আলো ! আলো !"]

বিদূরথ ॥ [নেপথ্য হইতে] অঞ্জনা—অঞ্জনা—শোন—শোন—

[ছুটিয়া বিদূরথের প্রবেশ]

বিদূরথ ॥ প্রভুদ্রোহিণী স্ত্রী যাক···পিতৃদ্রোহী পুত্র যাক···কিন্তু দুধের শিশু আমার ঐ রঞ্জন ! [পাষাণ প্রাচীরে করাঘাত করিতে করিতে] রঞ্জন ! রঞ্জন ! ওরে আমার রঞ্জন ! [পাষাণ প্রাচীরে মাথা খুঁড়িতে লাগিল।]

কংস ॥ বিদূরথ—

বিদূরথ ॥ [চমকাইয়া উঠিল। প্রভুর সম্মুখে স্বীয় মর্মবেদনা গোপন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সফল হইল না—] প্রভু !

কংস ॥ কে বন্দী হল ?

বিদূরথ ॥ প্রভুদ্রোহী স্ত্রীপুত্র— !

কংস ॥ আমার শত্রু।···কিন্তু সেজন্য কি তুমি কাঁদছ ?

বিদূরথ ॥ কাঁদছি ? না—কখনো না। প্রভুদ্রোহিতার উপযুক্ত দণ্ড হয়েছে—

কংস ॥ তবে—?

বিদূরথ ॥ না—না—না—না—ওঃ ! আমার বুকের ধন ঐ রঞ্জনটা—

[কাঁদিয়া ফেলিল।]

॥ ছয় ॥

প্রান্তর

ধরিত্রী

গান

পূজা-দেউলে, মুরারী,
শঙ্খ নাহি বাজে !
ভগ্ন ঘট, শূন্য থালা,
পুণ্য-লোক রক্তে ঢালা,
দৈত্য সেথা নৃত্য করে মৃত্যু-সাজে।
দাও শরণ তব চরণ মরণ মাঝে ॥

॥ সাত ॥

[পুনরায় সেই পুষ্পবাটিকা। পাষাণ ঘরের দেওয়ালে কাণ দিয়া দাঁড়াইয়া বিদূরথ…এ যেন কোন চোর…ভিতরে কেহ জাগিয়া আছে কিনা পরীক্ষা করিতেছে।]

বিদূরথ ॥ রঞ্জন !…রঞ্জন ! কথা…ক' সাড়া দে'…খিদে পেয়েছে ?…বল রে বল…না হয় কেঁদেই ওঠ…তবু বুঝি, এখনো—এখনো তুই—

[কংসের আবির্ভাব, সঙ্গে নরক]

কংস ॥ ওখানে কে ?

বিদূরথ ॥ [তড়িৎস্পৃষ্টবৎ চমকিয়া উঠিল—] এ্যা—

কংস ॥ বিদূরথ ! তুমি ! আজও এখানে—?

বিদূরথ ॥ [অপরাধের একটী কৈফিয়ৎ সংগ্রহ করিয়া] আমি…আমি কাণ পেতে শুনছিলাম অপরাধীরা আর্তনাদ করছে কিনা—

কংস ॥ আর্তনাদ করছে ?

বিদূরধ ॥ না।

কংস ॥ তোমার প্রভুর শত্রু চিরতরে নিপাত হয়েছে। বিদূরথ, তুমি আনন্দিত, না ব্যথিত ?

বিদূরথ ॥ [জোর করিয়াই] আনন্দের কথা বই কি—আনন্দের কথা বই কি—

কংস ॥ কিন্তু সে আনন্দের প্রকাশ কই ? তোমার মুখে হাসি কই ?

বিদূরথ ॥ [হাসিতে চেষ্টা করিয়া] হাসবো বই কি ! হাসবো বই কি ? [কিন্তু ব্যথা আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না] কিন্তু…কিন্তু ঐ রঞ্জনটা—[একটা অব্যক্ত আর্তনাদ অস্ফুটভাবে বাহির হইল। বিদূরথ প্রস্থান করিল।]

কংস ॥ নরক, এর অর্থ ?

নরক ॥ লক্ষণ ভালো নয় সম্রাট !

কংস ॥ পুত্র এবং পত্নীর বিদ্রোহ কি বিদূরথেও সংক্রামিত হল ?

নরক ॥ এখন হতে ওকে একটু চোখে চোখে রাখতে হবে সম্রাট।…চারিদিকেই লক্ষণ খারাপ। নারদ-মুনি তো স্পষ্ট বলেই গেলেন—

কংস ॥ তোমাকে আবার কি বলেছেন ?

নরক ॥ স্বর্গে দেবতাদের সভা হয়েছে। দুষ্কৃতের দমনের জন্য এবং সাধুদের পরিত্রাণের জন্য নারায়ণ নাকি অবিলম্বেই দেবকী-জঠরে জন্মগ্রহণ করবেন—

কংস ॥ সেই পুরাতন দৈববাণীরই পুনরাবৃত্তি…"ভগিনী নন্দন হতে কংসের নিধন।"

নরক ॥ ভগিনী-নন্দন তো সব সাবাড়—

কংস ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] সব ?

নরক ॥ সব।

কংস ॥ সব শুদ্ধ কটি গেল ?

নরক ॥ বোধ হয় ছয়টি ।…

কংস ॥ [সত্য সত্যই মর্মবেদনায় আহত হইল ।] আ—হা—হা, আমার সেই দেবকী ! ওঃ [দুই হাতে মুখ ঢাকিল ।]

নরক ॥ সম্রাট—

কংস ॥ নরক—

নরক ॥ এতগুলো জীবহত্যার চেয়ে ঐ বসুদেব…কি দেবকী…দুজনার একজনকে কেটে ফেললেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়—অর্থাৎ কিনা বিষবৃক্ষ কেটে ফেললেই বিষফলের ভাবনা থাকে না —

কংস ॥ নরক—

নরক ॥ সম্রাট—

কংস ॥ তুমি জানো না নরক, দেবকীকে আমি কি স্নেহ করেছি…কি স্নেহ করি !

নরক ॥ তা জানি না। তবে হয়ত তার একটু নিদর্শন দেখেছিলাম তারই বিবাহ-বাসরে…যখন ঐ কাল দৈববাণী হল—

কংস ॥ আমি তার শিরশ্ছেদ করতে উদ্যত হয়েছিলাম। নরক—নরক—আজ বুঝছি আমার সে অভিনয় কতখানি সফল, কতখানি সার্থক হয়েছিল। সে অভিনয়ে তবে শুধু বসুদেবই প্রতারিত হয়নি, তুমিও—!

নরক ॥…কিন্তু সম্রাট, দেবকীর ছয় ছয়টি পুত্রহত্যা…সে কিন্তু মোটেই অভিনয় নয়…সেগুলি সত্য-সত্যই…সত্য !

কংস ॥ নরক, আমি আমার ভগিনীকে ভালোবাসি, ভাগিনেয়কে নয়—

নরক ॥ ভাগিনেয় বধ করে ভগিনীকে যেরূপ নিদারুণ ভালোবাসা হচ্ছে—

কংস ॥ বুঝি, কিন্তু নরক, ভগিনীর চাইতেও আমি বেশী ভালোবাসি আমাকে।…হ্যাঁ নরক, এটি একটি পরম সত্য…। এই সত্যের উপাসক তুমি… আমি…সকলে।…অথচ এই সত্য কথাটিই তুমি বর্তমান আলোচনায় একেবারেই ভুলে যাচ্ছ—! সুখের বিষয় নারদঋষি এ কথাটি কোন সময়ই ভোলেন না। তিনি বলেন 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ।'

নরক ॥ "রক্ষেৎ" তো বুঝলাম। কিন্তু রক্ষার উপায় কি তা কিছু নির্দেশ করলেন ?

কংস ॥ সে তো পূর্বেই করেছেন, এবং সেই অনুযায়ী কাজও হচ্ছে। এবার তিনি শুধু একটি তিথির প্রতি লক্ষ্য রাখতে বললেন—

নরক ॥ তিথি ?

কংস ॥ হ্যাঁ, তিথি…অষ্টমী তিথি…কেন, শুনবে ?

নরক ॥ বলুন সম্রাট—

কংস ॥ সেটা গোপনই থাক…নরক !

নরক ॥ অথচ জানি, গোপন রাখতে পারবেন না। এ আপনার কম যন্ত্রণা নয় সম্রাট…

কংস ॥ যন্ত্রণা ?

নরক ॥ হ্যাঁ, যন্ত্রণা ।…বিশ্বাস না করতে পারার যন্ত্রণা ।…অন্যকেও বিশ্বাস করতে পারেন না, নিজকেও নয়—

কংস ॥ [নরকের প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে] নিজেকে বিশ্বাস করিনা কি করে তুমি জানলে ?

নরক ॥ সম্রাট, আমি আপনার জন্মরহস্য জানি—।

কংস ॥ জন্মের আর রহস্য কি ! আমি উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র…দানব দ্রমিলের ঔরসজাত পুত্র। মানবী মাতার গর্ভে দানবের ঔরসে আমার জন্ম…মানব-দেহধারী হলেও আমি দানব…এই তো রহস্য ? কে না জানে ?…কিন্তু আমি আমাকে বিশ্বাস করি না—এ কথা তুমি কি করে বল ?

নরক ॥ আপনার জন্মরহস্য সবাই জানে বটে, কিন্তু সবাই আপনার অবিরত পার্শ্বচর নয়। মহারাণী অস্তি আর মহারাণী প্রাপ্তি পিত্রালয়ে গমন করার পর থেকে আমি রাত্রেও আপনার পার্শ্বে প্রহরী থাকি…কারণ…ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে… আপনি সাধারণ মানুষের মতোই ভয় পেয়ে চমকে ওঠেন—। আমি আরো লক্ষ্য করেছি—

কংস ॥ কি, কি লক্ষ্য করেছ—

নরক ॥ আপনার ভেতরকার মানবী-মা আর্তস্বরে কেঁদে ওঠেন—

কংস ॥ নরক—নরক—

নরক ॥ আপনি তখন আপনার দানবত্ব বিস্মৃত হন। বিস্মৃত হয়ে সেই মানবী-মার পায়ে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়েন—

কংস ॥ সাবধান নরক, সাবধান—!

নরক ॥ কিন্তু সে আপনার মুহূর্তের দৌর্বল্য সম্রাট ! তারপরই যখন আবার আত্মস্থ হন…তখন আপনি শুধু দানব নন, দুর্নিবার দানব। কিন্তু সেই সাময়িক দৌর্বল্যের কথা আপনি জানেন, এবং জানেন বলেই আপনার আত্ম-বিশ্বাসের অভাব আছে !

কংস ॥ [একরূপ গায়ের জোরে] মিথ্যা কথা…আমার আত্মবিশ্বাস পর্বতের মত অটল।

[সেতুপথ আলোকিত হইল। দেখা গেল সেতুদণ্ডে ভর দিয়া চন্দনা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে]

চন্দনা ॥ মিথ্যা নয়, আমিও তার সাক্ষী…

কংস ॥ —কবে ?

চন্দনা ॥ গত রাত্রে।

কংস ॥ [পুনরায় গায়ের জোরেই] মিথ্যা—মিথ্যা—। অথবা তোমরা ভুল দেখেছ, ভুল বুঝেছ ।...আমি দুর্বল ? মিথ্যা কথা ।...মুহূর্তের তরেও আমি এতটুকু দুর্বল নই। আমি নির্মম···আমি নিষ্ঠুর...আমি শুধু দুর্দান্ত দানব নই, আমি দুর্নিবার শয়তান ।...ঐ যে সম্মুখে পাষাণ-ঘর—ওরই মধ্যে বন্দী করেছি এক সুকুমার কিশোর এবং সঙ্গে তার অভাগিনী মাতা...ঐ অন্ধকূপের অন্ধকার হতে ঐ পাষাণ বিগলিত করে ভেসে এসেছে তাদের কাতর আর্তনাদ "আলো দাও" "জল দাও" "আহার দাও"—! অট্টহাস্যে সেই আর্তনাদ ডুবিয়ে দিয়েছি, শিরায় শিরায় দানবের রক্ত নেচে উঠেছে···মনে প্রাণে শয়তান ক্ষেপে উঠেছে...ওঠে নি...? তোমরা দেখনি ?

নরক ॥ দেখেছি—

কংস ॥ কিন্তু ওতেও তো ক্ষুধা মিটছে না···পিপাসা ক্রমে বেড়েই চলেছে... এবার ? এরপর ?

চন্দনা ॥ —বাইরের ঐ যাদব পল্লীতে আগুন ধরিয়ে দাও !···পল্লীবাসীর শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র ছায়া শীতল কুঞ্জ-কুটীর জ্বলে উঠুক···সুখ-নিদ্রায় সুখ-শয়ান স্বামী-স্ত্রী চমকে উঠুক...তাদের প্রিয়তম পুত্রকন্যা তাদের চোখের সম্মুখে দগ্ধ হোক্··· তাদের উদ্ধার করবার বিফল প্রয়াসে তারা নিজেরা ভস্মীভূত হোক্···আকাশ জুড়ে ক্রন্দনের রোল উঠুক···প্রলয়ের বিষাণ বেজে উঠুক···

কংস ॥ [এই দৃশ্য যেন তাহার চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছিল—সোৎসাহে] উঠুক—উঠুক—আর সেই বিশ্বগ্রাসী লেলিহান অগ্নিশিখার রক্ত-আলোকে আলোকিত হয়ে আমরা সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখি—আমার ক্ষুধার্ত···পিপাসার্ত দানবাত্মা তৃপ্ত হোক···তৃপ্ত হয়ে নৃত্য করুক···থিয়া তাথৈ ! থিয়া তাথৈ !···বিদূরথ—বিদূরথ—

চন্দনা ॥ বিদূরথ নয়, এ আগুন আমি জ্বালাব আমি—আমি—আমি। দেখ তুমি—[প্রস্থান]

কংস ॥ সুরা দাও—সুরা দাও—পাত্রের পর পাত্র দাও—পিপাসায় আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছে···

[মদিরা, মদ্যপাত্র লইয়া নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিয়া কংসকে মদ পরিবেশন করিতে লাগিল।]

কংস ॥ [এই নৃত্যের মধ্যে কংস আকণ্ঠ মদ্যপান করিয়াছে—] আমার ঘুম পাচ্ছে—আমার ঘুম পাচ্ছে—আজ কতকাল পরে ঘুম এল চোখে !...নেচে নেচে নিয়ে আয় ঘুম—গান গেয়ে চোখে আন ঘুম। ঘুমুলে আমায় কেউ ডাকিস না··· তোরাও গিয়ে ঘুমো—

[নিদ্রাকর্ষণ ঘুমপাড়ানী গান—গাহিতে গাহিতে নর্তকীদের প্রবেশ]

ঘুম ঘুম ঘুম ধরার আঁখি !
চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে চকোর, ঝিমিয়ে আসে নয়ন-পাখী !

আজকে তারার দীপালিতে, কোন স্বপনের নিদালীতে,
এই অধরে ঐ অধরের চুমোর ছোঁয়া মাখিয়ে রাখি !
ঘুম-কুমারী, জাগো এখন অন্তরে,
ঘুমকে আন ঘুম-পাড়ানী মন্তরে !
শ্রান্ত মোরা মাটির কোলে, এই ধরণীর কলরোলে !
সাধ হয়েছে, পীতমকে আজ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে থাকি !

[কংস ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নর্তকীরা নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। নরক মদ খাইতে খাইতে তাহাদেব সঙ্গে চলিয়া গেল—শুধু কয়েকজন প্রহরী দূরে চিত্রপ্রায় দাঁড়াইয়া রহিল। অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ক্রমে ক্ষীণ আলোর বিকাশ হইল। কংস স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—

—স্বপ্নদৃশ্য—

পাষাণঘরে অবরুদ্ধ চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্তি। কঙ্কণ ও অঞ্জনা। অঞ্জনার ক্রোড়ে রঞ্জন। কঙ্কণের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সকলেই ক্ষুৎপিপাসায় মুমূর্ষু। খাদ্য এবং জলের জন্য সকলের প্রাণপণ চেষ্টা। চেষ্টা নিস্ফল। অবশেষে অঞ্জনা বেদীমূলে মাথা খুঁড়িতে লাগিল। কপাল কাটিয়া দরদরধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। সেই রক্ত অঞ্জনা সংগ্রহ করিয়া রঞ্জনের জিহ্বায় দিতে লাগিল। রঞ্জন তাহা খাইয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইল বটে, কিন্তু পরে মাতার স্তনদুগ্ধ চাহিতে লাগিল। অঞ্জনা জোর করিয়া তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া…সেই দুগ্ধ একটি পাত্রে সংগ্রহ করিয়া… তাহা পিপাসার্ত কঙ্কণকে দিলেন। কঙ্কণ তাহা পান করিল। রঞ্জন ক্রমে মৃত্যুবরণ করিল।…অঞ্জনা তাহা অনুভব করিয়া পুত্র-শোকে কাতর হইয়া কঙ্কণকে ডাকিলেন। কঙ্কণ গিয়া বুঝিল রঞ্জনের মৃত্যু হইয়াছে। কঙ্কণ শোকে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল…কিন্তু পরে শোকেই আবার অভিভূত হইয়া পড়িল, এবং মাতার গলা জড়াইয়া ধরিরা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অন্ধকার। ক্রমে আলোকের বিকাশ। দেখা গেল কংস ঘুমাইয়া রহিয়াছে,— কিন্তু তখনি বোধকরি ঐ ক্রন্দন তাহার কর্ণে পশিল। সে ঘুম হইতে চমকিয়া উঠিল। তাহার মধ্যকার সুপ্ত মানব জাগ্রত হইল। সে ভুলিয়াই গেল যে সে দানব। সে প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিল কোথা হইতে ঐ ক্রন্দন ভাসিয়া আসিতেছে। যখন বুঝিল, তখন ছুটিল…পাষাণঘরের দেওয়ালে কাণ পাতিল।

কংস ॥ ওরে, তোরা কে? বল, তোরা কে?…এক মা…আর দুই সন্তান! কি হয়েছে তোদের? দুধের শিশুর মৃত্যু হল! কেন? জল পায়নি! এক ফোঁটা জলও পায়নি!…কি? …মা ওকে এক ফোঁটা জল দিয়ে বাঁচাবার জন্য মাথা খুঁড়ছিল…কপাল কেটে রক্ত বের হল…ওর পিপাসা মেটাতে সেই রক্ত ওর জিবে দিলেন?…কি? কি?…আর একটু জোরে বল—…কি? এত করেও বাঁচল না? আ—হা—হা! [সেখানে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। একরূপ কাঁদিতে কাঁদিতেই সরিয়া আসিল—]…আ—হা—হা—! নিজের রক্ত

দিয়েও মা তার বুকের ধনকে বাঁচাতে পারল না! মায়ের চোখের সামনে এক ফোঁটা জলের জন্য কি তার আকুলি বিকুলি!···একি চারিদিকে হাহাকার। চারিদিকে দীর্ঘশ্বাস! আকাশে বাতাসে উঃ কি হৃদয়ভেদী ক্রন্দনের রোল! ও—হো—হো—! [কাঁদিতে কাঁদিতে] এ কি! এ কি! [সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগ্রত হইল] কেন এই ক্রন্দন? কেন এই দীর্ঘশ্বাস···এই হাহাকার? ···কার এই অত্যাচার? আমি তাকে—আমি তাকে—[হঠাৎ স্মরণ হইল অত্যাচার তার নিজের—অমনি—কাঁপিয়া উঠিল···পরম লজ্জায়] সে যে আমি—সে যে আমি—আমি নিজে—আমি নিজে—[বলিতে বলিতে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পলাইল—সিংহ-পীঠিকায় তাহার শয্যায়।···চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।]

[—অন্ধকার—]

[পুনরায় সেই স্বপ্নদৃশ্য। এবার রঞ্জনের কঙ্কালটি দেখা যাইতেছে। তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া অঞ্জনা পড়িয়াছিল। কঙ্কণ মাতাকে টানিয়া তুলিল। ···যেন বলিল ঈশ্বরের নিকট এর প্রতিশোধ প্রার্থনা করি এস। বহু কষ্টে অঞ্জনাকে ধরিয়া তুলিলে উভয়ে নতজানু হইয়া বসিল। প্রার্থনাও করিল। তাহার পরই অঞ্জনা মাটিতে সেই যে লুটাইয়া পড়িল, আর উঠিল না। কঙ্কণ বুঝিল অঞ্জনাও শেষ হইল। শোকে মুহ্যমান কঙ্কণ কাঁদিতে কাঁদিতে, প্রতিশোধ স্পৃহায় কাঁপিতে কাঁপিতে, নতজানু হইয়া এক হাত মৃত মাতার দিকে প্রসারিত করিয়া, অন্য হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া ভগবানের দৃষ্টি এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আকর্ষণ করিল—দেখিতে দেখিতে নারায়ণ মূর্তি রূপান্তরিত হইল এক কৃষ্ণ প্রস্তর-খণ্ডে···তাহাতে জলন্তাক্ষরে একে একে ফুটিয়া উঠিল—]

"যদাযদাহিধর্মস্যগ্লানির্ভবতি ভারত।
অভুত্থানমধর্মস্যতদাত্মানংসৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায়সাধুনাং বিনাশায়চদুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগেযুগে ॥

[আবার অন্ধকার। সে অন্ধকার যখন অন্তর্হিত হইল তখন দেখা গেল কংস নিদ্রিত। মশালহস্তে চন্দনা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জাগাইল।]

চন্দনা ॥ সম্রাট! দানবেশ্বর!

কংস ॥ [জাগিয়া উঠিয়াই] কি চন্দনা?

চন্দনা ॥ [পরমোল্লাসে] আগুন! আগুন—!

কংস ॥ কোথায়?

চন্দনা ॥ যাদব পল্লীতে। সব কী ঘুমই ঘুমাচ্ছিল···কিছুতেই জাগবে না। ···যেন প্রতিজ্ঞা করে ঘুমাচ্ছিল। এইবার ঘুম ভাঙে কিনা—দেখ— [সেখানকার একটি পরদা টানিয়া সরাইয়া] ···যে ঘরে বসে সংসার চিন্তাতেই বিভোর হয়ে ছিল ···সে জেগেছে···যে ঘরে বসে শাস্ত্রাধ্যয়ন করছিল সে জেগেছে,···সমাজ দেবতারাও জেগেছেন···শুধু জাগেনি—জ্বলন্ত ঘরের মধ্য হতে দগ্ধ হয়ে, ছুটে পথে এসে দাঁড়িয়েছে···নিজেরা জেগেছে...এইবার ভগবানকেও জাগতে বলছে। এইবার দেখব···ঐ বধির ভগবান জাগেন কিনা! এতেও যদি না জাগে,—এতেও যদি

ঐ মাটি...ঐ পাষাণের চেতনা না হয় তবে এবারে ঘরে আগুণ জ্বেলেছি, এখন বুকে আগুন জ্বালবো...মাতার বুকে...পিতার বুকে...নরের বুকে...নারীর বুকে সেই আগুন...যে আগুণ আমার বুকে জ্বলছে—সেই আগুনে ঐ মূক...ঐ বধির...অচেতন ভগবান...পুড়বে পুড়বে...পুড়ে আমারই মতো ছাই হ'য়ে যাবে।

[দূর হইতে ভাসিয়া আসিল সহস্র কণ্ঠের প্রার্থনা :—"ভগবান জাগো! ভগবান জাগো!"]

কংস ॥ [সেই অগ্নিদাহ-দৃশ্য যেন দুই চোখ দিয়া পান করিতেছিল—] আঃ...ক্ষুধা মিট্‌ল! পিপাসা মিট্‌ল! আঃ...আরো আগুন চাই, আরো আগুন

[বাহিরের প্রার্থনা ভাসিয়া আসিল—"ভগবান জাগো। ভগবান জাগো!"]

কংস ॥ হাঃ হাঃ হাঃ বলে ভগবান জাগো! ওদের ভগবান জাগে...ঐ—

[ঊর্ধ্বে ঈঙ্গিত। পাষাণদ্বার উঠিয়া গেল। পাষাণঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল কঙ্কণ, এক হাতে সেই চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি, অপর হাতে রঞ্জনের কঙ্কাল। অঞ্জনার মৃতদেহ পাষাণ ঘরে লুটাইতেছে—]

কঙ্কণ ॥ ভগবান জাগে—ভগবান জাগে। অত্যাচারের আগুন যখন জ্বলে উঠে, তখন মৃত মানব জাগে, নিদ্রিত ভগবান জাগে—!

কংস ॥ [কঙ্কণকে দেখিয়া সবিস্ময়ে] এ কি! এ কি! কে এ?

বিদূরথ ॥ কঙ্কণ! তুই এখনো বেঁচে আছিস?

কঙ্কণ ॥ হ্যাঁ, বেঁচে আছি। ...বেঁচে নাই মাতা। বেঁচে নাই রঞ্জন। [মৃতা অঞ্জনাকে দেখাইয়া] ঐ...মাতা। [রঞ্জনের কঙ্কাল বিদূরথের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া] হে প্রভুভক্ত পিতা, ঐ রঞ্জন। [কংসকে] আর হে শয়তান, ভাবছ কেমন করে আমি বাঁচলাম? শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠবে। তোমার এই নরকে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমার ভগবতী মাতা মুমূর্ষু দুধের শিশু ঐ রঞ্জনকে তার স্তন্য হতে বঞ্চিত করে, সেই স্তন্যের শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত আমায় পান করিয়ে, ঐ শিশু-দধিচী রঞ্জনকে নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। আজ আমি শুধু বেঁচে নাই, আজ আমি পাহাড় চূর্ণ করতে পারি। ...মাতৃস্তন্যের অমোঘ শক্তি আমার বাহুতে। এই বাহুতে বহন করি জাগ্রত ভগবান। প্রতিষ্ঠা করব দেবকী-ক্রোড়ে, কংস-কারাগারে [কংসের প্রতি] শয়তান সাধ্য থাকে বাধা দাও—[সগর্বে প্রস্থান।]

কংস ॥ [অভিভূত হইয়াও] ধর—ধর—[মূর্ছা।]

———

চতুর্থ অঙ্ক

॥ এক ॥

[প্রাসাদ কক্ষ। কক্ষেব এক পার্শ্বে একটি পূজাবেদী, তদুপরি শালগ্রাম শিলা। উগ্রসেন সেই শালগ্রাম শিলা পূজা শেষ করিয়া প্রণাম কবিযা উঠিয়াই দেখেন সম্মুখে কংস উপস্থিত।]

কংস ॥ [নেপথ্যে চাহিয়া ডাকিল] —নরক

[নবকেব প্রবেশ]

নরক ॥ সম্রাট—

কংস ॥ কই আমার পিতৃদেব কই ?

[নরক উগ্রসেনের মুখের দিকে তাকাইল। আবাব কংসেব মুখেব দিকে তাকাইল।]

উগ্রসেন ॥ আমাকে পিতা-রূপে স্বীকার করতে কি লজ্জা বোধ হচ্ছে সম্রাট ?

কংস ॥ আমার পিতা আপনি ? সে কি ! [ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া] তাই তো ! [তখনি শালগ্রাম শিলার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া] তবে ও কি ?

উগ্রসেন ॥ —নারায়ণ। আমি পূজা করি। এবং যদি তুমি এই শালগ্রাম চূর্ণ কর—তা হলেও আমি এতটুকু দুঃখিত হব না। কারণ—

কংস ॥ কারণ—?

উগ্রসেন ॥ এই শালগ্রাম শিলাটির সঙ্গে একটি দৈবদাণী জড়িত আছে। যদি ইচ্ছা হয়, তুমি শুনতে পার—

কংস ॥ দৈববাণী ?

উগ্রসেন ॥ হ্যাঁ, দৈববাণী। এক দৈববাণী তুমি স্বকর্ণে শুনেছ…দেবকীর বিবাহ-বাসরে। মনে আছে সে দৈববাণী ?

কংস ॥ হ্যাঁ, সে দৈববাণীর ছন্দটি অতীব মধুর বলে কিছুতেই ভোলা যায় না। কাণ দুটি আর একবার জুড়িয়ে দাও তো নরক—

নরক ॥ "দেবকী নন্দন হতে কংসের নিধন।"

কংস ॥ আ—হা—হা !…কি সুললিত ছন্দ ! কি শ্রুতিমধুর বাক্য-বিন্যাস ! বাবা, আপনার কর্ণপটাহে মধুবৃষ্টি হচ্ছে না ?

উগ্রসেন ॥ পুত্রের নিধনে পিতা উল্লসিত হয়…জগতে আর কখনো ঘটেছে কি না জানি না। কিন্তু আমি উল্লসিত হব। তুমি…আমাকে সিংহাসন চ্যুত করে সম্রাট হয়ে বসে আমাকে এই প্রাসাদ-কক্ষে বন্দী করে রেখেছ বলে নয়,—

কংস ।। পিতা, আপনার তবে কোন কষ্ট হচ্ছে না…কুশলে আছেন, এবং সুখেও আছেন দেখছি। নরক, যাক আজ আমার মন শান্তি পেল, পিতাকে আমি সুখী করতে পেরেছি। এ সংসারে কয়জন পুত্র তা পারে ? বল নরক—

নরক ।। যথার্থ বলেছেন সম্রাট !

উগ্রসেন ।। [নরকের প্রতি] স্তব্ধ হও কুক্কুর—[কংসকে] তুমি শোন নরাধম, তোমার নিধনে আমি মহা উল্লসিত হব কারণ…তুমি আমার এক পুত্র…রাজ্যব্যাপী আমার আর লক্ষ লক্ষ পুত্রের জীবন দুর্বিসহ করেছ…তুমি তাদের ঘর-সংসার শ্মশান করেছ…

কংস ।। কিন্তু তারা এ কথা বলে না—

উগ্রসেন ।। তুমি তাদের কণ্ঠরোধ করেছ—

কংস ।। হ্যাঁ, চীৎকার নাই। একটা পরম শান্তি—একটা চমৎকার শৃঙ্খলা বিরাজ করছে—।…

উগ্রসেন ।। কিন্তু তারই অন্তরালে,অব্যক্ত আর্তনাদ…অস্ফুট ক্রন্দন……তা তোমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে না বটে, কিন্তু…তা ব্যথাহারী নারায়ণের নিদ্রা ভঙ্গ করেছে, হে দানব এখনো সাবধান—

কংস ।। নারায়ণ ! নারায়ণ ? [শালগ্রাম শিলাটি তুলিয়া লইয়া]…ঘুম বুঝি এর কিছুতেই ভাঙে না, পিতা ?

উগ্রসেন ।। হ্যাঁ, চূর্ণ কর। আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে। আমি যে দ্বিতীয় দৈববাণী শুনেছি, পূর্ণ হবে।

কংস ।। আবার কি দৈববাণী ?

উগ্রসেন ।। শুনবে ? শুনবে ?

কংস ।। দৈববাণীর মধুর ঝঙ্কার…শুনব না ? বলুন পিতা, আমার কাণ খাড়া হয়ে উঠেছে—

উগ্রসেন ।। মন্দির লুণ্ঠন ভয়ে ভয়ার্ত এক ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ঐ শালগ্রাম শিলা আমাকে দান করে গেছেন। যে মুহূর্তে ঐ শালগ্রাম শিলা আমি অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করলাম সেই মুহূর্তে দৈববাণী হল—

কংস ।। মধু—মধু—না শুনতেই মধু বৃষ্টি হচ্ছে ! [উগ্রসেনকে] হ্যাঁ দৈববাণী হল—

[দৈববাণী ।। ঐ শালগ্রাম শিলায় আমি নারায়ণ রাজলক্ষ্মী সহ বাস করছি। যতদিন আমার এই শালগ্রাম অক্ষুন্ন অটুট থাকবে, ততদিন চঞ্চলা রাজলক্ষ্মীও এই সংসারে অচঞ্চলা অচলা হয়ে বাস করবেন।]

উগ্রসেন ।। সেই দৈববাণী, আবার ! [কংসকে] চূর্ণ কর…যদি ইচ্ছা হয় কর চূর্ণ ঐ শালগ্রাম। '…পাপ ভোজ-রাজত্বের অবসান হোক, যদুবংশের রাজত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হোক, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক—

[কংসের ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব। ভয়ে, আশঙ্কায়···চোখ—মুখ বুঁজিয়া কংস শালগ্রাম শিলা নরকের হাতে দিয়া তাহা বেদীতে স্থাপন করিতে ইঙ্গিত করিল—]

উগ্রসেন ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ওরে ভীরু······ওরে কাপুরুষ······বুঝে দেখ দেবতার প্রতাপ—

কংস ॥ [এ আঘাতও তার সহ্য হইল না। তৎক্ষণাৎ সে ক্ষেপিয়া গিয়া নরকের হাত হইতে শালগ্রাম শিলা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করিতে গিয়াই··· কি ভাবিয়া তখনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া] না থাক। এ না হয় আমার কাছেই থাক—

উগ্রসেন ॥ নারায়ণ পাপীকে এইরূপেই উদ্ধার করেন বৎস—

কংস ॥ [ইহাও তাহার নিকট অসহ্য বোধ হইল] নারায়ণ! ঘরে পুষব আমি!······[অন্তর্দ্বন্দ্ব]······[পরে সপ্রতিভ ভাব ধারণ করিয়া] না বাবা, তোমার মনে ব্যাথা দিতে পারব না···তোমার জিনিষ···তুমিই রাখো—

[উগ্রসেনের হাতে দিল।]

উগ্রসেন ॥ হ্যাঁ, সুমতি হোক্।

[কংস পালাইয়া বাঁচিল। নরক অনুবর্তী হইল।]

———

॥ দুই ॥

রাজপ্রাসাদ

চন্দনা ॥

—গান—

অগ্নি-রাগের গান ধ'রে কে বলছে প্রাণের দ্বারে—
জাগো রে মন, ঘুমিও না আর আঁধার-কারাগারে!
দীপ্ত তানের মূর্চ্ছনাতে
সূর্য্য জাগে সুর শোনাতে,
প্রভাত-প্রদীপ ভাসিয়ে দিয়ে রাতের পারাবারে!
চিত্ত-বীণায় কোন দীপকের ছন্দ জাগে রে,
নৃত্য করে গানের শিখা রক্তরাগে রে!
তাই তো বুকের তলে তলে
জ্বালামুখীর চিতা জ্বলে,
হাসিমুখেই ধূপের মতন পুড়ছি বারে বারে।

[কংসের প্রবেশ]

কংস ॥ আবার গান গাইছ চন্দনা ?

চন্দনা ॥ তবে কি করব ?…আসুন সম্রাট, আজ ফাগুয়া খেলি—

কংস ॥ না—না, কোনো উৎসব নয়। ঐ আলো গুলো বড় বেশী জ্বলছে …ওগুলো নিভিয়ে দাও—

চন্দনা ॥ অন্ধকার হবে—

কংস ॥ সেই ভালো চন্দনা, সেই ভালো।

চন্দনা ॥ সে কি সম্রাট ?

কংস ॥ আলো আমার ভালো লাগে তখন…যখন আমি চাই জগতের সকলে আমাকে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখুক…! চেয়ে দেখুক আমার অনন্ত ক্ষমতা, অপরিসীম-সম্পদ, অপরিমেয় ঐশ্বর্য…আলো চাই তখন…। দীপালোকে তখন আমার মন উঠবে না, তখন চাই আগুন, যার গগনস্পর্শী প্রদীপ্ত শিখা আমার মহিমা, আমার বিভূতি বিশ্বের চোখে উদ্ভাসিত করবে—! কিন্তু…চন্দনা, আলো আজ নয়—

চন্দনা ॥ কেন ?

কংস ॥ আজ একজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে। তার কাছে আমি লাঞ্ছিত হয়েছি। সত্য কথা বলব চন্দনা, আজ তাকে আমার মুখ দেখাতে—

চন্দনা ॥ বুঝেছি, লজ্জা হচ্ছে। আর এও বুঝেছি সে কে।

কংস ॥ কে ?

চন্দনা ॥ কঙ্কণ।

কংস ॥ [লজ্জায় মুখ ঢাকিল, ক্ষণকাল পর] আর মাত্র একজনের কাছে মাত্র একদিন, অমনি লাঞ্ছিত লজ্জিত হয়েছিলাম, সে ছিল এক নারী !

চন্দনা ॥ নারী ?

কংস ॥ হ্যাঁ, নারী। যে আমার ঐশ্বর্য আমার সম্পদ তুচ্ছ করে তার পল্লী-কুটিরে ফিরে গেল…আমার সজল চোখের পানে একটিবারও দৃষ্টিপাত করল না—! লজ্জায় লাঞ্ছনায় আমার উচ্চশির নত হল—,কিন্তু তারপর সেই নারীই নিজে…! স্বেচ্ছায়—

চন্দনা ॥ [উত্তেজিত হইয়া] সম্রাট—তুমি আমাকে অপমান করছ—

কংস ॥ স্বেচ্ছায় এসে আমার বাহুবন্ধনে ধরা দিল। আমার নতশির উন্নত হল। ইচ্ছা হল আমার সেই গৌরব, আমার সেই গর্ব এক বিশ্ব-ব্যাপী অগ্নি-আলোকে দীপ্যমান হোক। আজ যে এসেছে, সেও স্বেচ্ছায়ই এসেছে, কিন্তু তোমার মতো অনন্যোপায় হয়ে আসেনি…আমার প্রেরিত সৈন্য-সামন্ত একাই সে বধ করতে পারত, হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি, সে অনায়াসে পারত, কিন্তু তা সে করেনি। সে স্বেচ্ছায় শৃঙ্খলিত হয়েই এসেছে ! এ আমার নিদারুণ লজ্জা—নিভিয়ে দাও ঐ আলো—অন্ধকার আমার মুখ ঢাকুক—

চন্দনা ॥ হ্যাঁ মুখ ঢাকুক, আমারও। এই অন্ধকারে আমার আনন্দের আলো শুধু এইটুকু যে—অপমানিত, লাঞ্ছিত আজ শুধু আমি নই,—তুমিও !

[প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে সকল আলো ম্লান হইয়া গেল।]

কংস ॥ কিন্তু এ অন্ধকারে আমি বেশীক্ষণ থাকবো বলে মনে হচ্ছে না—কোন দিনই থাকিনি। কিন্তু, তোমার দুঃখ এই যে তোমার ও অন্ধকার তোমাকে আমরণ ঢেকে রাখবে। [নরককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া] নরক, আমার শৃঙ্খলা-বদ্ধ অতিথি—আমি প্রস্তুত। মদিরা, সুরা—।

[নরকের বন্দীকে আনিতে ইঙ্গিত। বাহিরে মৃদু বাদ্য। মদিরা সুরা আনিয়া দিল। কংস মদ্যপান করিতেছে। এমন সময় শৃঙ্খলাবদ্ধ কঙ্কণকে লইয়া প্রায় দশ জন দানব-রক্ষী প্রবেশ করিল]

কংস ॥ তুমিই বল নরক, এ জীবনে আমার সব চাইতে বড় বান্ধব কে? [নরক মহা মুস্কিলে পড়িল, সে তাহার কথাই বলিবে কি না তাহাই ভাবিতেছিল, তাহাকে উত্তর যোগাইয়া দেওয়ার মানসে] যদুকুলে—?

নরক ॥ কেন, আমাদের বিদূরথ

কংস ॥ সেই বিদূরথেরই নয়নানন্দ পুত্র ঐ কঙ্কণ, বড় ব্যাথা পাই নরক, যখন কর্তব্যের নিদারুণ আহ্বানে, এমন যে প্রিয়জন···তাকেও—

নরক ॥ সত্য সম্রাট !

কংস ॥ অথচ ওরা সে কথা বোঝে না ! বোঝে না যে কর্তব্যের অনুরোধে, শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, আমাদের এই অবুঝ সোণার চাঁদদের আঘাত করতে গিয়ে, আমরা নিজেরাই দ্বিগুণ আহত হই !

কঙ্কণ ॥ তোমার এই ভণ্ডামি আমার বৃদ্ধ পিতার জন্য সঞ্চিত থাক। তাতে তোমার কাজ হবে। আমাকে দাও আমার প্রাপ্য—

কংস ॥ হ্যাঁ, তোমার প্রাপ্য···আমার প্রীতি·· আমার স্নেহ। তোমার প্রাপ্য রাজসম্মান, রাজানুগ্রহ—

কঙ্কণ ॥ অর্থাৎ দাসত্বের স্বর্ণ-শৃঙ্খল ?

কংস ॥ কুলোকে ঐ আখ্যা দেয় বটে—, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে—

কঙ্কণ ॥ তা আরো ভয়ঙ্কর। প্রথম আসে ভীরুতা, তারপর আসে কাপুরুষতা। তারপর বিক্রয় হয় বিবেক, তারপর বিসর্জন হয় মনুষ্যত্ব। তখন পদাঘাতকে পুরস্কার মনে হয়, পাদুকালেহনে মোক্ষলাভ হয়।

কংস ॥ নরক, কঙ্কণের অসুখ করেছে। বিকারও বলতে পার। চিকিৎসা না করে তো পারি না, ও যে আমারই বিদূরথের পুত্র।

নরক ॥ ঔষধ তো প্রস্তুতই আছে সম্রাট—

কংস ॥ [নরককে ইঙ্গিত, পরম ব্যগ্রতায়] হ্যাঁ, সেই ঔষধ—সেই ঔষধ—[ইঙ্গিত পাইয়া নরক চলিয়া গেলে— কঙ্কণকে] তুমি আমার বিদূরথের পুত্র—বিনা চিকিৎসায় তোমায় রাখতে পারি না। শুশ্রূষা করবে কে ভাবছ ? সে ব্যবস্থাও আছে, বিদূরথই না হয় বৃদ্ধ হয়েছে, তোমার মাতাই না হয় মৃত, কিন্তু [পৈশাচিক

হাস্যে] বধূমাতা কঙ্কাদেবী তো আছেন [পার্শ্বের কক্ষে কঙ্কা নিদারুণ আর্তনাদ করিয়া উঠিল ও-হো-হো—] ঐ—ভো !

কঙ্কণ ॥ কঙ্কা—কঙ্কা—

কঙ্কা ॥ [কক্ষান্তর হইতে] প্রিয়তম ! প্রিয়তম !

কঙ্কণ ॥ তুমিও এখানে—তুমিও এখানে কঙ্কা ?

[উভয় কক্ষের মধ্যবর্তী সুবৃহৎ বাতায়ন-অন্তরালে কঙ্কাকে দেখা গেল…পার্শ্বে তাহার নির্যাতনকারিণী যবনী প্রহরিণী…প্রহরিণীর হস্তে শাণিত ছুরিকা—]

কঙ্কা ॥ [অব্যক্ত যন্ত্রণায়] হ্যাঁ, আমাকে এখানে এনেছে। এনে…[হাত তুলিয়া দেখাইয়া] আমার আঙ্গুল কেটে নিয়েছে—

[সেই মুহূর্তে আর এক যবনী প্রহরিণী এক স্বর্ণথালায় কঙ্কার কর্তিত অঙ্গুলি লইয়া আসিল—সঙ্গে আসিল নরক।]

নরক ॥ [কঙ্কণের প্রতি] তোমার ঔষধ এই কর্তিত অঙ্গুলির রক্তপ্রলেপ—

কংস ॥ ঔষধ খুব ভালো। তোমার বিকার দূর হল কঙ্কণ ?

কঙ্কণ ॥ শয়তান [তাহার চোখে আগুণ জ্বলিতে লাগিল] কিন্তু, বৃথা —ব্যর্থ হবে তোমার এই অত্যাচার । যখন দেখি দুর্বলের ওপর, নারী যে নারী, তারই ওপর প্রবল অত্যাচার করতে নিতান্ত ব্যগ্র তখনি বুঝি তার সত্যকার শক্তি লুপ্ত হয়েছে, রয়েছে শুধু তার শেষ সম্বল—ঐ পাশবিকতা। কিন্তু হে নিষ্ঠুর নির্মম দানব, তোমার অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আমরা আজ পাষাণ হয়েছি এই পাষাণে যত ইচ্ছা আঘাত কর আমরা নীরব, নিথর রইব । পাষাণে আঘাত করতে করতে তোমার হাত আপনা আপনি ক্লান্ত হবে…শ্রান্ত হবে…শেষে ঐ হাত কেঁপে উঠবে…অবশেষে ঐ হাত অবসাদের পক্ষাঘাতে আহত হয়ে এই পাষাণ পদতলে অসাড় হয়ে লুটিয়ে পড়বে !

কংস ॥ বিকার বেড়েই চলেছে নরক ! তবে আর এক অঙ্গুলির আর এক মাত্রা—

নরক ॥ হ্যাঁ, যেমন রোগ, তেমনি ঔষধ হওয়া চাই—

কংস ॥ এখনো বল—

নরক ॥ দাসত্ব স্বীকার কর কিনা—

কঙ্কা ॥ কখনো না—কখনো না—

কঙ্কণ ॥ দাসত্বের প্রস্তাবে আমি পদাঘাত করি—

কংস ॥ নরক, ঔষধের তবে দ্বিতীয় মাত্রা—

[নরকের প্রস্থান—]

কঙ্কণ ॥ চক্ষের সম্মুখে দানবের…রাক্ষসের এই অসহনীয় পৈশাচিক অত্যাচার…এক দুর্বলা নারীর ওপর…যে নারী আমাকে চিরতরে দাসত্ব-শৃঙ্খল হতে মুক্ত করেছে, সে মুক্তি যদি সত্য হয়, তবে মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা এই লৌহ-শৃঙ্খল [শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিল]—কোথায় কঙ্কা—কোথায় কঙ্কা—

[ছুটিয়া কঙ্কার প্রবেশ। হাতে তাহার যবণী-প্রহরিণীর ছুরিকা]

কঙ্কা ॥ আমি এসেছি—

কঙ্কণ ॥ ওরা তোমার অঙ্গুলির পর অঙ্গুলি কেটে আমায় ওদের দাসত্ব বরণ করতে বাধ্য করবে স্থির করেছে, কিন্তু জানেনা ওরা—

কঙ্কা ॥ যে সে অঙ্গুলি আমি স্বেচ্ছায় দিতে পারি—[নিজের অঙ্গুলি কাটিতে কাটিতে] অঙ্গুলি কেন, মুক্তি-প্রয়াসে, জীবন দিতে পারি, যদি প্রয়োজন হয়, জীবনের চাইতেও যে বেশী সেই তোমাকে পর্যন্ত চিরতরে ত্যাগ করতে পারি ! [বলার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে উহা কঙ্কণ অঞ্জলিতে গ্রহণ করিল। কংসের সম্মুখে গিয়া] নাও—নাও ঘাতক—। [তাহার সম্মুখে অঙ্গুলি রাখিল।] তৃপ্ত তুমি ? উত্তম। [কঙ্কণের হাত ধরিল। ভূপতিত শৃঙ্খলটি আর এক হাতে তুলিয়া লইল। কংসের সম্মুখে গিয়া দুই জনেই নতজানু হইল—] কিন্তু হে দস্যু, মুক্তিকামী হলেও আজ আমরা মুক্তি চাই না—

কংস ॥ মুক্তি চাও না ?

কঙ্কণ ॥—চাই, কিন্তু আজ নয়। আজ চাই কারা-বন্ধন। এই নাও লৌহ-শৃঙ্খল [নিক্ষেপ] ঐ লৌহ-শৃঙ্খলে আমাদের শৃঙ্খলিত কর···শৃঙ্খলিত করে প্রেরণ কর তোমার সেই কারাগারে—যেখানে আমাদের আত্মীয়-স্বজন, ভাই বন্ধু, সকলে, এক সঙ্গে সকল অত্যাচারের সব কঠোরতা তুচ্ছ করে, হাসিমুখে জগতে ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সেই অনাগত দেবতার জন্ম প্রতীক্ষায় তপস্যা করছে ! একের মুক্তি নয়, মুক্ত হব সবাই···একদিনে···এক সঙ্গে !

কংস ॥ তবে তাই হয়ো বৎস—এক সঙ্গেই মুক্ত হয়ো। [প্রস্থান]

[নরক রক্ষীদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া প্রভুর অনুবর্তী হইল। রক্ষীরা আসিয়া কঙ্কণ ও কঙ্কাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কঙ্কণ ও কঙ্কা সোল্লাসে নিজেরাই লৌহ-শৃঙ্খল হাতে তুলিয়া লইয়া গাহিল]—

"আজি শৃঙ্খলে বাজিছে মাভৈ বরাভয়"

———

॥ তিন ॥

কারাগার

[অন্তঃপ্রকোষ্ঠে বসুদেব, দেবকী ও তাহাদের কনিষ্ঠ-পুত্র নিদ্রিত। বহিঃপ্রকোষ্ঠে কেহ নাই। দূরে—কংস এবং নরক। রক্ষীগণ যথাস্থানে দণ্ডায়মান। নেপথ্য হইতে—কারাবন্দীদের গান মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছিল—"পায়ে পায়ে বাজে লোহার শিকল তালে তালে তারি আমরা গাই"]

কংস ॥ এই আমার কারাগার ?

নরক ॥ হ্যাঁ সম্রাট, কারাগার···তবে একাংশ মাত্র—।

কংস ॥ আরো আছে ?

নরক ॥ বলেন কি সম্রাট ? আর নেই ! অপরাধীর সংখ্যা যেরূপ বেড়ে গেছে, তাতে কারাগারকে এরূপ বিস্তৃত করতে হয়েছে যে—

কংস ॥ দেখো শেষে আমার প্রাসাদ নিয়ে টানাটানি করো না।

নরক ॥ না সম্রাট,—কিন্তু আজ কি এই গৌরবটাই সব চাইতে বড় হয়ে উঠছে না যে, হ্যাঁ···রাজ্য অরাজক নয়···শাসন আছে···শান্তি আছে শৃঙ্খলা আছে ?

কংস ॥ ভোজবংশের এ বড় কম কৃতিত্ব নয় নরক—সেজন্য তোমরা গর্ব অনুভব করতে পার।

নরক ॥ না সম্রাট মুক্ত-কণ্ঠেই স্বীকার করছি এ জন্য লজ্জাই অনুভব করি—

কংস ॥ কেন ?

নরক ॥ যে এ কৃতিত্ব সম্পূর্ণ ঐ যাদবদেরই। ওদের মধ্যে যারা মহিমময় সম্রাটের সেবা করবার সৌভাগ্য এবং সুযোগ লাভ করেছে, দেখেছি তারা সবাই আমাদের চাইতেও আপনার সিংহাসনের বেশী হিতাকাঙ্ক্ষী। দেখে অনেক সময় মনে সন্দেহই জেগেছে যে এ রাজ্য আমাদের না ওদের ! এই বিদূরথের কথাই ধরুন—

কংস ॥ কই বিদূরথ তো এখনো এল না ?

নরক ॥ শ্মশানেই আমি লোক পাঠিয়েছিলাম···সে এসে খবর দিল পুত্রশোকে বিদূরথ বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে···পুত্রের দা· ার্য শেষ করেই সে আসছে বলে পাঠিয়েছে—

কংস ॥ বিদূরথের একমাত্র বন্ধন ছিল ঐ শিশু-স· নটি ! না নরক ?

নরক ॥ হ্যাঁ সম্রাট, তাই তার এই অকাল-মৃত্যুতে সে শোকে কাতর হয়েছে বড় বেশী।

কংস ॥ কাতরতার পরই চাই কঠোরতা। প্রকৃতির সাম্য রক্ষা করতে হলে এটা নিতান্ত প্রয়োজন ॥ কি বল নরক ?

নরক ॥ যথার্থ বলেছেন সম্রাট।

কংস ॥ হুঁ। [কারাকক্ষের দিকে নরকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া] ওরা বুঝি ঘুমুচ্ছে—?

নরক ॥ হ্যাঁ সম্রাট।

কংস ॥ আর কঙ্কণ ও কঙ্কা ?

নরক ॥ তারা আছে ওদিকে। গিয়ে একবার দেখবেন ?

কংস ॥ [সাগ্রহে] কেন, ওরা কি পিপাসায় এখনি ছট্‌ফট্ করছে ?

নরক ॥ এ রকম কোন সুখবর এখনো পাইনি—

কংস ॥ হুঁ। [কি ভাবিল।] আচ্ছা নরক, দেবকীকে আমার একটিবার দেখতে ইচ্ছা হয়—কোন উপায় করতে পার ?

নরক ॥ সে কি সম্রাট, এখনি তাকে ডেকে তুলি—

কংস ॥ [শিহরিয়া উঠিয়া] না—না—। আমি, বুঝলে কিনা, তাকে তার অলক্ষ্যে দেখতে চাই—, অর্থাৎ—

নরক ॥ আপনি তার সম্মুখে যেতে চান না, অথচ তাকে একটিবার না দেখেও পারছেন না অর্থাৎ সেই পুরাতন দুর্বলতা-টা—

কংস ॥ [রুখিয়া উঠিয়া] সাবধান নরক [তাহাকে একরূপ ভেঙ্‌চাইয়া] দুর্বলতা—দুর্বলতা—দুর্বলতা—! জানো, দেবকীর এখনো এক পুত্র—

নরক ॥ [সভয়ে] জীবিত আছে জানি সম্রাট, কিন্তু তার জন্য দায়ী ঐ বিদূরথ। হত্যার ভার রয়েছে তার ওপর, কিন্তু এখনো তার দেখা নাই! না—ঐ যে সেও এসে পড়েছে।

কংস ॥ ওকে গিয়ে বল…পুত্র-শোকে তুমি বড়ই কাতর হয়ে পড়েছ বিদূরথ। অতএব প্রকৃতির সাম্য রক্ষার্থে—তোমাকে নিদারুণ কঠোর হয়ে—কি করতে হবে নরক ?

নরক ॥ বসুদেবের পুত্রকে হত্যা করতে হবে !

কংস ॥ জলে যখন বসন সিক্ত হয়, আগুনের তাপে তাকে উত্তপ্ত না করে পরিধান করলে অসুখ হয়। এও—তাই।

নরক ॥ বুঝেছি সম্রাট।—

কংস ॥ তবে এস—

[কংস অন্তরালে রহিল। বিদূরথ প্রবেশ করিলে নরক তাহার সম্মুখীন হইল।—পুত্র-শোকে একদিনেই বিদূরথ উন্মাদ হইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চেহারা দেখিলে মনে হয় এ যেন কোন প্রেত শ্মশান হইতে উঠিয়া আসিল। বিদূরথের গলদেশে একটি পাত্র ঝুলিতেছে, তাহাতে তাহার পুত্রের চিতাভস্ম।]

নরক ॥ এস, ভাই, এস—। শোক করে তো তাকে আর ফিরে পাবে না—

বিদূরথ ॥ সাবধান— [আপন মনে চিতাভস্ম ছড়াইতে লাগিল এবং বিড়বিড় করিয়া বকিয়া যাইতে লাগিল] ফিরে পাবে না…ফিরে পাবে না [হঠাৎ নরককে ভ্যাঙ্‌চাইয়া] ফিরে পাব না, কেন শুনি ?

[নরক বিস্ময়ে অবাক হইল।]

বিদূরথ ॥ [নরককে] কোনদিন বীজ বোননি ? তা থেকে গাছ হয়নি ? ও আমার সোনার চাঁদ, এই তোমার বুদ্ধি ?

নরক ॥ তুমি কি উন্মাদ হলে বিদূরথ ? তোমার ওপর যে সম্রাটের আদেশ রয়েছে—

বিদূরথ ॥ [সম্রাটের কথা মনে হইতেই সসম্ভ্রমে]—কি আদেশ ?

নরক ॥ বসুদেবের সর্ব-কনিষ্ঠ…শেষ পুত্র হত্যা করা—

বিদূরথ ॥ হ্যাঁ করব। নিয়ে এস—

নরক ॥ আমি আনছি—

[কারাগারের অন্তপ্র্ কোষ্ঠে প্রস্থান ।]

বিদূরথ। "এক ফোঁটা জল দাও—দাও—গলা ভেজাবার জন্য এক ফোঁটা না হয় আধ ফোঁটা জলই দাও —তাও তো দিলাম না।—দিতে গেলাম—কে যেন আমার হাত চেপে ধরল! আমার পায়ে শেকল বাঁধল! কিন্তু কাণে তো ভেসে এল "জল দাও—জল দাও—জল দাও—! এক ফোঁটা না দাও—আধ ফোঁটা দাও—!" ওরা বলল কাঁদছ কেন? হাসতে হবে—আমি হাসলাম! আমি হাসলাম! [দু চোখ দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল। [প্রস্থান।]

[অন্তপ্র্ কোষ্ঠ হইতে বসুদেব দেবকী ও নরক বাহির হইয়া বহিপ্রকোষ্ঠে আসিলেন। বসুদেবের হস্তে তাহাদের শেষ সন্তান। শিশুটি ঘুমাইয়া আছে। কারাগারের বাহিরে আসিবার কালে নরক বসুদেবের নিকট সন্তান চাহিয়া হাত বাড়াইল।]

নরক ॥ দাও—

[বসুদেব সন্তানকে নরকের হাতে তুলিয়া দিতে গেলেন। দেবকী গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

দেবকী ॥ [বসুদেবকে] দাঁড়াও আর একটি বার আমার বুকে দাও—আর একটিবার—

বসুদেব ॥ চুপ্...চুপ্...ঘুম ভেঙে যাবে!

দেবকী ॥ থাক...তবে থাক [কাঁদিতে লাগিলেন।]

বসুদেব ॥ [নরকের হাতে সন্তান তুলিয়া দিয়া] হত্যা করবে, ক'রো—, কিন্তু ঘুম ভাঙিয়ে হত্যা ক'রো না ও ভয় পাবে—ভয় পাবে । আর কেন দেবকী, সরে এস—

দেবকী ॥ [সন্তান লক্ষ্যে] ও কি জাগল? ও কি জাগল? ওর হয়তো ক্ষুধা পেয়েছে—ওর হয়তো—

বসুদেব ॥ তুমি কাতর হচ্ছ—তুমি কাতর হচ্ছ দেবকী—

দেবকী ॥ আমার বুকের ধন, আমার চোখের মণি—

বসুদেব ॥ হ্যাঁ, বুকের ধন—চোখের মণি—আমরা অঞ্জলি দিচ্ছি—আমরা অঞ্জলি দিলাম—এইবার বল—অনাগত দেবতা স্বাগতম্।

দেবকী ॥ [কাঁদিতে কাঁদিতে] অনাগত দেবতা স্বাগতম্!

[তিনবার আবাহনের পর দেবকীকে লইয়া বসুদেবের অন্তপ্র্ কোষ্ঠে প্রস্থান। নরক সন্তান লইয়া বাহিরে আসিল। বিদূরথও চিতাভস্ম ছড়াইতে ছড়াইতে পুনরায় প্রবেশ করিল—]

নরক ॥ [বিদূরথের সম্মুখে গিয়া] কর হত্যা—এই নাও ছুরি—

বিদূরথ ॥ [একদৃষ্টে সন্তানটি দেখিয়া]—মারব কি? মরেই গেছে!

নরক ॥ না, ঘুমিয়ে রয়েছে।

বিদূরথ ॥ এটা কে রে?

নরক ॥ বসুদেবের শেষ সন্তান। ছুরি নাও—বসিয়ে দাও—

বিদূরথ ॥ দাও—[সন্তান ও ছুরিকা গ্রহণ। সন্তানটিকে বেশ ভালো করিয়া একবার দেখিয়া লইয়া] আমার খোকা ?

নরক ॥ তোমার খোকা মারা গেছে—

বিদূরথ ॥ হ্যাঁ, মারা গেছে। তাকে নিজ হাতে পুড়িয়ে এলাম। পুড়িয়ে তার সব কটি ছাই তুলে নিলাম, শ্মশানে ছড়িয়েছি, পথে ছড়িয়েছি, এখানে ছড়িয়েছি, ওখানে ছড়িয়েছি, ঘরে ঘরে বিলিয়ে এসেছি···তারাও ছড়াবে বলেছে। কি হবে জান ?

নরক ॥ কি ?

বিদূরথ ॥ সেই ছাই থেকে আবার উঠবে···

নরক ॥ কে ?

বিদূরথ ॥ আমার খোকা। শুধু কি খোকা ? আমার খোকার মতো হাজার হাজার লাখ লাখ লোহার খোকা—! তারা কি করবে জান ?

[নরক নিরবেই রহিল।]

বিদূরথ ॥ এবার ওরা যা পায়নি, সেবার তারা তাই নিতে আসবে! এক ফোঁটা জল পায়নি···এক ফোঁটা দুধ পায়নি···এক মুঠো ভাত পায়নি । এবার ওরা এসে প্রথমেই বলবে—আগে চাই সুদ, তারপর চাই আসল।

নরক ॥ বাক্য রাখ বিদূরথ। তোমার কাজ কর—

বিদূরথ ॥ একে মারলেও ঠিক তাই হবে। মারব ?

কংস ॥ না !—[নেপথ্য হইতে]

বিদূরথ ॥ [স্বর চিনিতে পারিয়া] প্রভু ! [স্বর লক্ষ্য করিয়া তাকাইল—]

নরক ॥ হ্যাঁ—

কংস ॥ [নেপথ্যে] বিদূরথ ওকে আমার হাতে দাও—

[বিদূরথ সন্তান সহ কংসের দিকে ছুটিয়া দৃশ্যের অন্তরালে চলিয়া গেল। অন্তরাল হইতে একটা ভীষণ হুঙ্কার। এবং "মা—মাগো···" শিশুর আর্তনাদ শোনা গেল···কিন্তু তখনি বোধ হইল···শিশুকে কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করা হইল]

কংস ॥ [নেপথ্যে] আর একটি—আর একটি—তারপর—তারপর—

নরক ॥ হাঃ হাঃ হাঃ

———

॥ চার ॥

প্রান্তর

ধরিত্রী

গান

নাহি ভয়, নাহি ভয়।
মৃত্যু-সাগর মন্থন শেষ, আসে মৃত্যুঞ্জয়
হত্যায় আসে হত্যা-নাশন,
শৃঙ্খলে তাঁর মুক্তি-ভাষণ,
অন্ধকারায় তমো-বিদারণ
জাগিছে জ্যোতির্ময় ॥
দলিত হৃদয়-শতদলে তাঁর
আঁখিজল-ঘেরা আসন বিথার।
ব্যথাবিহারীরে দেখিবি কে আয়।
ধ্বংসের মাঝে শঙ্খ বাজায়
নিখিলের হৃদি-রক্ত-আভায়
নবীন অভ্যুদয় ॥

॥ পাঁচ ॥

কারাগার

[পাশাপাশি দুইটি প্রকোষ্ঠ। তাহার একটিতে কঙ্কণ, আর একটিতে কঙ্কা। যথাস্থানে কারারক্ষীরূপে অঘাসুর, বকাসুর এবং তৃণাবর্ত; কঙ্কণ ও কঙ্কা উভয়েই ক্ষুৎপিপাশায় কাতর।—]

কঙ্কণ ॥ কি হবে কঙ্কা, কি হবে?

কঙ্কা ॥ দেবে না…দেবে না, ওরা এক ফোঁটা জল। জল না দিয়ে আহার না দিয়ে…এরা দাঁড়িয়ে দেখছে…আমরা এই পাষাণ-কারায় ছটফট করতে করতে… মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে শেষ কথার শক্তিটুকু হারিয়ে…কেমন করে…তুমি আমার চোখের সামনে…আমি তোমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে চিরতরে চোখ বুঁজি।—

কঙ্কণ ॥ [রক্ষীদের প্রতি] ভেবে দেখ ভাই, শুধু একটিবার ভেবে দেখ… কোনদিন তোমার কি পিপাসা পায়নি ? পিপাসায় কণ্ঠরোধ হয়ে আসেনি ? এক ফোঁটা জলের অভাবে কি মৃত্যু যন্ত্রণারও অধিক যন্ত্রণা অনুভব করনি ?

অঘাসুর ॥ করেছি

কঙ্কণ ॥ করেছ ?

বকাসুর ॥ কেন করব না !

কঙ্কণ ॥ তা যদি করে থাক তবে অমাদের এই অসহ্য পিপাসার মরণাধিক যন্ত্রণা তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করেনা কেন ? কেন তবে পাষাণের মতো পাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছো ? ঠেলে ফেল এই লৌহদ্বার…নিয়ে এস সুশীতল জল… আমাদের বাঁচাও…আমাদের বাঁচাও—

তৃণাবর্ত ॥ আমরা আর তোমরা হলাম এক ? অসহ্য পিপাসায় যখন আমাদের বাক্য বন্ধ হয়ে আসে তখন আমরা এক কলস মদে গলাটা ভিজিয়ে নি।

অঘাসুর ॥ কারো কাছে মাথা খুঁড়তে হয়না।

বকাসুর ॥ কংস রাজার কল্যাণে না চাইতেই পাই।

কঙ্কা ॥ পিপাসার চাইতেও ওদের ঐ পরিহাস আরো বেশী যন্ত্রণা দেয় স্বামী ! কেন চাও ওদের কাছে জল ? তার চাইতে এস স্বামী…কণ্ঠে এখনো যেটুকু যতটুকু শক্তি আছে সমস্ত শক্তি একত্র করে জীবনের শেষ নিঃশ্বাসে প্রার্থনা করে মরি…হে ভগবান…তুমি করুণাহীন, মমতাহীন মরুভূমিতে শঙ্খধ্বনি করে নেমে এস। চক্রে তোমার ধ্বংস কর নির্মম দানব। গদাঘাতে চূর্ণ কর এই লৌহ-কারাগার। তারপর পদ্ম-হস্তের স্পর্শ দাও…আলো দাও…মুক্তি দাও…শান্তি দাও—। [মুমূর্ষু হইয়া পড়িল।]

অঘাসুর ॥ [কঙ্কাকে দেখাইয়া] ওটা বোধ হয় মুক্তিই পেল।

কঙ্কণ ॥ কঙ্কা। কঙ্কা। [সাড়া না পাইয়া] সাড়া নাই। তবে কি—তবে কি—শেষ ? সব শেষ ? [রক্ষীদের প্রতি] ওরে—তোরা বল…আছে না গেল ?

বকাসুর ॥ কি করে বলব মশাই—আপনার পরিবারের খবর। দেখছি কথা বলছেন না, এবং ভূমি নিয়েছেন। এটা তার মৃত্যু-লক্ষণ কি রাগাভিমানের লক্ষণ তা পরিজ্ঞাত হবার সৌভাগ্য আমাদের তো হয়নি মহাশয়।

কঙ্কণ ॥ [পাষাণ প্রাচীরে আঘাত করিতে করিতে] কঙ্কা—কঙ্কা—। [উৎকর্ণ হইয়া কোন সাড়া পায় কিনা শুনিল, কিন্তু সাড়া না পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল] নেই—নেই—। আমার গলা শুকিয়ে আসছে তালু ফেটে যাচ্ছে…জল… একটু জল…এক ফোঁটা জল—[সানুচর কংসের প্রবেশ]

কংস ॥ তাই তো, আমার বিদূরথের পুত্র কঙ্কণ…কঙ্কণই জল চাচ্ছে নরক। নরক, তোমাদের এসব কি হচ্ছে বল দেখি। আমার বিদূরথের পুত্র কঙ্কণ… সে কিনা এক ফোঁটা জল না পেয়ে মরতে বসেছে। ছিঃ।

নরক ॥ জল দি সম্রাট—

কংস ॥ আবার জিজ্ঞাসা করছ।

নরক ॥ [এক অনুচরের মস্তকস্থিত জলকলস লইয়া কঙ্কণের সম্মুখে গিয়া কারাগারের বাহিরে, ঠিক তাহার সম্মুখে, ধীরে ধীরে, অতি ধীরে' কলস হইতে আর একটি সুবিস্তৃত পাত্রে জল ঢালিতে লাগিল]—কঙ্কণ, জল নাও—

কঙ্কণ ॥ [নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। "জল" কথাটি কাণে যাওয়াতে চোখ মেলিল—জল দেখিয়া চোখে মুখে এক অদ্ভুত দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। লাফাইয়া উঠিল—] জল! জল! দাও জল—

কংস ॥ পান কর কঙ্কণ প্রাণ ভরে পান কর—

কঙ্কণ ॥ [লৌহদণ্ড ঝাকিয়া] কিন্তু ?

কংস ॥ বাইরে আসবে ?

কঙ্কণ ॥ দ্বার খোল

কংস ॥ নরক, অপরাধী কি বাইরে আসতে পারে ? আমি ব্যবহার শাস্ত্রের কথা বলছি।

নরক ॥ হ্যাঁ, আসতে পারে, যদি অপরাধী দোষ স্বীকার করে, ক্ষমা চেয়ে বশ্যতা স্বীকার করে—

কংস কঙ্কনের মুখের দিকে চাহিল।

কঙ্কণ ॥ না—না—না—। জল আমাকে ভিতরে এনে দাও—

কংস ॥ আমি ব্যবহার শাস্ত্রের কথা বলছি নরক। পিপাসা-দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী যে তাকে কি কারাকক্ষে জল দেওয়া যায় ?

নরক ॥ ব্যবহারশাস্ত্রে নিষেধ আছে সম্রাট।

কংস ॥ (যেন মহা চিন্তিত হইয়া) তাহলে কি হবে নরক ? কি করে আমি আমার কঙ্কণকে বাঁচাই—

নরক ॥ উপায় আপনার ঐ কঙ্কণের হাতেই—

কংস ॥ তাই তো। আচ্ছা ও ভেবে দেখুক। এস আমরা একটু ঘুরে আসি [নরকসহ অন্যদিকে প্রস্থান। প্রস্থানকালে নরক অঘাসুরকে গোপনে কি বলিয়া গেল। জল তদ্রূপ অবস্থাতেই রহিল।]

[সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। কঙ্কণের চোখের সম্মুখে সুশীতল অপর্য্যাপ্ত জল… অথচ সে তদ্দারা পিপাসা নিবারণ করিতে পারিতেছে না। জল দেখিয়া তাহার চোখে-মুখে এক অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিল। পিপাসা শান্তির আশায় তাহার জিব্ লক্ লক্ করিতে লাগিল। সে জিব্ বাহির করিয়া ধীরে ধীরে লৌহদণ্ডের মধ্য দিয়া মস্তক অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে যেই তাহার জিহ্বা যেই জলস্পর্শ করিতে যাইবে এমন সময় অঘাসুর আসিয়া পাত্রটি পা দিয়া আর একটু দূরে সরাইয়া দিল। কঙ্কণ অঘাসুরের দিকে একটিবার তাকাইল। তারপর পুনরায় সে অগ্রসর হইতে লাগিল। এবারও তাহার জিব যখন জলস্পর্শ করিতে গেল…তখন অঘাসুর পা দিয়া পাত্রটি উল্টাইয়া দিল। সমস্ত জল মাটিতে পড়িয়া গেল। কঙ্কণ দেখিল জলের আশা নির্মূল হয়, দেখিয়া সে মরিয়া হইয়া মাটিতে গড়ানো জলই যতটুকু পারে, জিহ্বা

দ্বারা চাটিয়া লইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অঘাসুর, ছুটিয়া আসিয়া সেই জল পা দিয়া লেপন করিয়া উহা কর্দমাক্ত করিয়া দিল।]

অঘাসুর ॥
বকাসুর ॥ } হাঃ হাঃ হাঃ
তৃণাবর্ত ॥

কঙ্কণ ॥ [তাহাদের দিকে অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ] বটে!

[এক প্রচণ্ড চেষ্টায় লৌহদণ্ড বাঁকাইয়া কারাকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহা দেখিয়া অঘাসুর, বকাসুর, তৃণাবর্ত এবং জলকলসবাহী রক্ষী সকলেই সন্ত্রস্ত হইল।]

অঘাসুর ॥ রক্ষী! রক্ষী!

বকাসুর ॥ অস্ত্র—অস্ত্র—

তৃণাবর্ত ॥ প্রহরী—সৈন্য—

[সকলে লোকজন ডাকিবার জন্য ছুটিল—। কঙ্কণ বাহির হইয়া আসিয়াই পলায়নরত··· সর্বপশ্চাৎ-অবস্থিত জলকলস-বাহী রক্ষীর হাত চাপিয়া ধরিল, এবং তাহার নিকট হইতে জলকলসটি ছিনাইয়া লইল। সে জলকলস রাখিয়াই অন্য সকলের সহিত পলায়ন করিল]

কঙ্কণ ॥ [সে জল-কলস কাড়িয়া লইয়াই নিঃশেষে সমস্ত জল পান করিবার জন্য কলস উঁচু করিয়া ধরিবা মাত্র কঙ্কার কথা তাহার মনে পড়িল।···] কঙ্কা! [কলস নামাইল! উহা হাতে লইয়া টলিতে টলিতে কঙ্কার প্রকোষ্ঠের দিকে গেল। প্রকোষ্ঠের লৌহদণ্ড ধরিল। ডাকিল]—কঙ্কা!

কঙ্কা ॥ প্রি—য়—ত—ম!

কঙ্কণ ॥ [কঙ্কা বাঁচিয়া আছে বুঝিবা মাত্র তাহার হৃদয়ে নব উৎসাহের সঞ্চার হইল। তাহার দেহে অপূর্ব বলসঞ্চার হইল। মাংসপেশীগুলি ফুলিয়া উঠিল—সে বিনা বাক্যব্যয়ে লৌহদণ্ড ভাঙ্গিবার প্রয়াস করিল। তাহার প্রয়াস সার্থক হইল। দ্বার ভঙ্গ হইল। জল-কলসটি হাতে তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া কঙ্কার সম্মুখে গিয়া]—কঙ্কা—কঙ্কা···জল!

[কঙ্কা দুই হাত বাড়াইয়া কঙ্কণের মুখখানি জড়াইয়া ধরিতে উঁচু হইতে লাগিল, হঠাৎ···পড়িয়া গেল, আর উঠিল না···চিরতরে এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল।]

কঙ্কণ ॥ কঙ্কা—[বুঝিল কঙ্কা মৃত।] নাই! ···নাই! [তাহার বুকের উপর পড়িতে গিয়াই] না—না আলিঙ্গন নয়···[বলিতে বলিতে কলস হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল] আজও আমরা দাস···আজও আমরা দাস···[—ঠিক এই সময় অঘাসুর ইত্যাদি দানবগনের সদলবলে প্রবেশ]

অঘাসুর ॥ ঐ যে জল খাচ্ছে—

কঙ্কণ ॥ জল? জল? [বাহিরে আসিয়া ভূতলে কলস নিক্ষেপ] জল!—

[সে দানবের দিকে অতি করুণভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। দানবেরা পিছাইয়া গেল। ···তাহারা পিছাইয়া গেল দেখিয়া, সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া···অন্য পার্শ্বের দানবদিগের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারাও পিছাইয়া গেল।]

কঙ্কণ ॥ [দানবের প্রতি] দয়া কর—দয়া কর···আমায় আজ শুধু একটি দয়া কর—

দানবগণ ॥ [বিস্মিত হইয়া] দয়া !

কঙ্কণ ॥ হ্যাঁ, দয়া।

[কংসের আবির্ভাব]

কংস ॥ দয়া।

কঙ্কণ ॥ হ্যাঁ, দয়া। ···আমি [কঙ্কাকে দেখাইয়া] ওর সঙ্গে যাব।··· তরবারির একটি আঘাত—না হয় বল্লমের একটি খোঁচা—না হয় একটা তীর··· একটা ইট···একখানা পাথর···আমায় মার···দয়া করে আমায় মার—[নতজানু হইল]

কংস ॥ নরক, কঙ্কণ হল আমার বিদূরথের পুত্র···। ওর কোন কামনা কি আমাদের অপূর্ণ রাখা উচিত ?

নরক ॥ না সম্রাট—

কংস ॥ তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক কঙ্কণ—[রক্ষীদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া প্রস্থান]

[ইঙ্গিত পাইয়া দানবগণ এক সঙ্গে সকল অস্ত্রদ্বারা কঙ্কণকে আঘাত করিল। কঙ্কণ ভূপতিত হইল।]

———

পঞ্চম অঙ্ক

॥ এক ॥

[নৃত্যশালা। কংস এবং নর্তকীগণ যে যেখানে ছিল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দ্বারে দ্বারে যবনী প্রহরিণীগণও নিদ্রিত। সুরার সরঞ্জাম, বাদ্যযন্ত্রাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা।

একটি মুক্ত বাতায়নের পাশে চন্দনা।...বাতায়নে ভর দিয়া বাহিরের দিকে মুখ রাখিয়া সেও বোধ করি ঘুমাইতেছিল।

দূর হইতে একটা কাতর আর্তনাদের শব্দ-ধারা ভাসিয়া আসিতে লাগিল। বহুদূরে যেন সহস্র লোক কাঁদিতেছে—! চন্দনা চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিল।

বাহিরে ঝড় উঠিল। মাঝে মাঝে দু একবার বিদ্যুৎও চমকাইল। বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল।]

চন্দনা ॥

—গান—

নিরন্ধ্র মেঘে মেঘে অন্ধ গগন।
অশান্ত ধারে জল ঝর ঝরে অবিরল
ধরণী ভীতি মগন ॥
ঝঞ্ঝার ঝল্লরী বাজে ঝনননন,
দীর্ঘশ্বসা কাঁদে অরণ্য শনশন,
প্রলয়-বিষাণ বাজে বজ্রে ঘনঘন,
মূর্চ্ছিত মহাকাল-চরণে মরণ ॥
শুধিবেনা কেহ কিগো এই পীড়নের ঋণ ?
দুঃখ-নিশির শেষে আসিবেনা শুভদিন ?
দুষ্কৃতি-বিনাশায় যুগ-যুগ-সম্ভব,
অধর্ম নিধনে এস অবতার নব,
'আবিরাবির্ম এধি' ঐ ওঠে রব—
জাগৃহি ভগবন্, জাগৃহি ভগবন্ ॥

চন্দনা ॥ [গানের শেষে প্রবল বৃষ্টি নামিয়া আসিল। গান শেষ হওয়া মাত্র ...ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল...এবং বজ্রপাত হইল...চন্দনা কি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল...গান ছাড়িয়া দিল—] ও কি? কে ও? এই দুর্যোগে...এই ঝড়-ঝঞ্ঝা বৃষ্টির মাঝে...ও কে যায়? ...কে তুমি পথিক...ঝড়-ঝঞ্ঝায় তুমি দৃক্‌পাত কর না...বজ্রকে তুমি তুচ্ছ করছ...অন্ধকারকে তুমি গ্রাহ্য কর না?

…ও কি? তোমার ক্রোড়ে কি ও? পথিক! পথিক! তোমার ক্রোড়ে কি আকাশের চাঁদ? চুরি করে পালাচ্ছ?…কে তুমি পথিক, কে তুমি? আকাশের চাঁদ তোমার ক্রোড়ে! …কে তুমি? [হঠাৎ চিনিতে পারিয়া]—বসুদেব! তুমি বসুদেব! তবে কি তোমার ক্রোড়ে…তোমার ক্রোড়ে—আমি দেখব! আমি দেখব!

[ছুটিয়া প্রস্থান।]

[মুহুর্মুহু বজ্রপাত। প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা। কংস হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বসিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—এক একটি বজ্র-পতন শব্দে চমকিয়া উঠিতে লাগিল। উঠিয়া দাঁড়াইল। পালাইয়া অন্যত্র যাইবে ভাবিয়া যেই এক এক দ্বারের সম্মুখে যায়, অমনি বাহিরে তাহাই যেন অতি কাছে এক একটি বজ্রপাত হয়। একে একে সকলেই জাগিয়া উঠে। কংস পালাইতে পথ পায় না। যাহারা জাগিয়া উঠিল তাহারাও ভয়ে নির্বাক হইয়া রহিল, তাহারা কংসের ঐ অবস্থা দেখিয়া আরো ভীত হইয়া পড়িল। সকলেই পলায়ন করিতে চায়, অনুমতির জন্য কংসের মুখের পানে চায়। ক্রমে মুহুর্মুহু বজ্রপাত হইতে লাগিল—অন্য সকলেও প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল—। কংস পলাইতে পারিতেছে না, এ যেন স্বয়ং প্রকৃতি মাতা প্রতি দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহার গতি রোধ করিয়া তাহাকে এই কক্ষে বন্দী করিয়া রাখিলেন। কংস ছুটিয়া গিয়া শয্যায় বসিল, এবং হাতের কাছে যাহা পাইল, তাহার জড়াইয়া ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রথমে প্রাণপণ চীৎকার করিয়াই একবার ডাকিল—"নরক—নরক" কিন্তু তাহার পরই ভয়ে যেন তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার ডাকগুলি ক্রমেই মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া শেষে আর শোনাই গেল না, যদিও দেখা যাইতে লাগিল যে কংস নরককে প্রাণপণেই ডাকিতেছে। প্রতি দ্বার দিয়া অঘাসুর, বকাসুর, তৃণাবর্ত প্রভৃতি দানব সেনানীর প্রবেশ। হাতে তাদের উন্মুক্ত রক্তাক্ত তরবারি, চোখে-মুখে ঘাতকের উল্লাস-দীপ্তি। তাহাদের সঙ্গে নরক]

কংস ॥ [তাহাদিগকে দেখিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল] ওঃ—

নরক ॥ [ছুটিয়া সম্মুখে গেল] সম্রাট—সম্রাট—

[কংস কাঁপিতে লাগিল]

নরক ॥ সম্রাট, আমি নরক…

কংস ॥ —না।

নরক ॥ সম্রাট, চেয়ে দেখুন আমি আপনার দাসানুদাস নরক—

কংস ॥ [স্থির হইল। একদৃষ্টে ক্ষণকাল তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিল] নরক?

নরক ॥ প্রভু, আমায় চিনতে পারছেন না?

কংস ॥ [চিনিতে পারিয়া] হ্যাঁ নরক। [নরকের মুখ হইতে দৃষ্টি অপসারণ না করিয়া, দানব সেনানীদের দিকে হাত বাড়াইয়া তৎপ্রতি নরকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, চুপি চুপি…] ওরা কারা?

দানব সেনানীগণ ॥ [সকলে একসঙ্গে কংসের কাছে আসিয়া নতজানু হইয়া] সম্রাটের দাসানুদাস—

নরক ॥ অঘাসুর…বকাসুর…তৃণাবর্ত প্রভৃতি আপনারই সেনানায়কগণ।

কংস ॥ ওরা কেন?

নরক ॥ সম্রাটকে সুসংবাদ দিতে এসেছে—

কংস ॥ [কাঁপিতে কাঁপিতে] আমি জানি—আমি জানি কি সে সংবাদ—

নরক ॥ কি সম্রাট ?

কংস ॥ [বলিতে কণ্ঠ রোধ হইয়া আসে] যে আজ—

নরক ॥ আজ কি ?

কংস ॥ [চারিদিকে সভয়ে চাহিয়া লইয়া]…অষ্টমী।

নরক ॥ হ্যাঁ, সম্রাট অষ্টমী।

কংস ॥ সে আজ জন্মেছে—!

নরক ॥ যদি জন্মেই থাকে—তাতে ভয় কি সম্রাট ?

কংস ॥ [কংস ভয় পাইয়াছে এ কথা অন্যের মুখে শোনা তাহার অভ্যাস নয়, শুনিলে বিশেষ বিরক্ত হয়। যথাসম্ভব শীঘ্র ভীতভাব কাটাইয়া উঠিয়া, বিরক্তি সহকারে।] নরক ! তোমার স্পর্ধা !

নরক ॥ —সম্রাট !

কংস ॥ তুমি বলতে চাও, আমি ভয় পেয়েছি ?

নরক ॥ কখনো মুহূর্তের তরেও তা কল্পনা করবারও স্পর্ধা রাখি নাই—

কংস ॥ আমি বিশ্ব-ত্রাস কংস। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করছি…সে কি জন্মেছে—?

নরক ॥ আমি তার উত্তর দিচ্ছি—সে মরেছে—

কংস ॥ [মহারাগান্বিত হইয়া] পরিহাস, নরক ?

নরক ॥ পরিহাস নয় সম্রাট। সম্রাটের আশঙ্কা, শত্রু জন্মগ্রহণ করবে, কারাগারে দেবকী জঠরে।

কংস ॥ তাই দৈববাণী নরক—

নরক ॥ ওটা ছলনা। দেবতারা ঐরূপ প্রকাশ করে আপনার দৃষ্টি বিপথে পরিচালিত করেছে! প্রকৃতপক্ষে শত্রু জন্মগ্রহণ করেছে, অন্যত্র, যেখানে ঐ দৈববাণীর কুহকে ভুলে সম্রাট আদৌ দৃষ্টি দেন নি !

কংস ॥ —নরক—নরক—

নরক ॥ হ্যাঁ সম্রাট, নইলে শত্রুর নাড়ী-নক্ষত্র প্রকাশ করতে দেবতাদের এ অস্বাভাবিক আগ্রহ কেন ? তারা ঐ দৈববাণী দ্বারা আপনাকে প্রতারিত করেছে—

কংস ॥ বটে ! বটে ! [দুই চোখে আগুন জ্বলিতে লাগিল]

নরক ॥ কিন্তু আমাদের প্রতারিত করতে পারেনি। তাই আজ রাজ্যের যত পুত্র সন্তান…নবজাত এবং সদ্যোজাত…সব—

দানবসেনানীগণ ॥ [মহোল্লাসে] আমরা বধ করে এসেছি—

কংস ॥ —সব ?

দানবসেনানীগণ ॥—সব। ছিন্ন-শিরের তপ্ত-রক্তে আমাদের অসি এখনো উত্তপ্ত—!

কংস ॥ [যেন এসব কথা তাহার কানেই গেল না—] কারাগারে—কারাগারে— ?

নরক ॥ সেখানেও গিয়েছি—

কংস ॥ [যেন মৃত্যুদণ্ডও শুনিতে পারে…এইরূপ আশঙ্কায়]…সেখানে কি ?

[কিন্তু তখনই তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল]

অঘাসুর ॥ আমাকে বলতে দিন সম্রাট। সেখানে আমরা গেলাম…উদ্যত অসি নিয়ে…এই আশা করে…যে…যদি শত্রু জন্মগ্রহণ করে থাকে, তাকে তার মাতৃক্রোড় হতে ছিনিয়ে সবলে আকর্ষণ করে নিয়ে শিলাতলে নিক্ষেপ করে তখনি বধ করব—

কংস ॥ [যেন তাহার চক্ষের উপর ইহা ঘটিতেছে,—মহাউল্লাসে] বধ করলে ?

অঘাসুর ॥ না সম্রাট—। গিয়ে দেখি শত্রু জন্মগ্রহণ করেনি—

কংস ॥ মূর্খ !…সে গর্ভের অন্তরালে বসে হাসছে !…সেখান থেকে তাকে—[গর্ভ বিদারণ করিয়া টানিয়া বাহির করিয়া ভ্রূণ হত্যার ইঙ্গিত—]

নরক ॥ কিন্তু সে তো দেবকী-নন্দন নয়—

কংস ॥ পরিহাস নরক, পরিহাস—?

নরক ॥ সে দেবকী-নন্দিনী—। আজই জন্মগ্রহণ করেছে—

কংস ॥ নন্দিনী ?

নরক ॥ হ্যাঁ সম্রাট—

কংস ॥ ভগিনী-নন্দিনী ?

নরক ॥ হ্যাঁ সম্রাট ; ভগিনী-নন্দন নয়।

কংস ॥ আ—[যেন বাঁচিয়া গেল—] আমার ভাগিনেয়ী ?

নরক ॥ হ্যাঁ সম্রাট—!

কংস ॥ [সহজভাবে] ভাগ্নী ! ভাগ্নী ! [কপটতায়] কত দুঃখ ছিল মনে নরক ; আমার সব আছে, রাজ্য আছে, ঐশ্বর্য্য আছে…দাসদাসী…হস্তী অশ্ব সব আছে, ছিল না শুধু একটি ভাগ্নী…আজ আমি সেই ভাগ্নী পেলাম ! আজ যে কি আনন্দ [সহসা] তার ওপর তো হাত তোলনি তোমরা ?

দানবসেনানীগণ ॥ না সম্রাট—

কংস ॥ আমায় রক্ষা করেছ ! [ঊর্ধে চাহিয়া] দৈববাণী ! দৈববাণী ! [অট্টহাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ

[ছুটিয়া চন্দনার প্রবেশ]

চন্দনা ॥ [কংস ঊর্ধে চাহিয়া অট্টহাস্য হাসিতেছিল চন্দনা তাহার সম্মুখে গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। যে মুহূর্তে কংসের অট্টহাস্য শেষ হইল, সেই মুহূর্তে চন্দনা কংসের মুখের দিকে তাকাইয়া] হাঃ হাঃ হাঃ [হাস্য।]

কংস ॥ [হাসির শব্দ শুনিয়া. নিম্নে তাকাইয়া দেখিল চন্দনা আবেগে তাহার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া একটি ঝাঁকি দিয়া কহিল] চন্দনা…আজ কি আনন্দ !

চন্দনা ॥ আনন্দে আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আমি মরি ! আজ আমি মরি !

কংস ॥ ছিঃ ! আজ আমার সেই দুঃস্বপ্ন ব্যর্থ ! আজ তবে তোমায় পাব চন্দনা ?

চন্দনা ॥ [চটুল দৃষ্টিতে] হ্যাঁ, আজ আমায় পাবে। কিন্তু, তোমার উৎসব কই ? জয়-বাদ্য কোথায় ? এত অন্ধকার কেন ?

কংস ॥ [বিশেষ ব্যাকুলতা হসকারে] সহস্র দীপ জ্বালো—লক্ষ দীপ জ্বালো—রংমশাল কই ? রংমশাল ?

চন্দনা ॥ কি হবে সহস্র দীপে। আজ সহস্র চাঁদ আমার চোখে লাগবে না··· লক্ষ সূর্য্যও না কেউ কি কখনো দেখেছ আকাশের বুক চিরে রূপ ঠিকরে বের হয়ে আসে ? আমি দেখেছি। কেউ কি দেখেছ রূপ দেখে আকাশ হল মাতাল, বাতাস হল পাগল ? আমি দেখেছি। কেউ কি দেখেছ রূপ দেখে বনের অজগর এল ছুটে···চরণপদ্মের পরশ নিল···ধন্য হয়ে ফণা ধরল···ফণা ধরে তার জয়যাত্রায় জয়-ছত্র হল ? আমি দেখে এলাম···আমি দেখে এলাম, রূপ নয়, রূপের আগুন··· কোটি কোটি পতঙ্গ সেই রূপের আগুনে ঝাঁপ দিতে ছুটেছে—আমিও আমিও—

[যবনী প্রহরিণীগণ রংমশাল জ্বালাইয়া আনিয়াছিল—তাহা হাতে লইয়া চন্দনার নৃত্য···

কংস ॥ চন্দনা—চন্দনা—! অপরূপ ! অপরূপ !

চন্দনা ॥ হা: হাঃ হাঃ—

কংস ॥ তুমি আমার—তুমি আমার—! কিন্তু, ও কি চন্দনা—ও কি চন্দনা—? এ যে আগুন !

চন্দনা ॥ হ্যাঁ ; আগুন···রূপের আগুন ! রূপের আগুনে আজ ঝাঁপ দিয়েছি··· আঃ ! [অগ্নি-গর্ভে ডুবিয়া গেল]

কংস ॥ চন্দনা—চন্দনা—

॥ দুই ॥

প্রান্তর

ধরিত্রীর গান

তিমির বিদারি অলক-বিহারী কৃষ্ণমুরারী আগত ওই
টুটিল আগল, নিখিল পাগল, সর্বসহা আজি সর্বজয়ী।
বহিছে উজান অশ্রু-যমুনায়
হৃদি-বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে আয়,
বসুধা-যশোদার স্নেহধার উথলায়
কাল-রাখাল নাচে থৈ তা থৈ ॥

বিশ্ব ভরি ওঠে স্তব—নমো নমঃ,
অরির পুরীমাঝে এল অরিন্দম।
ঘিরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরীজন,
অন্ধ-কারায় এল বন্ধ-বিমোচন।
ধরি অজানা পথ, আসিল অনাগত,
জাগিয়া ব্যথাহত ডাকে মাভৈঃ॥

[শেষ-রাত্রি। কারাকক্ষে নিদ্রিত বসুদেব ও দেবকী। দূরে কারা রক্ষীও নিদ্রিত। ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া চোরের মতো কংসের প্রবেশ। সঙ্গে কোন অনুচর নাই, অন্য কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলে সর্বদাই এই আশঙ্কায় সশঙ্ক।]

কংস ॥ [চাপা গলায়] বসুদেব—বসুদেব—

বসুদেব ॥ [জাগ্রত হইয়া] কে ?

কংস ॥ আমি—

বসুদেব ॥ কে তুমি !

কংস ॥ [চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নাম বলিতে সাহস পাইল না—] আমি আমি—

বসুদেব ॥ কংস !

কংস ॥ চুপ্—[চারিকিে চাহিয়া দেখিতে লাগিল কেহ শুনিয়াছে কিনা—]

বসুদেব ॥ একি কংস ? প্রাসাদের বিলাস ত্যাগ করে রাত্রি শেষে এই কারাগার-সম্মুখে সম্রাট একাকী তুমি—তস্করের মতো চারিদিকে তোমার সশঙ্ক দৃষ্টি—

কংস ॥ চুপ্—চুপ্—

বসুদেব ॥ আবার কি নতুন নির্য্যাতন-সঙ্কল্প তোমার ?

কংস ॥ দোহাই তোমার, দয়া কর...শোন—

বসুদেব ॥ দয়া করব তোমাকে আমি ! তোমার এই সশঙ্ক-সকরুণ অভিনয় দেখে মনে হচ্ছে আজ তোমার অত্যাচারের কঠোরতা চরমে উঠবে।

কংস ॥ [অস্থিরতার সঙ্গে] ভুল—ভুল বসুদেব।...আমি আজ—আমি আজ—

[বসুদেবের মুখের দিকে এরূপ ভাবে তাকাইল যে দেখিলে করুণার উদ্রেক হয়।]

বসুদেব ॥ হ্যাঁ, তুমি আজ...?

কংস ॥ আমি—আমি—দেবকীর [চারিদিকে চাহিয়া দেখার পর]...পায়ে লুটিয়ে পড়ব—

বসুদেব ॥ এ অতি উত্তম অভিনয় শয়তান—

কংস ॥ অভিনয় নয়—অভিনয় নয়। বিশ্বাস কর বসুদেব...আমি ঘুমুতেও পারি না। চোখ বুঁজলেই দেখি তোমার সাত-সাত পুত্রের ছিন্নশিরের উচ্ছ্বসিত রক্তধারা

আমার চোখে-মুখে সর্বাঙ্গে ছিটকে এসে পড়েছে—! তাও যদি সইতে পারি···কিন্তু কিছুতেই সইতে পারিনা···যখন চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে—আমার ঐ আদরিণী ভগিনীর···শোক-কাতরা বিষাদ-বিধুরা প্রতিমূর্তি। তাও যদি বা সইতে পারি··· কিছুতেই সইতে পারিনা—যখন দেখি ভগিনী আমার শুধু নীরবে চোখের জলই ফেলে···প্রতিশোধ নিতে চায় না, অভিশাপ দেয় না—!

বসুদেব ॥ আজ এসব কথা কেন কংস—?

কংস ॥ হ্যাঁ, আজ।···আজ আমি তাকে চাই। আজ আমি তাকে বলব··· ভুলে যাও দিদি—ভুলে যাও—শুধু আজ স্মরণ কর—আমি তোমার সেই কংস। যার মুহূর্তের অদর্শন তুমি সইতে পারতে না—[অধীর হইয়া] খোল দ্বার···দ্বার খোল বসুদেব—সেই ভাই আজ সেই বোনকে দেখতে এসেছে, দ্বার খোল—দ্বার খোল—

বসুদেব ॥ সে ঘুমিয়ে রয়েছে। কতকাল সে ঘুমায়নি—আজ সে ঘুমিয়েছে···

কংস ॥ তাকে ডাকো—তাকে ডাকো—

বসুদেব ॥ দেবতা তার চোখে হাত বুলিয়ে ঘুম এনে দিয়েছেন। সে ঘুম ভাঙাবার সাধ্য আমার নেই—

কংস ॥ [চাপা গলায়] দেবকী···দেবকী···ভগিনী···

বসুদেব ॥ বৃথা চেষ্টা—বৃথা চেষ্টা—

কংস ॥ তুমি দ্বার খোল—দ্বার খোল

বসুদেব ॥ ঐ নিদ্রিত কারারক্ষীকে ডেকে তোল—

কংস ॥ [আতঙ্কে] না—না—ওরা দেখবে—

বসুদেব ॥ তুমি সম্রাট, চোর নও। দেখলে ক্ষতি কি ?

কংস ॥ সে হবে আমার মৃত্যু। অনুশোচনায়, মর্ম-বেদনায় কংস কাতর···এ যদি আমার কোন ভৃত্য চোখে দেখে—তখনি—তখনি হবে আমার মৃত্যু ! আমি নিজেই দ্বার খুলবো—[খুলিবার চেষ্টা, ব্যর্থ হইয়া] একি ! [পুনরায় চেষ্টা, তাহাতেও ব্যর্থ হইয়া] আমি ভাঙ্‌ব—আমি পাহাড় চূর্ণ করেছি···আমি—আমি— [ব্যর্থ চেষ্টা—] একি ! একি ! আমারই হাতে গড়া কারাগারে আমি প্রবেশ করতে পারবো না !

বসুদেব ॥ বুঝে দেখ কংস—এই পাষাণ-কারার লৌহ-দ্বার—তুমি একে যতদূর পেরেছো কঠোর করেছ, আজ বুজে দেখ—!

কংস ॥ [পুনরায় চেষ্টা করিতেছিল···কিন্তু এবারও ব্যর্থ হইল—] আমি পারছি না—কেন পারছি না—[দেবকীর স্বর শোনা গেল।]

দেবকী ॥ তুমি পারবে না—

কংস ॥ [মরিয়া হইয়া চেষ্টা করিতে করিতে] আমি পারব—পারব—

[দেবকীর প্রবেশ—বুকে তাহার যোগমায়া]

দেবকী ॥ [কারা-দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে] তুমি পারবেনা।

কারাগারে আজ দেশের যত ধর্মাত্মা, যত পুণ্যাত্মা, যত মহাত্মা—কারাগারে আজ ভগবান স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেছেন—কারাগার আজ পুণ্য-তীর্থ! কারগার আজ স্বর্গ! তাই জগতের এই মহাতীর্থে ভগবানের এই স্বর্গে পাতকী তুমি···তোমার প্রবেশ নিষেধ; শয়তান তুমি বৃথা মাথা খুঁড়ে মরছ!···কিন্তু, কেনই বা এই চেষ্টা···, আমাকে চাও? আমি নিজেই বাহিরে আসছি ঐ লৌহ-দ্বার আর আমার পথ-রোধ করতে পারবে না···আমি আজ···আমি আজ—তাঁর জননী যিনি দুষ্কৃতের দমনের জন্য, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে-যুগে জন্ম গ্রহণ করে থাকেন—, আমার তপস্যায় এ যুগেও আমারই গর্ভে আজ জন্মগ্রহণ করেছেন—

[বলিতে বলিতে বাহিরে আসিলেন, লৌহ-দ্বার সরিয়া গিয়া তাহার পথ করিয়া দিল। কংস অভিভূতের মতো ধীরে ধীরে পশ্চাদপদ হইল।]

কংস॥ [দেবকীর ক্রোড়স্থ সন্তান দেখিয়া] তবে—সে—ঐ

দেবকী॥ [সাতঙ্কে] ও আমার নয়—আমার নয়—

বসুদেব॥ সাবধান কংস, ঐ সন্তান নন্দের-নন্দিনী বিশ্বের যোগমায়া—

কংস॥ সন্তানের প্রাণ রক্ষার জন্য সানন্দে মিথ্যাভাষণ করছ···কিন্তু আমি ভুলব না, আমি কংস

[রুখিয়া গিয়া দেবকীর ক্রোড় হইতে যোগমায়াকে তুলিয়া লইয়া ভূতলে সজোরে নিক্ষেপ—অমনি ঊর্দ্ধে অষ্টভূজা মহামায়া মূর্তির আবির্ভাব।]

মহামায়া॥ "তোমারে বধিবে যে
গোকুলে বাড়িছে সে।"

কংস॥ [কাঁপিতে কাঁপিতে] একি! একি!

দৈববাণী॥ ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদা বতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যারি সংক্ষয়ম্॥

বসুদেব॥ শোন কংস, শোন। আজ সফল হল আমাদের পুজা, সার্থক হল আমাদের তপস্যা—

কংস॥ হাঃ হাঃ হাঃ—কেন?

বসুদেব॥ আজ ভগবান স্বয়ং স্বর্গ থেকে ধরাতলে নেমে এসেছেন—

কংস॥ আসেনি। আর যদি এসেই থাকে, তোমরা তাকে আনতে পারনি, এনেছি···আমি।

বসুবেব॥ তুমি?

কংস॥ হ্যাঁ, আমি, এই দুবৃত্ত···এই নারকী! কত যুগ-যুগ ধরেই তো কত কোটি-কোটি লোক কত পূজা করেছে···কত তপস্যা করেছে···তাতে স্বর্গের আসন একতিলও টলেনি। চোখ বুঁজে পড়ে থেকে সে শুধু পুজাই নিয়েছে···আমি তার এই স্পর্ধা সইতে পারিনা···আমি তাই অত্যাচারে অত্যাচারে তাকে জর্জরিত করে স্বর্গ থেকে আমার এই মর্তেই টেনে এনেছি···কেন জান?

বসুদেব॥ তোমারই মুক্তির জন্য।

কংস ॥ চুপ—চুপ—। না—না—আমি—আমি তাকে দেখব···শুধু একটিবার দেখব···

বসুদেব ॥ হ্যাঁ,..দেখবে।···দেখবে তিনি শুধু আমাদের মুক্তির জন্য আসেননি ॥ ···হে দুবৃত্ত···হে নারকী, তিনি এসেছেন···আমাদের মুক্ত করতে, সেই সঙ্গে তোমাকেও !

॥ যবনিকা ॥

॥ উৎসর্গ পত্র ॥

পরম পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী

শ্রীযুক্তা সরোজিনী রায়

শ্রীচরণ কমলেষু ।

সেবকাধম সন্তান

মন্মথ রায়

"বরদাভবন" (বালুরঘাট)

১৯ ডিসেম্বর ১৯৩০

প্রথম সংস্করণে
লেখকের কথা

নটসূর্য্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিরা তাঁহাদের জন্য একখানি নাটক লিখিয়া দিতে গত জুলাই মাসে আমাকে অনুরোধ করেন। তদনুযায়ী গত ১২ই আগষ্ট আমি "কারাগার" রচনায় ব্রতী হই, এবং ২৫শে আগস্ট মধ্যে উহার প্রাথমিক গঠন শেষ করিয়া পাণ্ডুলিপি শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর হস্তে সমর্পণ করি। নানাকারণে মিনার্ভা থিয়েটারে উহার অভিনয় সম্ভব হয় না। কিন্তু তথাপি এই নাটক প্রাণয়নে শ্রীযুক্ত চৌধুরীর নিকট হইতে যে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছি তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিব।

গত ১৭ই নভেম্বর মনোমোহন থিয়েটারের সর্বাধ্যক্ষ অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ আমার "কারাগার" মনোমোহন থিয়েটারে অবিলম্বে অভিনয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন এবং তাহার যথাযথ ব্যবস্থাও করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধদার এই সস্নেহ আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিবার শক্তি আমার ছিল না, এবং তাঁহার আগ্রহে ২৫শে নভেম্বর হইতে ১৩ই ডিসেম্বর মধ্যে আমি "কারাগার"কে বর্তমান রূপে সজ্জিত করি। শ্রীযুক্ত প্রবোধদার ঐকান্তিক সহানুভূতি, সম্মোহন স্নেহ, কলানিপুণ ইঙ্গিত এবং প্রাজ্ঞ উপদেশ পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল বলিয়াই এত অল্প সময়ের মধ্যে আমার "কারাগার" আজ অভিনয়োপযোগী হইতে পারিয়াছে। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া গঙ্গাপূজা করিবার ইচ্ছা নাই।

গান রচনায় আমি অক্ষম। কিন্তু, আমার এই অক্ষমতা সার্থক হইয়াছে সেই এক পুণ্যপ্রভাতে যেদিন সারা-বাঙলার কবি-দুলাল কাজী নজরুল ইসলাম আমার হাত দু'খানি পরম স্নেহে ধরিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি আপনার নাটকের জন্য আমাকে দিয়া গান লেখাইয়া না লইলে আমার অভিমানের কারণ হইবে।" যে আন্তরিক স্নেহে তিনি আমার "মহুয়ার" কণ্ঠে গান দিয়াছিলেন, এবারও আমার "কারাগারে"র জন্য তেমনি আন্তরিক স্নেহে তিনি গান রচনা করিয়াছেন। রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পূর্ব মুহূর্তেও তিনি "কারাগারে"র জন্য শুধু গান রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরমোল্লাসে উহাতে স্বয়ং সুরযোজনা করিয়াছেন। আমার আরো সৌভাগ্য, বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার দরদী-কবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ও আমার প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহে এবং মমতায় "কারাগারে"র জন্য কয়েকটি গান রচনা করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ মহা সৌভাগ্যে, আজ আমার শুধু এই প্রার্থনাই মনে জাগিতেছে, জন্মে জন্মে যেন গীত রচনার এই অক্ষমতা নিয়াই জন্মগ্রহণ করি, এবং জন্মে জন্মে যেন সে অক্ষমতা এমনিভাবেই সার্থক হয়।

ধরিত্রীর গানগুলি শ্রীযুক্ত নজরুল ইসলাম রচনা করিয়াছেন, এবং বাকী গানগুলি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচনা। গানগুলিতে সুর যোজনাও তাঁহারাই করিয়াছেন।

মুগ্ধ চিত্তে আর একজনের কথা স্মরণ করি, তিনি বাঙলার নাট্যজগতের কলালক্ষ্মী কল্পা শ্রীযুক্তা নীহারবালা। মাতার মমতায়, ভগিনীর স্নেহে আমার এই নাটক রচনায় তিনি আমাকে উৎসাহিত ও সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন। নাটকের নৃত্যপরিকল্পনা তাঁহার, এবং সে পরিকল্পনা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই আমার হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেন, আমি বিশ্বাস করি।

এই নাটক রচনায় আরো অনেকের নিকট হইতেই সাহায্য পাইয়াছি, সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে শিশু-সাহিত্যিক শিল্পী কবি আত্মীয়-প্রতিম শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী, সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত, সুপণ্ডিত ডাঃ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ রায়, এম-বি, এবং ভোটরঙ্গ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক মহাশয়গণের নাম উল্লেখ না করিলে আমি তৃপ্ত হইতে পারি না।

নাটকের প্রযোজনা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া সর্বাগ্রে শ্রীযুক্ত প্রবোধদার প্রশস্তি উচ্চারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইব, কারণ এ বিষয়ে তাঁহার দক্ষতার পরিচয় দিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়। সাজসজ্জা এবং রূপ-পরিকল্পনা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াই তৃপ্ত হইব, তাঁহাদের সম্যক পরিচয় দিবার শক্তি আমার নাই। তাঁহারা শ্রীযুক্ত চারু রায় এবং শ্রীযুক্ত যামিনী রায়। ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদের স্নেহের ঋণ শোধ করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই।

আজ আবার তাঁহার কথাই বারে বারে স্মরণ হইতেছে, যাঁহাকে এই নাটক দেখাইতে পারিলে ধন্য হইতাম, তৃপ্ত হইতাম, সার্থক হইতাম, তিনি আমার স্বর্গগত পিতৃদেব। শুধু এই প্রশ্নটিই বারে বারে মনে হয় দেবতার কি চোখ নাই? তিনি এই মরুভূমির পানে একটিবারও তাকান না?

"বরদা-ভবন" বালুরঘাট।
১৯শে ডিসেম্বর ১৯৩০

মন্মথ রায়

দ্বিতীয় সংস্করণে

লেখকের কথা

"কারাগার" মহাসমারোহে সগৌরবে মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হইতেছিল। গত ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার তথায় অষ্টাদশ অভিনয়ের পর, বাঙলা সরকারের নিষেধাজ্ঞা ক্রমে "কারাগারে"র পুনরভিনয় রহিত হয়। কলারসিকগণ তজ্জন্য বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন, সংবাদপত্রে তজ্জন্য বিশেষ প্রতিবাদ হইয়াছিল, অভিনয় যে শুধু অভিনয়ই নয়, বাঙলার নাড়ীর সঙ্গে তাহারও যোগ রহিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট বোঝা গিয়াছিল। বজ্রাঘাতের ঐ বিদ্যুৎটুকুই আমার এই ভাগ্য-বিপর্যয়ে পরম-সম্পদ মনে হইয়াছিল।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য্য ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কারাগারের পুনরভিনয় ব্যবস্থাকল্পে বঙ্গীয় আইন সভায় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন।

অধুনালুপ্ত মনোমোহন থিয়েটারের সর্বাধিকারী, বর্তমান নাট্য-নিকেতনের সত্বাধিকারী অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ বিশেষ চেষ্টা করিয়া নাট্যনিকেতনে "কারাগার" নাটকের পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নাট্যনিকেতনে নবপর্যায়ে গত ৮ই আগস্ট কারাগারের প্রথম অভিনয়োৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয়ের এই কৃতিত্ব বাঙলার নাট্য-ইতিহাসে স্মরণীয় হইবে সন্দেহ নাই।

যাঁহারা "কারাগারে"র পুনরভিনয় ব্যবস্থাকল্পে আন্দোলন অথবা আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন আজ সর্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া নিবেদন করিতেছি, তাঁহাদের কাজ এখনো শেষ হয় নাই।

"বরদা-ভবন" বালুরঘাট, দিনাজপুর।
২০শে আগস্ট, ১৯৩১

মন্মথ রায়

The Government of Bengal

POLITICAL DEPARTMENT
POLITICAL BRANCH
NO, 1695 P.

Order

Calcutta the 4th February, 1931

Whereas it appears to the Governoı in-Council that the play entitled "Karagar" by Manmatha Ray, M. A., printed by him at the Sree-Gouranga Press at No. 71/1, Mirzapur Street, Calcutta, and published at Barada-Bhaban, Balurghat (Dinajpur), which has been performed at the Monomohan Theatre, Calcutta, is likely to excite feelings of disaffection towards the Government established by law in British India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Dramatic performances Act, 1876, (XII of 1876), the Governor-in-Council hereby prohibits the performance of the said play in any public place.

By order of the Governor-in-Council,
Sd. / R. N. Reid.
offg. Chief Secretary to
The Government of Bengal,

An extract from

ADVANCE

March 6th, 1931, DaK,

Bengal Council

3rd March. 1931

"Karagar show prohibited

While admitting that the Bengali drama, "Karagar," or prison, which was staged for some days at the Monomohan Theatre, was a mythological one the Hon Mr. W. D. R. Prentice told Dr. N. C. Sen Gupta that the Government had prohibited the further performance of the play on the advice of their legal advisers, as it was likely to excite feelings of disaffection towoards the Government.

The Home Member added that ostensibly the play did not relate to present-day politics but actually its bearing on present-day politics was beyond doubt.

কারাগার

নাট্যশিল্পিগণ

প্রথম-রজনী—মনোমোহন থিয়েটার ২৪শে ডিসেম্বর বুধবার ১৯৩০

পুনরভিনয়—নাট্য-নিকেতন ৮ই আগস্ট ১৯৩১

অধ্যক্ষ—	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
পুনরভিনয়ে	" নির্মলেন্দু লাহিড়ী
কথা ও সুর	" হেমেন্দ্রকুমার রায়
	" নজরুল ইসলাম
রূপকার	" চারু রায়
	" অখিল নিয়োগী
নৃত্য-শিল্পী	" ব্রজবল্লভ পাল
	শ্রীমতী নীহারবালা
স্মারক	শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি সান্যাল

	শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য
রঙ্গ-পীঠাধ্যক্ষ	" নারায়ণচন্দ্র তা
আলোকশিল্পী	" বিভূতিভূষণ রায়
হারমোনিয়াম বাদক	চারুচন্দ্র সুর
সঙ্গত	" বনবিহারী পান
সজ্জাকর	" নৃপেন্দ্রনাথ রায়
	" বিভূতিভূষণ দে

প্রথম-রজনীর অভিনেতৃগণ

উগ্রসেন—	শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়
পুনরভিনয়ে—	" ললিত মিত্র
কংস—	" নির্মলেন্দু লাহিড়ী
নরক—	" মণীন্দ্রনাথ ঘোষ
বিদূরথ—	" সন্তোষকুমার দাস
কঙ্কণ—	" ভুমেন্ রায় (এ্যামেচার)
পুনরভিনয়ে—	" বঙ্কিম দত্ত
বসুদেব—	" সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
পুনরভিনয়ে—	" মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
কীর্তিমান—	শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী
পুনরভিনয়ে—	" মতিবালা
রঞ্জন···	' মতিবালা
পুনরভিনয়ে—	" সাগরবালা
যাদবগণ—	শ্রীযুক্ত পশুপতি সামন্ত, লক্ষ্মীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, কালী গুপ্ত, ননীলাল বন্দোপাধ্যায়, কালীচরণ গোস্বামী ইত্যাদি
পূজার্থীগণ—	শ্রীযুক্ত নিরাপদ শীল, সুশীল মুখার্জি, হারাধন ধাড়া, চুনীলাল মুখার্জি
দেবকী—	শ্রীমতী সুশীলাবালা
পুনরভিনয়ে—	" নিভাননী
কঙ্কা—	" সরযুবালা
পুনরভিনয়ে—	" নিরুপমা
চন্দনা—	" নীহারবালা
অঞ্জনা—	" হরিমতী (ব্ল্যাকী)
পুনরভিনয়ে—	" নীরদা সুন্দরী
যোগমায়া—	" রাধারাণী

মদিরা—	শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)
ধরিত্রী—	” রাজলক্ষ্মী
পুনরভিনয়ে—	” নীহারবালা
নর্তকীগণ—	” আশালতা, নিরুপমা, অন্নদাময়ী, গিরিবালা, কমলা, রাধারাণী, নির্মলা, সরসীবালা, স্নেহলতা, উমাসুন্দরী, আঙ্গুরবালা, কচি, নন্দরাণী ইত্যাদি—

———

সাবিত্রী

লেখকের কথা

"নাট্যনিকেতন"-অধিকারী অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ তাঁহার "নাট্যনিকেতনে" অভিনয়ার্থে সাত দিনের মধ্যে "সাবিত্রী" নাটক রচনা করিয়া দিবার জন্য আমাকে পত্র লিখিলে, সাবিত্রীর উপাখ্যানে নাটকত্বের প্রাচুর্য্য নাই মনে করিয়া আমি প্রথমতঃ অস্বীকৃত হই। শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু আমাকে কলিকাতায় আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করেন, এবং আমি কলিকাতায় আসিলে, নানা আলোচনার পর স্থির হয়, সাবিত্রী উপাখ্যানকে সু-সমঞ্জস কল্পনায় পল্লবিত করিয়া আমিই নাটক লিখিব। তদনুযায়ী গত ৪ঠা বৈশাখ হইতে ৭ই বৈশাখ, এবং ২৬শে বৈশাখ হইতে হইতে ৫ই জ্যৈষ্ঠ, এই চৌদ্দ দিনে, আমার নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া, "সাবিত্রী"র রচনা কার্য সমাপ্ত হয়। গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, "নাট্যনিকেতনে" মহাসমারোহে "সাবিত্রীর" প্রথম অভিনয় হয়।

"সাবিত্রীর" যাহা কিছু সাফল্য, তাহার কৃতিত্ব শ্রীযুক্ত প্রবোধদাদারই প্রাপ্য একথা বলিলে শুধু বিনয় প্রকাশ করা হইবে না, সত্যকথাই বলা হইবে, কারণ, এ নাটক লিখিতে আমি প্রথমে অস্বীকৃতই হইয়াছিলাম, তিনিই আমাকে এ নাটক লিখিতে সম্মত করিয়াছেন, এবং তাঁহার উৎসাহে উপদেশেই আমার মানস কন্যাটি "সাবিত্রী"মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পাদ-প্রদীপের সম্মুখে সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

"সাবিত্রী"র পরিকল্পনা করিতে গিয়া আমি আর একজনকে আমার কাছে বসাইয়া রাখিয়া বিনিদ্র-রজনী যাপনে বাধ্য করিয়াছি, তিনি শিশু-সাহিত্যিক রূপদক্ষ কবি শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী। মুগ্ধচিত্তে আজ তাঁহার সাহায্যের কথা স্মরণ করি।

"সাবিত্রী"র পরম সম্পদ হইয়াছে তাহার গান। লিখিতে গর্বে এবং গৌরবে আমার বুক ভরিয়া ওঠে যে সমস্ত গান গুলির কথা এবং সুরই গীত-সুন্দর সুর-যাদুকর বাংলার কবি-দুলাল কাজী নজরুল ইসলামের সস্নেহদান। ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার এই আন্তরিক স্নেহের অবমাননা করিতে চাহি না।

"সাবিত্রী" প্রণয়ন কালে আমি আমার ছোটমামা, সাহিত্য-রসিক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত বি-এস-সি, ছোটমামী শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেবী, এবং আরো অনেকের নিকট বহুবিধ সাহায্য পাইয়াছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে এ স্থলেও স্নেহ-ভালোবাসার অমর্য্যাদাই হইবে।

সাবিত্রী উপাখ্যানের মূল ভাব-ধারাটি আমি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই আমার কল্পনাকে পল্লবিত করিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস। এরূপ পরিকল্পনায় নাট্যকারের অধিকার আছে কিনা তাহা রসজ্ঞ সমালোচকগণ বিবেচনা করিবেন। মহাভারতে যম এবং সাবিত্রীর কথোপকথন অতি প্রসিদ্ধ, আমি তাহা যতদূর সম্ভব গ্রহণ করিয়াছি।

আজও আবার আমার ৺পিতৃদেবের অভাবটিই বড় বেশী বেদনা দিতেছে। মৃত্যুজিতা আমার এই মানসকন্যাটি তাঁহার ঠাকুরদাদার জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করিল না কেন!

বরদাভবন বালুরঘাট (দিনাজপুর)
১লা আষাঢ়, ১৩৩৮

মন্মথ রায়

যে আমার কোন নাটকই দেখিয়া যায় নাই,

আমার নাটক লেখার কল্পনাতেই যে

আনন্দিতা হইয়া গিয়াছে, সেই

অনিন্দিতা…সাবিত্রী-কল্পা

সহোদরা…

৺অমিয়বালা গুপ্তার

পুণ্যস্মৃতিতে আমার "সাবিত্রী"কে

উৎসর্গ করিলাম।

মন্মথ রায়

সাবিত্রী

প্রথম অভিনয় রজনীর
পাত্র পাত্রীগণ

"নাট্যনিকেতন"

অধ্যক্ষ	...	শ্রীনির্মলেন্দু লাহিড়ী
সুরশিল্পী	...	কবি নজরুল ইসলাম
সহকারী সুরশিল্পী	...	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
বংশীবাদক	...	শ্রীতিনকড়ি দাস
হারমোনিয়ম বাদক	...	শ্রীচারুচন্দ্র শীল
সঙ্গতী	...	শ্রীবনবিহারী পান
স্মারক	...	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য
আলোক-শিল্পী	...	শ্রীবিভূতিভূষণ রায় শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়
মঞ্চকারু	...	শ্রীনারায়ণচন্দ্র তা
সজ্জাকর		শ্রীবিভূতিভূষণ দে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় শ্রীরাখালচন্দ্র দাস

পরিচয়

যমরাজ		শ্রীসন্তোষকুমার দাস
নারদ		শ্রীজয়মঙ্গল শর্মা
অশ্বপতি	মদ্ররাজ	শ্রীনির্মলেন্দু লাহিড়ী
বিজয়কেতু	ঐ সামন্ত	
দ্যুমৎসেন	শাল্বরাজ (রাজ্যচ্যুত)	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
সত্যবান	ঐ পুত্র	শ্রীকামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়
কৌশিক	ঐ পুরোহিত	শ্রীপশুপতি সামন্ত

অশ্বপতির মন্ত্রী, দ্যুমৎসেনের মন্ত্রী ইত্যাদি

মন্ত্রী		শ্রীবনবিহারী পান
বিক্রমদেব		শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায়
মালবী	অশ্বপতির স্ত্রী	শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী
শৈব্যা	দ্যুমৎসেনের স্ত্রী	শ্রীমতী নিভাননী
সাবিত্রী	সত্যবানের স্ত্রী	শ্রীমতী নীহারবালা
শাশ্বতী	আশ্রম বালিকা	শ্রীমতী নিরুপমা
অদৃষ্ট-সঙ্গিনী		শ্রীমতী গিরিবালা

আশ্রম বালিকাগণ, সখীগণ, তাপস রমণীগণ ইত্যাদি—শ্রীমতী শেফালিকা, অন্নদাময়ী, আঙ্গুরবালা, পটলমণি, প্রফুল্লবালা, কমলাবালা, উমাশশী, গিরিবালা, ননীবালা, মতিবালা, আভাবতী, রাধারাণী, সরসীবালা ইত্যাদি—

সাবিত্রী

প্রথম প্রকাশ, ১লা আষাঢ়, ১৩৩৮

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মদ্ররাজ প্রাসাদ।...রাজকন্যা সাবিত্রী সখীগণসহ তাঁহার প্রিয় রাজহংস মীনকেতনকে লইয়া খেলা করিতেছিলেন।]

নৃত্যগীত

মৃদুল মন্দে মঞ্জুল ছন্দে
মরাল মদালস নাচে আনন্দে।
তরঙ্গ হিন্দোলে শতদল দোলে,
(শিশু) অরুণে জাগায় অমা যামিনীর কোলে,
শুষ্ক কানন ভ'রে বকুল গন্ধে ॥
নন্দন উপহার ধরণীর করে,
শুভ্র পাখায় শুভ আশীষ ঝরে।
মিলন বসন্তের দূত আগমনী,
কণ্ঠে সুমঙ্গল শঙ্খের ধ্বনি,
কুহু কেকা গাহে মধুর ছন্দে ॥

[সহসা রাজা অশ্বপতির প্রবেশ]

অশ্বপতি ॥ সাবিত্রী—

[তৎক্ষণাৎ সকল উৎসব বন্ধ হইল। সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন—সখীগণ প্রস্থান করিলেন। "মীনকেতন" লইয়া শুধু একজন সখী রহিল।]

সাবিত্রী ॥ [পিতার কাছে আসিয়া] বাবা!

অশ্বপতি ॥ [দ্বারস্থ যবনী প্রহরিণীদের প্রতি] সাবধানে দ্বার রক্ষা কর। আমার বিনা অনুমতিতে এখানে অন্যের প্রবেশ নিষেধ।

[প্রহরিণীগণ কর্তব্যরতা হইল...]

[অন্যতমা প্রহরিণীকে]—সামন্ত বিজয়কেতু—[প্রহরিণী তাহাকে ডাকিতে গেল]

সাবিত্রী ॥ ব্যাপার কি বাবা?

অশ্বপতি ॥ আমার মৃত্যু!...আমার মৃত্যু!...যে মৃত্যুকে এতকাল সাবধানে সযত্নে পরিহার করে চলেছিলাম...আজ সে এসেছে!—দ্বারদেশে আমি তার করাঘাত শুনে এসেছি...ঐ—ঐ—

[ভয়ার্তের মতো দ্বারের দিকে তাকাইলেন। বিজয়কেতুর প্রবেশ]

বিজয়কেতু! সে কি এখনো দ্বারদেশেই?—

বিজয়কেতু ॥ [কে বুঝিতে না পারিয়া]...কে প্রভু?

অশ্বপতি ॥ সে—। সে এখন কোথায় বিজয়কেতু?

[বিজয়কেতু বুঝিতে না পারিয়া নিরুত্তরই রহিলেন]

অশ্বপতি ॥ কাম্যক বনবাসী সেই ব্রাহ্মণ—

বিজয়কেতু ॥ তিনি পরিচয় দিচ্ছেন রাজ্যচ্যুত দ্যুমৎসেনের পুরোহিত—

অশ্বপতি ॥ আমি তার পরিচয় জানবার জন্য আকুল নই বিজয়কেতু। আমি শুনতে ব্যাকুল, তিনি এখন কোথায়…এবং কি করছেন—

বিজয়কেতু ॥ তিনি অতিথিশালায়—

অশ্বপতি ॥ রাজোচিত সম্মানে সেই ব্রাহ্মণের পরিচর্যা কর—

বিজয়কেতু ॥ তাঁর পরিচর্যা করছেন স্বয়ং রাণী-মা—

অশ্বপতি ॥ [বিরক্তিব্যঞ্জক চীৎকারে] রাণী ! কেন ?

বিজয়কেতু ॥ আপনার দর্শন লাভ করতে না পেরে তিনি অবশেষে রাণীমার শরণাপন্ন হন। রাণী-মা তাঁর কাহিনী শ্রবণ করে—

অশ্বপতি ॥ এ কি অন্যায় রাণীর !

সাবিত্রী ॥ কি অন্যায় বাবা ?

অশ্বপতি ॥ অজ্ঞাত কুলশীল এক অতিথি, তাঁর কাহিনী শ্রবণ করা। যাক… শোন।…আমি সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন দেবো। কিন্তু তার বিলম্ব আছে।…বিজয়কেতু, মন্ত্রীকে আমি প্রাসাদের পৃষ্ঠ-দ্বারে রথ নিয়ে প্রস্তুত থাকতে আদেশ দিয়েছি। তুমি দেখ…সে আদেশ প্রতিপালিত হয়েছে কি না।

বিজয়কেতু ॥ যথা আজ্ঞা প্রভু—

অশ্বপতি ॥ এখনো না হয়ে থাকলে সে আদেশ এখনই যাতে প্রতিপালিত হয় মন্ত্রীকে বল। এবং…

বিজয়কেতু ॥ [প্রস্থান করিতে গিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া] এবং—?

অশ্বপতি ॥ সেই ব্রাহ্মণকে আমি দর্শন দান করব …কিন্তু এখন নয়, সে দর্শন খুব বিলম্বে হয় এই আমার ইচ্ছা—

বিজয়কেতু ॥ ভৃত্যের নিকট প্রভুর ইচ্ছাই আদেশ।

[অভিবাদনান্তে প্রস্থান]

সাবিত্রী ॥ [পিতার কাছে গিয়া সাদরে] বাবা—

অশ্বপতি ॥ মা—

সাবিত্রী ॥ তুমি কি কোনো ভয় পেয়েছ বাবা ?

অশ্বপতি ॥ [এই সহানুভূতিতে বিচলিত হইয়া] মা !

সাবিত্রী ॥ তোমারও ভয় ?

অশ্বপতি ॥ [ভয়ার্তভাবে] হ্যাঁ মা, ভয়—নিদারুণ ভয়। জীবনে মাত্র একটি ভয় ছিল। আজ সেই ভয়…মৃত্যুরও অধিক ভয় মা, মৃত্যুরও অধিক ভয়—

সাবিত্রী ॥ সে কি কথা বাবা ?

অশ্বপতি ॥ সে ভয় হতে আমায় রক্ষা করতে পারে মাত্র একজন—কিন্তু, সে কি—[সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন]

সাবিত্রী ॥ কে সে ?

অশ্বপতি ॥ আমার চক্ষের মণি—আমার বক্ষের ধন—আমার জীবন—আমার প্রাণ—

সাবিত্রী ॥ আমি ?

অশ্বপতি ॥ তুমি। আমায় রক্ষা কর মা, আমায় রক্ষা কর—

সাবিত্রী ॥ আমায় কি করতে হবে তুমি আমায় শুধু সেই কথাটি বল—

অশ্বপতি ॥ বলতে পারি…বলব, যদি তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে আমার কথাটি রাখ—

সাবিত্রী ॥ আমি রাখবো না তোমার কথা ? বাবা, কি করে তুমি তা ভাবতে পার ?…

অশ্বপতি ॥ যদি তোমার মাতা তোমায় বাধা দেন ?

সাবিত্রী ॥ সে বাধা মানব না। তোমায় তো কোনদিনই উতলা দেখিনি বাবা ; কোনদিন তোমার এমন কাতর করুণ ভাবও দেখিনি। এ যে আমি সইতে পারছিনা ! বল বাবা, বল আমায় কি করতে হবে ?

অশ্বপতি ॥ বলি…যদি কোন প্রশ্ন না করে—যদি বিনা বাক্যব্যয়ে—

সাবিত্রী ॥ বল—বল—

অশ্বপতি ॥ এখনি…এই মুহূর্তে—এই রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে তোমাকে বিদেশ যাত্রা করতে হবে—

সাবিত্রী ॥ বাবা—

অশ্বপতি ॥ কথা নয় মা।

সাবিত্রী ॥ [দ্বারদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মাকে খুঁজিলেন। না পাইয়া পিতার প্রতি] মা—

অশ্বপতি ॥ না—

সাবিত্রী ॥ [সাশ্রুনেত্রে পিতাকে প্রণাম করিয়া উঠিলেন] আমায় কি নির্বাসন-দণ্ড দিলে বাবা ?

অশ্বপতি ॥ তার পূর্বে যেন আমার মৃত্যু হয় মা। নির্বাসন নয়, নির্বাসন নয়। তোমায় মা দিলাম পরম এক সম্পদ…পরম এক অধিকার…স্বাধিকার ! স্বাধিকার !

সাবিত্রী ॥ স্বাধিকার !

অশ্বপতি ॥ হ্যাঁ, স্বাধিকার। প্রাসাদের পৃষ্ঠদ্বারে মন্ত্রী রথ নিয়ে তোমার প্রতীক্ষা করছেন। তুমি রথারোহণে তীর্থযাত্রা কর—পথে মন্ত্রী তোমায় বলবেন—কি সে অধিকার—কি সে স্বাধিকার !

সাবিত্রী ॥ [পুনরায় পিতাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া] বাবা—! মাকে আমার প্রণাম দিয়ো—[কয়েক পা অগ্রসর হইয়া] আমার ঐ মীনকেতন—ওকে—

[অশ্বপতি স্বয়ং সাবিত্রীর প্রিয় রাজহংস মীনকেতনকে লইয়া গিয়া সাবিত্রীর বুকে তুলিয়া দিলেন। সাশ্রুনেত্রে সাবিত্রী প্রস্থান করিলেন।]

অশ্বপতি ॥ [গম্যমানা সাবিত্রীর দিকে অগ্রসর হইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে] কেঁদে তুমি মা আজ গেলে, কিন্তু হেসে তুমি মা আসবে, এই আশায় মা এই আশায়…[বাক্য অসমাপ্ত রাখিয়াই] যখন তুমি তা বুঝবে, ওরে অভিমানিনী মা, আমার ওপর সেদিন তোর এতটুকু অভিমান থাকবে না, আমি দিব্য চক্ষে দেখছি !

[বিপরীত দিক হইতে যবনী প্রহরিণী প্রবেশ করিল]

প্রহরিণী ॥ রাণী-মা।

অশ্বপতি ॥ রাণী—?

প্রহরিণী ॥ রাণী-মা—

অশ্বপতি ॥ কোথায় ?

প্রহরিণী ॥ দ্বারদেশে—

অশ্বপতি ॥ কেন ?

প্রহরিণী ॥ প্রবেশের অনুমতি—

[যবনী প্রহরিণীর প্রস্থান]

অশ্বপতি ॥ [অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু তখনি আত্মস্থ হইয়া তাহাকে স্বয়ং অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে গেলেন] এস রাণী—

[রাণী মালবীর প্রবেশ]

মালবী ॥ উত্তম এ অপমান। হোক অপমান। তবু, অবিচলিতচিত্তেই, আজ তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব…তার সহজ, সরল, সত্য উত্তর পেলে আমার এ অপমানও সার্থক হবে—

অশ্বপতি ॥ আজ ঘোরতর দুর্দিন। অবিচলিতচিত্তে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা, আজ, বিশেষ এখন, আমার আছে কিনা জানিনা। তবু প্রশ্নকর্ত্রী— যখন তুমি, তখন…তোমার সম্মান রাখতে হবে বই কি রাণী !

মালবী ॥ মিথ্যে সম্মান আমি চাই না রাজা ! চাই না, আমি চাই সহজ, সরল, সত্য উত্তর—

অশ্বপতি ॥ কি তোমার প্রশ্ন ?

মালবী ॥ আমি যদি আজ বলি সাবিত্রীর বিবাহ আজও হয়নি, কন্যা যে আমার অরক্ষণীয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার জন্য আর কেউ দায়ী নয়, দায়ী একমাত্র তুমি, —মিথ্যা ?

অশ্বপতি ॥ রাণী—

মালবী ॥ উত্তর দাও রাজা—

অশ্বপতি। দায়ী আমি ? হাঃ হাঃ হাঃ, রাণী তুমি কি দেখনি দেশ-বিদেশের রাজপুত্ররা সাবিত্রীর অলৌকিক রূপগুণের কাহিনী শুনে তার পাণি-গ্রহণার্থে দেশ-দেশান্তর থেকে উন্মত্তবৎ ছুটে এসেছে—কিন্তু তারা তার চোখ দু'টির পানে চেয়েই তাকে প্রণাম করেছে রাণী—প্রণাম করেছে। যাবার বেলায় বলে গেছে--তুমি বিবাহের বধূ নহ—বিবাহের বধূ নহ—তুমি দেবী, পূজার দেবী। মিথ্যা ?

মালবী ॥ সত্য। কিন্তু, দেশ-বিদেশের রাজপুত্রদের মধ্যে পাত্রান্বেষণের কোন প্রয়োজনই ছিলনা রাজা! পাত্র তুমি সাবিত্রীর জন্মের পূর্বেই, এমন কি…তোমার সঙ্গে আমার বিবাহেরও পূর্বে…

অশ্বপতি ॥ [মৃত্যুদণ্ড উচ্চারিত হইতেছে বুঝিলে লোক যেমন তাহাতে বাধা দেয়] শোন—শোন—

মালবী ॥ আমি শুনেই যে এলাম—

অশ্বপতি ॥ কি শুনে এলে ?

মালবী ॥ তোমার সঙ্গে আমার বিবাহেরও পূর্বে কন্যার পাত্র…স্থির করে রেখেছিলে—

অশ্বপতি ॥ সে হয়তো বাল্যের কোনো খেলা—কোনো খেয়াল!—যেমন বালক বালিকারা পুতুল নিয়ে খেলা করে। বলে তোর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব।…বিয়ে হয়। বাদ্য-বাজে। শুক পাখী হয় বরযাত্র—আর সারী পাখী হয় কন্যা-যাত্রী—!

মালবী ॥ প্রবঞ্চনা—এ তোমার প্রবঞ্চনা! কিন্তু এ প্রবঞ্চনায় ধর্ম ভুলবে না, জগৎ ভুলবে না। তুমি তখন শিশু নও…কিশোরও নও…তুমি তখন যুবরাজ। তোমার সেই জাগ্রত-যৌবনে…তুমি এবং তোমার আশৈশব বন্ধু…তোমার প্রিয়তম সতীর্থ দ্যুমৎসেন ধর্মসাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও—

অশ্বপতি ॥ কে বলল ? কে বলল ?

মালবী ॥ তুমি বল…হওনি ?

অশ্বপতি ॥ [সামলাইয়া লইয়া] কি প্রতিজ্ঞা ?

মালবী ॥ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লে…উভয়ের পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করলে একের পুত্রের সঙ্গে অপরের কন্যার বিবাহ দিয়ে সেই বাল্য-বন্ধুত্বকে অক্ষয় করবে—। মিথ্যা এ কথা ?

অশ্বপতি ॥ [বিশেষ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন, শেষে বলিলেন] —আমার কথা আমি পরে বলব…তোমার কথা আগে শেষ হোক—

মালবী ॥ তিনি ছিলেন শাল্বদেশের রাজপুত্র। তিনি বিবাহ করলেন, তুমিও। কালক্রমে তাঁর হ'ল পুত্র…তোমার হ'ল কন্যা…। কিন্তু রাজা তারপর ?

অশ্বপতি ॥ রাণী, তবে দয়া করে স্মরণ কর সাবিত্রীকে। মনে কর সেই দুর্ভাগ্য-জীবন। রাজ্য ছিল, ঐশ্বর্য ছিল, সবই ছিল, অথচ মনে হ'ত কিছুই নাই, সব বৃথা—সব ব্যর্থ…শুধু এই জন্য যে আমরা ছিলাম নিঃসন্তান। মনে করে দেখ তোমার বুকের স্নেহ, আমার মনের মমতা। কিসের অভাবে অনুক্ষণ হাহাকার করত— তারপর…তারপর…স্মরণ কর আমার কল্যাণকামী ঋষিবর্গের মুখে সেই দেবতার সেই প্রত্যাদেশ। সেই প্রত্যাদেশ অনুযায়ী, সাবিত্রী-দেবীর প্রীত্যর্থে, আমার সেই সুকঠিন সুদীর্ঘ তপস্যা। যে তপস্যার ফলে দেবীর বরে পুত্রাদপি গরীয়সী আমাদের এই সাবিত্রী লাভ। সে তো মানবী নয়, সে দেবী, তার উপযুক্ত বর মানব নহে দেবতা। দেবতাই

বা বলি কেন,—রাণী, রাণী—আমার সাবিত্রী যদি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী হয় তবুও আমার মন ওঠে না…কে ?

[যবনী প্রহরিণীর প্রবেশ]

যবনীপ্রহরিণী ॥ সামন্ত বিজয়কেতু—

অশ্বপতি ॥ [নেপথ্যে চাহিয়া]—কি বিজয়কেতু ?

বিজয়কেতু ॥ [নেপথ্য হইতে] ব্রাহ্মণ আপনার দর্শনলাভের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

অশ্বপতি ॥ উত্তম, তিনি এখানেই আসুন বিজয়কেতু।…রাণী, রাণী, তুমি তার মা। তুমিই বল, সে যদি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী হয়, তবু কি তোমার তৃপ্তি হয় ?

মালবী ॥ এ প্রশ্ন আজ উঠতেই পারে না রাজা, যখন মহামতি দ্যুমৎসেনের নিকট তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—

অশ্বপতি ॥ বটে ! কোথায় সেই দ্যুমৎসেন ? সে কি এখনো জীবিত ?

[দ্যুমৎসেন-পুরোহিত কৌশিকের প্রবেশ]

কৌশিক ॥ জীবিত।

অশ্বপতি ॥ কে আপনি ?

কৌশিক ॥ আমি তার পুরোহিত—

অশ্বপতি ॥ যে রাজ্যচ্যুত…যে বনবাসী…যে ভিক্ষাজীবী…তার পুরোহিত।

কৌশিক ॥ যজমানের হিত-সাধনই পৌরোহিত্য। রাজপুরীতেই পৌরোহিত্য সীমাবদ্ধ নয়। যজমান যত দুস্থ যত বিপন্ন হয়…পুরোহিতের কর্তব্য ততই বিস্তৃতি লাভ করে।

অশ্বপতি ॥ দ্যুমৎসেনের হিতসাধনই যদি আপনার পৌরোহিত্য হয়, তবে তার পুরোহিত আর কেউ, আপনি নন—

কৌশিক ॥ আপনার কথার অর্থ বোধ হ'ল না—

অশ্বপতি ॥ দ্যুমৎসেন জ্ঞাতিশত্রু কর্তৃক সিংহাসন চ্যুত হয়ে অবশেষে অন্ধও হন। সেই অবস্থাতেই স্ত্রীপুত্র সহ—তিনি বনে আত্ম-গোপন করে কোনরূপে প্রাণরক্ষা করেন। তাঁর সেই অজ্ঞাত-বাসের সন্ধান লাভের জন্য এখনো তার শত্রুগণের অসীম অধ্যবসায় লক্ষ্য করেছি…আপনি দেখছি তাঁর সেই অজ্ঞাতবাসকে লোক সমক্ষে সুপ্রকাশ করবার জন্যই ব্যস্ত—

কৌশিক ॥ মহারাজ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তিনি এখন আর অজ্ঞাতবাসে নন। কাম্যক বনের তপস্বিগণ তাঁকে আশ্রয় দেওয়াতে তিনি এক্ষণে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

অশ্বপতি ॥ [চিন্তিত হইয়া] বটে ! বেশ। তা কি উদ্দেশ্যে আপনার শুভাগমন ?

কৌশিক ॥ আপনার প্রতিজ্ঞানুযায়ী দ্যুমৎসেন-নন্দন শ্রীমান সত্যবানের হস্তে

আপনার নন্দিনী শ্রীমতী সাবিত্রীকে সম্প্রদান করুন, দ্যুমৎসেনের এই শুভ প্রস্তাব নিয়ে আমি আপনার দ্বারে—সমুপস্থিত—

অশ্বপতি ।। তৎপূর্বে আমার কয়েকটি কথা প্রণিধান করুন। আমার কন্যা এখন ষোড়শী, অরক্ষণীয়া যুবতী। সত্যবান হস্তে তাকে সম্প্রদান করা যদি আমার কর্তব্যই বিবেচিত হয়, তবে সে কর্তব্য পালন করবার দিন আজ নয়—

কৌশিক ।। কেন ?

অশ্বপতি ।। না আজ নয়। সে কর্তব্য পালিত হওয়া উচিত ছিল আট বৎসর পূর্বে—যখন সাবিত্রী অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করেছিল। তাতে কর্তব্য পালনও হত, গৌরীদানের পুণ্য অর্জনও হত।

কৌশিক ।। কিন্তু আট বৎসর পূর্বে মহারাজ দ্যুমৎসেন জ্ঞাতি শত্রু কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়ে,—শুধু তাই নয়, অন্ধ হয়ে স্ত্রীপুত্র সহ বনে অজ্ঞাতবাস করতে যান··· সকলের জীবনই ছিল তখন বিপন্ন। বিবাহের উৎসব তখন অসম্ভব ছিল।

অশ্বপতি ।। কিন্তু তখনই, এক তখনই ছিল কন্যার উপর আমার সর্ব অধিকার। তার তখন হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। মনও তখন তার জাগ্রত হয়নি। আমি তখন তার অভিভাবক ছিলাম···সত্য রক্ষার জন্য তাকে বলি দেওয়াও আমার অধিকার ছিল। কিন্তু আজ—

কৌশিক ।। আজ ?

অশ্বপতি ।। আজ আমার সে অধিকার নাই। আজ সে অজ্ঞান নয়, হিতাহিত জ্ঞান তার সম্যক বিকশিত। মন তার পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত। পতি-নির্বাচন এখন তার স্বধর্ম,—বিবাহ এখন তার স্বাধিকার।

কৌশিক ।। আজ এ এক নতুন কথা শুনছি রাজা—

অশ্বপতি ।। নতুন কথা নয়। এ পুরাণের অতি পুরাতন কথা। ষোড়শীর স্বয়ম্বরা হবার প্রথা অতীব প্রাচীন···সনাতন ধর্মেরই একটি কল্যাণকর বিধান।

কৌশিক ।। কিন্তু কন্যাকে স্বয়ম্বরা হবার অনুমতিই কি আপনি দিয়েছেন ?

অশ্বপতি ।। দিয়েছি—দিয়েছি—অবশ্য দিয়েছি—নিশ্চয় দিয়েছি—

মালবী ।। মহারাজ !

অশ্বপতি ।। [তৎপ্রতি কর্ণপাত না করিয়া আপনার আবেগে] তীর্থে তীর্থে সে তার মনোমত পতি অন্বেষণ করছে। এতে যদি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তেও যেতে হয় সে যাবে···মন্ত্রীকে সেই আদেশ দিয়ে তার সঙ্গে পাঠিয়েছি। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি দেশ হতে দেশান্তরে সাবিত্রীর পুষ্পকরথ চলেছে··· বিশ্বময়-বিঘোষিত হচ্ছে স্বয়ম্বরা সাবিত্রী ! স্বয়ম্বরা সাবিত্রী !

মালবী ।। মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা—

অশ্বপতি ।। সত্য কিম্বা মিথ্যা, কন্যার মাতা অনুসন্ধান করুন।

মালবী ।। উত্তম। সাবিত্রীই এসে তোমার মুখের উপর বলুক···এ মিথ্যা কত বড় মিথ্যা—

[সাবিত্রীকে আনিতে প্রস্থান]

অশ্বপতি ॥ হাঃ হাঃ হাঃ !

কৌশিক ॥ এ কি ! আপনি তবে সত্যবানের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত নন ?

অশ্বপতি ॥ পতি অন্বেষণরত রাজকন্যা যদি কোনদিন বনে প্রবেশ করেন এবং তখন যদি রাজ্যচ্যুত বনবাসী সেই ভিক্ষুক-পুত্রের কাতর-ক্রন্দনে কর্ণপাত করে তাকেই পতিত্বে বরণ করবার মতো সুবিবেচনা তার হয়, সত্যবানের সঙ্গেই হবে তার বিবাহ !

কৌশিক ॥ ভিক্ষুক ! ভিক্ষুক পুত্র ! হে রাজা, তোমার এত অহঙ্কার ! অন্ধ অসহায় বন্ধুকে, ভিক্ষুক বলে উপহাস করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ হ'লনা ? শোনো রাজা,—আমি কারো কোন প্রার্থনা নিয়ে—তোমার কাছে আসিনি, এসেছিলাম, তোমাকে তোমার বিস্মৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিতে। কিন্তু দেখছি তুমি ইচ্ছা করে সত্যভঙ্গ করেছ। ইচ্ছা করেই তোমার রাজ্যচ্যুত গৃহহীন-অন্ধ-বন্ধুর সন্ধান নাওনি, কারণ তুমি তোমার আদরিণী কন্যাকে রাজ্যহীন, গৃহহীন, দরিদ্রের গৃহিণী-রূপে দেখতে ঘৃণা বোধ কর—[প্রস্থান]

অশ্বপতি ॥ ভগবান জানেন ! ভগবান জানেন ! আমি শুধু এই জানি আমার সাবিত্রী যদি ইন্দ্রের ইন্দ্রানী হয়, তবু আমার মন উঠবেনা—

[মালবীর প্রবেশ]

হ্যাঁ রাণী, তাই ভাবলাম বরং ও স্বয়ম্বরা হোক। তাতে অন্ততঃ এইটুকু সান্তনা আমার থাকবে যে ওর বর আমার মনের মত না হলেও ওর মনের মত হয়েছে—

মালবী ॥ এ তোমার আত্ম প্রবঞ্চনা, শুধু আপনাকে প্রবঞ্চনা নয়, সত্যকে প্রবঞ্চনা, সাবিত্রীকেও প্রবঞ্চনা। এই প্রবঞ্চনায় মহা অকল্যাণ। তোমার পায়ে পড়ি নাথ, এ প্রবঞ্চনা পরিহার কর··· সত্যকে আশ্রয় কর···অবিলম্বে ঘোষণা কর সাবিত্রী স্বয়ম্বরা নয়, সাবিত্রী—বাগ্‌দত্তা—

অশ্বপতি ॥ ঘোষণা ? ঘোষণা আমিই করছি। সাবিত্রী···রাজ্যহীন, গৃহহীন কোন ভিক্ষুকের বধূ হবার জন্য স্বর্গ থেকে নেমে আসেনি···সে এসেছে···

[বামে কাহার অট্টহাস্য শোনা গেল। অশ্বপতি ছুটিয়া সেই দিকে গেলেন। দক্ষিণে অট্টহাস্য।—সেইদিকে ছুটিলেন—সম্মুখে ঊর্ধ্বে অট্টহাস্য—ছুটিয়া তথায় আসিয়া]

ও কি ? ও কার অট্টহাস্য—? কার অট্টহাস্য ?

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কাম্যকবন—রাজা দ্যুমৎসেনের আশ্রমের পুরোভাগ। আশ্রম বালিকাগণ বন হইতে ফল-মূল, লতা পুষ্প প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।]

গীত

প্রণমি তোমায় বন-দেবতা।
শাখে শাখে শুনি তব ফুল বারতা—দেবতা ।।
তোমার ময়ূর তোমার হরিণ
লীলা সাথী রয় নিশিদিন
বিলায় ছায়া বাণী বিহীন তরু ও লতা—দেবতা ।।

[নাচিয়া গাহিয়া তারা চলিয়া গেল। সত্যবানের প্রবেশ—মাথায় কাঠের বোঝা।]

সত্যবান ।। মা !

শৈব্যা ।। [কুটীরের বাহিরে আসিয়া] বাবা।

সত্যবান ।। নাও, আর হোমের ভাবনা নেই—সব যজ্ঞকাষ্ঠ।

[বোঝা নামাইয়া রাখিলেন]

শৈব্যা ।। [সত্যবানকে কাছে বসাইয়া অঞ্চলাগ্রে ব্যজন করিতে করিতে] তোর কপালে এও ছিল !

সত্যবান ।। ছিল বলেইতো তোমার নিজহাতের শুশ্রূষা পেলাম মা। নইলে আজ যদি রাজপুত্র থাকতাম, তবে এতক্ষণ হাজার দাসী এসে আমার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলত !

শৈব্যা ।। তবু তুই হাসিমুখে এই দুঃখ, এই কষ্ট, বনবাসের এত বেদনা সহ্য করছিস। কিন্তু তিনি তো তা পারছেন না। জ্ঞাতি শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতা তাঁকে মর্মাহত করেছে। এক সময় প্রতিশোধ নেবার জন্য উন্মত্ত হন কিন্তু তখনি—তখনি হাহাকার করে ওঠেন "আমি অন্ধ—আমি অন্ধ"।

সত্যবান ।। সবই সইতে পারি মা—সবই সইতে পারি, শুধু সইতে পারিনা যে পিতা অন্ধ—

শৈব্যা ।। চোখ দু'টি হারিয়ে সর্বদাই শুধু এই মনে করেন পৃথিবী বুঝি বদলে গেছে, মানুষ বুঝি আরো নিষ্ঠুর হয়েছে, সবাই না জানি আমাদের ওপর আরও কত অত্যাচার কত উৎপীড়ন করছে, সর্বদাই আতঙ্ক···জ্ঞাতি শত্রুরা বুঝি এখানেও আসছে উৎপীড়ন করতে। সর্বদা তোকে চোখে চোখে রাখতে পারলে হয়ত নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন, এক মুহূর্ত শান্তিতে থাকতে পারছেন না, কিন্তু চোখ দুটি হারিয়ে তা পারেননা বলেই আশা করছেন তোকে বিয়ে দিয়ে—

সত্যবান ।। বিবাহের কথা থাক মা—আজ কৌশিকদেব এখনও যজ্ঞে বসছেন না কেন ? তিনি কোথায় ?

শৈব্যা ॥ তোমার পিতার অনুরোধে তিনি মদ্ররাজ পুরীতে গিয়েছেন—এখনো ফিরে এলেন না কেন তাই ভাবছি—

সত্যবান ॥ মদ্ররাজ পুরীতে? কেন?

শৈব্যা ॥ তুমি তো জানো বাবা তোমার পিতা ও মদ্ররাজ উভয়ে অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। উভয়ের প্রতিজ্ঞা ছিল—

সত্যবান ॥ জানি মা জানি। সবই জানি। কিন্তু তবু পিতা কেন—

শৈব্যা ॥ দুর্নিবার লোভ,—তারও আমারও। যখনই সেই মদ্ররাজদুহিতার রূপগুণের কাহিনী শুনি—তখনই ভাবি সে দেবী আমার ঘরে আসবে কবে!

সত্যবান ॥ প্রাসাদের দেবী আসবে তোমার কুটীরে মা?

শৈব্যা ॥ ভাঙ্গা ঘরে কি চাঁদের আলো আসে না বাবা?

সত্যবান ॥ মা, তবু এ তোমাদের দুরাশা।

শৈব্যা ॥ দুরাশা নিশ্চয়। কিন্তু উভয় বন্ধুর প্রতিজ্ঞাবাণী যে এই দুরাশাকে সঞ্জীবিত রেখেছে বাবা।

সত্যবান ॥ কিন্তু তা বলে দৈনন্দিন যজ্ঞ বন্ধ রেখে—

শৈব্যা বন্ধ কেন থাকবে বাবা—কৌশিকদেব অবিলম্বেই ফিরে আসবেন।

সত্যবান ॥ পিতা কোথায়?

শৈব্যা ॥ তিনি শাশ্বতীর হাত ধরে পথে দাঁড়িয়ে—

সত্যবান ॥ কেন?

শৈব্যা ॥ ঐ কৌশিকদেবেরই অপেক্ষায়।

সত্যবান ॥ তুমি মা যজ্ঞায়োজন কর—কৌশিকদেব এসেই যেন যজ্ঞে বসতে পারেন—আমি বেদগানের আয়োজন করছি। [প্রস্থান]

[শৈব্যা কুটিরাভ্যন্তরে কাষ্ঠের বোঝা লইয়া গমন করিলেন]

[নেপথ্যে বেদগান]

জবা কুসুম সঙ্কাশ ওই—
উদার অরুণোদয়
অপগত তমোভয় জয় হে জ্যোতির্ময় ॥
জননীর সম স্নেহ সজল
নীল গাঢ় গগন তল
সুপেয় বারি প্রসূন ফল
তব দান অক্ষয়
অপহৃত সংশয় জয় হে জ্যোতির্ময় ॥

[অপর দিক হইতে শাশ্বতীর হাত ধরিয়া দ্যুমৎসেনের প্রবেশ]

দ্যুমৎসেন ॥ শৈব্যা—

শৈব্যা ॥ প্রভু—

দ্যুমৎসেন ॥ কৌশিকদেব কি অন্যপথে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছেন ?

শৈব্যা ॥ না প্রভু—

দ্যুমৎসেন ॥ তবে যে শাশ্বতী বলল তিনি এসেছেন ?

শাশ্বতী ॥ না এলে, বেদগান কেন ?

শৈব্যা ॥ না, তিনি আসেন নি। তিনি এলে যজ্ঞ হবে—তারই আয়োজনে এ বেদগান।

দ্যুমৎসেন ॥ তিনি এখনো ফিরে আসেননি কেন ? শৈব্যা ! তবে হয়তো—তবে হয়তো—

শৈব্যা ॥ কি প্রভু—

দ্যুমৎসেন ॥ বন্ধু আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে। যদি না করতো তবে সে শুধু একটি কথাই বলতো "না"। কৌশিকদেব কোন কালে ফিরে আসতেন ! কিন্তু বিলম্ব যখন হচ্ছে, তখন হয়তো—নিশ্চয়—নিশ্চয়—[মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল]।

শৈব্যা ॥ কি প্রভু !

দ্যুমৎসেন ॥ সে বিবাহের আয়োজন করছে। নইলে…নইলে এত বিলম্ব কেন ?

শৈব্যা ॥ তাই হোক প্রভু—তাই হোক।

দ্যুমৎসেন ॥ তাই হোক ভগবান, তাই হোক। কিন্তু ভগবান, আমি এ আনন্দ —এ উৎসব চোখে দেখতে পাবোনা। জীবনের এই পরমদিনে—পরম মুহূর্তে আমি অন্ধ !

শৈব্যা ॥ এই যে কৌশিকদেব আসছেন।

দ্যুমৎসেন ॥ এসেছেন ? এসেছেন ? আমার বন্ধুও তবে এসেছেন ! [অগ্রসর হইলেন]

[কৌশিকদেবের প্রবেশ]

কৌশিক ॥ কে আপনার বন্ধু রাজা ?

দ্যুমৎসেন ॥ কেন অশ্বপতি।…কৈ সে…সে কি আসেনি ?

কৌশিক ॥ কে আসবে রাজা ! তিনি বন্ধু ছিলেন, যখন আপনার রাজ্য ছিল—ঐশ্বর্য্য ছিল—সম্পদ ছিল—অথবা তার পূর্বেও ছিলেন, যখন আপনারা রাজপুত্র ছিলেন।

দ্যুমৎসেন ॥ আর আজ ?

কৌশিক ॥ আজ আপনি রাজ্যচ্যুত গৃহহীন বনবাসী ভিক্ষুক। আর তিনি, রাজাধিরাজ মহারাজ। বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। এখন কি করে আপনাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বিদ্যমান থাকতে পারে ?

দ্যুমৎসেন ॥ তবে সে আর আমার বন্ধু নয় ?

কৌশিক ॥ না।

দ্যুমৎসেন ॥ এ কথা কে বলে ?

কৌশিক ॥ তিনিই বলেন—আমি তারই কথার পুনরাবৃত্তি করছি।

দ্যুমৎসেন ॥ হুঁ। [ক্ষণকাল স্তব্ধতা] আজ বন্ধু নয়। কিন্তু যৌবনের সে. প্রতিজ্ঞা—?

কৌশিক ॥ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন আপনি—

দ্যুমৎসেন ॥ আমি !

কৌশিক ॥ হ্যাঁ আপনি। যখন তাঁর কন্যা শিশু ছিল, তখন কন্যার বিবাহে তাঁর হাত ছিল—তখন আপনি আপনার পুত্রের সঙ্গে তাঁর সেই শিশুকন্যার বিবাহ প্রস্তাব করলে তিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু তখন আপনি রাজ্যচ্যুত হয়ে অদৃশ্য হলেন—অতএব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন আপনি !

দ্যুমৎসেন ॥ জ্ঞাতি শত্রুর ষড়যন্ত্রে তখন যে আমাদের জীবনই বিপন্ন। স্ত্রী পুত্রের হাতধরে তখন এই অন্ধ—গহন-বনের অন্ধকারে অজ্ঞাতবাসে, জলাভাবে,. খাদ্যাভাবে মুমূর্ষু ! তারপর তপোবনে আশ্রয় পেয়ে আজ আমরা নিরাপদ। আজ আমরা নিরাপদ। আজ আর আমাদের অজ্ঞাতবাস নয়, আজ ?

কৌশিক ॥ আজও আপনি রাজ্যহীন গৃহহীন ভিক্ষুক। আপনার পুত্র ভিক্ষুকপুত্র। তিনি আমায় স্পষ্ট বললেন, তাঁর কন্যা এখন প্রাপ্ত-যৌবনা ষোড়শী—স্বয়ম্বরা হবার অনুমতি লাভ করে সম্প্রতি তিনি পতি-নির্বাচন মানসে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রাজকন্যা যদি রাজ্যচ্যুত বনবাসী ভিক্ষুকপুত্রের সকাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত ক'রে তাকেই পতি বলে নির্বাচন করে—করুক।

দ্যুমৎসেন ॥ ওঃ লাঞ্ছনার চরম ! শত্রুর শত্রুতা সহ্য করা যায়, কিন্তু মিত্রের শত্রুতা···ওঃ অসহ্য—অসহ্য— ! ভিক্ষুক ! আমি ভিক্ষুক ! তুমি কি তবে এই মনে করেছ যে আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছিলাম ! হে ঐশ্বর্য্য মদমত্ত রাজা—

শৈব্যা ॥ ক্ষান্ত হ'ন প্রভু—আপনার বন্ধুকে অধর্ম থেকে রক্ষা করবার জন্য—তাঁর প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে—আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি। আজ তিনি রাজা,. আপনি বনচারী তপস্বী। তাঁর রাজ্য আছে—ঐশ্বর্য্য আছে—সাবিত্রী সদৃশা কন্যা সাবিত্রী আছে ! আমরা তো তাঁর কৃপাভিখারী নই। তিনি যদি তাঁর কন্যার গর্ব করতে পারেন—আমরাও পারি—গর্ব করতে আমাদের পুত্রের !

দ্যুমৎসেন ॥ সত্য বলেছ শৈব্যা !—অশ্বপতি ! অশ্বপতি ! তোমারও যদি আছে. সাবিত্রী—আমারও আছে সত্যবান।

[অলক্ষে সত্যবান এই কথোপকথন শুনিতেছিলেন—তিনি ছুটিয়া আসিলেন]

সত্যবান ॥ এবং তোমার আশীর্বাদে পিতা, তোমার এই অপমানের উপযুক্ত. প্রতিশোধ, সত্যবান নেবে।

[পুত্র পিতার পদধূলি লইলেন, পিতা পুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন]

———

তৃতীয় দৃশ্য

নগরোপকণ্ঠ

মন্ত্রী ও সাবিত্রী

মন্ত্রী ॥ এদেশের নাম শাল্বদেশ। রাজা ছিলেন দ্যুমৎসেন...

সাবিত্রী ॥ আমি জানি। শুনেছি—তিনি পিতার প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন, প্রাসাদে তাঁর প্রদত্ত বহু উপহার আছে, তাও আমি দেখেছি—

মন্ত্রী ॥ ও উপহারের যে ইতিহাস আছে, তা জানো মা ?

সাবিত্রী ॥ তাও জানি। মহারাজ দ্যুমৎসেনের পুত্র হয়! বাবাকে তিনি ঐ উপহার প্রেরণ করে সেই শুভ-সন্দেশ জ্ঞাপন করেন।

মন্ত্রী ॥ জানো দেখছি। কিন্তু...আচ্ছা...বল দেখি—দ্যুমৎসেনের পুত্রের নাম কি ?

সাবিত্রী ॥ সত্যবান! তাও শুনেছি! ভারী মিষ্টি নাম না ? সত্যবান!

মন্ত্রী ॥ ও তো গেল একটি নাম। আর একটি ?

সাবিত্রী ॥ আর একটি নামও আছে নাকি ?

মন্ত্রী ॥ আছে।

সাবিত্রী ॥ কিন্তু সত্যবান,...এর চেয়ে মিষ্টি নাম...হতেই পারে না। আর একটি নাম যে জানিনা তাতে আমার ক্ষোভ নেই দেব!

মন্ত্রী ॥ কিন্তু সে নামটি তোমার পিতার দৌলতে!

সাবিত্রী ॥ কেন ?

মন্ত্রী। সত্যবান যখন শিশু...তখন তোমার পিতা তাকে উপহার পাঠালেন একটি সোণার ঘোড়া। অশ্বপতি কিনা!

সাবিত্রী ॥ অতটুকু ছেলে মাথায় মুকুট পরে হাতে চাবুক নিয়ে সোণার ঘোড়ায় চড়ে খেলত। কিন্তু ঘোড়া আর চলতো না। খুব জব্দ হয়েছিল সে, না ?

মন্ত্রী ॥ কিন্তু ঐ নকল থেকেই আসল শুরু হ'ল। ঘোড়ার জন্য শ্রীমান এমনি ক্ষেপে উঠলো যে ঘোড়া না পেয়ে রাতদিন রাগ করে মাটিতে ঘোড়ারই ছবি আঁকতো! মহারাজ খবর পেয়ে ওর আর এক নাম রাখলেন "চিত্রাশ্ব!"

সাবিত্রী ॥ কি দুর্দান্ত ছেলে! বড় হয়েও কি সে বদলায় নি ? চলুন দেব দেখে আসি—

মন্ত্রী ॥ তাঁরা ওখানে নেই। সত্যবান বড় হবার পূর্বেই দ্যুমৎসেন জ্ঞাতিশত্রুদের দ্বারা রাজ্যচ্যুত হলেন।

সাবিত্রী ॥ রাজ্যচ্যুত! কেন ?

মন্ত্রী ॥ জ্ঞাতিশত্রুদের ঈর্ষা। তাঁদের অমানুষিক নির্মমতায়, চরম বিশ্বাস-ঘাতকতায় তিনি শুধু সিংহাসন হারালেন না, চক্ষু দু'টিও হারালেন—

সাবিত্রী ॥ চক্ষু দু'টিও ?

মন্ত্রী ॥ চক্ষু দু'টিও! তখন তাঁর জীবন রক্ষা করাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়ালো। কোনরকমে শিশুপুত্র আর পত্নীকে নিয়ে পুরোহিত কৌশিকের হাত ধরে বনে গিয়ে প্রাণরক্ষা করলেন।

সাবিত্রী ॥ না জানি অন্ধ রাজা কতই কষ্ট পেয়েছেন!...তাঁরা কোথায়? রাজপুত্র? রাজমুকুট তার মাথায় উঠল না!...তাঁরা কোথায়? তাঁরা কোথায়?

মন্ত্রী ॥ তারপর থেকেই তারা অজ্ঞাতবাস করছেন...কোন বনে কারও জানা নেই। এ রাজ্য এখন অরাজক। এ রাজ্যে...যাবে মা?

সাবিত্রী ॥ যেতাম...কিন্তু...না...কেন যাব? ওযে নরক! নরক!

মন্ত্রী ॥ তবে এখন কোথায় যাব মা? অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র সিন্ধু কাশী—জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত—আরো কত দেশ কত রাজ্য...সবইতো দেখা হল মা!

সাবিত্রী ॥ তবে চলুন ঘরে ফিরি।

মন্ত্রী ॥ না মা, ঘরে ফিরবার যো নেই--যতক্ষণ না তুমি মনের মত পতি লাভ করছ। এখন যদি ঘরে ফিরি তবে মহারাজ আমাদের মুখ দর্শন করবেন না। তিনি বড় আশা করে আমায় দিয়ে তোমায় পাঠিয়েছেন। আমাদের উদ্দেশ্য যতদিন সিদ্ধ না হয় ততদিন আমরা ঘরে ফিরব না। এর জন্য যদি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে হয়, তাও যাবো। আমি সে কথা ভাবছিনা—অমি শুধু ভাবছি এবার রথ চলবে কোনদিকে—কোন পথে!—

সাবিত্রী ॥ পথের ভাবনা ভাববেন—ভগবান। চলুন রথে উঠি। আর কিছু না হোক খুব দেশ দেখা হচ্ছে। [একটু থামিয়া] কিন্তু দুঃখ এই—দেশই দেখছি, মানুষ দেখছি না।

মন্ত্রী ॥ সে কি মা?

সাবিত্রী ॥ হ্যাঁ দেব। মানুষ কই? শ্রীরামের শৌর্য্য কই? লক্ষ্মণের বিক্রম কই? ভরতের ভক্তি কোথায়? শত্রুঘ্নের নিষ্ঠা?—নাই। সবাই আমায় দেখছে—বলছে আমি দেবী। আমি যে মানুষ—মানুষ আজ সে বিশ্বাস হারিয়েছে—মানুষ এত নীচে নেমে গেছে।

মন্ত্রী ॥ হতাশ হয়োনা মা। গৌরীর মত তোমার তপস্যাও সিদ্ধিলাভ করবে। তপস্যা এখনো বোধ হয় শেষ হয়নি—যেদিন হবে—সেদিন নগরে যাকে পাওনি—পথে যাকে পাওনি—পথে যাকে দেখলে না—সে হয়ত ঐ বনের আড়াল থেকে হাত বাড়াবে—

সাবিত্রী ॥ [নেপথ্য লক্ষ্যে] ও কি? আমার মীনকেতন পালাল—ঐ—ঐ—বনের দিকেই পালাল। কে আছ—ওকে ধর—ওকে ধর—

[ছুটিয়া প্রস্থান। মন্ত্রী পশ্চাদনুসরণ করিল]

———

চতুর্থ দৃশ্য

আশ্রম। একপার্শ্বে কুটির

আশ্রমবালিকাগণ ও শাশ্বতী

গান

শুক্লা জ্যোৎস্না তিথি ফুল পুষ্প বীথি,
গন্ধ বন গীত আকুল উপবন।
চিত্ত স্বপ্নাতুর, অঙ্গ চুর চুর,
মাগে হৃদিপুর সুন্দর পরশন ॥
চন্দন গন্ধিত মন্দ দখিণা বায়
নন্দন বাণী ফুলে ফুলে বয়ে যায়,
তনু মন জাগে রাঙা অনুরাগে
মনে লাগে আজি বাসর জাগরণ
আজি মাধবী বাসর জাগরণ ॥

[গীতান্তে সকলের প্রস্থান। সত্যবান ও কৌশিকের প্রবেশ]

কৌশিক ॥ কি স্থির করলে ?

সত্যবান ॥ প্রথমে যাব মদ্রপুরে ; রাজা অশ্বপতিকে একবার মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করব তিনি আমার পিতাকে কোন অপরাধে অপমান করেন। আমার পিতা তাঁর কৃপাপ্রার্থী নন। যখন তিনি ঘরে বাহিরে জ্ঞাতি শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হন তখন তিনি তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করেন নাই, যখন রাজ্যচ্যুত হন, তখন তাঁর দ্বারে আশ্রয়-প্রার্থী হন নাই, ভিক্ষুক হয়ে তাঁর দ্বারে কোন দিন ভিক্ষা চাইতে যান নাই। তবে কোন অধিকারে তিনি তাঁকে অপমান করতে সাহসী হন···আমি তার সহজ সরল উত্তর চাই—

কৌশিক ॥ কিন্তু আমার মতে তার চেয়ে হবে যোগ্য প্রতিশোধ···যদি ঐ বাগদত্তা কন্যাকে তুমি বলপূর্বক গ্রহণ কর—

সত্যবান ॥ না—না—না—, যে আমার পিতাকে অপমান করে, আমি তাঁর কন্যাকে···গ্রহণ করতে পারিনা।

কৌশিক ॥ কিন্তু, বাগদত্তা কন্যা অপরকে পতিত্বে বরণ করলে তার ধর্মহানি হবে। ধর্মতঃ তুমিই তার স্বামী। তদুপরি তুমি ক্ষত্রিয়। সেই কন্যার ধর্মরক্ষা তোমার ক্ষত্রোচিত কর্তব্য···

সত্যবান ॥ ক্ষত্রিয়! আমার ক্ষত্রিয়ত্বের আজ শুধু স্মৃতিটুকুই আছে দেব। আমি যদি আজ ক্ষত্রিয়ের অভিমান রাখতে পারতাম, তবে···এখনো···আমার পিতৃশত্রু জীবিত ? স্বরাজ্য শত্রু করতলগত ? পিতামাতা বনবাসী ? দেব, আমি যে ক্ষত্রিয়

সে কথা…আজ থাক। আমি আজ শুধু পুত্র…পুত্র…অন্ধ পিতার একমাত্র পুত্র। বৃদ্ধ অসহায় পিতা এবং অভাগিনী মাতার আমিই আজ একমাত্র অবলম্বন…তাঁদের রক্ষণা-বেক্ষণই আজ আমার প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য…কিন্তু…তাঁদের অভাবে…আমি ক্ষত্রিয়! ক্ষত্রিয়! শুধুই ক্ষত্রিয়! তখন চাই একখানি অসি…আর একটি অশ্ব… সৈন্য চাইনা, সামন্ত চাইনা, বন্ধু চাইনা—

কৌশিক ॥ বন্ধু চাও না?

সত্যবান ॥ শত্রু অত শত্রু নয়, বন্ধু যখন শত্রু হয়। বন্ধু চাই না, চাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ, চাই পিতৃপুরুষের আশীর্বাদ…চাই একখানি অসি…চাই একটি অশ্ব—, কিন্তু সে আজ নয়। আজ…আজ যে আমি কি চাই, জানিনা, কিন্তু…তবু আমি যাব…ঐ মদ্রপুরে…অশ্বপতি সকাশে। আজ আমার এই যাত্রার পরিণাম কি জানি না…হয়ত মৃত্যু…হয়ত তার…কিম্বা…আমার!

কৌশিক ॥ তুমি বুদ্ধিমান—তুমি বিচক্ষণ। তবু আমার ভয় হচ্ছে। যদি ঐ বাগদত্তা কন্যাকে বলপূর্বক গ্রহণ করবার জন্যে আজ যাত্রা করতে, তবে হয়ত—

সত্যবান ॥ কি যে করব…আমি কিছুই স্থির করে উঠতে পারিনি…আজ যে কি হবে, একমাত্র ভগবানই জানেন!

কৌশিক ॥ নিয়তি! নিয়তি! সবই নিয়তি! নিয়তির খেলা দেখতেই এসেছি, নিয়তির খেলাই দেখে যাব…মানুষের সংকল্প, মানুষের প্রতিজ্ঞা…কিছু নয়…কিছু নয়—[প্রস্থান]

[অন্যদিক হইতে শাশ্বতী সত্যবানের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

শাশ্বতী ॥ যাচ্ছ না কি?

সত্যবান ॥ হ্যাঁ—

শাশ্বতী ॥ বৌ আনবে?

সত্যবান ॥ সাবধান শাশ্বতী, সব সময়—

শাশ্বতী ॥ গম্ভীর হয়ে থাকব তুমি বল—

সত্যবান ॥ আমি বিদেশে যাচ্ছি।

শাশ্বতী ॥ সত্যের অপলাপ হল! তুমি দাঁড়িয়ে থেকে কি করে বল, যাচ্ছি?…

সত্যবান ॥ যাব। তুমি ভাই, আমার বাবা আর মাকে দেখবে তো?

শাশ্বতী ॥ যতদিন চোখে দেখতে পাব…দেখব। কিন্তু যদি কাণা হই,—কি করে বলব…দেখব?

সত্যবান ॥ তোমার সঙ্গে আমি পারব না। আমি হার মানছি।…ওদের দেখো—

শাশ্বতী ॥ এখন বুঝি দেখিনা?

সত্যবান ॥ তখন আরো বেশী দেখো। বাবা যখন ঘরের বের হবেন, তুমি ওঁর হাত দু'খানি ধরো…তুমি হয়ো ওঁর চোখ।

শাশ্বতী ॥ [দূরে সরিয়া গিয়া] এতটুকু তো তাঁর মাথাটা…তাতে কি করে [আপাদ মস্তক দেখাইয়া] সাড়ে তিন হাত চোখ…আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার আমি সব কথা শুনব, সত্যি বলছি, তুমি যদি আমায় কথা দাও—

সত্যবান ॥ কি ?

শাশ্বতী ॥ আমার একটা সাথী এনে দেবে—

সত্যবান ॥ সাথী ?

শাশ্বতী ॥ আমার হবে সাথী, তোমার হবে বৌ ! ভারী মজা হবে, দেখো—

সত্যবান ॥ আচ্ছা, সে দেখা যাবে। একঘর বোঝাই কাঠ কেটে রেখে গেলাম। বিক্রয় করে ওঁদের খাওয়াবে।—পারবে না ?

শাশ্বতী ॥ আমিই পারি, তুমিই বরং পার না। সেদিন তো…ঠকে গেলে। আমি হলে—

সত্যবান ॥ ঠকতে না। আমিও তাই ভাবছি তোমার ওপর ওঁদের ভার দিয়ে গেলে আমি ঠকবো না। আমি বিদেশে নিশ্চিন্তমনে আমার কাজ করতে পারব। হ্যাঁ, আর দেখ, আমার হরিণ দু'টি—

শাশ্বতী ॥ ঐটি মাপ করতে হবে দাদা—ও আমি পারবোনা—

সত্যবান ॥ কেন শাশ্বতী ?

শাশ্বতী ॥ ওদের ঐ শিং…বাবারে !

সত্যবান ॥ ওদের আমি বলে যাব—

শাশ্বতী ॥ তবু ওদের এতটুকু বিশ্বাস নেই। ওরা তেমন মানুষ হলে জানোয়ার না হয়ে পরমেশ্বর হ'তো। তবে, হ্যাঁ, পারি, যদি ওদের ঐ শিংগুলি— [কাটিবার ইঙ্গিত]

সত্যবান ॥ না—না,—ওদের আমি…খুব ভালো করে—বলে যাব—

শাশ্বতী ॥ কিছু বললেই ওরা একটি জিনিসই বোঝে…খুব ভালো করে শিং নেড়ে তেড়ে আসা। আচ্ছা বেশ, দেখব। আমারও আছে। আচ্ছা, সে হবে—

সত্যবান ॥ ওদের চোখে বুঝি খোঁচা দেবে ?

শাশ্বতী ॥ তোমরা বল খোঁচা। কিন্তু…আমি তাকে বলি চুমো। তুমি ভেবো না দাদা—

সত্যবান ॥ ভাবনার কথাই হ'ল শাশ্বতী। তোমায় যে আমি ভালো করেই চিনি—

শাশ্বতী ॥ না—না, কিছু ভেবো না। আর কিছু বলবার আছে ?

সত্যবান ॥ আর কিছু ? না…আর কিছু নেই। আমার জন্য যদি কেউ কখনো উতলা হয়, তুমি তাকে প্রবোধ দিয়ো।

শাশ্বতী ॥ হ্যাঁ, দেবো।

সত্যবান ॥ তবে আমি আসি—

শাশ্বতী ।। দাঁড়াও। সবার ভারই তো আমায় দিয়ে গেলে। কিন্তু একজন যে বাকী রইল ? তার ভার কাকে দিয়ে যাচ্ছ ?—

সত্যবান ।। কে ?

শাশ্বতী ।। আমি !—আমার কথাটি একটিবারও বুঝি মনে পড়ল না দাদা ? যদি আমি হরিণ হতাম…তবে হয়তো…

সত্যবান ।। তোমার ভার নেবার মতো লোক এ আশ্রমে নেই। বিদেশে যাচ্ছি…সেখানে খুঁজব !…আপাততঃ তোমার ভার তোমার ওপরই দিয়ে গেলাম। নদীটি সাঁতরে পার হয়ো না…কুমীর এসেছে। ও বনটায় একা যেও না…তিনটে বাঘ ওৎপেতে থাকে, দেখেছি !…

শাশ্বতী ।। যাক…খবরগুলো পাওয়া গেল। আমার নতুন তীরগুলোর ধার পরখ করা হয়নি…ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ দাদা—

সত্যবান ।। ওরে, না—না—

শাশ্বতী ।। ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ দাদা—[ইহার মধ্যে সাবিত্রীর সেই রাজহংস কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ঘরের বাহিরে, দুই দেওয়ালের সংযোগস্থলে বসিয়াছে। তাহা দেখিয়াই…] চুপ !…দেখেছ দাদা ? [তৎপ্রতি সত্যবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল]

সত্যবান ।। এ কি ! কার এ রাজহংস ? কোথা থেকে এখানে এল ?

শাশ্বতী ।। আমায় ঐটি ধরে দাও • —

সত্যবান ।। চুপ। [ধনুকে তীর যোজনা করিলেন]

শাশ্বতী ।। না—না, মেরো না, ধরো—

সত্যবান ।। আমার হরিণের চোখে খোঁচা দেবে ?

শাশ্বতী ।। না—কখনও না !—

সত্যবান তার শিং কাটবে ?

শাশ্বতী ।। বরং আমার নাক কেটে ফেলব…[অনুনাসিকস্বরে] তবু ওর শিং…না—

সত্যবান হাসিয়া] আচ্ছা—তবে আমি—

[ধনুর্বান রাখিয়া দেওয়াল ধরিয়া…পা টিপিয়া টিপিয়া…রাজহংস ধরিতে অগ্রসর হইলেন। শাশ্বতী সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে তাহা দেখিতে লাগিল। সাবিত্রী এবং তাহার একসখীও রাজহংসটির পেছনে পেছনে ছুটিয়া আসিয়াছেন। সাবিত্রী অন্য দেওয়ালটির ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং রাজহংসটি দেখিয়াই পুলকিত বিস্ময়ে তাহা তাহার সঙ্গী সখীকে দেখাইলেন। সখীকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সাবিত্রীও

দেওয়াল ধরিয়া…পা টিপিয়া টিপিয়া রাজহংস লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সাবিত্রী এবং সত্যবান কেহই কাহাকে দেখিতেছেন না। উভয়ে রাজহংস সমীপে উপনীত হইয়া…এবং ঠিক একই মুহূর্তে…দুইজনেই রাজহংস ধরিবার জন্য হাত ফেলিলেন। বিধাতার বিধানে…রাজহংস সরিয়া গেল এবং তাহাকে না ধরিয়া একে অন্যের হাত ধরিয়া ফেলিলেন। উভয়েই চমকিয়া উঠিয়া পরস্পরের মুখের পানে চাহিলেন।]

সাবিত্রী ॥ [অপলক নেত্রে] কে—কে তুমি ?

সত্যবান ॥ সত্যবান।…তুমি ?

সাবিত্রী ॥ সাবিত্রী।

[উভয়ের শুভদৃষ্টি]

শাশ্বতী ॥ [রাজহংসটিকে ধরিয়া, তাহাকে লইয়া বসিয়া, তাহার মুখটি মুখের কাছে আনিয়া] কে তুমি ? "রাজহংস !" আমি ? "শাশ্বতী" !

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ

অশ্বপতি ॥ পুরবাসীরা শোভাযাত্রা করে সাবিত্রীকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসছে। ঐ শোন লক্ষ কণ্ঠে সাবিত্রীর জয়ধ্বনি—আজ কি আনন্দ! কিন্তু এ আনন্দের দিনে তোমার চোখে জল কেন রানী ?

মালবী ॥ আমি শুধু ভাবছি রাজা, এত বড় অধর্ম—

অশ্বপতি ॥ চুপ রানী চুপ। ভুলে যাও যে দ্যুমৎসেন বলে কখনো কোন রাজা ছিল, ভুলে যাও যে ঐ নামে কোন কালে আমার কোন বন্ধু ছিল, আর ভুলে যাও যে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে আমি কখনো কারও কাছে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আজ আনন্দের দিন, আনন্দ কর...উৎসব কর—

মালবী ॥ কিন্তু মহারাজ—

অশ্বপতি ॥ না না—আর ও আলোচনা নয়—আমার সাবিত্রী আজ স্বয়ম্বরা হয়ে ফিরে আসছে—আমি শুধু ভাবছি কোন রাজপুত্র তার অন্তর জয় করল—অথবা নিশ্চয়ই কোন রাজপুত্র নয়—সে কোন দেবতা—দেবতা !

[মালবী নিরুত্তর]

অশ্বপতি ॥ রানী নীরব কেন ? কথা কও কথা কও—আমার সাবিত্রী আসছে—আমি তাকে বুকে নেব—বুকে নিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করব—কাকে মা—কাকে তুই বরণ করে এলি—কানে কানে সে আমায় বলবে। আমি জানব কন্যা দিয়ে কাকে আমি পুত্ররূপে পেলাম—কে সেই রাজপুত্র—অথবা কে সেই দেবতা—

[নেপথ্যে সাবিত্রীর জয়ধ্বনি]

মালবী ॥ ঐ সাবিত্রী আসছে—ঐ তার রথের ধ্বজা আমার চোখে পড়ছে—ভগবান—ভগবান—

অশ্বপতি ॥ কই, আমি তো রথচূড়া দেখতে পাচ্ছিনা—আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে—তারপর, দীর্ঘ অদর্শনের পর আজ এই মিলনের প্রারম্ভে—একি চোখে জল আসছে কেন! জীবনের এই পরম-দিনে চরম-আনন্দে চোখ জলে ভরে যায় কেন! আমি যে এখন কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা মালবী—কোথায় আমার সাবিত্রী ? কত দূরে—কত দূরে—সাবিত্রী—সাবিত্রী—

মালবী ॥ ঐ তার রথ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করছে—ঐ—ঐ আমি তাকে দেখছি—ঐ আমার সাবিত্রী—ঐ আমার মা—আজ কত দিনের পর—কত দিনের পর—কিন্তু আমি ওর চোখের দিকে চাইতে পারছিনা—মুখের দিকে চাইতে পারছিনা—

অশ্বপতি ॥ মা—মা—আমার চোখ জলে ভরে উঠছে। আমি ঝাপ্সা দেখছি।

রানী! রানী! তুমি কি সত্যি-সত্যিই তাকে দেখছ যার মুখখানি আনন্দে ভরা? না? বল রানী বল, যার চোখে মুখে আজ এক অলৌকিক দিপ্তী—না? আমি দেখতে পাচ্ছিনা—আমি দেখতে পাচ্ছিনা—

মালবী ॥ ঐ—ঐ আমার মা মন্দিরে ঠাকুর প্রণাম করছে। কে—কেও… মন্দিরের ভেতর থেকে বীণা হস্তে ও কে বেরিয়ে এলেন? দেবর্ষি নারদ!

অশ্বপতি ॥ বেশ বেশ! এই শুভদিনে তবে তিনিও শুভ পদার্পণ করেছেন! আজ আমার কি আনন্দ! আজ আমার কি সৌভাগ্য—আজ আমার কন্যা রাজ-রাজেশ্বরী অথবা দেবীরও দেবী কোন মহাদেবী! রানী! রানী! এগিয়ে চল, এগিয়ে চল—আর বিলম্ব আমি সইতে পারছিনা—

সাবিত্রী ॥ [নেপথ্যে] বাবা!

অশ্বপতি ॥ ঐ—ঐ তার কণ্ঠস্বর—মা—মা।

সাবিত্রী ॥ [নেপথ্যে] মা—মা।

মালবী ॥ মা—

[সাবিত্রী, সহচরীগণ ও মন্ত্রী প্রভৃতির প্রবেশ]

অশ্বপতি ॥ কাকে? কে, সে?—বল মা বল?

সাবিত্রী ॥ তোমার কুশল বাবা? তুমি বড় শুকিয়ে গেছ—কেন বাবা কেন?

অশ্বপতি ॥ শুধু তোমার চিন্তায় মা—তোমার চিন্তায়—বল মা—কাকে—কাকে তুমি পতি-রূপে মনোনয়ন করে নিজে সুখী হয়েছ। আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছ—বল মা বল—কে সেই রাজরাজেশ্বর—অথবা কে সেই দেবাদিদেব মহাদেব?

সাবিত্রী ॥ বাবা, তিনি কোন রাজরাজেশ্বর নন—রাজপুত্রও নন।

অশ্বপতি ॥ আমি জানি—আমি জানি—আমার মন বলছে—আমার দেবী কন্যা দেব-বধূ হয়েছে! কে সেই দেবতা মা—কে সেই দেবতা?

সাবিত্রী ॥ তিনি দেবতাও নন পিতা—

অশ্বপতি ॥ …তবে? তবে? বল মা বল—উৎকণ্ঠায় আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে—

সাবিত্রী ॥ তিনি এই মাটিরই মানুষ।

অশ্বপতি ॥ রাজা নয়—দেবতা নয়—মাটির মানুষ! কোথায়—কোন দেশে?

সাবিত্রী ॥ কাম্যক বনে।

অশ্বপতি ॥ কাম্যক বনে! তবে কি—তবে কি—এর পরে এই শুনব—যে আমি যাকে দু'হাতে ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম—সেই রাজ্যচ্যুত ভিক্ষুক-পুত্র—সেই সত্যবানই—

সাবিত্রী ॥ আমার স্বামী। বাবা, মা—আমায় আশীর্বাদ কর।

[নারদের প্রবেশ]

নারদ ॥ আশীর্বাদে অন্তরায় আছে মা।

অশ্বপতি ॥ দেবর্ষি—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

নারদ ॥ স্থির হন মহারাজ—হ্যাঁ মা—তুমি এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর।

মালবী ॥ কেন দেবর্ষি—সত্যবান কি সাবিত্রীর উপযুক্ত পাত্র নয়?

নারদ ॥ সত্যবান সর্বগুণে গুণান্বিত—কিন্তু—

মালবী ॥ কিন্তু—

নারদ ॥ সে যে স্বল্পায়ু।

সকলে ॥ স্বল্পায়ু?

নারদ ॥ স্বল্পায়ু। বিবাহের পর মাত্র এক বৎসর তার পরমায়ু।

অশ্বপতি ॥ দেবর্ষি! দেবর্ষি! বলুন এ সত্য নয়—বলুন আজকের কোন কথাই সত্য নয়—বলুন—সাবিত্রীর কথা মিথ্যা—দেবর্ষি যে দেবর্ষি—বলুন বলুন—আপনার কথাও মিথ্যা।

নারদ ॥ মিথ্যা নয়। সাবিত্রী অন্যপতি নির্বাচন করুক।

সাবিত্রী ॥ এক পতি বর্তমানে—অন্য পতি নির্বাচন করতে বলছ—তুমি দেবর্ষি!

নারদ ॥ সে যে স্বল্পায়ু মা!

সাবিত্রী ॥ স্বল্পায়ু? সে তো ব্যাধিরই এক রূপান্তর। ব্যাধিগ্রস্ত যে প্রিয়জন তাকে কি কেউ বর্জন করে? বরং প্রীতি তখন আরও প্রখর হয়, স্নেহ তখন আরও গভীর হয়, কর্তব্য তখন আরও প্রেমময় হয়……প্রীতিময় হয়। স্বল্পায়ুর ভয় করিনা। ভয় করি পাপ…ব্যভিচারিণীর পাপ—দ্বিচারিণীর পাপ।

অশ্বপতি ॥ সে যে ভিক্ষুকের পুত্র ভিক্ষুক!

সাবিত্রী ॥ আমিও ভিক্ষুণী বাবা।

অশ্বপতি ॥ না, না, তা হয় না—তা হতে পারেনা। ওরে সাবিত্রী, আমি যে তা কল্পনাও করতে পারিনা। শুধু তো পিতার মর্মবেদনা এর সঙ্গে জড়িত নয়, এতে যে আমার রাজ-মহিমা কলঙ্কিত হবে—আমার উচ্চশির ধূলায় লুণ্ঠিত হবে। আমার আজ্ঞা—তুমি অন্য পতি নির্বাচন কর।

সাবিত্রী ॥ মা—

মালবী ॥ আমি! ওরে, আমি যে নারী, ঘৃণায় লজ্জায় আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে। আমি পালাই—আমি পালাই—

সাবিত্রী ॥ কিন্তু তার পূর্বে তুমি আমার কর্তব্য পথ নির্দেশ করে দিয়ে যাও মা—

মালবী ॥ তোমার মা, শুধু একটি পথ—সেই পথ—যে পথে তোমার পতি জীবনযাত্রা করেছেন; হোক না কেন সে পথ গহন বনের বুকে—হোক না কেন সে পথ মরুভূমির মাঝে—, সেই তোমার একমাত্র পথ।

সাবিত্রী ॥ বাবা—তবে অনুমতি দাও—

অশ্বপতি ॥ অসম্ভব মা, অসম্ভব। তুমি অন্য পতি নির্বাচন কর—

নারদ ॥ হ্যাঁ মা! অকাল বৈধব্য কেউ স্বেচ্ছায় বরণ করেনা। তুমি অন্য পতি নির্বাচন কর—

[সাবিত্রী মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন]

মালবী ॥ আজ দেখছি নারীর কর্তব্য—নারীর ধর্ম—পুরুষের চোখে তুচ্ছ এক বিলাস বস্তু। পুরুষের চোখে এ যেন এক খেলবার খেলনা—মনঃপূত না হলেই পরিবর্তন চলে।

অশ্বপতি ॥ সাবধান রানী, ইচ্ছা করে কন্যার সর্বনাশ সাধন করো না।

মালবী ॥ হোক সর্বনাশ! দারিদ্র্য-দুঃখ—সেও ভাল, অকাল বৈধব্য—তাও ভালো, তথাপি, আমি নারী—আমি মাতা—আমি ঐ কন্যাকে, ঐ নারীকে এ শিক্ষা কখনো দিতে পারব না—একবার যাকে দেহ মন নিবেদন করেছ—তাকে বর্জন করে অন্য পতি নির্বাচন কর।

অশ্বপতি ॥ রানী অবুঝ হয়ো না—

মালবী ॥ পুরুষ একাধিক বিবাহ করতে জানে, কিন্তু নারীর বিবাহ একবারই হয়ে থাকে। নারীর সতীত্ব আছে—পুরুষের 'সতীত্ব' হাসির বিষয়! নারীর সতীধর্ম পুরুষের ধারণারও অতীত—হোক না কেন সে পুরুষ পিতা—হোক না কেন ঋষি—হোক না কেন দেবতা! তা না হলে এ কি করে সম্ভব হয়—তোমার পিতা তোমাকে দ্বিচারিণী হতে বলছেন—আর দেবর্ষি তোমাকে ব্যভিচার শিক্ষা দিচ্ছেন!

অশ্বপতি ॥ সুদীর্ঘ কঠোর তপস্যার ফলে দেবীর বরে যেদিন পুত্রাদপি গরীয়সী কন্যা লাভ করেছি—সেই দিন থেকে জীবনে শুধু একটি কামনা…একটি প্রার্থনা পোষণ করেছি—সে শুধু কন্যার সুখ—কন্যার শান্তি—কন্যার কল্যাণ। আমার সেই আশাতরু সমূলে উৎপাটিত হবে! আমার চোখের মণি—আমার বুকের মাণিক—আমার অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী সাধনায় সিদ্ধি এক ভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্রে বিসর্জন দেব! বৎসরান্তে মা আমার অকাল বৈধব্য ভোগ করবে—এ আমি কেমন করে সইব—এ আমি কেমন করে সইব!

সাবিত্রী ॥ বাবা—

অশ্বপতি ॥ অন্তর্যামি জানেন—মা আমার ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী হলেও আমার মনঃপুত হোতনা—অন্তর্যামি জানেন শুধু এই উচ্চাশার মোহে—ক্ষত্রিয় হয়েও আমি নীচ কৌশলে সত্যভঙ্গ করতে দ্বিধা করিনি—তবু—তবু—নিয়তি—নিয়তি!

সাবিত্রী ॥ বাবা! বাবা!

অশ্বপতি ॥ আয় মা শীঘ্র আমার বুকে আয়। রাজ্যচ্যুত বনবাসী ভিক্ষুকপুত্রের বেশ ধরে নিয়তি তোকে গ্রাস করতে আসছে—আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করব—আনো আমার তরবারি—দাও আমার বল্লম…শুধু একবার তুই বল মা—তুই যাবিনা—তুই যাবিনা—

সাবিত্রী ॥ আমি যাব।

অশ্বপতি ॥ ওর রাজ্য নেই—ওর ঐশ্বর্য্য নেই—ওর প্রাসাদ নেই—

সাবিত্রী ॥ তবু আমি যাব।

অশ্বপতি ॥ বনে ওর বাস!

সাবিত্রী ॥ সে আমার স্বর্গবাস।

অশ্বপতি ॥ তবে যা [দূরে ঠেলিয়া দিলেন] দূর হ—[সাবিত্রী মালবীর বুকে পড়িলেন] দূর হ—দূর হ—[প্রস্থান]

সাবিত্রী ॥ দেবর্ষি আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন।

নারদ ॥ নতুন আর কি বলব মা!

সাবিত্রী ॥ মা, বাবা বিদায় দিয়েছেন। এইবার তুমি বিদায় দাও মা—

মালবী ॥ এস মা—

সাবিত্রী ॥ [অলঙ্কার খুলিতে খুলিতে] আমার ভিক্ষুণীর বেশ দাও মা—আর দাও আমার কপালে, তোমার কপালের ঐ অক্ষয় সিন্দুর।

মালবী ॥ [সাবিত্রীর কপালে সিন্দুর পরাইয়া দিলেন—তাহাকে স্নেহচুম্বন করিয়া কহিলেন] এই সিন্দুর তোমার কপালে অক্ষয় হোক মা!

সাবিত্রী নারদ ও মালবীকে প্রণাম করিলেন—পিতার উদ্দেশ্যে সিংহ পিঠিকায় প্রণাম করিলেন। সহচরীগণের নিকট বিদায় নিলেন। অবশেষে মন্ত্রীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং মন্ত্রীসহ প্রস্থান করিলেন। উদ্‌ভ্রান্তভাবে অশ্বপতির প্রবেশ।

অশ্বপতি ॥ সাবিত্রী! সাবিত্রী!

মালবী ॥ পিছু ডেক না—পিছু ডেক না—

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

নগর তোরণ

[পুরবাসী-পুরবাসিনীগণ কর্তৃক সাবিত্রীর যাত্রাপথে মাঙ্গলিক গান]

[গান]

এস এস তব যাত্রা পথে, শুভ বিজয় রথে—
ডাকে দূর সাথী।
মোরা তোমার লাগি, হেথা রহিব জাগি—
তব সাজায়ে বাসর, জ্বালি আশার বাতি ॥
হের গো বিকর্ণ শত শুভ চিহ্ন
পথ পাশে নগর ঘাটে,
সবৎসা ধেনু গোক্ষুর রেণু
উড়ায়ে চলে দূর মাঠে;—
দক্ষিণ আবর্ত বহ্নি, পূর্ণ ঘট কাঁখে তন্বী।
দোলে পুষ্পমাল্য ঝলে শুক্লা রাতি ॥

তৃতীয় দৃশ্য

[আশ্রম বালিকাগণ এবং শাশ্বতী। শাশ্বতীর ক্রোড়ে সেই রাজহংস]

[আশ্রম বালিকাগণের গীত]

ফুলে ফুলে বন ফুলেলা।
ফুলের দোলা ফুলের মেলা
ফুল তরঙ্গে ফুলের ভেলা ॥
ফুলের ভাষা ভ্রমর গুঞ্জে
দোলন চাঁপার ঝুলন-কুঞ্জে,
মুহুমুহু কুহরে কুহু
সহিতে না পারি ফুল ঝামেলা ॥

[আশ্রম বালিকাগণের প্রস্থান। শাশ্বতীও প্রস্থান করিতেছিল এমন সময় সত্যবানের প্রবেশ]

সত্যবান ॥ শাশ্বতী—

শাশ্বতী ॥ দাদা—

সত্যবান ॥ এদিকে এস।

[শাশ্বতী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

তোমায় আমি বার বার বলেছি এ রাজহাঁস ছেড়ে দিতে। দাওনি কেন?

শাশ্বতী ॥ আমি পারব না। ওর চোখ দু'টি দেখেছ? ওর ঠোঁট দু'টি? আর এই পালক?

সত্যবান ॥ আমি দেখতে চাইনা—আমি দেখব না। ওকে ছেড়ে দাও—উড়িয়ে দাও—তাড়িয়ে দাও।

শাশ্বতী ॥ ছেড়ে দিলেও ও আর যায় না। উড়িয়ে দিলেও ওড়ে না। তাড়িয়ে দিলে ফিরে আসে। ওর এখানে মন বসেছে! ও এখানে বাসা বাঁধবে!

সত্যবান ॥ ও মায়াবী। ও যাদুকর। ইন্দ্রজালে ও আমাকে বাঁধতে এসেছে। ওকে আমি—[রাজহাঁসটি কাড়িয়া লইতে গেলেন]

শাশ্বতী ॥ না—না—না—

সত্যবান ॥ [কাড়িয়া লইয়া] হাঃ হাঃ হাঃ—এইবার ঐ চোখ—চোখে কি দুর্নিবার আকর্ষণ! ঐ মুখ—মুখে কি অনন্ত প্রলোভন! ঐ চোখ আমায় পাগল করেছে—আমি আজ অপমান ভুলেছি—তোকে আমি—তোকে আমি—[ঊর্দ্ধে তুলিয়া সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করতে গিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখখানির কাছে স্বীয় মুখ লইয়া সাদরে] ভালোবেসেছি—ভালোবেসেছি। [চুপি চুপি]

আমায় তুই বল—আমায় তুই বল। সে কি করে তোকে ছেড়ে আছে? সে কি তোকে নিতে আর আসবে না—আর আসবে না?

শাশ্বতী ॥ [খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল] হাঃ হাঃ হাঃ—

[সত্যবান চমকিত হইলেন—শাশ্বতীর দিকে চাহিলেন—এই অবসরে শাশ্বতী সত্যবানের শ্লথ হাত দু'খানি হইতে হাঁসটি লইল।]

শাশ্বতী ॥ ঐ দেখ—কে এসেছে—

[ভিক্ষুণীর বেশে সাবিত্রীর প্রবেশ]

সত্যবান ॥ একি! কে?

সাবিত্রী ॥ আমি [ঐখান হইতেই সাবিত্রী সত্যবানের উদ্দেশ্যে গল-লগ্নী-কৃতবাসে প্রণাম করিলেন।]

সত্যবান ॥ সাবিত্রী!

সাবিত্রী ॥ দাসী।

সত্যবান ॥ এ তোমার কি খেলা রাজকন্যা? দীনতম দরিদ্রের সঙ্গে তোমার এ কি নির্মম পরিহাস?

সাবিত্রী ॥ তুমি আমার স্বামী—আমি তোমার দাসী।

[শাশ্বতীর প্রস্থান]

সত্যবান ॥ না—না—তা অসম্ভব—অসম্ভব।

সাবিত্রী ॥ তুমি আমার পাণিগ্রহণ করেছ—সাক্ষী তার এই রাজহংস—সাক্ষী তার বনদেবতা, সাক্ষী তার তুমি স্বয়ং। ·ল পাণিগ্রহণ করোনি?

সত্যবান ॥ দৈব—দৈব! সত্য নয়—সত্য নয়—আমার জীবনে একমাত্র সত্য এই—আমি ভিক্ষুক—আমি ভিক্ষুক!

সাবিত্রী ॥ আমিও আজ ভিক্ষুণী। কোথায় আমার সেই স্বর্ণ অলঙ্কার?—কোথায় আমার রাজ-পরিচ্ছদ? কোথায়?

সত্যবান ॥ কোথায়?

সাবিত্রী ॥ কোথায় যে ছুঁড়ে ফেলেছি মনেও নেই। আজ শুধু আমি জানি এই গহন বন, এই গহন বনে শান্ত স্নিগ্ধ এক তপোবন, সেই তপোবনের পূণ্যপূত প্রাঙ্গণে এক তরুণ তাপস—বুকখানি তার প্রেম ব্যাকুল, চোখ দু'টি তার অশ্রুসজল। আমি থাকতে পারলাম না—আমি থাকতে পারলাম না—আমি ছুটে এলাম—ছুটে এলাম তোমার কাছে। আমায় তোমার দুঃখের ভাগ দাও—তোমার দৈন্যের ভাগ দাও—তোমার ভিক্ষার ভাগ দাও—তোমার পুণ্যের ভাগ দাও—তোমার পাপের ভাগ দাও—তোমার জীবনের ভাগ দাও—তোমার মরণের ভাগ দাও।

সত্যবান ॥ দিতাম—আমি দিতাম—তোমায় আমি কি না দিতাম! তোমায় আমি কি না নিতাম! আমরা পরস্পরের মাঝে পরস্পর বিলীন হয়ে যেতাম—কিন্তু—কিন্তু তোমার আমার মাঝে এক প্রচণ্ড ব্যবধান···

সাবিত্রী ॥ সে কি?

সত্যবান ॥ আমাদেরও একদিন রাজ-সম্পদ ছিল সেদিন তোমার পিতা আমার পিতার পরম বন্ধু ছিলেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান চরম দুর্দিনে তোমার পিতা আমার পিতাকে ভিক্ষুক বলে উপহাস করেছেন...

সাবিত্রী ॥ আমায় প্রত্যাখান করে কি, তুমি নিতে চাও তারই প্রতিশোধ ?

[অশ্বপতির প্রবেশ]

অশ্বপতি ॥ হ্যাঁ, প্রতিশোধ নাও—প্রতিশোধ নাও—সাবিত্রী তোমার শত্রুকন্যা—শত্রুকন্যাকে প্রত্যাখান করে পিতৃশত্রুর উপর যোগ্য প্রতিশোধ নাও।

[কুটির মধ্য হইতে দ্যুমৎসেনের স্বর শোনা গেল]

দ্যুমৎসেন ॥ হ্যাঁ বৎস, প্রতিশোধ নাও—প্রতিশোধ নাও—এই তার সুবর্ণ সুযোগ।

অশ্বপতি ॥ এ সুযোগ হেলায় পরিত্যাগ করো না। আমার কন্যা তোমার প্রেমমুগ্ধা। তুমি তাকে প্রত্যাখ্যান কর—প্রত্যাখ্যান কর।

দ্যুমৎসেন ॥ [শৈব্যর হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া] তুমি ওকে গ্রহণ কর। ওরে বনবাসী ভিক্ষুক পুত্র সম্মুখে তোর রাজরাজেশ্বর। তারই সম্মুখে তারই কন্যা সকাতরে তোর পত্নীত্ব প্রার্থনা করছে। যদি প্রতিশোধ নিবি ঐ রাজকন্যাকে সাদরে গৃহিণীরূপে গ্রহণ কর—গ্রহণ কর...প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলি—প্রতিশোধ নে... প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর—আর রক্ষা কর তার প্রতিজ্ঞা যে ঐশ্বর্যমোহে অন্ধ হয়ে—এই অন্ধ বন্ধুকে ভিক্ষুক বলে ঘৃণা করে এবং ভিক্ষুকপুত্রকে দূরে রেখে সত্যভঙ্গের প্রয়াস করে।

[মালা লইয়া ছুটিয়া শাশ্বতী প্রবেশ করিল এবং সাবিত্রীর হাতে সেই মালা তুলিয়া দিল। সাবিত্রী সত্যবানকে মাল্য দিতে আসিলেন]

অশ্বপতি ॥ না না

দ্যুমৎসেন ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—

[সাবিত্রী সত্যবানকে মালা দিলেন]

অশ্বপতি ॥ ওঃ—

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লতা-বিতান

শাশ্বতী বেদীতে বসিয়া গাহিতেছিলেন

গীত

নিসুতি রাতের শশী ॥
ঘুমায় সকলে নিশীথ নিঝুম,
হরিল কে তব নয়নেরি ঘুম,
কার অভিসারে জাগ গগন পারে
চাঁদ ভুলানো সে কোন রূপসী ॥
লুকায়ে হেরি আমি অভিসার তব
তারকারা হেরে লুকায়ে নীরব
কপট ঘুম ভেঙে হের হাসিছে সব
দূর অলকার বাতায়নে বসি ॥

[লেখনি মস্যাধার ও পুঁথি লইয়া কৌশিকের প্রবেশ]

কৌশিক ॥ শাশ্বতী! আমার ওপর ঘরে-বাইরে যদি এমন অত্যাচার চলে, কি করে আমি আমার লেখা শেষ করি?

শাশ্বতী ॥ সে গল্পটা শেষ হয়েছে বাবা?

কৌশিক ॥ কি করে শেষ করব মা? তুমি যেরূপ চীৎকার করছ তাতে…

শাশ্বতী ॥ গান গাইছিলাম বাবা।

কৌশিক ॥ কিন্তু এখন ঘুমোবারই কথা।

শাশ্বতী ॥ তোমার গল্প শেষ হলে শুনব আশা করে, জোর করে জেগে আছি বাবা।

কৌশিক ॥ গল্পের শেষটা বড় ভীষণ, তা শুনলে রাতে আর তোমার ঘুমই হবে না মা। তুমি বরং কাল সকাল বেলায় শুনো—এখন গিয়ে ঘুমোও।

শাশ্বতী ॥ তুমি?

কৌশিক ॥ আমি এই চাঁদের আলোতেই লিখব মনে করছি। যাও মা, তুমি গিয়ে ঘুমোও—আমার মাথা আর খেয়োনা মা।

শাশ্বতী ॥ [যাইতে যাইতে] কিন্তু তোমার রক্ত খাবে বাবা—

কৌশিক ॥ রক্ত খাবে? কে?

শাশ্বতী ॥ একপাল মশা। [প্রস্থান]

[কৌশিক লিখিতে বসিলেন—তখনি মশার উপস্থিতি অনুভব করিলেন। দু একটা মশা তাড়াইয়া লিখিতে লাগিলেন—কিন্তু তখনি ত্রস্ত-ব্যাকুলা সাবিত্রীর প্রবেশ—সাবিত্রী এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইয়া এখানে ছুটিয়া আসিয়াছেন। দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা তাহার চোখে মুখে সুস্পষ্ট।]

সাবিত্রী ॥ ঠাকুর—ঠাকুর—

কৌশিক ॥ [বিরক্ত হইয়া] আঃ কে ? তুমি ! [উদ্বিগ্ন হইয়া] এই গভীর রাত্রে এখানে এভাবে ? সত্যবান কোথায় ?

সাবিত্রী ॥ অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছেন ; আমিও যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ এক দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে বিষম ভয় পেয়েছি…তাই…ছুটে এসেছি আপনার কাছে, আপনি আমায় বলতে পারেন…ওঃ আমি যে সে দুঃস্বপ্ন বলতেও পারছিনা !

কৌশিক ॥ তবে সত্যবানকে বরং ডেকে তুলে সে স্বপ্ন-কাহিনী শোনাও। দেখছ না, আমি বড়ই ব্যস্ত।

সাবিত্রী ॥ না না সে স্বপ্ন-কথা তাঁকে বলতে পারবোনা, মাকেও না, তাঁদের কাউকে না…বলতে হবে আপনাকে…আপনি আমায় শুধু বলুন—

কৌশিক ॥ দাঁড়াও মা. তুমি মা, না হয় একটু বসো। আমিও একটা ভয়ানক জায়গায় এসে পড়েছি। আমি লিখছি এক গন্ধর্বের প্রেম-কাহিনী। তার প্রিয়-তমার হল মৃত্যু।…গন্ধর্ব ছিল এক শ্রেষ্ঠ বীণাবিদ্ । তার বীণার তানে স্থাবর-জঙ্গম মন্ত্রমুগ্ধ হত। সেই বীণা সে হাতে নিয়ে বাজাতে বাজাতে গিয়ে উপস্থিত—স্বর্গপুরে।

সাবিত্রী ॥ আমি পরে শুনব—আগে আমায় বলুন—

কৌশিক ॥ বলতো তারপর আমি কি লিখেছি ?

সাবিত্রী ॥ পরে শুনছি। আগে বলুন—

কৌশিক ॥ আঃ…বল—

সাবিত্রী ॥ আমি এক বিষম দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে এলাম। আর্য্যপুত্র কাষ্ঠাহরণ করতে কুঠার নিয়ে গেছেন। গভীর বন। চারিদিকে নিদারুণ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধ বনস্পতি !

কৌশিক ॥ তারপর বোধহয় দেখলে……সত্যবান অমনি কুঠার নিয়ে সেই বনস্পতি লক্ষ্য করে ছুটল !

সাবিত্রী ॥ হ্যাঁ, ছুটল।…সে যতই অগ্রসর হতে লাগল, বনস্পতি রুদ্র হতে রুদ্রতর মূর্তি ধারণ করল। আমি দেখলাম…ভয়ে আমার প্রাণ কেঁপে উঠল। স্থির করলাম ছুটে গিয়ে ওঁকে ফিরিয়ে আনি…

কৌশিক ॥ ফিরিয়ে আনলে ?

সাবিত্রী ॥ না না না পারলাম না। ছুটতে গেলাম, পা চলল না…কে যেন আমার পা বেঁধে রাখল। চীৎকার করে ডাকতে গেলাম…দেখি…কণ্ঠে ভাষা নেই…কে যেন আমার গলা চেপে ধরল—

কৌশিক ॥ আ—হা—হা ! তারপরই বুঝি

সাবিত্রী ॥ আর্য্যপুত্র সেই বনস্পতিকে কুঠারঘাত করলো। আকাশ বাতাস কম্পিত করে তখনি উঠল এক হৃদয়ভেদী আর্তনাদ—

কৌশিক ॥ আর্তনাদ ? বনস্পতির আর্তনাদ ?

সাবিত্রী ॥ বনস্পতির নয়, আমার স্বামীর···আমার স্বামীর !

কৌশিক ॥ তারপর ? তারপর ?

সাবিত্রী ॥ আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে চেয়ে দেখি···আর্যপুত্র বনে নয়, কুঠার হাতে নয়, বনস্পতির তলেও নয়, আমারই পাশে অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছেন। কিন্তু···তবে আমি, ও কি স্বপ্ন দেখলাম ঠাকুর ?

কৌশিক ॥ ওকে বলে বনস্পতির অভিশাপ। বৃক্ষেরও জীবন আছে মা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যু চায় না, চায় এই ধরণীর অনন্ত আলো···অনন্ত বাতাস ···চায় অনন্ত প্রাণ। তাকে যখন আঘাত করা যায়···সে তখন ক্ষিপ্ত হয়ে অভিশাপ দেয়···সঙ্গে সঙ্গে তার আততায়ী অমনি আর্তনাদে মৃত্যু বরণ করে !

সাবিত্রী ॥ মৃত্যু ! লক্ষ্য লক্ষ্য বনস্পতির মধ্যে কে কি করে চিনবে কে সেই অনন্ত-জীবন-প্রয়াসী বনস্পতি ?

কৌশিক ॥ তা কি আর চেনা যায় মা !

সাবিত্রী ॥ তবে কি হবে ! যাগযজ্ঞের জন্য আর্য্যপুত্রকে কাষ্ঠাহরণ করতে হয়। যদি অজ্ঞানতাবশতঃ কোন দিন তাঁর ভাগ্যে, আমার ভাগ্যে—এই দুঃস্বপ্ন সত্যসত্যই···

কৌশিক ॥ ফলবারই কথা মা। সুখ স্বপ্ন বরং ফলে না, কিন্তু দুঃস্বপ্ন··· সবই ভাগ্যলিপি মা ! সাবধান হয়েই বা লাভ কি ? তবে শোন মা আমার গল্প।···সেই যে গন্ধর্ব স্বর্গপুরে উপস্থিত হয়ে বীণা বাজাতে লাগল। তার বীণার মূর্ছনায় দেবতামণ্ডলও মন্ত্রমুগ্ধ হলেন, আর মন্ত্রমুগ্ধ হলেন স্বয়ং যমদেব। ···যমদেব গন্ধর্বকে বললেন বর গ্রহণ কর গন্ধর্ব ! গন্ধর্ব পত্নীর পুনর্জীবন প্রার্থনা করল।

সাবিত্রী ॥ প্রার্থনা পূর্ণ হল ? পূর্ণ হল !

কৌশিক ॥ হল। কিন্তু তার সঙ্গে তারা এক শর্ত দিলেন।

সাবিত্রী ॥ কি শর্ত ?

কৌশিক ॥ শর্ত রইল গন্ধর্ব স্বর্গপুরীতে তার পত্নীর পানে ফিরে তাকাতে পারবে না—গন্ধর্ব যাবে আগে আগে, পত্নী যাবে পিছে পিছে—যদি ফিরে তাকায়, তবে পুনর্জীবিতা পত্নী পুনরায় মৃত্যুবরণ করবে—

সাবিত্রী ॥ গন্ধর্ব কি ফিরে তাকালেন ?

কৌশিক ॥ "[পুঁথিপাঠ] দু'জন চলতে লাগল। চলতে চলতে," আর আমার লেখা হয় নি মা।···এইবার তুমি এসো···আমি গল্পটা শেষ করি—

[একমনে লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। সাবিত্রী কৌতূহলী চিত্তে উপুড় হইয়া লেখা পড়িতে লাগিলেন। দূরে সত্যবানের স্বর শোনা গেল।]

সত্যবান ॥ সাবিত্রী···সাবিত্রী—

[সাবিত্রী সচকিতা হইয়া সত্যবানের দিকে ছুটিয়া গেলেন। সত্যবানের প্রবেশ]

সত্যবান ॥ সাবিত্রী, তুমি এখানে ! তোমাকে আমি খুঁজে খুঁজে—

সাবিত্রী ॥ [এক হস্তে মুখে চাবি দিয়া অন্য হস্তে পুরোহিতের দিকে সত্যবানের

দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, এবং কাণে কাণে বলিলেন] ওঁকে বিরক্ত করো না।

কৌশিক ॥ [কিন্তু তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই] আঃ—না, আমাকে তোমরা আর লিখতে দিলে না।

সত্যবান ॥ রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল ঠাকুর।

কৌশিক ॥ বরং বল বেলা দুপুর। তোমাদের কাণ্ড দেখে সেই কথাই মনে হচ্ছে বৎস। কিন্তু…আমাকে এখন ঘুমাতে হবে…ভারী ঘুম পেয়েছে—

সাবিত্রী ॥ লেখাটি ?

কৌশিক ॥ কোন রকমে শেষ করলাম।

[পুঁথিপত্র তুলতে গেলেন]

সাবিত্রী ॥ আচ্ছা ওসব থাক…আমি তুলব এখন।

কৌশিক ॥ বাঁচালে মা। কিন্তু সাবধান শাশ্বতীর হাতে দিও না। [প্রস্থান]

সাবিত্রী ॥ ভারি সুন্দর গল্প লেখেন উনি। আজও একটি লিখেছেন—পড়বে ?

সত্যবান ॥ হ্যাঁ পড়ব। আজ এস আমরা বাকী রাতটুকু জেগেই কাটিয়ে দি।

সাবিত্রী ॥ এসো তবে দু'জনে এক সঙ্গে বসে, পড়ি—

[দু'জনে পাশাপাশি বসিয়া পুঁথি পড়িতে লাগিলেন]

সত্যবান ॥ উঃ—কি মশা !

সাবিত্রী ॥ এসো মনে মনে পড়ি—দেখি কার আগে শেষ হয়—

সত্যবান ॥ বেশ। [পাঠ ও মধ্যে মধ্যে মশা তাড়না। হঠাৎ সত্যবান সাবিত্রীর গালে একটি মশা দেখিয়া তাঁহার গালে মশা মারিলেন]

সাবিত্রী ॥ উঃ—[উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

সত্যবান ॥ [উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও অপরাধীর মত] ভুল হ'য়ে গেছে ! কিন্তু…মশাটা মেরেছি—

সাবিত্রী ॥ কিন্তু এ রকম ভুলটি আর যেন না হয় ! উঃ—

[উভয়েই পুনরায় বসিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন]

সত্যবান ॥ [হঠাৎ সাগ্রহে সাবিত্রীর প্রতি] গন্ধর্ব কি ফিরে তাকাল ?

সাবিত্রী ॥ [পুঁথি বন্ধ করিয়া উঠিয়া] আমিও ঠিক এই পর্য্যন্ত এসেছি। গন্ধর্ব ফিরে তাকাল কি না তা আছে পর পৃষ্ঠায়। বলত কি হল ? গন্ধর্ব কি ফিরে তাকাল ?

সত্যবান ॥ না—না তা তাকাবে কেন ? তবে যে সে তার পত্নীকে পুনরায় হারাবে—!

সাবিত্রী ॥ সে ফিরে তাকাল। ঐ নিয়তি—

সত্যবান ॥ অসম্ভব—

সাবিত্রী ॥ বেশ ! যদি আমার কথা সত্য হয় তা হলে বল তুমি আমার একটি কথা রাখবে।

সত্যবান ॥ হ্যাঁ রাখব !

[পুঁথি খুলিয়া পড়িলেন]

সাবিত্রী ॥ উত্তম। "গন্ধর্ব তাঁহার পত্নীর অদর্শন সহ্য করিতে পারিলেন না। বিষম উতলা হইয়া দেবতার নির্দেশ না মানিয়া পশ্চাতে পত্নীর পানে ফিরিয়া চাহিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার পুনর্জীবিতা পত্নী মৃত্যুমুখে পতিতা হইলেন"— আমার জয়—

সত্যবান ॥ মূর্খ সেই গন্ধর্ব !

সাবিত্রী ॥ এই বার তবে আমার কথাটি রাখ—আমার নিকট সত্য কর !

সত্যবান ॥ সত্য ! কি সত্য ?

সাবিত্রী ॥ তুমি বনে গিয়ে আর কাঠ কাটতে পারবে না।

সত্যবান ॥ তা হলে হোম যজ্ঞ—?

সাবিত্রী ॥ সে ভার আমার। [সত্যবানকে লইয়া প্রস্থান]

——

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ

অশ্বপতির শয়ন-মন্দির

[শুভ্র দেওয়ালে আর কোন সাজসজ্জা ন.২। আছে শুধু কালি দিয়া আঁকা বৎসরের ৩৬৫টি দিন জ্ঞাপক ৩৬৫ সরল রেখা। তাহাদের উপর দিয়া সমান্তরাল ভাবে একটি দীর্ঘ রেখা ৩৬০ রেখা ভেদ করিয়াছে, এবং মাত্র ৫টি সরলরেখা অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে। রাজার শয়নাগার, কিন্তু কোন শৃঙ্খলা নাই, সবই বিশৃঙ্খল—বিপর্য্যস্ত। অশ্বপতি কন্যা বিরহে উদ্‌ভ্রান্ত—উন্মত্ত। যে ৫টি রেখা অক্ষত রহিয়াছে তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে সেই রেখা ৫টিই দেখিতেছিলেন এবং মনে মনে গুণিতেছিলেন।]

অশ্বপতি ॥ এক—দুই—তিন—চার পাঁচ [ভাল করিয়া গুণিলেন] এক। দুই। তিন। চার। পাঁচ। এখনো পাঁচ দিন—কিন্তু, মাত্র পাঁচ দিন। তিনশ ষাট দিন—দেখতে দেখতে চোখের ওপর দিয়ে চলে গেল—আর আছে মাত্র পাঁচটি দিন—বৎসর পূর্ণ হ'তে মাত্র পাঁচটি দিন—[নীরবে রেখা পাঁচটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন]

মালবী ॥ [ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া] নাথ !

অশ্বপতি ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] কে ?—রানী ! একের পর দুই, তার পর তিন তার পর চার—তার পর ?

মালবী ॥ পাঁচ—

অশ্বপতি ॥ কেন, ছয়ও তো হতে পারে। তাই বা কেন? দশ হ'তেই বা দোষ কি ?

মালবী ॥ তা হয় না নাথ।

অশ্বপতি ॥ কেন হবে না ?

মালবী ॥ [মাথা নীচু করিয়া] তা হয় না নাথ !

অশ্বপতি ॥ বুঝেছি রানী ! এ এক ষড়যন্ত্র ! সবাই চাইছে—সে আর পাঁচ দিন পর বিধবা হোক। যদি বলি—না,—আর দশ দিন পর, অমনি মাথা নেড়ে বলছ—'তা কি হয় ? তা হয় না নাথ।'—দূর হও—[ওখান হইতে আসিয়া শয্যায় বসিলেন]

[রানী মালবীর প্রবেশ]

মালবী ॥ নাথ !

অশ্বপতি ॥ শোন রানী। মনে কর দেবর্ষি নারদের সেই ভবিষ্যদ্বাণী, বিবাহের পর ঠিক এক বৎসর পূর্ণ হইলেই মার আমার বৈধব্য ঘটবে।—প্রাসাদ গাত্রে আমি এক বৎসরের প্রত্যেক দিন এ'কে রাখলাম। একটি একটি করে দিন গেছে, একটি একটি করে রেখা কেটে দিয়েছি।···দিই নি ?

মালবী ॥ দিয়েছ।

অশ্বপতি ॥ অতএব গণনা আমার কিছুমাত্র ভুল হ'তে পারে না। পারে ?

মালবী ॥ না।

অশ্বপতি ॥ [রাগিয়া উঠিলেন] না ? কেন ? [ছুটিয়া গিয়া রানীর হাত চাপিয়া ধরিয়া] ভুল কি হতে পারে না ? জানো মুনি যে মুনি, তাঁদেরও ভুল হয়, আমার ভুল হতে পারবে না কেন ?

মালবী ॥ কি ভুল ?

অশ্বপতি ॥ হিসাবে ভুল। একটি দিন গেছে—আমি ভুলে একটি রেখা কেটে, দু'টি···বা—তিনটি—কিম্বা—কিম্বা—ঘুমের ঘোরে একেবারে এক সঙ্গে দশটি রেখাই কেটে দিয়েছি। এ কি অসম্ভব ?

মালবী ॥ অসম্ভব নয়।

অশ্বপতি ॥ [স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া] তুমি আমায় বাঁচালে রানী, তুমি আমায় বাঁচালে। তবে পাঁচ দিন নয়—হয়তো এখনো দশদিন—কিম্বা হয়তো—একমাস বাকী রয়েছে, কি বল ?

মালবী ॥ অসম্ভব নয়, প্রভু।

অশ্বপতি ॥ যাক, এক মাসের জন্য নিশ্চিন্ত। রানী, আমার বুকটা শুকিয়ে গেছে—একটু জল দেবে ?

মালবী ॥ শুধু জল নয় প্রভু, কিছু আহার কর। আজ কতদিন তুমি উপবাসে রয়েছ—আজ কতদিন তোমার চোখে ঘুম নেই—! আমি আসছি—

[পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রস্থান]

অশ্বপতি ॥ এখনো একমাস—একমাস সে সধবা থাকবে, একটি মাস—ত্রিশটি দিন!—ত্রিশটি দিন তার সীমন্তে সিন্দুর রেখা শোভা পাবে—সাবিত্রী মা আমার !

[স্বর্ণথালে কিছু আহার এবং পানপাত্রে পানীয় লইয়া মালবীর প্রবেশ]

মালবী ॥ প্রভু!

অশ্বপতি ॥ আমার ঘুম পাচ্ছে রানী—

মালবী ॥ ঘুমুবে বই কি, কতদিন ঘুমোও না। তার পূর্বে এইটুকু—

অশ্বপতি ॥ কি ?

মালবী ॥ কয়েকখানি পিষ্টক আর একটু মিষ্টান্ন।

অশ্বপতি ॥ [স্বর্ণথালা গ্রহণ করিয়া চোখের সম্মুখে ধরিয়া] পিষ্টক এবং মিষ্টান্ন! [অগ্নিময় দৃষ্টিতে মালবীর পানে চাহিয়া] মিষ্টান্ন এবং পিষ্টক! [বাতায়ন পথে স্বর্ণথালা বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া মালবীর প্রতি] রানী, কোনদিন কি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেছ? অসহ্য ক্ষুধার জ্বালা ভিক্ষান্নে কখনো মিটিয়েছ কি? তুমি কি করে জানবে যে ভিক্ষায় পিষ্টক মেলেনা—মিষ্টান্ন মেলেনা—একমুষ্টি অন্ন তাও মেলেনা!—মেলে কয়েকটি তণ্ডুল-কণা,—কোনদিন তাও মেলেনা! যেদিন তা মেলে—সেদিন সেই তণ্ডুল-কণা সে রন্ধন করে, সংসারের প্রত্যেক্যের ক্ষুধা মিটিয়ে যদি তার দু'টি অবশিষ্ট থাকে—[কাঁদিয়া] কোনদিন হয়তো তাও থাকেনা! —আর এখানে মিষ্টান্ন! পিষ্টক! রাজভোগ!···আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে—তুমি আমায় জল দাও—জল দাও—[সাগ্রহে জলপাত্র গ্রহণ করিয়া পান করিতে গিয়াই দেখেন, জল নয়, দুগ্ধ] এ কি? এতো জল নয়—

মালবী ॥ দুধ—

অশ্বপতি ॥ [পান-পাত্র উপুড় করিয়া ধরিলেন। সমস্ত দুধ পড়িয়া গেল। পান-পাত্রটিও শ্লথ হস্ত হইতে পড়িয়া গেল।] দুধ! দুধ! যেন তাদের একটা গো-গৃহ আছে, তাতে শতশত দুগ্ধবতী গাভী আছে। দুধে তারা স্নান করে, দুধই তারা পান করে—সেখানে জল মেলেনা, শুধু দুধ আর দুধ!—কন্যা তোমার দুধের সাগরে সাঁতার কাটছে দেখে এসেছ, না?

মালবী ॥ [ইতিমধ্যে এক পাত্র জল আনিয়া] জল, নাও—

অশ্বপতি ॥ রক্ষা কর—আমায় রক্ষা কর। জল চাইলেই কি কেউ জল পায়? তার যখন পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে আসে তখন হয়তো কুটীরের কলসে জল নাই! তখন হয়তো মধ্যাহ্ন! সেই মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রচণ্ড অগ্নি বর্ষণ মাথায় করে পিপাসার্ত মা আমার নদীপথে ছুটলো—নদীতটে অগ্নিময় বালুকারাশি তার পা দু'খানি পুড়িয়ে দিল—সম্মুখে নদীবক্ষে শীতল জল—সে চোখে চেয়ে দেখলো—কিন্তু—আর একপদ অগ্রসর হতে পারল না—মা আমার দগ্ধ-পদে দ্বিগুণিত পিপাসায় দগ্ধ হয়ে গৃহে ফিরে এল, এল কি, এল না—কে খোঁজ নিল!

মালবী ॥ এ তোমার কল্পনা মাত্র। স্বামী-সঙ্গে সে সুখে আছে।

অশ্বপতি ॥ স্বামী-সঙ্গ! স্বামী-সঙ্গ! আর ক'দিন স্বামী-সঙ্গ? [ছুটিয়া গিয়া অক্ষত রেখাগুলি দেখাইলেন—মালবীর পানে তাকাইয়া অস্ফুটস্বরে—শুধু মুখ ব্যাদানে] এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ।

মালবী ॥ তুমিই বলেছ—তোমার ভুল হয়েছে। পাঁচ দিন নয়, এখনো হয়তো দশ দিন—হয়তো এক মাস—

অশ্বপতি ॥ [দৃঢ়তায়] ভুল নয়—ভুল নয়। এ যদি আমার ভুল হয়ে থাকে, তবে—তবে আমি যে তার পিতা—তাও ভুল। জান রানী একটি করে দিন গেছে—একটি করে রেখা কেটে দিয়েছি, আমার বুকের একটি করে শির ছিঁড়ে গিয়েছে। কি করে ভুল হয়, ভুল হতেই পারেনা আর ভুল যদি হয়েই থাকে তবে তা হয়েছে কমের দিকে—বেশীর দিকে নয়—বেশীর দিকে নয়—। আর আছে মাত্র পাঁচ দিন,—পাঁচ দিনও নয়। রাত্রি শেষ হ'য়ে আসছে! এই রাত্রি শেষে আর থাকবে মাত্র চার দিন। আর চারটি দিন মাত্র তার সীমন্তে সিন্দুর রেখা শোভা পাবে—হস্তে স্বর্ণবলয়।

[বলিতেই মনে পড়িল, তাহার স্বর্ণবলয়, স্বর্ণালঙ্কার সাবিত্রীর অঙ্গে নহে তাহারই বুকে। তৎক্ষণাৎ বুক চাপিয়া ধরিলেন]

মালবী ॥ সে তো স্বর্ণবলয় নিয়ে যায়নি—কোন অলঙ্কারই সে নেয়নি—সে গেছে নিরাভরণা হয়ে, মাথায় সিন্দুর দিয়ে, হাতে শাঁখা পরে—

অশ্বপতি ॥ কেন যায়? কেন তার অলঙ্কার এখানে ফেলে যায়? সে অলঙ্কারের বোঝা কে টানে? আমি পারিনে—এ বোঝা বইতে আমি আর পারিনে।

মালবী ॥ তোমার কাছে! তবে যে তার পরিত্যক্ত ঐ অলঙ্কার চুরি গিয়েছিল—সে কথা মিথ্যা?

অশ্বপতি ॥ সে চোর আমি—সে চোর আমি। শুধু কি তার অলঙ্কার চুরি করে বুকে পুরে রেখেছি—আমার ইচ্ছা হয়—ইচ্ছা হয়—

নালবী ॥ কি?

অশ্বপতি ॥ তাকে শুদ্ধ চুরি করে এনে বুকের ভিতরে ভরে রাখি। আর শুধু কি তাকে?

মালবী ॥ তবে?

অশ্বপতি ॥ যে ওকে আমার বুক হতে চুরি করে নিয়ে গেছে—তাকেও—তাকেও—

মালবী ॥ সত্যবান?

অশ্বপতি ॥ চুপ্! চুপ্—

মালবী ॥ বল—বল—সত্যবান?

অশ্বপতি ॥ সাবধান—রানী সাবধান?

মালবী ॥ থাক। রাত্রি শেষ হয়ে এল—

অশ্বপতি ॥ রাত্রি শেষ হয়ে এল! [বাতায়ন-পাশে ছুটিয়া গিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিয়া মালবীর প্রতি সকাতরে] যাও, আমি ঘুমোবো—

মালবী ॥ আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দি—

অশ্বপতি ॥ সে দিত—সে দিত—

মালবী ॥ স্বামী ! প্রভু ! কেন তবে এই মর্মান্তিক যাতনা সহ্য করছ ! চল—বনে চল—তার কুটিরে চল—

অশ্বপতি ॥ সাবধান—তার কুটির নয়—তার কুটির নয়, সে আমার পরম শত্রুর কুটির ! তুমি এখন এসো রানী ! আমায় বিরক্ত করোনা—আমি এখন ঘুমোবো—
[শয্যায় মাথা রাখিলেন, মালবী দ্বিধান্বিত চিত্তে চলিয়া গেলেন]

অশ্বপতি ॥ [নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া ছিলেন মাত্র। রানী চলিয়া গেলে, উঠিয়া নিঃসন্দেহ হইলেন, রানী চলিয়া গিয়াছেন। তখন…] রাক্ষসী রাত্রি দুর্নিবার গতিতে ছুটে চলেছে। ওকে কি ধরে রাখা যায় না ? কিছুতেই যায় না ? কিছুতেই যায় না ? মাথা খুঁড়েও না ?—মাথা খুঁড়েও না ? [মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ] যায় না ত !—কতদিনের কত অশ্রু, কত ভিক্ষা, কত অনুনয়……ওর ঐ দুর্নিবার গতি এতটুকু শিথিল করতে পারেনি ! চলেছে—ছুটে চলেছে—ভীমা ভয়ঙ্করী চক্ষু বুজে দুর্নিবার গতিতে ছুটে চলেছে—তারই ছায়ায় ছায়ায় ছুটে চলেছে মৃত্যু—নির্মম নিষ্ঠুর মৃত্যু।……রাত্রি প্রভাতেই, জয়দৃপ্ত ঐ মৃত্যু প্রসন্ন সূর্যের অন্তরাল থেকে মৃদুহাস্যে আমায় বলবে আর একটি রেখাও কাট। থাকছে…এক—দুই—তিন—চার—মাত্র চারটি দিন—আর চারটি মাত্র দিন সে সধবা আর চারটি মাত্র দিন সীমন্তে তার সিন্দুর রেখা, হস্তে শাঁখার শোভা ! সেই অপূর্ব মূর্তি, সেই অপরূপ বধূ বেশ…পিতা হয়ে আমি একটি দিনও দেখিনি…একটি বারও কি দেখব না ? দেখব। দেখব পিতা আমি…[মুহূর্তে অলঙ্কারের পেটিকা বক্ষে লইয়া শয্যাবরণ বস্ত্রখানিতে আত্মগোপন করিয়া চোরের মত ছুটিতে ছুটিতে] একদিন—একটিবার দেখব—একটিবার শুধু একটিবার।

[যাইতে যাইতেই হঠাৎ স্মরণ হইল অদ্যকার রেখাটি কাটা হয় নাই। কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া আসিলেন। একখানি অঙ্গার লইয়া রেখাটি কাটিয়া দিলেন—মনে হইল তাহার একটি শিরই ছিন্ন হইল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন]

তৃতীয় দৃশ্য

আশ্রমের পুরোভাগ

[পূজোপকরণ লইয়া শাশ্বতী ও আশ্রমবালিকাগণ গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল]

—গান—

কুসুম সুকুমার শ্যামলতনু
হে ফুল দেবতা লহ প্রণাম।
বিটপীলতায় চিকণ পাতায়
ছিটাও হাসি কিশোর শ্যাম ॥

পূজার থালা এ অর্ঘ্য ডালা
এনেছি দিতে তোমার পায়
দেহ শুভবর কুসুম সুন্দর
হউক নিখিল নয়ন আরাম ॥
এ বিশ্ব বিপুল কুসুম দেউল
হউক তোমার ফুল কিশোরঃ
মুরলী করে এস গোলোকবিহারী
হউক ভূলোক আনন্দ ধাম ॥

শাশ্বতী ॥ পূজার আয়োজন তো হল। এখন দরকার একটা পুরোহিত। তাই তো ভাই, একটা পুরোহিত কোথায় পাই?

প্রথমা বালিকা ॥ আমাদের দলে পুরোহিতের মতো চেহারা—[খুঁজিয়া দেখিয়া] ওর [দ্বিতীয়াকে দেখাইল]।

দ্বিতীয়া বালিকা ॥ পুরোহিত হতে আমি খুব রাজি। কিন্তু ভাই, ভাল রকম নৈবিদ্য টৈবিদ্য যোগাড় করেছ তো?

তৃতীয়া বালিকা ॥ দেখেছ? পূজায় নজর নেই, যত নজর ঐ নৈবিদ্যির দিকে! কখনোও তোকে পুরোহিত হতে দেব না। পুরোহিত হব আমি—

চতুর্থা বালিকা ॥ তা বেশ, পুরোহিত হও, কিন্তু ভাগ চাই সমান। কেমন ভাই?

তৃতীয়া বালিকা ॥ কি? পুরোহিতের সঙ্গে সমান ভাগ? তোরা যে আমার প্রসাদ পাবি, কিঞ্চিৎ প্রসাদ—

শাশ্বতী ॥ ও বাবা, তুমিও আবার কিঞ্চিৎ? বড় গণ্ডগোলের কথা দেখছি!

[নারদের প্রবেশ]

নারদ ॥ না আসতেই গণ্ডগোল! ব্যাপার কি?

শাশ্বতী ॥ ওরে বাবা! এ আবার কে?

নারদ ॥ আমি দেবর্ষি।—অজে তোমাদের এখানে ব্যাপার কি?

শাশ্বতী ॥ বলতে পারি, যদি আপনি আমাদের একটা কাজ করেন। বলুন রাজী?

নারদ ॥ হ্যাঁ, রাজী, তবে একটি কাজ পারব না—

শাশ্বতী ॥ সে কাজটা কি?

নারদ ॥ বিয়ে।

শাশ্বতী ॥ আমাদের তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোমায় বিয়ে করতে বলব! কনে যেন তোমার জন্য গড়াগড়ি যাচ্ছে—।

নারদ ॥ থাক—থাক। কলহে কাজ নেই। তোমাদের কি কাজ বল—

শাশ্বতী ॥ তবে শুনুন। ঠিক এক বছর আগে, এই দিনে, এক রাজকন্যা এখানে শুভ পদার্পণ করেন—

নারদ ॥ সাবিত্রী!

শাশ্বতী ॥ আমাদের এখানেও এক রাজপুত্র ছিলেন—

নারদ ॥ সত্যবান! তারপর?

শাশ্বতী ॥ এক দেবতা সেদিন দু'জনের শুভদৃষ্টি সংঘটন করেন।

নারদ ॥ দেবতা?

শাশ্বতী। হ্যাঁ দেবতা।

নারদ ॥ কোন দেবতা?

শাশ্বতী ॥ ইনি—

[তাহার বুকে সুসজ্জিত মীনকেতন ছিল। তাহা নারদের সম্মুখে লইয়া গেলেন]

নারদ ॥ দেবতা। আরে এটা তো একটা রাজহাঁস—!

শাশ্বতী ॥ বিয়ের নামে ভয় পাও—এর মর্ম তুমি কি বুঝবে? ইনি হচ্ছেন মীন-কেতন। এ'রই কল্যাণে সাবিত্রী-সত্যবানে মিলন হয়েছে। আজ সেই দিনের স্মৃতিপূজা—

প্রথমা বালিকা ॥ আবার চারদিন পরে আমাদের আর একটা উৎসব আছে—সেই দিন হয়েছিল দাদার বিয়ে—

নারদ ॥ হুঁ, সাবিত্রী কোথায়—সত্যবানই বা কই?

শাশ্বতী ॥ বৌ আমাদের খেলায় যোগ দিচ্ছে না বলে—দাদাকে পাঠিয়েছি বৌকে ধরে আনতে—

তৃতীয়া বালিকা ॥ ঐ তারা আসছে।

[সত্যবান ও সাবিত্রীর প্রবেশ]

সত্যবান ॥ এই নাও—তোমাদের বৌ এসেছে—এইবার তো হ'ল—

শাশ্বতী ॥ আমরাও এই পুতুল পেয়েছি—

সাবিত্রী ॥ [নারদকে দেখিয়া ভয়-কম্পিতস্বরে] দেবর্ষি!

নারদ ॥ হ্যাঁ, আমি। এই পথে যাচ্ছিলাম···আশ্রমে উৎসব দেখলাম...তোমার কথাটি মনে পড়ল। তোমায় দেখতে এলাম।···সুখে আছ মা?

সাবিত্রী ॥ সুখে আছি—সুখে আছি—সুখেই আছি!

সত্যবান ॥ হ্যাঁ, সুখে আছে। কেমন সুখে আছে, বলব?

নারদ ॥ হ্যাঁ, শুনে রাখা ভাল। ওর পিত্রালয়ে আমার গতিবিধি আছে। বলা যাবে—।

সাবিত্রী ॥ না—না—, কিছু বলতে হবেনা। আমি সুখে আছি, খুব সুখে আছি, খুব—খুব—

সত্যবান ॥ সারাটি দিন ওর মুখে হাসি নাই। সে কথা ওকে যেই বলি ওর মুখে অমনি ম্লান হাসি ফুটে ওঠে। তা দেখে আমার মনে হয়, ও যদি চীৎকার করে কাঁদতো, তাও হয়তো সইতে পারতাম, কিন্তু সেই ম্লানহাসি···না—না···সইতে পারি না—সইতে পারি না!

সাবিত্রী ॥ [অশ্রু গোপন করিয়া লোক দেখানো আনন্দোচ্ছাসে শাশ্বতীদের প্রতি] এস আমরা খেলি—এস ভাই এস। কিন্তু, কি খেলা খেলব? আজ কি খেলা খেলব? [অর্থহীন হাস্য, চোখে জল।]

সত্যবান। তাও তোমায় বলে দিতে হবে সাবিত্রী? আজ যে দশমী ঠিক একটি বছর পূর্বে...এই দিনে—

শাশ্বতী ॥ তোমাদের শুভদৃষ্টি হয়। সেই শুভদৃষ্টির স্মৃতি উৎসব আজ।

সত্যবান ॥ অথচ সুখী সাবিত্রী সে কথাটি ভুলে গেছে—!

নারদ ॥ কিন্তু এ কথাটিও কি ভুলে গেছ যে তারই চারদিন পর হয় বিবাহ, এবং আগামী কৃষ্ণাচতুর্দশীতেই—

সাবিত্রী ॥ স্তব্ধ হও যদি দেবতা হও, যদি ঋষি হও—কণ্ঠ তোমার স্তব্ধ হোক। [তখনি তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া সাশ্রুনেত্রে] পরিবর্তে আমায় নীরবে আশীর্বাদ কর—আশীর্বাদ কর—আমার সীমন্তের এই সিন্দুর অক্ষয় হোক—

[নারদ একহাতে মুখ ঢাকিয়া অন্যহাত সাবিত্রীর মাথায় রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন]

———

চতুর্থ দৃশ্য

আশ্রম

সত্যবান ও শৈব্যা

সত্যবান ॥ মা—

শৈব্যা ॥ কি বাবা—

সত্যবান ॥ তোমাদের বৌকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দাও—

শৈব্যা ॥ সে কি যেতে চাইছে?

সত্যবান ॥ সে মুখ ফুটে কিছু বলেনা। তা যদি বলত তবে হয়ত তাকে বুঝতাম। কিন্তু সে কথা বলেনা। তার মুখে হাসি নেই। তার বুকে কি এক গোপন দুঃখ। সে এখানে সুখে নেই মা—সুখে নেই—

শৈব্যা ॥ আমিও তা লক্ষ্য করেছি বাবা।

সত্যবান ॥ ও যেন সর্বদাই কি এক নিদারুণ অমঙ্গল আশঙ্কা করছে। দেবর্ষি নারদ এসে ওকে কি জিজ্ঞাসা করলেন তখনি ও জ্বলে উঠল—তাকে কথাটি কইতে

দিলে না—কিন্তু পরক্ষণেই তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে আশীর্বাদ চাইলে—সীমন্তের সিন্দুর অক্ষয় হোক। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম—দেবর্ষি সে আশীর্বাদ করতে কেঁপে উঠলেন!

শৈব্যা ॥ না—তা কেন হবে বাবা! মেয়েরা যখন আশীর্বাদ চায় তখন ধন সম্পদ—রূপ যৌবন না চেয়ে ঐ আশীর্বাদই চায়। আমার মাও তাই চেয়েছিল বাবা। মা আমার লক্ষ্মী—চঞ্চলা লক্ষ্মী নয়—ধীর, স্থির, অচঞ্চলা লক্ষ্মী।

সত্যবান ॥ লক্ষ্মী খুব ভাল কথা মা, কিন্তু লক্ষ্মী ঠাকরুণ যে হাসবেন না—সব সময়ই তাঁর বাহন পেঁচাটির মতন মুখ ভার করে—

শৈব্যা ॥ দাঁড়া তো [সত্যবানকে তাড়না, সত্যবানের পলায়ন-তৎপশ্চাতে শৈব্যা]

[বিপরীত দিক হইতে সাবিত্রীর প্রবেশ ও গীত]

কেন করুণ সুরে হৃদয় পুরে বাজিছে বাঁশরী।
ঘনায় গহন নীরদ সঘন নয়ন মন ভরি
বিজলী চমকে পবন দমকে পরাণ কাঁপে রে;
বুকের বঁধুরে বুকে বেঁধে ঝুরে বিধুরা কিশোরী॥

[গীতান্তে শাশ্বতীর প্রবেশ]

শাশ্বতী ॥ হ্যাঁ বৌ, ব্যাপার কি? সেই অনামুখো লোকটা তিথির খবর জিজ্ঞেস করতেই তোর চোখ জ্বলে উঠল—তখনই আবার চোখের জলে ভেসে গেলি—সে জল তোর চোখ থেকে আর গেল না,—কি হয়েছে ভাই, বল না! বাপ-মার জন্য মন কেমন করছে ভাই?

সাবিত্রী ॥ বাপ-মার জন্য কার মন ব্যাকুল না হয় ভাই?

শাশ্বতী ॥ তবে না হয় বাপের বাড়ি গিয়ে দু'দিন থেকে আয়।

সাবিত্রী ॥ এখান থেকে আমার এক পাও নড়বার যো নেই—

শাশ্বতী ॥ বৌ হবার তো বিপদ কম নয়—শশুরবাড়িতে থাকা চলে না—আবার বাপের বাড়িতেও যাওয়া চলে না! তা বেশ তো ভাই, দু'বাড়িতে তো পত্রালাপ চলতে পারে—

[পত্র হস্তে সত্যবানের প্রবেশ]

সত্যবাণ ॥ সাবিত্রী—[পত্রখানি সম্মুখে ধরিলেন]

সাবিত্রী ॥ পত্র!

সত্যবান ॥ তোমার মার। তোমায় তোমার মা পত্র পাঠিয়েছেন—

সাবিত্রী ॥ আমায় দাও—আমায় দাও—

সত্যবান ॥ দেবো। যদি তুমি একটি গান গাও—

সাবিত্রী ॥ গান? গান? কি করে গাই? কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে—আমি পারি না—আমি পারব না—

সত্যবান ॥ যখন তোমায় পাইনি, তখন কল্পনায় দেখেছি তুমি অপরূপা—

নৃত্যে-গীতে অতুলনীয়া—হাস্যে-লাস্যে বিশ্বজয়ী! কিন্তু যখন তোমায় পেলাম, তখন, তুমি প্রাণহীনা—পাষাণী!

সাবিত্রী ॥ তুমি বুঝবে না,—তা তুমি বুঝবে না—আমার অদৃষ্ট—আমার অদৃষ্ট! দাও—দাও—আমার পত্র আমায় দাও—

সত্যবান ॥ পত্রই তোমার সব?—আমি কি তোমার কেউ নই?

সাবিত্রী ॥ [কাঁদিতে কাঁদিতে] তুমি বুঝবে না—বুঝবে না!

সত্যবান ॥ বুঝেছি। রাজকন্যার নৃত্য—রাজকন্যার সঙ্গীত দেখবার বা শোনবার অধিকার আমার নেই।

সাবিত্রী ॥ না—না—তা নয়—তা নয়…

সত্যবান ॥ হ্যাঁ তাই। আমার অধিকার নাই, কারণ আমি বিশ্বের নিঃস্ব ভিক্ষুক।

সাবিত্রী ॥ এ যে কত বড় অসত্য।

সত্যবান ॥ এ যে কত বড় সত্য—তা আমি মর্মে মর্মে বুঝেছি। তা না হ'লে এ কি করে সম্ভব হয় যে তুমি আমার সহস্র অনুরোধেও [হঠাৎ ভাবাবেগ দমন করিয়া] রাজকন্যা, রাজপুরীর পত্র নাও।

সাবিত্রী ॥ [স্তম্ভিত হইয়া] থাক।

সত্যবান ॥ থাকবে কেন?—নাও।

সাবিত্রী ॥ না।

সত্যবান ॥ এ পত্র এসেছে তোমার পিত্রালয় হতে। পিত্রালয়ের সংবাদ আছে এ পত্রে। আমার উপরই তোমার ঘৃণা,…পত্রের উপর নয়!

[সাবিত্রী কোন কথা বলিতে পাড়িলেন না।]

সত্যবান ॥ আচ্ছা বেশ তবে আমিই পড়ি—তুমি শোনো।

সাবিত্রী ॥ [চমকিয়া উঠিলেন] না—না—

সত্যবান ॥ কেন?

সাবিত্রী ॥ না জানি ওতে কি দুঃসংবাদ আছে!

সত্যবান ॥ তা হ'লে সেটা আমারই আগে জানা কর্তব্য!

সাবিত্রী ॥ না—না—এমন দুঃসংবাদ থাকতে পারে, যা আমি জানলেও তোমায় জানতে দিতে পারিনা—কিছুতেই না।

সত্যবান ॥ বটে?

সাবিত্রী ॥ হ্যাঁ!

সতবান ॥ তুমি আমায় এতটুকুও আপনার ভাবতে পার না সাবিত্রী!

সাবিত্রী ॥ কি করব? আমার অদৃষ্ট! আমার অদৃষ্ট!

[সত্যবান পত্রটি সাবিত্রীর হাতে গুঁজিয়া দিলেন এবং পার্শ্বস্থ বেদীর দিকে অগ্রসর হইলেন, হঠাৎ থামিয়া সাবিত্রীকে একবার দেখিয়া লইলেন, কি বলিতে চাহিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না। অশ্রু সম্বরণ করিয়া পার্শ্বস্থ বেদীর উপর গিয়া দুই গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, কি ভাবিতে লাগিলেন।]

সাবিত্রী ॥ [প্রচণ্ড উত্তেজনায় পত্র লইয়া পড়িলেন। পড়া শেষ হইলে ধীরে ধীরে সত্যবানের দিকে অগ্রসর হইলেন, সত্যবানের সম্মুখে চিঠি ধরিয়া] এই নাও পড়।

সত্যবান ॥ আমি পরের পত্র পড়িনা।

সাবিত্রী ॥ তবে আমিই পড়ি।

[সত্যবান নিরুত্তর]

সাবিত্রী ॥ লিখেছেন মা। "মাগো আমি স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পাইয়া সত্যবানের মঙ্গলার্থে তোমাকে আজ বিশেষ একটি বার্তা পাঠাইতেছি। কাল হইতে তুমি ত্রিরাত্রী উপবাস করিয়া সাবিত্রীদেবীর ব্রত করিবে। তাহার নিয়ম সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিলাম। তুমি কায়মনোবাক্যে অক্ষরে অক্ষরে তাহা প্রতিপালন করিবে।"

সত্যবান ॥ ক'রো। তোমার প্রাণ যা চায় তাই ক'রো। আমি একটু ঘুমাবো—আমাকে ঘুমাতে দাও।

[কুটীর অভ্যন্তরে প্রস্থান]

সাবিত্রী ॥ [কুটীর দরজা পর্যন্ত গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া পত্রের বাকি অংশ পাঠান্তে] মা আমার, তোমার পত্রে মনে বল পেলাম,—সাহস পেলাম, কিন্তু মা, পিতার হাতের একটি অক্ষরও তো পেলাম না। ওগো আমার পাগল পিতা! তুমি কি সত্য সত্যই আমায় একেবারে বিসর্জন দিয়েছ! একেবারে ভুলে গেছ!

[আশ্রমে অশ্বপতির প্রবেশ]

অশ্বপতি ॥ [প্রবেশ করিতে করিতে] মা আমার! আমি ভুলব তোমায়—আমি বিসর্জন দেব তোমায়!

সাবিত্রী ॥ [সচকিতা ও বিস্মিতা] বাবা!

অশ্বপতি ॥ মা···মা আমার [দুই বাহু প্রসারণ করিলেন]

[সাবিত্রী অশ্বপতির ব্যগ্র বাহুবন্ধনে ধরা দিলেন। উভয়ে শুধু অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন]

সাবিত্রী ॥ তুমি কাঁদো কেন বাবা? আমি ওঁকে ডাকি, তুমি ওঁকে আশীর্বাদ কর, ও তোমাকে প্রণাম করুক—

অশ্বপতি ॥ না...না...[তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন] কিন্তু—কি শোভা কি অপূর্ব এই শোভা! সৃষ্টির শোভা নারী, নারীর শোভা তার সীমন্তের সিন্দুর হাতের শঙ্খ-বলয়...

সাবিত্রী ॥ [কাঁদিয়া] বাবা! আর মাত্র তিনটি দিন—আর মাত্র তিনটি দিন!

অশ্বপতি ॥ অথচ যদি তুই মা তখন...

সাবিত্রী ॥ পিতা!

অশ্বপতি ॥ যদি তুই আমার কথা রাখতিস...দেবর্ষির কথা রাখতিস!

সাবিত্রী ॥ পিতা!

অশ্বপতি। ঐ বনবাসীভিক্ষুক-পুত্রের গলে বরমাল্য অর্পণ না করে, ঐ মরণশীল মানবকে স্বামীত্ব বরণ না করে যদি…

সাবিত্রী ॥ পিতা ! [তাহার বাহুপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া] ফিরে যাও তুমি তোমার প্রাসাদে—এখনি এই মুহূর্তে—

অশ্বপতি ॥ তুইও আয় মা—তুইও আয়—

সাবিত্রী ॥ কেন ? কেন ? তুমি রাজা…এই দারিদ্র্য—এই ভিক্ষা-বৃত্তি তুমি ঘৃণা কর। কিন্তু আমি দরিদ্রের গৃহিণী—ভিক্ষুকের পত্নী—আমার স্বামীর এই কুটীরই আমার স্বর্গ, তাঁর দারিদ্র্যই আমার শ্রেয়, তাঁর ভিক্ষান্নই আমার প্রিয় ! জানি উনি কোন মৃত্যুঞ্জয় দেবতা নন। জানি আমার স্বামী স্বল্পায়ু মরণ শীল মানব—তথাপি, তিনি আমার স্বামী, আমার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—ইহকাল পরকাল, ভূলোকে দ্যুলোকে, মর্ত্যে স্বর্গে, চিরকাল—চিরকাল .

অশ্বপতি ॥ থাক তবে—থাক [প্রস্থান কালে ফিরিয়া] কিন্তু এ বোঝা যে আর আমি বইতে পারিনে [অলঙ্কারের পেটিকা বাহির করিয়া] চুরি করে বুকে পুরে রেখেছিলাম তোর এই বোঝা…শুধু এই মনে করে যে এ আমার সাবিত্রীর—সাবিত্রীর ! ফিরিয়ে নে.—ফিরিয়ে নে—ওরে তোর অলঙ্কার তুই ফিরিয়ে নে।

সাবিত্রী ॥ দাও [গ্রহণ করিয়া] আমার স্মৃতি কাউকে আঘাত করে…দগ্ধ করে এ আমি চাই না ! পিতা, তোমার সাবিত্রীকে ভুলে যাও পিতা। [প্রণাম]

সত্যবান ॥ [কুটিরাভ্যন্তরে অর্দ্ধজাগ্রত হইয়া] সাবিত্রী ! সাবিত্রী !

সাবিত্রী ॥ যাই প্রভু !

অশ্বপতি ॥ [সত্যবানকে জাগরিত দেখিয়া প্রস্থানোদ্দেশ্যে অস্ফুট কণ্ঠে] বিদায় মা বিদায়।

[সাবিত্রী নীরবে কাঁদিতেছিলেন। অশ্বপতি কিন্তু যাইতে পারিলেন না, পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন, পশ্চাৎ হইতে কম্পিত হস্তে।]

অশ্বপতি ॥ দাও—দাও—

সাবিত্রী ॥ কি ?

অশ্বপতি ॥ ঐ বোঝা। ও আমার বুকেই থাক—নইলে কি নিয়ে আমি বাঁচব ? কি নিয়ে আমি বাঁচব ?

সাবিত্রী ॥ নাও—[তাহার হাতে অলঙ্কারের পেটিকা প্রত্যার্পণ করিলেন]

[অশ্বপতি তৎক্ষণাৎ তাহা বুকে লুকাইয়া সাবিত্রীকে যেন শেষ দেখা দেখিতে লাগিলেন।

সত্যবান ॥ [কুটিরাভ্যন্তরে] কে ?—কে ?—কে ওখানে ?

[সত্যবানের এই এক একটি প্রশ্ন অশ্বপতিকে তাড়না করিতে লাগিল, অশ্বপতি সত্যবানের দৃষ্টির অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন। সত্যবানের প্রবেশ]

সত্যবান ॥ সাবিত্রী !…আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, তোমার পিতা স্বর্ণরথ নিয়ে এসেছিলেন তোমায় নিয়ে যেতে কিন্তু, তুমি…গেলে না, রথ ফিরিয়ে দিলে। বললে…, কি বললে ?

সাবিত্রী ॥ ওগো, তোমায় ছেড়ে আমি যেতে পারব না—তোমায় ছেড়ে আমি যেতে পারব না।

[সত্যবানের বুকে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন]

———

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আশ্রম / ঊষা

[দ্যুমৎসেন ও শৈব্যা]

দ্যুমৎসেন ॥ আজ তিনদিন উপবাসে ?

শৈব্যা ॥ তিনদিন উপবাসে।

দ্যুমৎসেন ॥ কেন ? কেন ?

শৈব্যা ॥ আমায় এসে বলল, মা আমি ত্রিরাত্রী ব্রত করব। আমি বললাম, করবে বই কি মা। ও তো বধূদেরই ধর্ম। তখন আমি অত বুঝিনি !

দ্যুমৎসেন ॥ তারপর ?

শৈব্যা ॥ পরশুদিন প্রভাতে স্নান সমাপনান্তে সে ধ্যানস্থা হল—সে ধ্যান তার আজো ভাঙ্গেনি—

দ্যুমৎসেন ॥ এ তিনদিন তার মুখে তবে জল পর্যন্ত পড়েনি ?

শৈব্যা ॥ না। কতবার তার কাছে গিয়েছি, ডেকেওছি, সাড়া পাইনি। ধ্যান ভাঙ্গতে সাহস পাইনি। কি জানি যদি ব্রত ভঙ্গ হয় !

দ্যুমৎসেন ॥ ও যে রাজকন্যা ! আজন্ম সুখে স্বচ্ছন্দে বিলাসে প্রতিপালিতা। ওর কি এই কৃচ্ছ্র সাধন সহ্য হবে।···শৈব্যা—শৈব্যা···ওর কেন এই তপশ্চর্য্যা ? কেন এই কঠোর তপস্যা ?

শৈব্যা ॥ জানিনা নাথ। বিবাহের পর প্রথম যখন এল, তখন দেখতাম ওকে আনন্দ প্রতিমা, তার পর যতই দিন যাচ্ছে, ততই দেখছি মা আমার বিষাদে আচ্ছন্ন হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করেছি, উত্তর পাইনি, শুধু একটু ম্লান হাসি ওর মুখে ফুটে উঠেছে, বলেছে, "কই মা আমি তো খুবই সুখে আছি !"

দ্যুমৎসেন ॥ মা আমার রাজকন্যা ! দরিদ্রের কুটীরে হয়ত তার সাধ পুরছেনা—

শৈব্যা ॥ তাই বা কি করে বলি, নাথ ! মা যে, আমার স্বয়ম্বরা, জেনে শুনেই তো···শুধু তাই বা কেন, পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে—পিতার আদেশ অমান্য করে—সে আমার দরিদ্র-পুত্রকে বরমাল্য অর্পণ করেছে—

দ্যুমৎসেন ॥ তবে হয়তো—তবে কি সত্যবানই মাকে—অনাদর করে ?

শৈব্যা ॥ এর চেয়েও আর মিথ্যা কিছু নাই। পুত্র আমার সাবিত্রী বলতে অজ্ঞান। সাবিত্রী উপবাসে রয়েছে বলে পুত্রও উপবাসী রয়েছে।

দ্যুমৎসেন ॥ কিছুই আমি বুঝছি না—কিছুই না···সত্যবান—কোথায় সে ?

শৈব্যা ॥ বনে। সে বন হতে রাজ্যের ফল এনে জড় করেছে।

দ্যুমৎসেন ॥ কেন ?

শৈব্যা ॥ ব্রত ভঙ্গের পর সাবিত্রীকে খাওয়াবে। সাবিত্রী খাবে একটি কি দু'টি ফল, খাবে কি খাবেনা, তার ঠিক নেই, কিন্তু, পুত্র আমার পাগল। সারাদিন শুধু ফলই আনছে, ফুলই আনছে, কত রকমের—কত রূপের !

[শাশ্বতীর প্রবেশ]

শাশ্বতী ॥ মা, বৌর ধ্যান ভেঙ্গেছে।

দ্যুমৎসেন ॥ ভেঙ্গেছে ? ভেঙ্গেছে ? চল শৈব্যা চল—মার কাছে আমায় নিয়ে চল—

শৈব্যা ॥ এস—

[উভয়ে প্রস্থান করিলেন। শাশ্বতী একটি ফুলের মালা গাঁথিতেছিল, সেও মালা গাঁথিতে গাঁথিতে তাঁহাদের অনুগামিনী হইতেছিল, এমন সময় অন্যদিক হইতে সত্যবানের প্রবেশ। সত্যবান যেন বন উজাড় করিয়া ফল এবং ফুল আনিয়াছেন। তিনি সঙ্কেতে শাশ্বতীকে ডাকিলেন। শাশ্বতী ফিরিয়া তাকাইল, দেখিল সত্যবান। হাতের মালা ফেলিয়া দিয়া সত্যবানের কাছে ছুটিয়া আসিল এবং তাহার ফলফুল ভূতলে নামাইয়া রাখিতে গেল।]

সত্যবান ॥ ওরে আগে শোন।

শাশ্বতী ॥ দাঁড়াও [একটি ফলে কামড় দিয়া] বল—

সত্যবান ॥ সে কি এখনো ধ্যানে ? ব্রত তার শেষ হয়নি ?

[শাশ্বতী ফল খাইয়া যাইতে লাগিল]

সত্যবান ॥ ওরে,—বল—বল—

শাশ্বতী ॥ ভেবে বলব তো ? [ফল খাইয়া যাইতে লাগিল]

সত্যবান ॥ এতে ভেবে বলবার কি আছে ? দেখিসনি ? ওরে, তুই দেখিসনি ?

শাশ্বতী ॥ [খাইতে খাইতে] দাঁড়াও মনে করছি—

সত্যবান ॥ [তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বতীর মুখ হাঁ হইল। মুখ হইতে অর্দ্ধভুক্ত ফলটি পড়িয়া গেল।] বল—

শাশ্বতী ॥ উ—উ—উ—

সত্যবান ॥ [হাত ছাড়িয়া দিয়া] বেশ, এইবার বল—

শাশ্বতী ॥ কি যেন জিজ্ঞাসা করছিলে ?

সত্যবান ॥ সাবিত্রীর খবর। সে কি এখনো ধ্যানে ? ব্রত কি এখনো তার শেষ হয়নি ?

শাশ্বতী ॥ শেষ হয়েছে ক—খ—ন !

সত্যবান ॥ হয়েছে ? শেষ হয়েছে ?

শাশ্বতী ॥ এতক্ষণ শেষ হয়েছে যে আবার বুঝি শুরু হল—

সত্যবান ॥ বটে ! সাবিত্রী…সাবিত্রী…

(সাবিত্রীর উদ্দেশ্যে ছুটিয়া প্রস্থান)

গীত

শাশ্বতী ॥

বন বিহারিণী চপল হরিণী
চিনি আঁখিতে চিনি কানন নটিনীরে
ছুটে চলে যেন বাঁধ ভাঙা তটিনীরে
নেচে নেচে চলে ঝর্ণার তীরে তীরে।
ছায়া বীথি তলে কভু ধীরে চলে
চকিতে পলায় ছুটি ছায়া হেরি গিরি শিরে ॥

[শাশ্বতীর প্রস্থান। সাবিত্রীকে লইয়া সত্যবানের পুনঃপ্রবেশ, সাবিত্রীর হাতে পুজোপকরণ]

সাবিত্রী ॥ ছাড়ো—আমায় একটি বার ছেড়ে দাও—

সত্যবান ॥ আমি তোমায় ছেড়ে দিলে তুমি পড়ে যাবে। তিন তিনটে দিন তুমি উপবাসে রয়েছ। একবিন্দু জল পর্য্যন্ত তোমার মুখে পড়েনি।…তুমি এখানে বসবে, আমি তোমায় খাওয়াবো। তিন দিন তোমার জন্য কোন ফল আনতে বাকী রাখিনি—ফলের পর তোমায় দেব ফুল…এফুল নয়, ওফুলও নয়…গহন বনের গোপন ফুল…[বুক হইতে পুষ্পস্তবকের কিয়দংশ বাহির করিয়া দেখাইয়াই তখনি তাহা লুকাইয়া] কিন্তু আগে নয়—আগে ফল, তবে ফুল—

সাবিত্রী ॥ ছাড়ো—একটিবার আমায় ছাড়ো—। আমি পড়ব না …তুমি দেখ [সত্যবান হইতে বিমুক্ত হইয়া তাহাকে পূজা করিলেন।]

সত্যবান ॥ সাবিত্রী ! সাবিত্রী ! তুমি কাঁদছ ?

সাবিত্রী ॥ [কাঁদিয়া] না—

সত্যবান ॥ না ! তোমার চোখের জল আমার পায়ে পড়ল ; তবু না ? এই যে এখনো…এখনো তুমি কাঁদছো !

সাবিত্রী ॥ [পূজা শেষ করিয়া প্রণামান্তে সত্যবাণের চরণ দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া] তুমি বল আমায় ছেড়ে আজ কোথাও যাবে না—

সত্যবান ॥ সে তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা সাবিত্রী ! আমরা দু'জনে সারাটি দিন আজ একসঙ্গে কাটাব।

সাবিত্রী ॥ এই আশ্রমে—

সত্যবান ॥ আশ্রমে থাকলে যদি তুমি সুখী হও আশ্রমেই থাকবো। তোমার ইচ্ছা…তোমার ইচ্ছা সাবিত্রী।…আশ্রমে বল—আশ্রমে—বনে বল—বনে !

সাবিত্রী ॥ বনে নয়, বনে নয়

সত্যবান ॥ আশ্রমে ?

সাবিত্রী ॥ আশ্রমে ! আশ্রমে এই ছায়াবীথি তলে, এই লতাকুঞ্জ মাঝে তুমি আর আমি—আমি আর তুমি !

সত্যবান ॥ সে তো আমার জীবনের স্বপ্ন সাবিত্রী !···সে হল স্বপ্নের কথা। কিন্তু একটা সত্যকথা ভুললেও তো চলবে না

সাবিত্রী ॥ কি কথা নাথ ?

সত্যবান ॥ তিনদিন তিনরাত্রি তুমি উপবাসে—

সাবিত্রী ॥ হ্যাঁ, আমি যে ত্রিরাত্রি ব্রত করেছিলাম—মা পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন তুমি তো জানো—

সত্যবান ॥ কিন্তু ব্রত তো শেষ হয়েছে। এইবার—

[কয়েকটি ফল অঞ্জলি করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিলেন]

সাবিত্রী ॥ না—না। এখন না। এখন আমি কিছু খেতে পারব না।

সত্যবান ॥ কেন ? কেন সাবিত্রী ?

সাবিত্রী ॥ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত নই। সূর্য্যাস্তের পূর্বে আমি কিছু মুখে দিতে পারবো-না।

সত্যবান ॥ এ কি এই ব্রতেরই নিয়ম সাবিত্রী ?

সাবিত্রী ॥ না প্রভু, না।

সত্যবান ॥ তবে সাবিত্রী, তবে ?

সাবিত্রী ॥ সূর্য্যাস্ত—সূর্য্যাস্ত—আমি আজ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দেখব।···সূর্য্যাস্তের পূর্বে এ গলা দিয়ে কিছু যাবে না—। না না না—

সত্যবান ॥ তোমার হল কি সাবিত্রী ?

সাবিত্রী ॥ আমার মন জানে—কিন্তু···কি যে জানে তা আর কেউ জানবে না—

সত্যবান ॥ তুমি আমায় বল সাবিত্রী, তুমি আমায় বল—

সাবিত্রী ॥ না না না

[ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন]

সত্যবান ॥ এ কি সাবিত্রী ! তুমি ভয়ে কাঁপছ ! তোমার হল কি ?

সাবিত্রী ॥ না না কিছু না।

সত্যবান ॥ বলবে না ?

সাবিত্রী ॥ কি বলব ?

সত্যবান ॥ তুমি অমন উতলা হচ্ছ কেন ?

সাবিত্রী ॥ প্রভু, প্রিয়তম···যদি আমি—

সত্যবান ॥ যদি তুমি—

সাবিত্রী ॥ আজ—

সত্যবান ॥ আজ ?

সাবিত্রী ॥ মরি ?

সত্যবান ॥ সাবিত্রী—

সাবিত্রী ॥ হ্যাঁ, প্রিয়তম ! আমি যদি আজ মরি ?

সত্যবান ॥ সাবিত্রী—সাবিত্রী—

সাবিত্রী ॥ সূর্য্যাস্তের পূর্বে আজ যদি আমার মৃত্যু হয়·· তোমারই সামনে—তোমারই সামনে—

সত্যবান ॥ না না, ও হো হো, না—

সাবিত্রী ॥ কাঁদো কেন ? তুমি কাঁদো কেন ?

সত্যবান ॥ পাষাণী ! পাষাণী ! তোর মুখে এ কি কথা । ওরে—ওরে—[সাবিত্রীকে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া তাঁহারই মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া] তোর মুখে এ কি কথা ? বল···এ তোর ছলনা—এ তোর ছলনা—

সাবিত্রী ॥ এ আমার কামনা ! এ আমার কামনা !

সত্যবান ॥ [তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া] কেন ?

সাবিত্রী ॥ কেন ! কেন নয় ? নারী চায় স্বামী । তুমি আমার স্বামী··· আমার স্বপ্নকে করেছ তুমি সত্য, আমার জীবনকে করেছ তুমি স্বপ্ন । তুমি সফল করেছ আমার কামনা, সার্থক করেছ আমার প্রার্থনা । নারী চায় রূপ । তোমারই কল্যাণে সীমন্তে পেয়েছি সিন্দুর···হাতে পেয়েছি শাঁখা—নারীর শোভা ! জীবন আমার ধন্য ! যৌবন আমার ধন্য ! আজ যদি আমি মরি···দুঃখ নাই···ক্ষোভ নাই···তুমি থাকবে সামনে···সীঁথিতে রইবে সিন্দুর···হাতে থাকবে শাঁখা—

সত্যবান ॥ ভুল—ভুল—ওরে আমার ছলনাময়ী প্রিয়া, এ কথা তোর মিথ্যা । মৃত্যুতে ক্ষোভ নাই ?···ওরে, জীবনের যে এখনো কত বাকী ! যৌবনের তো এই ঘুম ভাঙল ! বনের কত ফুল এখনো জাগেনি ! আকাশের কত তারা এখনো চোখ মেলেনি ! মৃত্যু এখন কে চায় ? মৃত্যু এখন কে চায় ?

সাবিত্রী ॥ ওগো, ওগো···তুমি থামো—তুমি থামো—

সত্যবান ॥ এখনি ? এখনি ? এখনো তো তোমার সে স্বপ্নটি আমি বলিনি । স্বপ্ন দেখেছি—আমি স্বপ্ন দেখেছি—

সাবিত্রী ॥ [ভয়ে, আতঙ্কে] তুমিও স্বপ্ন দেখেছ ? তুমিও ?

সত্যবান ॥ তুমিও বুঝি দেখেছ ?···আমিও !···দেখেছি, তোমার বুকে—তোমার বুকে—

সাবিত্রী ॥ আমার বুকে—?

সত্যবান ॥ সন্তান···[আনন্দে প্রায় নৃত্য করিয়া উঠিয়া] আমার···আমার ! ···চোখে তার মায়া-কাজল···মুখখানি তার হাস্যোজ্জ্বল···মধু হতে মধু, সুধা হতেও সুধা [আমাদের সেই স্বপ্ন-শিশু, এখনো পাইনি তার দেখা !···মৃত্যু এখনই কে চায় ? মৃত্যু এখনই কে চায় !

সাবিত্রী ॥ এত সুখ ! এত আশা !

সত্যবান ॥ শুধু কি তাই ? তারপর—তারপর তুমি আর আমি এক সঙ্গে

যজ্ঞ করব। দশ বছর ধরে হবে সে যজ্ঞ। সেই যজ্ঞে আহুতি দিয়ে আমরা পিতার চক্ষু বর প্রার্থনা করব—

দ্যুমৎসেন ॥ [নেপথ্যে] সত্যবান! সত্যবান!

সত্যবান ॥ [চমকিত হইয়া] পিতা!…ব্যাকুল কণ্ঠে পিতা আমায় ডাকেন! কেন? কেন?

[স্বরলক্ষ্যে ছুটিয়া প্রস্থান]

দ্যুমৎসেন ॥ [নেপথ্যে] আমাদের যাগ-যজ্ঞ-হোম সব বন্ধ। সত্যবান—সত্যবান—

সাবিত্রী ॥ যাগ যজ্ঞ হোম সব বন্ধ! যজ্ঞকাষ্ঠ ত' এনে রেখেছিলাম।…কিন্তু ব্রত আরম্ভ করবার পূর্বে ওদের তা না বলে কি ভুলই করেছি! কেন বলিনি… কেন বলিনি!

[কাষ্ঠ আনিতে ছুটিয়া প্রস্থান]

দ্যুমৎসেন ॥ [নেপথ্যে] কাষ্ঠাহরণ করে বধূমাতা! ছি ঃ

[শৈব্যাসহ দ্যুমৎসেন ও নতমুখে সত্যবান প্রবেশ করিলেন]

দ্যুমৎসেন ॥ বৃক্ষ-ছেদন…কাষ্ঠাহরণ…যজ্ঞকাষ্ঠ চয়ন…এ কার কাজ? পুরুষের না স্ত্রীর?…তোমার না ঐ কুলবধূর?

সত্যবান ॥ আমার। কিন্তু সে—

শৈব্যা ॥ তোমার হাত থেকে সে-কাজ সে কেড়ে নিয়েছে কারণ তোমার পায়ে কাঁটাটি বিঁধলে সে সইতে পারেনা…

সত্যবান ॥ সাবিত্রী! সাবিত্রী! না, থাক্। মা, যজ্ঞায়োজন কর—আমি বৃক্ষ-ছেদন করে যজ্ঞকাষ্ঠ নিয়ে এখনি ছুটে আসছি

[কুঠার লইয়া দ্রুত প্রস্থান]

দ্যুমৎসেন ॥ সাবিত্রী! সাবিত্রী! মা আমার! আজ যে কিছুতেই মনে করতে পারছিনা তুই রাজকন্যা। কেউ কি কখনো দেখেছে—কেউ কি কখনো শুনেছে বনপথে স্বামীর পায়ে কাঁটাটি বিঁধবে ভয়ে স্বামীকে ঘরে রেখে পত্নী করেছে কাষ্ঠাহরণ! ওরে, রাজকন্যা তোর পরিচয় নয়, তোর পরিচয় নয়, তোর পরিচয় তুই "বধু"…দরিদ্রের সংসারে অমরাবতীর মধু! শোকে শান্তি, দুঃখে সান্ত্বনা…আমার কুলবধূ! কুলবধূ!

[যজ্ঞকাষ্ঠ মাথায় লইয়া ক্লান্ত হইলেও ব্যাকুল পদবিক্ষেপে সাবিত্রীর প্রবেশ]

সাবিত্রী ॥ পিতা

শৈব্যা ॥ এ কি মা, তুমি যজ্ঞকাষ্ঠ এনেছ? তবে ও আর গেল কেন?

সাবিত্রী ॥ কে?

শৈব্যা ॥ সত্যবান!

সাবিত্রী ॥ বনে?

শৈব্যা ॥ হ্যাঁ, বনে!

[সাবিত্রী যজ্ঞকাষ্ঠগুলি ফেলিয়া দিলেন]

সাবিত্রী ॥ [মরণাহত হইয়া] কোন পথে ?—কোন পথে ? [ক্লান্তচরণেই টলিতে টলিতে ছুটিতে ছুটিতে] আর্য্যপুত্র ! আর্য্যপুত্র !

[সত্যবানের পথে প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন পথ

[সত্যবান কাঠ কাটিতে চলিয়া গেলেন]

[বনদেবীর গান]

তোর বিদায় বেলার বন্ধুরে
দেখে নে নয়ন পুরে।
সে যায় মিশে ঐ কোন দূরে
দিন শেষের শেষ সুরে ॥
ঘুমের মাঝে বন্ধু তোর
ছিঁড়বে বাহুর বাঁধন ডোর
যাবে নয়ন, রবে নয়ন লোর
যায়রে বিহগ যায় উড়ে ॥
(তুই) বহাবি নদী কেঁদে, পাষাণে হৃদয় বেঁধে
তবু যেতে হবে তায়
অসহায় অচিন পুরে ॥

(পাগলিনী প্রায়-সাবিত্রী সত্যবান উদ্দেশ্যে ছুটিয়া গেলেন)

তৃতীয় দৃশ্য

গহন বন

[সত্যবান একটি বৃদ্ধ বনস্পতি গাত্রে কুঠারাঘাত করিতেছেন। দূরে দেখা গেল সাবিত্রী]

সাবিত্রী ॥ [এক একটি আঘাত যেন তাহারই বুকে পড়িতেছিল।] উঃ—উঃ—উঃ—

সত্যবান ॥ [সাবিত্রী ছুটিয়া আসিয়াও অল্পের জন্য সত্যবানের শেষ আঘাত রোধ করিতে পারিলেন না। বনস্পতি ভূমিসাৎ হইল।] ও—হো—হো—! মাথা জ্বলে গেল ! পুড়ে গেল !

সাবিত্রী ॥ আর্য্যপুত্র ! [সত্যবান ভূপতিত হইতেছিলেন। সাবিত্রী তাহাকে ধরিলেন। সত্যবানের মাথাটি সাবিত্রীর কোলে রহিল।]

সত্যবান ॥ সাবিত্রী ! তুমি ?

সাবিত্রী ॥ মুহূর্তের বিলম্ব…ওগো, আমার এক মুহূর্তের বিলম্ব তারই ফলে—

সত্যবান ॥ সাবিত্রী ! যাই—ওঃ—অন্ধ পিতাকে দেখো—অভাগিনী মাকে—

সাবিত্রী ॥ ওগো—ওগো—

সত্যবান ॥ অভাগিনী তুমি ! জীবনে তোমার মুখে হাসি ফোটাতে পারিনি—পারিনি—পারিনি—

সাবিত্রী ॥ ভুল—ভুল প্রিয়তম—ভুল ! আজকের এই রুদ্র অভিশাপ—তারই আতঙ্ক—তারই আশঙ্কা—আমার এই একটি বছরের প্রতিটি মুহূর্ত…ওগো—শোন শোন কেন আমার মুখে ছিলনা হাসি— মনে ছিলনা শান্তি, শোন—

সত্যবান ॥ শোনবার আর সময় নাই সাবিত্রী। ঐ আমায় কে নিতে এসেছে…আমায় যেতে হবে—যেতেই হবে—নিয়তি ! নিয়তি !

সাবিত্রী ॥ তোমায় আমি যেতে দেবনা—দেবনা—

সত্যবান ॥ [উঠিতে চেষ্টা করিতে করিতে] আমিও যাব না—তোমায় ছেড়ে আমি যাবনা—[কিন্তু তখনই পড়িয়া গেলেন] অন্ধকার। তোমায় যে আর দেখতে পাচ্ছিনা সাবিত্রী—

সাবিত্রী ॥ ওগো—ওগো—

সত্যবান ॥ মনের আশা—মনেই রইল -সাবিত্রী ! বিদায় !

[মৃত্যু]

সাবিত্রী ॥ ওঃ [আর্তনাদ]

[যমের প্রবেশ। সত্যবানের আত্মাহরণ]

সাবিত্রী ॥ কে ? কে তুমি ?

যম ॥ আমি যম।

সাবিত্রী ॥ যম ! স্বামীর জীবন হরণ করবে…পত্নী জীবিত থাকতে ? তা হয়না—হতে পারেনা—হবে না—

[যমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আশ্রম পথ

[দ্যুমৎসেনকে লইয়া শৈব্যার প্রবেশ]

দ্যুমৎসেন ॥ তাদের কি চোখে পড়ছে ? দেখ শৈব্যা, দেখ—ভাল করে দেখ—

[শৈব্যা নীরব রহিলেন]

নীরব কেন তুমি শৈব্যা ? নীরব কেন ?

শৈব্যা ॥ তাদের দেখছিনে প্রভু !

দ্যুমৎসেন ॥ দেখছ না ? তবে ডাক—ডাক—

শৈব্যা ॥ ওরে, তোরা কোথায় ? তোরা কোথায় ?

দ্যুমৎসেন ॥ তোমার ও ডাক তারা শুনতে পাবেনা। কিন্তু আমারই ডাক কি তারা শুনবে ? কণ্ঠ আমার অসাড় হ'য়ে আসছে—

শৈব্যা ॥ তাদের তো কতই ডাকলাম। এইবার ভগবানকে ডাক—

দ্যুমৎসেন ॥ ওদের পেয়ে ভগবানকেও ভুলেছি—ওরাই আমার ভগবান—ওরে সাবিত্রী—ওরে সত্যবান—

শৈব্যা ॥ ভগবানকে ডাকো।—ভগবান—ভগবান—

দ্যুমৎসেন ॥ সত্যবান—সত্যবান—ভগবানকে ডাকতে গিয়ে কণ্ঠে আসে শুধু সত্যবান আর সত্যবান—! ভগবানকে ডাকো তুমি। আমার মনে আমার কণ্ঠে শুধু সাবিত্রী আর সত্যবান—সাবিত্রী আর সত্যবান !

শৈব্যা ॥ প্রভু—প্রভু—আর কেন ? আর কেন ? ঘরে চল, ঘরে চল প্রভু—

দ্যুমৎসেন ॥ ঘরে আমি ফিরবনা—তারা এসে আমায়—হাত ধরে ঘরে না নিলে ঘরে আমি ফিরবনা—ওরে সাবিত্রী—ওরে সত্যবান—

শৈব্যা ॥ ঘরে চল প্রভু, ঘরে চল। হয়ত তারা অন্য পথে ঘরে ফিরেছে··· অথবা, হয়ত আশ্রমবাসীরা তাদের সন্ধান নিয়ে আশ্রমে ফিরেছে। এখানে থেকে লাভ ?

দ্যুমৎসেন ॥ ঘরে আমি ফিরবনা—ঘরে আমি ফিরবনা। ঘরে ফিরব তখন, যখন তারা এসে হাত ধরে আমায় ঘরে নেবে···ঘরে আমি তখনই ফিরব, নইলে···না—না—ঘরে আমি আর ফিরবনা—

শৈব্যা ॥ তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর। আমি গিয়ে দেখে আসি—

দ্যুমৎসেন ॥ তাই যাও—তাই যাও—

[শৈব্যার প্রস্থান]

সাবিত্রী—সত্যবান—সাবিত্রী—সত্যবান—সাবিত্রী—সত্যবান—[অবশেষে তাহাই তাহার জপমালা হইল]

[দূরে অশ্বপতি ও মালবী]

অশ্বপতি ॥ এইদিকে—এইদিকে—

মালবী ॥ শীঘ্র চল—শীঘ্র চল—

দ্যুমৎসেন ॥ [উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইলেন।] কে ? সাবিত্রী ? সত্যবান ? তোরা এলি ? আয়—আয়—আয়—

অশ্বপতি ॥ ও কে ?

মালবী ॥ কে ও ?

দ্যুমৎসেন ॥ আমি—আমি—ওরে আমি।

অশ্বপতি ॥ [মালবীকে নিম্ন কণ্ঠে] দ্যুমৎসেন—

মালবী ॥ জিজ্ঞাসা কর—ওকে জিজ্ঞাসা কর—

অশ্বপতি ॥ চুপ—

মালবী ॥ কেন ? কেন ?

অশ্বপতি ॥ আমার সাহস নেই—উত্তর শোনবার আমার সাহস নেই।

দ্যুমৎসেন ॥ ওরে তোরা দূরে কেন ? ওরে…তোরা আয় ছুটে আমার বুকে আয়—বুকে আয়—[অগ্রসর হইতে লাগিলেন]

অশ্বপতি ॥ তুমি বল…কোথায় সাবিত্রী—

মালবী ॥ কোথায় তোমার সত্যবান—

দ্যুমৎসেন ॥ [থমকিয়া দাঁড়াইয়া] কে তোমরা ?

অশ্বপতি ॥ আগে বল তোমার পুত্র কি এখনো জীবিত ?

দ্যুমৎসেন ॥ আমি জানিনা আমি অন্ধ, তোমরা কি জানো ?

অশ্বপতি ॥ হো—হো—তবে কি তাদের হারিয়েছ ?

দ্যুমৎসেন ॥ কে তুমি ? আমারই মতো উদ্বেগ বুকে নিয়ে কে তুমি ? তোমায় দেখতে পাচ্ছিনা, কিন্তু ঐ উৎকণ্ঠিত কণ্ঠ পরিচয় দিচ্ছে তুমি কে। রাজাধিরাজ—

অশ্বপতি ॥ [ছুটিয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গণ করিয়া] বন্ধু !

দ্যুমৎসেন ॥ আজ তোমার সাবিত্রী নেই আজ আমার সত্যবান নেই—

অশ্বপতি ॥ নেই ?—নেই ?

শৈব্যা ॥ [নেপথ্যে] নেই, আশ্রমে তারা নেই।

[শৈব্যার প্রবেশ]

মালবী ॥ [শৈব্যার সম্মুখে গিয়া] আমার সাবিত্রী সেও কি আশ্রমে নেই ?

শৈব্যা ॥ না—নেই। পথেও কি তাদের দেখা পাওনি ?

অশ্বপতি ॥ পথে তাদের দেখিনি। আশ্রমে তারা নেই। তবে তারা…

দ্যুমৎসেন ॥ তারা দু'জনেই আজ প্রভাতে গেছে বনে। সেই যে গেল আর তো এলনা !

মালবী ॥ [অশ্বপতিকে] বনে চল নাথ—বনে চল—

[বনের দিকে ছুটিলেন]

অশ্বপতি ॥ দাঁড়াও—দাঁড়াও—[ছুটিলেন]

দ্যুমৎসেন। আমাকেও নিয়ে চল ভাই—আমাকেও নিয়ে চল—আমি যে অন্ধ—আমি যে অন্ধ—

[অশ্বপতি ফিরিয়া আসিযা তাঁহার হাত ধরিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। শৈব্যা তাঁহার অনুগমণ করিলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

বনদেবী

[বনদেবীর গীত]

ঘোর ঘন ঘটা ছাইল গগন
ভূবন গভীর বিষাদ মগন।
বারি ধারে কাঁদে চারিধারে আজি
শ্বাসিয়া শ্বাসিয়া ঝুরিছে পবন ॥
নাহি রবি শশী নাহি গ্রহ তারা
নিখিল নয়নে শ্রাবণের ধারা
সৃষ্টি ডুবাল গো শোকের প্লাবন।

[প্রস্থান]

[অগ্রে যম পশ্চাতে সাবিত্রী। যম পশ্চাতে পদশব্দ পাইযা ফিরিয়া তাকাইলেন দেখিলেন সাবিত্রী]

যম ॥ এ কি! তুমি আমার অনুসরণ করছ? সাবিত্রী, প্রতি-নিবৃত্ত হও। শীঘ্র ফিরে গিয়ে সত্যবানের ঊর্ধ্ব'দৈহিক কার্য সমাধান কর—

সাবিত্রী ॥ আমার স্বামী যে স্থানে নীত হয় অথবা স্বয়ং গমন করেন আমারও সেই স্থানে গমন করা কর্তব্য। এ নিত্য ধর্ম। হে মহাত্মন! তপস্যার গুরুভক্তিতে, ভর্তৃস্নেহে, ব্রতে ও তোমার প্রসাদে আমার গতি আজ অপ্রতিহত। স্বামীর অনুসরণে তবে আমি কেন ক্ষ্যান্ত হব ধর্মরাজ?

যম ॥ হে অনিন্দিতে! নিবৃত্ত হও। আমি তোমার সব্যক্ত ও যুক্তিযুক্ত বাক্যে পরিতুষ্ট। তুমি বরং বর প্রার্থনা কর; সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে বর তুমি প্রার্থনা করবে, সেই বরই আমি তোমায় প্রদান করব।

সাবিত্রী ॥ আমার শ্বশুর রাজ্যচ্যুত হ'য়ে বনে বাস করছেন। তাঁর চক্ষু দু'টি নষ্ট হ'য়েছে। তিনি তোমার প্রসাদে চক্ষুলাভ করুন এবং অগ্নির মত সূর্য্যের মত বল লাভ করুন—

যম ।। অয়ি অনিন্দিতে, তথাস্তু। এক্ষণে আমার অনুসরণে প্রতিনিবৃত্ত হও··· । দেখ তুমি অতীব পরিশ্রান্ত—

সাবিত্রী ।। হে ধর্মরাজ ! আমি যখন স্বামীর সমীপে আছি···তখন এতো আমার শ্রান্তি নয়, এ যে আমার পরম শান্তি, স্বামীই আমার একমাত্র গতি। স্বামীকে নিয়ে তুমি যেখানে যাবে···আমিও সেখানে যাব। আমি পদে পদে তোমার অনুগমন করব। আমি জানি সাধুদের সঙ্গে এক পা পথ চললেই মিত্রতা জন্মে। সাধুসঙ্গ ত্যাগ করব ধর্মরাজ ?

যম ।। হে ভামিনি ! তোমার এই বাক্য-বিন্যাস হৃদয়-রঞ্জক, হিতকর—বুধগণেরও বোধ-বর্ধন। সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর—

সাবিত্রী ।। বরই যদি দেবে ধর্মরাজ, বর দাও—আমার শ্বশুর হৃতরাজ্য পুনরায় লাভ করুন এবং অক্ষয়কীর্তি লাভ করুন।

যম ।। তথাস্তু। হে রাজ-কন্যা, পূর্ণ তোমার কামনা। এক্ষণে তুমি আমার অনুসরণে ক্ষান্ত হও—

সাবিত্রী ।। হে দেব। মানব তোমারই নিয়মে নিগৃহীত হয় এবং তুমিই মানবের কামনাও পূর্ণ কর, তাই তোমার যমত্ব সুবিখ্যাত। হে যমরাজ ! শোন। কায়মনো-বাক্যে সকলের প্রীতি সাধন করা, সকলকে অনুগ্রহ করা,এবং দান করাই সনাতন ধর্ম। সজ্জনগণ শত্রু যে শত্রু, তাকেও দান করে থাকেন—

যম ।। অয়ি শুভে ! পিপাসু ব্যক্তির যেমন পানীয়, তদ্রূপ তোমার বাক্যও সকলের আদরণীয়। আমি প্রসন্ন। সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে বর ইচ্ছা, প্রার্থনা কর—

সাবিত্রী ।। আমার পিতা অপুত্রক। বংশ রক্ষার্থে আমি তাঁর শতপুত্র প্রার্থনা করি—

যম ।। হে ভদ্রে, তথাস্তু। তোমার পিতার বংশধর তেজস্বী—শতপুত্র জন্মলাভ করুক। রাজপুত্রি ! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হল, এক্ষণে প্রতি-নিবৃত্ত হও···দেখ··· তুমি অতি দূর পথে আগমন করেছ—

সাবিত্রী ।। হে ঈশ্বর, স্বামী যখন আমার সন্নিধানে রয়েছেন, তখন আমি যতদূর পথই হোক যাব। তুমিও চল আমিও চলি। আমি বলে যাই, তুমি শুনে যাও—তুমি ভগবান বিবস্বানের পুত্র। তাই তোমার নাম বৈবস্বত। সংসারে তুমি নিরপেক্ষ ভাবে ধর্মদণ্ড-পরিচালনা কর, তাই প্রজাগণের নিকট তুমি ধর্মরাজ আখ্যায় সুপ্রসিদ্ধ !

যম ।। আমি এই অশ্রুতপূর্ব তোমার বাক্যে পরম প্রীত হলাম। তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন অন্য যে কোন বর গ্রহণ করে নিবৃত্ত হও—

সাবিত্রী ।। স্বামীর জীবন নয় ?

যম ।। না। তদ্‌ভিন্ন অন্য যে কোন বর—

সাবিত্রী ।। স্বামীর জীবন ব্যতীত যে কোন বর ? সত্য ?

যম ।। সত্য—।—সত্য।

সাবিত্রী ॥ উত্তম। [ভাবিতে লাগিলেন]

যম ॥ বল সাবিত্রী, বল—স্বামীর জীবন ব্যতীত যে কোন বর?

সাবিত্রী ॥ উত্তম। তবে সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে বলবান কুলবর্ধক একশত পুত্র হোক—

যম ॥ তথাস্তু। [যম ত্বরিৎপদে অগ্রসর হইলেন। দুইপদ অগ্রসর হইয়াই পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন সাবিত্রীও তাঁহার অনুসরণোদ্যতা। তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন] তথাস্তু—তথাস্তু—। [বলিয়াই তিনি পুনরায় ত্বরিৎপদে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সাবিত্রী প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি যমের অনুসরণ করিতেই লাগিলেন।]

তৃতীয় দৃশ্য

যমদ্বার

[যম আসিলেন। তাঁহার পুরীতে প্রবেশ করতে গিয়াই দেখেন সাবিত্রী। সাবিত্রী তাঁহার অনুসরণ করিতে নিবৃত্ত হন নাই।]

যম ॥ এ কি! তুমি এখনো নিবৃত্ত হওনি? এখানেও?

সাবিত্রী ॥ পতি-বিরহে আমি জীবন ধারণ করতে পারবনা—। বরই যদি দেবে দেবতা—তবে বর দাও স্বামীর পুনর্জীবন…

যম ॥ অসম্ভব। অয়ি সাধ্বী, অন্যবর প্রার্থনা কর—

সাবিত্রী ॥ কি হবে অন্য বরে? আমি স্বামী-বিহীন সুখ চাইনা; সে সুখ পরম দুঃখ। আমি স্বামী-বিহীন ঐশ্বর্য্য চাইনা, সে ঐশ্বর্য্য চরম রিক্ততা। আমি স্বামী-বিহীন জীবন চাইনা। সে জীবন মৃত্যু-যন্ত্রণার নামান্তর! স্বামী-বিহীন যে স্বর্গ আমি সে স্বর্গও চাইনা,…চাইনা যম, চাইনা—

যম ॥ তবে কি চাও?

সাবিত্রী ॥ চাই…স্বামীর পুনর্জীবন—

যম ॥ অসম্ভব।

সাবিত্রী ॥ যদি তুমি ধর্মরাজ হও…সত্য যদি তোমার ধর্ম হয়, আমার স্বামীর পুনর্জীবন অসম্ভব নয়, অবশ্য সম্ভব—

যম ॥ অবশ্য সম্ভব?

সাবিত্রী ॥ হ্যাঁ অবশ্য সম্ভব। তুমি আমায় বর দিয়েছ সত্যবানের ঔরসে আমার শত পুত্রের জন্ম।…সত্য?

যম ॥ সত্য—।

সাবিত্রী ॥ তা যদি সত্য হয়,—তা যদি সত্য, কি করে তুমি ঐ সত্যবানকে অপহরণ করবে? কি করে? কি করে? বল, কি করে?

[যম নিরুত্তর রহিলেন]

সাবিত্রী ॥ উত্তর দাও ধর্মরাজ। তুমিই আমায় সত্যবানের ঔরসে শতপুত্রের বর দিয়েছ, আবার তুমিই সত্যবানকে...হরণ করছ...হে ধর্মরাজ! এই বিপরীত আচরণই কি তোমার ধর্ম?

যম ॥ সাধু—সাধু—সাধু অপরাজেয় যে মৃত্যু, সে মৃত্যুও আজ তোমার নিকট পরাজিত। হে সতী, মুক্ত তোমার পতি। [সত্যবানের আত্মাকে মুক্তিদান করিলেন। সেই জ্যোতিষ্ক আত্মা সাবিত্রী হাতে আসিয়া স্থির হইল] অয়ি মৃত্যুজিতা; তোমার নিকট আমার পরাজয়ের এই অলৌকিক কাহিনী যুগে যুগে বিঘোষিত হোক। তোমার কাহিনী প্রতি পত্নীকে প্রতি যুগে অনুপ্রাণিত করুক...আজিকার এই পরাজয়ের পরমানন্দ আবার কবে...কোন যুগে কোন সতীর প্রসাদ লাভ করব জানিনা...কিন্তু সেজন্য আমি যম উন্মুখ হয়ে রইলাম দেবী!—ব্যগ্র হয়ে রইলাম।

চতুর্থ দৃশ্য

বন

সত্যবানের মৃতদেহ

[আকাশে বাতাসে করুণ রাগিণী। বেদনাবিধুর প্রকৃতি। দ্যুমৎসেন একাকী। বহুকষ্টে এদিকে ওদিকে অগ্রসর হইতেছেন।]

দ্যুমৎসেন ॥ আমায় ওরা এখানে বসিয়ে রেখে পাগলের মতো তাদের খুঁজতে গেল। কিন্তু কি করে চুপ করে বসে থাকি?...বুকের মাণিক সবাই খুঁজবে, শুধু আমিই কি পারব না? আমিও খুঁজব। ওরে কোথায় তোরা? কোথায় তোরা? আয়! আয়! তোরা যে আমায় একদণ্ড না দেখলে পাগল হয়ে যেতিস. আজ তোরা কোথায়? ওরে তোরা ভেবেছিস কি? আমায় লুকিয়ে থাকবি! আমিও তোদের খুঁজব...যত কাল না পাব খুজব,...খুঁজতে খুঁজতে হয়ত বিপথে পড়ে আমার মৃত্যু হবে হোক—হোক—তাই হোক—ওরে—ওরে নিষ্ঠুর, ওরে নির্দয়...তোদের না পেলে; আমি মৃত্যুই চাই—মৃত্যুই চাই! আমিও যে তাই চাই!—[খুঁজিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুজিতে সত্যবানের মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন] কে?...কে?...ওরে, তুই কে? শৈব্যা শৈব্যা—অশ্বপতি—ভাই—বন্ধু—কে কোথায় আছ...শীঘ্র এসো শীঘ্র এসো! আমি যেন কাকে পেয়েছি—আমি বুঝি আমার হারানো রতন ফিরে পেলাম! [তখনি সেখানে বসিয়া মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে করিতে] হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয় সত্যবান—সত্যবান—আমারই রক্তমাংস আর আমি চিনবনা—ওরে তুই এখানে ঘুমিয়ে রয়েছিস, এই তোর কীর্তি? ওরে জাগ—চেয়ে দেখ...এ কি! জাগেনা কেন? হৃদয় স্পন্দনহীন, দেহ তুষার শীতল! একি! এযে মৃত! না না এ তবে সে নয়! এ হয়ত কোনো পথিক—অজ্ঞাত কোনো পথিক। ...কিন্তু...কিন্তু এ যে সেই হাত সেই মুখ—এ কি নিদারুণ সমস্যা! ঈশ্বর...ঈশ্বর...

দয়া করে একটিবার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দাও···একটিবার—একটিবার শুধু দেখতে দাও···এ আমার সত্যবান নয় এ কোন—এ কোন···এ কি! মনে হচ্ছে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসছে···তাইতো···তাইতো···আমার অনন্ত অন্ধকার যেন ক্রমে ক্রমে কেটে যাচ্ছে—আলো···আলো—আজ কতকাল—কতকাল পরে আলো দেখছি—তাইতো—তাইতো আমি আর অন্ধ নই, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—[মৃত-দেহে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়াই] কি দেখছি! সত্যবান [উত্তর না পাইয়া] সত্যবান—সত্যবান—[উত্তর না পাইয়া] সত্যবান—ও—হো—হো—ঈশ্বর—ঈশ্বর পুত্রের মৃত-মুখ দেখবার জন্যই কি এই অন্ধকে চক্ষু দান করলে! [সেখান হইতে উন্মাদের মতো] কে চায় এ চোখ! কে চায় এ চোখ! কেন দিলে এ চোখ! এ চোখ—এ চোখ আমি উপড়ে ফেলব—এ চোখ আমি উপড়ে ফেলবো—

[দ্যুমৎসেনের মন্ত্রী স্বর্ণথালে রাজমুকুট লইয়া প্রবেশ করিলেন।]

মন্ত্রী ॥ মহারাজ—

দ্যুমৎসেন ॥ এ কি! বিক্রমদেব! তুমি! এই গহন বনে! ও কি? রাজমুকুট!···শত্রুদের পরাজিত করে আমার জন্য আজ উপহার এনেছ! চমৎকার! চমৎকার! জীবনে আর দিন হলনা, চক্ষু পেলাম আজ! রাজমুকুট পেলাম আজ! এ কি সব স্বপ্ন? না সত্য···না আমি উন্মাদ?

[অশ্বপতি-মালবী শৈব্যার প্রবেশ।]

অশ্বপতি ॥ পেয়েছ বন্ধু? পেয়েছ?

দ্যুমৎসেন ॥ হ্যাঁ পেয়েছি। এমন পাওয়া জীবনে কেউ পায়না···আজ আমি দৃষ্টি পেয়েছি···হৃত রাজ্য ফিরে পেয়েছি···আর পেয়েছি—আর পেয়েছি—[কাঁদিয়া ফেলিলেন।]

শৈব্যা ॥ দৃষ্টি পেয়েছ? দৃষ্টি পেয়েছ?

দ্যুমৎসেন ॥ হ্যাঁ পেয়েছি। দৃষ্টি শুধু পাইনি। তোমরা যা দেখছ না, তোমাদের আগে আজ আমি তাও দেখেছি—

শৈব্যা ॥ একি সৌভাগ্য! আজ আমাদের একি সৌভাগ্য!

দ্যুমৎসেন ॥ হ্যাঁ, পরম সৌভাগ্য—আজ আমার পরম সৌভাগ্য!

অশ্বপতি ॥ শুধু দুর্ভাগ্য এই···এই সৌভাগ্যের মুহূর্তে কোথায় আমার সাবিত্রী—

শৈব্যা ॥ কোথায় আমার সত্যবান—

দ্যুমৎসেন ॥ আছে—আছে—সত্যবান আছে। আমি তাকে স্বচক্ষে দেখেছি—আমি তাকে পেয়েছি—

অশ্বপতি ॥ কই? কোথায়?

শৈব্যা ॥ কোথায় প্রভু?

দ্যুমৎসেন ॥ [বামহাতে শৈব্যার হাত চাপিয়া ধরিয়া সত্যবানের মৃতদেহের দিকে রাজমুকুট ছুঁড়িয়া দিয়া] ঐ—

শৈব্যা ॥ [হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে করিতে] সত্যবান—[কোন উত্তর

না পাইয়া] সত্যবান—[হাত ছাড়াইয়া লইয়া] সত্যবান—[সত্যবানের উপরে গিয়া পড়িলেন]

দ্যুমৎসেন ॥ কোন সাড়া পাবে না। ও ঘুমিয়েছে···সেই ঘুম যে' ঘুম আর ভাঙবার নয়···যে ঘুম আর ভাঙবেনা—ডাকো ডাকো···আমি ওকে জাগাতে পারিনি··· তুমি মা···তুমি যদি পারো···

শৈব্যা ॥ ওঃ! [মূর্চ্ছা]।

অশ্বপতি ॥ নিয়তি! নিয়তি! দুর্নিবার নিয়তি! সহস্র চেষ্টায়ও তার গতি রোধ করা যায় না···মূর্খ আমি···তাকে রোধ করতে গিয়েছিলাম···তার জন্য সত্যভঙ্গ করেছিলাম কিন্তু···ও···দুর্নিবার! দুর্নিবার!

মালবী ॥ আমার সাবিত্রী?

অশ্বপতি ॥ না না তাকে আর না দেখাই ভালো—তাকে আর না দেখাই ভালো—

দ্যুমৎসেন ॥ সেও কি আর জেগে আছে! সেও কোথায় ঘুমিয়েছে···আমি দেখছি···আমি দেখতে পাবো···নইলে চোখ হ'ল কেন?

মালবী ॥ সাবিত্রী! সাবিত্রী! ওঃ!

[অদূরে সাবিত্রীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

সাবিত্রী ॥ মৃত্যুকে আমি জয় করেছি—মৃত্যুকে আমি জয় করেছি—

অশ্বপতি ॥ মৃত্যুকে জয় করেছে?···কে?

[সাবিত্রীর প্রবেশ।]

সাবিত্রী ॥ আমি।

[তাহাকে দেখিয়াই সকলে মুখ অবনত করিলেন।]

সাবিত্রী ॥ [সত্যবানের সম্মুখে গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া] আর্য্যপুত্র! আর্য্যপুত্র!

সত্যবান ॥ [পুনর্জীবিত হইয়া] সাবিত্রী!

[সাবিত্রী সত্যবানকে ধরিয়া তুলিলেন। ঊর্দ্ধ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। শূন্যে যমের আবির্ভাব।]

সাবিত্রী ॥ মা! মা! ওঠ-দেখ—মৃত্যুকে আমি জয় করেছি।

শৈব্যা ॥ বাবা—বাবা—সত্যবান

মালবী ॥ মা—মা।

যম ॥ কাষ্ঠাহরণ করতে এসে সত্যবান বিধাতার বিধানে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐ সাবিত্রীর প্রভাবে মৃত্যুকে পরাজিত করে, স্বামীকে পুনর্জীবিত করে সীমন্তের সিন্দুর হাতের শাঁখা অক্ষয় অক্ষুন্ন রাখল। সাবিত্রী আজ থেকে দেবীরও দেবী। আজ হতে পৃথিবীতে সাবিত্রী পূজা প্রচারিত হোক। যে সাবিত্রীর সাধনা, সাবিত্রীর তপস্যা, সাবিত্রীর এই পরম পাতিব্রত্য শ্রবণ-পূর্বক কায়-মনো-বাক্যে সাবিত্রীর পূজা এবং সাবিত্রীর ব্রত করবে—আমার বরে বৈধব্য তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

[অন্তর্দ্ধান।]

—আনন্দ দৃশ্য—

[বনবাসিনীগণের প্রবেশ। তাঁহারা সাবিত্রীর সীমন্তে সিন্দুর পরাইয়া দিলেন। সাবিত্রী ও সত্যবান যুগল মূর্তিতে দাঁড়াইলেন। অশ্বপতি এবং দ্যুমৎসেন আলিঙ্গন বদ্ধ হইলেন। মালবী এবং শৈব্যা সাদর সম্ভাষণে ব্যাপৃত হইলেন। বনবাসিগণ সাবিত্রী-মঙ্গল গাহিলেন]

॥ গান ॥

জয় মর্তের অমৃতবাদিনী চির আয়ুষ্মতী
জয় নারী-রূপা দেবী পুণ্যশ্লোকা সতী ॥
জয় অগ্নিহোত্রী অয়ি দীপ্তা উগ্র-তপা জ্যোতির্ময়ী।
জয় সুর-লোক-বাঞ্ছিতা সতী মহিমার গীতা, মৃত্যু-জয়ী!
জয় সীমন্তে নবারুণ, ধরণীর অরুন্ধতী ॥
চির-শুদ্ধাচারিণী চির-পবিত্রা সুমঙ্গলা,
চির অবৈধব্য-যুতা তুমি চিরপূজ্যা মা, নহ অবলা।
মাগো যুগে যুগে চির ভাস্বর তুমি উদীচি জ্যোতি ॥
তব সীমন্ত-সিন্দুর মাগে, মাগো ; বিশ্ব-বধূ
সব কন্যা জায়া যাচে তব বর, কর প্রণতি ॥

॥ যবনিকা ॥

মহাভারতী

১৮৫৭-১৯৪৬

লেখকের কথা

আমার লেখা প্রথম নাটক অভিনীত হয় ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ষ্টার থিয়েটারে। নাটকটি ছিল একখানি একাঙ্কিকা—নাম 'মুক্তির ডাক'—একটি ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা। তাহার পর পেশাদার রঙ্গমঞ্চে আমার যে সব নাটক অভিনীত হয়, তাহার কোনটিই সামাজিক নাটক ছিল না। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে 'নাট্যনিকেতনে'র জন্য 'মীরকাশিম' নাটক রচনার পর সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাল পেশাদার রঙ্গমঞ্চের জন্য আমি আর কোন নাটকই লিখি নাই। ১৯৫২ সালে আমি পুনরায় নাটক লিখিতে মনস্থ করিয়া ঐ বৎসরেরই এপ্রিল মাসে 'মহাভারতী' রচনা করি। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জন্য লিখিত আমার নাটকগুলির মধ্যে 'মহাভারতী'ই প্রথম সামাজিক নাটক। এই নাটকখানি ১৩৫৯ সালের 'মন্দিরা' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ-রদ, ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০-৩১ সালে আইন-অমান্য ও লবণ-সত্যগ্রহ আন্দোলন, ১৯৪২ সালে আগস্ট বিপ্লব এবং ১৯৪৬ সালে বৃটিশ কর্তৃক ভারতের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ এই রাজনীতিক ঘটনাগুলি এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের বিষয়বস্তু।

মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রকুলবর্তী একটি গ্রামে মহাভারত মাইতি নামক এক মধ্যবিত্ত কৃষক এবং তাহার পরিজনবর্গকে কেন্দ্র করিয়া এই রাজনীতিক নাটকটি পরিকল্পিত হইয়াছে। চরিত্রগুলি সমস্তই কাল্পনিক। সমগ্র নাটকে মাত্র একটি দৃশ্যপটই ব্যবহৃত হইয়াছে। ঘটনার ত্রুটি-বিচ্যুতি অথবা অন্য কোন অসংগতি সংশোধন করিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিব। এ বিষয়ে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ আমাকে সাহায্য করিবেন, এই নিবেদন।

শ্রীযুক্ত পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকের কয়েকখানি গান রচনা করিয়া এবং প্রখ্যাত চিত্রী শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত এই গ্রন্থের চিত্রগুলি আঁকিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

এই নাটক প্রণয়নে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ এবং শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের নিকট যে উৎসাহ পাইয়াছি তাহা মুগ্ধচিত্তে চিরদিন স্মরণ করিব। মন্মথ রায়

স্বাধীনতা দিবস, ১৯৫৩

দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত)

নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত "১৮৫৭ বিদ্রোহ শতবার্ষিকী জয়ন্তী" উৎসবে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোকরঞ্জন শাখা ২৪শে এবং ২৫শে আগস্ট (১৯৫৭) এই মহাভারতী নাটক হিন্দীভাষায় অভিনয় করেন। এতদুপলক্ষে 'অবতরণিকা' মূল নাটকে সংযোজন করিয়াছিলাম। এই বাংলা সংস্করণেও উহা দিলাম।

মন্মথ রায়

১লা জানুয়ারী : ১৯৬০

মহাভারতী

৭ই মে ১৯৫৩

তারিখে অনুষ্ঠিত

সর্বকনিষ্ঠা সহোদরা

শ্রীমতী লীলা রায়ের সহিত

শ্রীমান অমল দে'র

শুভ বিবাহে

স্নেহাশিস্

আশীর্ব্বাদক

দাদা

মন্মথ রায়

মহাভারতী

প্রথম অভিনয়

কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ

কর্তৃক

শ্রীরঙ্গম নাটমঞ্চে

২৬শে জানুয়ারী : ১৯৫৩

নব পর্যায়ে প্রথম অভিনয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোকরঞ্জন শাখা

কর্তৃক

কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসভা কংগ্রেস

নাটমঞ্চে ২২শে জানুয়ারী : ১৯৫৪

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ অখ্যাত অজ্ঞাত সৈনিকের

আত্মাহুতির অমর কাহিনী

মহাভারতী

রচনাকাল—৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল ঃ ১৯৫২
প্রথম অভিনয়—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রদর্শনীতে ২২শে জানুয়ারী, ১৯৫৪

অবতরণিকা
(১৯০৮)

[মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথি মহকুমার রামনগর থানার সমুদ্রতীরবর্তী গ্রাম ঃ শ্রীপুর। মহাভারত মাইতি এই গ্রামের জনৈক সম্পন্ন চাষী—বয়স প্রায় ৪০। স্ত্রী গঙ্গা—বয়স ৩০। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম—বয়স ১৪।

গৃহপ্রাঙ্গণ। একপার্শ্বে শয়ন গৃহের বহির্বারান্দা। অপর পার্শ্বে ধানের গোলা ও তুলসীমঞ্চ। দৃশ্যের শেষভাগে মাটির দেওয়াল। দেওয়ালের মধ্যস্থলে বাহির যাতায়াতের সদর দরজা।

১৯০৮ সাল। গ্রীষ্মকাল। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। ঘরের বারান্দায় মহাভারত মাইতির বৃদ্ধ পিতা কীর্তিবাস মাইতি (বয়স প্রায় ৭৫) মৃত্যুশয্যায় অবস্থিত। প্রাঙ্গণে মহাভারত মাইতি বিষণ্ণচিত্তে দাঁড়াইয়াছিল—তাহার স্ত্রী গঙ্গাদাসী হুঁকাটি আনিয়া তাহার হাতে দিল। মহাভারত হুঁকাটি হাতে লইয়া একটি মোড়ায় গিয়া বসিল।]

মহাভারত ॥ বুড়ো এখন মরলে বাঁচি!

গঙ্গা ॥ ছি-ছি! নিজের বাপ, তার কি কখনও মরণ চাইতে হয়!

মহাভারত ॥ সাধে কি আর চাইছি! সারাটা জীবন পাগলামী করে কাটিয়েছেন, তা-ও সয়েছি। কিন্তু মরতে বসে এখন যা করছে। তাতে যে আমাদের সবার হাতে দড়ি পড়বে গঙ্গামণি! ঐ শোনো···ঐ আবার!

কীর্তিবাস ॥ ঐ নতুন কার্তুজে শুয়োরের চর্বি! হিন্দু মুসলমান সেপাই আমরা—ঐ কার্তুজ আমরা দাঁতে কাটব না—কাটব না! খবরদার—খবরদার!···ঐ—ঐ গুলি ছুঁড়ল—ব্যারাকপুর ব্যারাকে মঙ্গল পাঁড়ে গুলি ছুঁড়ল—গোরা অফিসার কুপোকাৎ।

[এই কথার মধ্যে মহাভারত ও গঙ্গা ছুটিয়া গিয়া তাহাকে থামাইল।]

মহাভারত ॥ তোমার পায়ে পড়ি বাবা, তুমি থামো।

কীর্তিবাস ॥ থামছি বাবা—থামছি—আমার সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে—পুড়ে যাচ্ছে!

মহাভারত ॥ একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর বাবা!

কীর্তিবাস ॥ আচ্ছা বাবা, করছি! তুই যা। তোকে আমি সইতে পারছি না। কার ছেলে হয়ে আজ তুই কী হয়েছিস?

মহাভারত ॥ আবার বকতে শুরু করলে!

কীর্তিবাস ॥ আচ্ছা—আচ্ছা—থামছি। তোরা গেলেই আমি থামব।

[মহাভারত ও গঙ্গা প্রাঙ্গণে আসিল।]

গঙ্গা ॥ আজ জ্বরের ঘোরে ওসব উনি কী বলছেন! মঙ্গল পাঁড়ে! ব্যারাকপুর! সিপাহীবিদ্রোহ!

মহাভারত ॥ ওসব কথায় কান দিওনা। ওসব প্রলাপ।

গঙ্গা ॥ না—না, প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিচ্ছ কেন গো! আজ দুপুরে তো জ্বর ছিল না। তখন যে আমায় সব বললেন।

মহাভারত ॥ কী বললেন?

গঙ্গা ॥ বললেন, ওঁর যখন বয়স কুড়ি বাইশ—তখন উনি ওঁর বাপের সঙ্গে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন—কাশী। আর সেখানে নাকি তখন দেশী সেপাইরা ক্ষেপে গিয়ে সাহেবদের সব মেরে ফেলেছিল।

মহাভারত ॥ চুপ—চুপ। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ একটা হয়েছিল বটে। বাঙলার ব্যারাকপুরেই শুরু হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেসব কথা এতদিন পেটে রেখে এখন একেবারে ঢাক পেটানো শুরু করেছেন।

কীর্তিবাস ॥ বাহাদুর শাহ! সম্রাট! ভাবছ কেন? ঐ দেখ—নানাসাহেব—তাঁতিয়া টোপি—কুমার সিং—ঝাঁসীর রাণী! হাজার হাজার দেশী সেপাই—বিদ্রোহের নিশান তুলেছে—ইংরাজ রাজত্ব শেষ করে ছুটে আসছে দিল্লীর মসনদে—তোমাকে বসাতে!

[বলা বাহুল্য এইবারও মহাভারত ছুটিয়া তাহার কাছে গেল।]

মহাভারত ॥ আঃ! তুমি থামবে কিনা বল বাবা!

কীর্তিবাস ॥ জ্বলে যাচ্ছে—আমার সারা গা জ্বলে যাচ্ছে! কবরেজ ডেকে আন—আমাকে বাঁচা।

মহাভারত ॥ কবরেজের তো কত ওষুধ খেলে—কী হ'লো?

কীর্তিবাস ॥ তবে তুই আমায় হাওয়া কর। জোরে হাওয়া কর…আরো জোরে!

মহাভারত ॥ তুমি চুপ না করলে আমি হাওয়া করব না বাবা!

কীর্তিবাস ॥ আচ্ছা—আচ্ছা।

[মহাভারতের প্রস্থান। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম মাইতি—পা টিপিয়া টিপিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া আসিল।]

রাম ॥ মা!

গঙ্গা ॥ কীরে রাম, ঘুমুতে পারলি না বুঝি বাবা!

রাম ॥ না মা, আমি ঘুমুইনি ত! ঠাকুর্দার সব কথা শুনছি—শুনতে আমার এত ভাল লাগে মা। জানো মা, সিপাই বিদ্রোহে ঠাকুর্দা আর তার বাবা দু'জনেই সিপাইদের হয়ে লড়াই করেছেন কাশীতে। শেষে কানপুরেও।

গঙ্গা ॥ তোকেও ওসব বলেছেন বুঝি!

রাম ॥ হ্যাঁ মা, চুপি চুপি বলেছেন আজ বিকেলে। সাহেবদের গুলিতে ঠাকুর্দার বাবা মারা যায়,—আবার ঠাকুর্দার লাঠি খেয়ে সাহেবও নাকি মরেছিল কটা! রীতিমত যুদ্ধ! আচ্ছা মা, ঠাকুর্দার ওসব কথা কি সত্যি?

গঙ্গা ॥ কী জানি বাবা—এতদিন তো এসব চেপে গেছেন—এখন যাবার সময় সব বলছেন। হতেও পারে বা !

রাম ॥ আচ্ছা, মা, ঠাকুর্দা কি সত্যিই বাঁচবে না।

গঙ্গা ॥ একটা কাজ করতে পারবি বাবা ?

রাম ॥ কী মা ?

গঙ্গা ॥ ভবতারণ কবরেজকে একবার ডেকে আনতে পারবি ?

রাম ॥ এই দুপুর রাতে কি সে বুড়ো আসবে মা ?

গঙ্গা ॥ তুই দেখ না বাবা, যদি হাতে পায়ে ধরে আনতে পারিস ?

রাম ॥ আনব মা, আনব—যেমন করে হোক—ঠাকুর্দাকে বাঁচাতেই হবে। নইলে ঐ সব লড়াইয়ের গল্প আমাকে কে বলবে মা ?

গঙ্গা ॥ লণ্ঠনটা নিয়ে যা।

[চট করিয়া লণ্ঠন লইয়া রাম ছুটিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। পরক্ষণেই মহাভারত মাইতি পাখা হাতে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল।]

মহাভারত ॥ কে গেল !

গঙ্গা ॥ রাম।

মহাভারত ॥ রাম ! কোথায় গেল ?

গঙ্গা ॥ ভবতারণ কবরেজকে ডেকে আনতে।

মহাভারত ॥ সর্বনাশ ! রাম-রাম—ফিরে আয়—ফিরে আয় [চীৎকার]

গঙ্গা ॥ ছুটে গেছে—এতক্ষণে ও কবরেজ বাড়ী পৌঁছে গেছে। কিন্তু ওকে পিছু ডাকছো কেন, অমন করে ?

মহাভারত ॥ সর্বনাশ হ'ল !

গঙ্গা ॥ সর্বনাশ কী গো ? কবরেজ এসে দেখে ওষুধ দিলে জ্বালাটা হয় তো যাবে---ঘুমও হবে।

মহাভারত ॥ তা হয়ত যাবে—কিন্তু ঐ সঙ্গে আমার ঘর সংসার যে জ্বলে যাবে।

গঙ্গা ॥ কী যে তুমি বল কিছুই বুঝি না।

মহাভারত ॥ তাই যদি বুঝবে তো মেয়ে মানুষ হয়েছ কেন ? দিনকতক আগে এই মেদনীপুর জেলায় ঐ নারাণগড়ের রেললাইনে বোমা ফাটিয়ে বাঙলার লাটসাহেবের গাড়ী উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল স্বদেশী ছোঁড়ারা। তা সে হ'লো গিয়ে বাবা—লাটসাহেব। তার কি আর মরণ আছে ? মরতে মরণ আমাদের।

গঙ্গা ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—গাঁয়ে খুব ধরপাকড় হচ্ছে।

মহাভারত ॥ আমাদের নারাণ চৌকিদার একেবারে বাঘ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরে ঘরে। তার কানে যদি তোমার শ্বশুর ঠাকুরের কথা একবার যায়, আর তবে রক্ষে আছে ভাবছ ? ঐ যে ভবতারণ কবরেজ, যাকে তোমরা ডেকে আনছ, যদি এসব কথা শোনে এখুনি গিয়ে একেবারে ঢাক পিটিয়ে বেড়াবে। তার সঙ্গে সঙ্গে নারান চৌকিদারের দড়ি এ বাড়ির সবার হাতে এসে উঠবে !···

গঙ্গা ॥ কিন্তু শ্বশুরঠাকুর যে সব কথা বলছেন, সে সব তো আর আজকের কথা নয়! তোমার আমার জন্মের আগের কথা। তার জন্যে এখন আমাদের হাতে দড়ি পড়বে কেন গো?

মহাভারত ॥ আরে স্বদেশীছোঁড়াদের আজ এই যে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব এর গোড়াপত্তনই তো হয়েছে সেই ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে—যাতে তীর্থ করতে গিয়েও মেতে উঠেছিলেন আমার ওই বুড়ো কর্তা আর তাঁর বুড়ো বাপ। তা বুড়ো কর্তার বাবা মরে বেঁচেছেন, আর আমার ঐ কর্তা এতকাল কথাগুলো ধামাচাপা রেখে, শেষে যাবার সময় প্রলাপ বকে নিজে মজবেন, আমাদেরও মজিয়ে যাবেন দেখতে পাচ্ছি! এই নাও হয়ে গেল, ভবতারণ এসে গেলেন।

[রামের সহিত কবিরাজ ভবতারণের প্রবেশ। একহাত ঘোমটা টানিয়া গঙ্গা তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল।]

ভবতারণ ॥ ব্যাপার কি মহাভারত? এই রাতদুপুরে একেবারে সমনজারী করে ধরে আনলে যে! কীর্তিবাসদা তো সকালের দিকে ভালই ছিলেন দেখে গেলাম।

মহাভারত ॥ আজ্ঞে, এখনো ভাল আছেন—বেশ আছেন। আর থাকবেন নাই বা কেন, আপনার বড়ি যখন একবার পেটে পড়েছে—

ভবতারণ ॥ হ্যাঁ, যা বলেছ, এ হচ্ছে ভবতারণ বড়ি বাবা! যা-ই কুপিত হোক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে নির্বাপিত হ'তেই হবে। শাস্ত্রেই বলেছে—অপস্মারে জ্বরে কাশে কামলায়াং—তা চলো একবার দেখেই যাই।

মহাভারত ॥ না—না আর দেখে দরকার নেই ভবতারণ খুড়ো। বাবা তো দিব্যি ঘুমুচ্ছেন—

ভবতারণ ॥ আরে বাবা সেটা আবার মহাঘুম কিনা সেটাও তো দেখতে হবে।

মহাভারত ॥ না—না, অত সহজে মহাঘুম আমার বাবার হবে না খুড়ো। ও বুড়ো সে ছেলেই নয়।

ভবতারণ ॥ বেশ—বেশ! কিন্তু তবে আমার কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে এমন করে টেনে আনলে কেন?

মহাভারত ॥ স্ত্রীবুদ্ধি—স্ত্রীবুদ্ধি! বাবা একবার হাঁচলেন কি কাশলেন—অমনি একেবারে আঁতকে ওঠেন আপনার বৌমা।

ভবতারণ ॥ কিন্তু বাবা, এই রাত দুপুরে—বুঝলে ত? গুরুরই আদেশ—দর্শনীটা ডবল।

মহাভারত ॥ তা তো বটেই—সেটা আর আমি জানি না—[ট্যাক হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া] নিন।

ভবতারণ ॥ তা বাবা, দর্শনী যখন দিলে, একবার দর্শনটা করে যাবো না?

মহাভারত ॥ কোনো দরকার নেই খুড়ো, বাবা এখন আমার একেবারে কুম্ভকর্ণ। আপনি আসুন। এই রাম, লন্ঠনটা নিয়ে রেখে আয়।

[রাম লণ্ঠন হাতে কবিরাজকে লইয়া চলিল এমন সময়—]

কীর্তিবাস ॥ কে তুমি! কোথায় যাচ্ছ?

ভবতারণ ॥ [চমকিয়া ফিরিয়া] অ্যাঁ! কীর্তিবাসদার গলা না?

মহাভারত ॥ না—না, ও কিছু নয় খুড়ো! আপনি চলে যান দরকার হয়তো আমি আপনাকে ডাকবো।

ভবতারণ ॥ আর ডাকবে কিহে—ঐ তো ডাকছে!

[ভবতারণ ফিরিয়া প্রাঙ্গণে আসিল, কীর্তিবাসও প্রলাপের ঘোরে বাহিরে আসিতেছে, গঙ্গা তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।]

কীর্তিবাস ॥ আমরা গাঁয়ের চাষাভূষো একদল যাত্রী তীর্থ করতে গেছি—কোনও দোষ করিনি আমরা কারো কাছে। হঠাৎ দেখি গুলি গোলা চলছে—বিদেশী পল্টনের সঙ্গে দেশী পল্টন লড়াই করতে করতে ছুটে আসছে—ভয়ে আমরা পালাচ্ছি—বিদেশী গোরাগুলো আমাদের দিকে একঝাঁক গুলি চালালো—তারই একটা গুলি খেয়ে রক্ত বমি করতে করতে আমার বাবা আমার চোখের সামনে মরে গেল! উঃ কী জ্বালা! সারাটা গা আমার জ্বলে যাচ্ছে! কবরেজ এ জ্বলুনির শান্তি কিসে বলতে পার?

[ইতিমধ্যে উহারা তাহাকে ধরিয়া প্রাঙ্গণের খাটিয়ায় বসাইয়াছে। রাম গঙ্গার ইঙ্গিতে ভিতর হইতে পাখা আনিয়াছে, গঙ্গা হাওয়া করিতেছে। মহাভারত তাহাকে ধরিয়া আছে।

ভবতারণ ॥ ও সব তুমি কী বলছ কীর্তিবাসদা?

মহাভারত ॥ প্রলাপ বকছে! ও আপনি ধরবেন না খুড়ো!

ভবতারণ ॥ প্রলাপ!

[নাড়ি টিপিয়া দেখিতে গেল—কীর্তি জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইল।]

কীর্তিবাস ॥ নাড়ি টিপে কিছু বুঝতে পারবে না কবরেজ। যদি বুঝতে হয় ত এই বুকে হাত দাও। নয়, চল আমার সঙ্গে সেই কানপুরে—বিশ বছরের জোয়ান তখন আমি। কিন্তু সিপাই নই বলে পল্টনে ঢুকতে পারলাম না। তা বলে আমি ছাড়িনি। আমিও পেয়েছিলাম আমার শিকার একদিন…

[কবিরাজের হাত চাপিয়া ধরিল]

ভবতারণ ॥ উঃ! ছাড়ো ছাড়ো!

কীর্তিবাস ॥ হ্যাঁ—সেও এমনি করে হাত ছাড়িয়ে নি᠎. গিয়েছিল—

মহাভারত ॥ দেখছেন কী? পাগল, খুড়ো—পাগল!

ভবতারণ ॥ বিকার—ঘোরতর বিকার। এর পর হয়তো কামড়াবে। বিষম চিকিৎসার দরকার। আমি বাড়ি গিয়ে পুঁথি ঘেঁটে দেখছি। [পলায়ন]

কীর্তিবাস ॥ কেন জানি না আমার দয়া হ'ল। আমি ছেড়ে দিলাম সাহেবটাকে। তার সেই বন্দুকের মুখের ছোরাটা—যেটা দিয়ে কত লোককে সে খুঁচিয়ে মেরেছিলে—বন্দুকের মুখের সেই ছোরাটা আমার হাতে রেখেই সে পালিয়ে গেল। তোরা সব জানিস কোথায় আছে আমার সেই ছোরাটা?

মহাভারত ॥ না—সে আমরা জানি না। কখনো তো তা বলনি! কেন বলনি বাবা?

কীর্তিবাস। শেষে আমরাই যে হেরে গেলাম। তার পরে ইংরেজের এমন অত্যাচার শুরু হ'লো যে ভয়ে আমরা থ হয়ে গেলাম। পালিয়ে এলাম নিজের ভিটেয়। থানায় থানায় হুলিয়া হ'লো—"সিপাই বিদ্রোহে কে যোগ দিয়েছিল বলো।" তাই, সেই যে মুখ বন্ধ করে দিলাম আজ তার চাবি খুলেছে এই মরণ কালে। আজ আর সে সব কথা কিছুতেই চেপে রাখতে পারছি না বাবা। আরও পারছি না এই আনন্দে যখন শুনছি বিদেশী লাট সাহেবের ট্রেন উড়িয়ে দিতে গেছে এই মেদিনীপুরেরই ছেলে। এখন দেখছি স্বাধীনতার লড়াই আবার সুরু হয়েছে দেশে, আমি শান্তি পাচ্ছি—আমার ঘুম আসছে। আঃ!

[অব্যক্ত যন্ত্রণা ক্রমশঃ শান্ত হইল। খাটিয়ায় শুইয়া পড়িয়াছে কীর্তিবাস। চক্ষু মুদ্রিত করিল।]

মহাভারত ॥ [গঙ্গাকে] মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি ঘুম এলো!

গঙ্গা ॥ দেখ, রাতদুপুর গড়িয়ে গেল—তোমার কিন্তু এই টাল-মাটালে খাওয়া হয়নি, এই ফাঁকে খাবে চলো। রাম খেয়েছে, রাম বরং বাবার কাছে একটু বসুক, এসো।

মহাভারত ॥ তুই ভয় পাবি না তো রাম?

রাম ॥ ঠাকুর্দা রয়েছে, কীসের আবার ভয়?

[গঙ্গা ও মহাভারতের প্রস্থান। রাম ঠাকুর্দার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।]

কীর্তিবাস ॥ কেরে? রাম?

রাম ॥ হ্যাঁ, ঠাকুর্দা।

কীর্তিবাস ॥ ওরা কোথায় গেল?

রাম ॥ বাবা আর মা? ওরা খেতে গেল ঠাকুর্দা, আচ্ছা ঠাকুর্দা সাহেবের বন্দুকের মুখের সেই ছোরাটা…সেটা কি সত্যিই তুমি পেয়েছিলে?

কীর্তিবাস ॥ বিশ্বাস করছিস না বুঝি?

রাম ॥ কই দেখাওনি ত কোনদিন?

কীর্তিবাস ॥ দেখলে বিশ্বাস করবি?

রাম ॥ হ্যাঁ, তবেই বিশ্বাস করব, নইলে বুঝব সবই তোমার গল্প, যে সব গল্প বলে আমাকে ঘুম পাড়িয়েছ তুমি এতকাল।

কীর্তিবাস ॥ বটে! তোকে দেখাব, যদি তুই ঐ তুলসী গাছ ছুঁয়ে আমায় বলিস বিদেশী শাসন তুই মানবি না—স্বাধীনতার সেপাই হবি তুই।

[রাম ছুটিয়া গিয়া তুলসী গাছ ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"বিদেশী শাসন আমি মানবো না—স্বাধীনতার সেপাই হবো আমি"।]

কীর্তিবাস ॥ তুলসী বেদীর তলের মাটি খানিকটা সরিয়ে ফেল…ফেলেছিস্?

রাম ॥ হ্যাঁ, দাদু।

কীর্তিবাস ॥ কিছু পেলি?

রাম ॥ পেয়েছি দাদু !

[একটানে একটি খাপে ঢাকা "বেওনেট" বাহির করিয়া ফেলিল রাম। চট করিয়া খাপ হইতে বেওনেট বাহির করিয়া ঠাকুর্দার কাছে ছুটিয়া গেল।]

রাম ॥ ঠাকুর্দা, এই যে !

কীর্তিবাস ॥ বিশ্বাস করেছিস ?

রাম ॥ করেছি দাদু, করেছি।

কীর্তিবাস ॥ আজ আমার কাজ ফুরোলো দাদু ভাই—আজ আমার কাজ ফুরোলো। ওটা হ'ল গিয়ে তোর বংশের সম্মান—ও সম্মান তুই রাখবি চিরদিন চিরকাল। যেখানকার জিনিষ সেখানে রেখে দে। এবার আমায় শেষ ঘুম ঘুমুতে দে।

[রাম তুলসী বেদীর তলে যথাস্থানে বেওনেটটি লুকাইয়া রাখিয়া ঠাকুর্দার কাছে আসিল।]

রাম ॥ ঠাকুর্দা ! ঠাকুর্দা !

[কোন সাড়া না পাইয়া তাহার বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল]

রাম ॥ ঠাকুর্দা !

[দৃশ্য অন্ধকার হইয়া গেল।]

———

প্রথম অঙ্ক

১৯০৫—১৯১১

[পূর্বোক্ত দৃশ্য। ১৯১১ সালের ডিসেম্বরের শেষভাগ। কার্য উপলক্ষে মহাভারত মেদিনীপুর শহরে গিয়াছে। মহাভারতের স্ত্রী গঙ্গা তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছে।]

গঙ্গা ॥ মা লক্ষ্মী, কৃপা করো, কাঞ্চন দিয়ে আমি কাঁচ নেবো না। ঘরের থাকতে আমি পরের নেবো না, শাঁখা থাকতে আমি চুড়ি পরবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না, মোটা বসন অঙ্গে নেবো, মোটা ভূষণ আভরণ করবো, মোটা অন্ন অক্ষয় হোক। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক। ছেলেমেয়েরা মানুষ হোক।

[গঙ্গা প্রণাম করিয়া বাতাসার থালা হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ছেলেমেয়েরা কীর্তন গাহিতে লাগিল :]

ছেলেমেয়েরা ॥ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে ॥

[গঙ্গা হরির লুট দিল। সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া হরির লুট লইল। জিনিসপত্র হাতে লইয়া মহাভারত ঘরে ফিরিল। তাহার পশ্চাতে আসিল বাক্স-বিছানা বাহিয়া একজন চাকর ; সে উহা রাখিয়া অন্দরে চলিয়া গেল।]

মহাভারত ॥ মেদিনীপুর থেকে সেই কোন সকালে রওনা হয়েছি! যাক, হরির কৃপায় ঠিক সময়েই বাড়ি ফিরেছি দেখছি।

[হাঁটু গাড়িয়া তুলসীমঞ্চমূলে প্রণাম করিল। ছেলেমেয়েরা সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, গঙ্গা হরির লুটের থালা লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বড়মেয়ে তুলসী, বয়স আঠারো বৎসর, কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—]

তুলসী ॥ এত দেরি করলে কেন বাবা ?

গঙ্গা ॥ শরীর ভালো তো ?

[দ্বিতীয় পুত্র নিধিরাম, বয়স ষোল বৎসর, মহাভারতের হাত হইতে জিনিসপত্র লইতে গেল।]

নিধিরাম ॥ ঘোড়া কিনে এনেছ বাবা—ঘোড়া ?

[ছোটছেলে বলরাম, বয়স চৌদ্দ বৎসর, সাগ্রহে কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।]

বলরাম ॥ আমার জুতো, আমার কোট ?

গঙ্গা ॥ থাম সব। বাড়িতে পা দিতেই তাণ্ডব শুরু হয়েছে! কই, জিনিসগুলো আমাকে দাও। [ছেলেদের প্রতি] গোয়ালঘরে ধুনো দিয়ে সব পড়তে বসো গিয়ে [তুলসীকে] ওঁর হাত-পা ধোবার গামছা-গাড়ু।

[গঙ্গা জিনিসগুলি নিজের হাতে লইল। ছেলেমেয়েরা চলিয়া গেল।]

মহাভারত ॥ [ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য করিয়া] এনেছি—সবার জন্যে কিছু এনেছি। তোমাদের ধবলীগোরুর গলার ঘণ্ঠা—তাও ভুলিনি। [গঙ্গাকে] ভালো ছিলে তো সব ?

গঙ্গা ॥ হ্যাঁ, সব ভালোই ছিলাম। শ্রীধর-ঠাকুরপো কলকাতা থেকে আজ ফিরেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

মহাভারত ॥ রামের কোন খবর এনেছে ?

গঙ্গা ॥ কীজানি, আমি ওর পাগলামি সব সময়ে বুঝি না ! কথা শুনে মনে হয় রামের অনেক খবরই জানে—কিছু ভাঙতে চায় না। রামের কথা আমি আর ভাবতে পারিনা। পেটের ছেলে হয়ে এমন দাগা দেবে, কে জানতো ? এ কি, কোথায় চললে ?

মহাভারত ॥ শ্রীধরের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

গঙ্গা ॥ না—না, এক্ষুনি কি যাবে ? শ্রীধর-ঠাকুরপো আবার আসবে বলে গেছে ; না আসে খবর পাঠাবো। তুমি এসো—হাত-পা ধোবে, খাবে।

মহাভারত ॥ ও, হ্যাঁ, আসল কথাই যে তোমায় বলা হয়নি।

গঙ্গা ॥ কী ?

মহাভারত ॥ নারান আসছে যে !

গঙ্গা ॥ কোন নারান ?

মহাভারত ॥ দফাদার নারান।

গঙ্গা ॥ বল কী ? হঠাৎ গরিবের বাড়িতে হাতির পা ?

মহাভারত ॥ পথে দেখা। বললে, কী একটা তদন্তে যাচ্ছে। ফেরবার পথে আমার এখানে খাওয়া-দাওয়া করে যেতে বলেছি। একটু জোগাড়যন্ত্র করো। তুলসীর সঙ্গে ওর বিয়ের কথাটা আজ পাকা করবো মনে করছি।

গঙ্গা ॥ ও আমাদের ঘরের মেয়ে বিয়ে করবে না। ওর চাল দেখে আমার গা জ্বলে যায়।

মহাভারত ॥ তা, দফাদার মানুষ, চাল তো একটু হবেই। প্রতাপটা তো কম নয়! দশটা গাঁয়ের চৌকিদারদের মাথা। এ ছেলেকে জামাই করতে পারলে আমার প্রতাপটাই কি কম হবে গিন্নী! হাঃ হাঃ! যাও—যাও, তুলসীর জন্যে ময়ুরপংখী শাড়ি এনেছি, ওকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখো। শুধু মেয়েকে সাজালে হবে না— মেয়ের মাকেও সাজতে হবে। শাশুড়িও পছন্দ হওয়া চাই কিনা, তাই। হাঃ হাঃ! তা তোমার জন্যেও এনেছি আমি—এই যে নীলাম্বরী।

গঙ্গা ॥ ওমা! এ শাড়ি পরবার কি আমার বয়স আছে ? আর এত পাতলা! ওমা, এটা যে বিলিতী!

মহাভারত ॥ তা হোক—তবু তো মনের মতো হয়েছে।

গঙ্গা ॥ না—না ; বিলিতী শাড়ি আমি পরতে পারবো না।

মহাভারত ॥ আরে, শহরে শুনে এলাম, ভাঙা বাংলা আবার জোড়া লেগেছে। বিলিতী শাড়ি পরতে বাধা কী?

[তুলসীর প্রবেশ]

তুলসী ॥ বাবা, কুয়োর পাড়ে তোমার হাত-পা ধোবার জল দিয়েছি।

মহাভারত ॥ যাচ্ছি।

[মহাভারত হাত-পা ধুইতে চলিয়া গেল]

তুলসী ॥ মা, বাবা আমার জন্য ময়ূরপংখী এনেছে?

গঙ্গা ॥ কী জানি মা, কী এনেছে দেখো। নারান দফাদার আজ রাত্রে খাবে, চলো দেখি—কি রান্নাবান্না হবে।

[তুলসী কাগজের মোড়ক হইতে শাড়ি বাহির করিল]

তুলসী ॥ মা, এই তো আমার ময়ূরপংখী। ওঃ কী চমৎকার! আর এটা? ও, এটা নীলাম্বরী। তোমার জন্যে। কিন্তু, মা, তোমার এ শাড়িটা তো বিলিতী! বাবা বিলিতী কেন আনলেন? তুমি বিলিতী শাড়ি পরবে মা?

[অদূরে শ্রীধর ও তাহার দলবলের স্বদেশী গান শোনা গেল]

"বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
পুণ্য হউক, হে ভগবান।"

তুলসী ॥ [চাপা গলায়] মা, শ্রীধর কাকা! বিলিতী শাড়িটা দেখলে আর রক্ষে নেই। তুমি এসব নিয়ে ঘরে যাও, আমি কথা বলছি।

[গঙ্গা জিনিসপত্র লইয়া অন্দরে চলিয়া গেল। গাঁয়ের গায়েন শ্রীধর সদলবলে গাহিতে গাহিতে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল]

"বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক
এক হউক, হে ভগবান।"

[গান শুনিয়া সেখানে বাড়ির সকলে সমবেত হইল। মহাভারতও। শ্রীধর সদলবলে কথকতার গান ধরিল।

"বণিক এলো বিদেশ থেকে,
মোদের দেশে বসলো জেঁকে,
ব্যবসা ছেড়ে শাসন গেড়ে
শোষণ করলো শুরু।"
দাঁও মেরে গদিখানা
[বাংলার গদিখানা]
করে লাটসাহেবিয়ানা।

গর্বে তারা আত্মহারা
ভুললো লঘুগুরু
বণিক শাসন করলো শুরু—
এই বাংলার রক্ত শুষে
শাসন করলো শুরু
এলো উনিশ-শ' পাঁচ সন,
এলো লাট লর্ড কার্জন,
স্পর্ধা এত—ইচ্ছামতো
করলো বাংলাকে দু,খানা !

অশ্বিনী-সুরেন্দ্র-বিপিন—
গর্জে' উঠে সবাই সেদিন,
বললে হেঁকে সভা ডেকে,
বাংলা-ভাগ হবে না মানা।
এ বাংলা একই র'বে।
বাংলা-ভাগ হবে না মানা—
উঠলো ধ্বনি মেঘমন্দ্রে—
বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্
দেশময় জাগলো সাড়া বাংলা মায়ের জয়।

রবি ঠাকুরের দলও তখন
রাখীবন্ধনে করলো পণ—
এক বাংলা এক বাঙালী—
দুই কিছুতেই নয়—
বাঙালী উঠলো জেগে—
জয় বাংলার জয় !
বিলাতী বয়কট হোলো
দেশে সব দেশী চললো।
ভারত জুড়ে একই সুরে
হাঁকে 'বন্দেমাতরম্'।
বঙ্গ ভঙ্গ অন্দোলনে
বারীন-অরবিন্দ সনে
বিপ্লবীরাও যোগ দিল যে
নিয়ে বারুদ-বোম্।
ভারতে পড়লো সাড়া—
হাঁকে 'বন্দে মাতরম্'।

উনিশ-শ' এগারোর শেষে
পঞ্চম জর্জ ভারতে এসে
দরবার ডেকে দিল্লী থেকে
বললে, বঙ্গ ভঙ্গ নয়।
সফল মোদের আন্দোলন
হেঁট-মুণ্ড লর্ড কার্জন।
কলকাতা থেকে দিল্লী নিল—
বাঙালীকে তার ভয়।
রাজধানী, ভাই, দিল্লী নিল!
—জয় বাংলার জয়!

মহাভারত ॥ হ্যাঃ! রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লী গেল—বাঙালীর ভয়ে! তোমার যেমন কথা!

শ্রীধর ॥ হ্যাঁ, বাঙালীর ভয়ে। একশ' বার বলবো, বাঙালীর ভয়ে। এই মেদিনীপুরের ভয়ে—তাও বলবো। তুমি তোমার রামের খবর আমায় জিজ্ঞেস করো। করো কিনা? তবে আমার এই রামায়ণ শোনো—সব খবর পাবে।

[গান ধরিল]

শোনো—শোনো, ভাই, মেদিনীপুরের
অমর কাহিনী।
এই জেলাতেই প্রথম হোলো
শহীদ-বাহিনী।
অরবিন্দ গড়েছিল গোপন-সমিতি—
যে দুই গুপ্ত সমিতি—
অধীন দেশকে স্বাধীন করা
যার ছিল নীতি,
সেই সমিতির এক সমিতি
এই মেদিনীপুরে।
এই জেলারই হেম কানুনগো
এলো ফ্রান্স ঘুরে—
ফরাসী দেশ থেকে শিখে
বোমার কারিকুরি।
মুরারিপুকুরে করলো
বোমা তৈরির পুরী।
(ও ভাই) প্রথম বোমা নারায়ণগড়ে
সে তো মেদিনীপুরে—

এক বোমাতেই লাটসাহেবের

ট্রেনটি গেল উড়ে।

বোমা নিয়ে বেরলো যে

তরুণ-বাহিনী,

তাদের কথাই মেদনীপুরের

অমর কাহিনী।

কিংসফোর্ড সাহেব বিপিন পালকে

পাঠিয়েছিল জেলে।

কিংসফোর্ডকে শেষ করবে

পণ করে দুই ছেলে—

(একজন মেদিনীপুরের ছেলে)

মজঃফরপুর জেলায় তাকে

বদলি করে দিলো।

ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী

সেথায় পিছু নিলো

মরলো ক্ষুদিরামের ভুলে

দারুণ বোমা খেয়ে

একজন মিসেস কেনেডি, আর

কেনেডিরই মেয়ে।

প্রফুল্ল চাকী দিল ফাঁকি

নিজেকে মেরে হাসি,'

পড়লো ধরা ক্ষুদিরাম বোস

গলায় নিল ফাঁসি।

(ও ভাই) কিশোর ছেলের এমন সাহস

কেউ তো ভাবিনি—

মেদিনীপুরের বুকে লিখলো

অমর কাহিনী।

মহাভারত ॥ না—না, ভাই, এসব বড় গোলমেলে কথা। নারান সেদিন বলছিলো, পুলিস খবর পেয়েছে, তুমি এইসব বে-আইনী গান গাও। বলেছে, কোনদিন তোমার হাতে দড়ি পড়বে। সেই নারান আজ আমার এখানে আসছে। তুমি ভাই; বাড়ি যাও। কাজ নেই আমায় রামের খবরে।

গঙ্গা ॥ আমি জানি সে আর নেই!

শ্রীধর ॥ আছে কি নেই, সে তোমরা বলতে দিচ্ছ কই ?

মহাভারত ॥ না—না তোমাকে আর বলতে হবে না। ওসব বে-আইনী গান শুনে কি শেষে আমাদের হাতেই দড়ি পড়বে!

শ্রীধর ॥ তবে দাদা, শোন এবার—
"বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা
এর চেয়ে নেই বড় তামাসা।"

মহাভারত ॥ শ্রীধর, তুমি যাবে কিনা বলো ?

শ্রীধর ॥ যাচ্ছি, দাদা, যাচ্ছি।

[বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, তার চেয়ে নেই বড় তামাসা…" গাহিতে গাহিতে সদলবলে চলিয়া গেল। অন্যান্য লোকজনও কর্তার রাগ লক্ষ্য করিয়া অদৃশ্য হইল]

গঙ্গা ॥ [ক্রুদ্ধ মহাভারতের কাছে গিয়া] তুমি নিজে কলকাতায় গিয়ে রামের খবরটা নিয়ে আসতে পারো না ?

মহাভারত ॥ না, পারি না। আমার ভারি দায় পড়েছে! ধরে নাও, ও ছেলে আমার মরে গেছে। বাড়ির বড়ছেলে, ক্ষেত-খামার করবে, আমার পাশে দাঁড়াবে। তা' না করে তিনি গেলেন কলকাতা শহরে চাকরি করতে! চাকরি কি-না—খানসামার চাকরি। যেদিন গেছে সেদিনই আমি জেনেছি, ও ছেলে আমি হারিয়েছি!

[একাকী শ্রীধরের প্রবেশ]

মহাভারত ॥ একী! আবার!

শ্রীধর ॥ রামের খবর।

মহাভারত ॥ থাক্!

গঙ্গা ॥ সত্যিই কি তার খবর কিছু জানো ঠাকুরপো ?

শ্রীধর ॥ জানি।

মহাভারত ॥ জান তো বলতে কী হচ্ছে ?

শ্রীধর ॥ বলতেই তো এসেছি।

মহাভারত ॥ কিন্তু, খবরদার, গানটান নয়।

শ্রীধর ॥ না, গানটান নয়, তাই তো দলবল সরিয়ে রেখে চুপি চুপি আমি এলাম, গোপনে বলবো বলে।

মহাভারত ॥ গোপনে! গোপনে কেন ? সে চোর না ডাকাত!

গঙ্গা ॥ না—না, সে হয়তো, বেঁচে নেই……তাই।

শ্রীধর ॥ বেঁচে আছে—ডাকাতি করছে।

মহাভারত ॥ ডাকাতি করছে! আমার ছেলে ? আমি বিশ্বাস করি না। বরং বলো সে মরেছে।

শ্রীধর ॥ মরেনি বরং মারছে। দেশের শত্রু নিপাত করছে। বিদেশী ডাকাতদের তাড়াতে সে স্বদেশী ডাকাত হয়েছে।

মহাভারত ॥ আমি বিশ্বাস করি না। আমার ছেলে কী এক খবরের কাগজের আপিসে খানসামার কাজ করতো। খানসামার কাজ ছোট কাজ, তাই বলে ডাকাতির মতো ছোট কাজ সে করবে না।

শ্রীধর ॥ হ্যাঁ, "যুগান্তর"-আপিসে সে কাজ করতো। গোটা দেশকে জাগিয়েছে 'যুগান্তর'—তোমার রাম বাদ যাবে ? ক্ষুদিরামের ফাঁসিতে সে ক্ষেপে উঠেছে। মেদিনীপুরেরই তো ছেলে !

গঙ্গা ॥ তবে কি রামেরও ফাঁসি হবে, ঠাকুরপো ?

শ্রীধর ॥ ফাঁসির ভয় আছে বইকি বউঠান। কিন্তু, সে ভয়কে ওরা জয় করেছে। তুমি মা, তোমাকে কেউ যদি বেঁধে রাখে—ছেলে কি তা, দাঁড়িয়ে দেখবে ? তাতে কি তোমার মুখ উঁচু হবে, বউঠান ? আজ আমাদের সকলের মা, আমাদের দেশজননী দাসত্বশৃঙ্খলে বন্দিনী। সে বন্ধন মোচন করতে হ'লে শুধু আবেদন-নিবেদনে চলবে না। শুধু সুরেন বাঁড়ুজ্যের আন্দোলনে ভাঙা বাংলা জোড়া লাগে নি। ক্ষুদিরামের ওই বোমাটারও দরকার ছিল।

মহাভারত ॥ বোমা-বারুদ আমি বুঝি না—

শ্রীধর ॥ কিন্তু রাম সেটা ভালো করে বুঝেছে। 'যুগান্তর' আর 'অনুশীলন' দল বোমা-বারুদ দিয়েই বিদেশী শাসন উড়িয়ে দেবে। দেশের বিপ্লবী সন্তানরা মরীয়া হয়ে উঠেছে। অত্যাচারী শাসকদের কুকুরের মতো গুলি করে মেরে একে একে তারা সাবাড় করছে। কিন্তু শুধুহাতে এ লড়াই চলে না। টাকা চাই। তাই ডাকাতি করে এই টাকাটা জোগাড় করতে হচ্ছে।

মহাভারত ॥ হ্যাঁ, দেশের লোকের সর্বনাশ করে দেশোদ্ধার হচ্ছে !

শ্রীধর ॥ লোক বুঝেই তারা ডাকাতি করছে মহাভারতদা। যাদের অনেক আছে, শুধু তাদেরই নিচ্ছে। একটা কথা ভুলো না মহাভারতদা মায়ের বন্ধন-মোচন করতে গিয়ে পাপ-পুণ্যের চুলচেরা বিচার চলে না। সবচেয়ে বড় কথা মাকে মুক্ত করা—পরাধীনতার অশুচি থেকে মুক্ত হওয়া। এ সাধনায়—এ তপস্যায় মেদিনীপুর পিছিয়ে নেই, এগিয়ে চলেছে। বরং গর্ব করো—সে দলে তোমাদের রামও আছে।

মহাভারত ॥ তাই যদি হয়—আমি মনে করবো—ছেলে আমার মরে গেছে।

[ক্রোধে মহাভারত সেখান হইতে চলিয়া গেল]

গঙ্গা ॥ আমি তা মনে করবো না ঠাকুরপো। ছেলে আমার বেঁচে থাক। তোমার অত কথা আমি বুঝিনা, কিন্তু এইটুকু বুঝি, আমাকে যদি কেউ বেঁধে রাখে সে বাঁধন খুলে আমায় মুক্ত করতে আমার যে ছেলে প্রাণ দেবে—সেই আমার ছেলে, যে দেবেনা, সে আমার ছেলে নয়।

শ্রীধর ॥ রাম তোমার সেই ছেলে। সে বেঁচে আছে।

গঙ্গা ॥ আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি, আমি দেখেছি, মায়ের জন্য ওর প্রাণ কাঁদে। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'—ওর মুখের সেই গান আমি ভুলতে পারিনা।

[শ্রীধরের গান]

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে, ভাই।
দীন-দুখিনী মা যে মোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সুতার সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই ;
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
পরের দোরের ভিক্ষা চাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে,
এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই,
পরের জিনিস কিনবো না যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।"

[রজনীকান্ত সেন]

[গানের মধ্যভাগে মহাভারত এবং শেষভাগে নারান দফাদার আসিয়া দাঁড়াইল।]

নারান ॥ আবার তোমার পাগলামি শুরু হয়েছে শ্রীধর খুড়ো ? এসব স্বদেশী গান গাওয়া বে-আইনি—জান তো ?

শ্রীধর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ !

[অট্টহাস্য করিয়া গান ধরিল।]

"আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবি,
আমি কি মা'র সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মাকে ফেলে ?"

[শ্রীধর গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।]

মহাভারত ॥ এসো, বাবা নারান, এসো, বসো।

নারান ॥ হুঁ, বসছি। কিন্তু, এদের নামে রিপোর্ট করতে হবে।...আর, এরা আপনার বাড়িতেই বা আসে কেন ?

মহাভারত ॥ পাগলে কী না বলে আর ছাগলে কী না খায় ! ওদের কথা ধরো না বাবাজী, ওদের কাজই হোলো বাড়ি বাড়ি ঘোরা আর ভিক্ষে করা। আমি হাঁকিয়েই দিয়েছি।

গঙ্গা ॥ তা হ'লে তোমরা বসো, আমি আসছি।

নারান ॥ [হঠাৎ গঙ্গাকে লক্ষ্য করিয়া] ও, আপনি ! আমি দেখিই নি !

[গঙ্গাকে প্রণাম করিল)

গঙ্গা ॥ থাক বাবা, থাক। ভালো আছো তো ?

নারান ॥ আর ভালো! দশ-দশটি গাঁয়ের চৌকিদারদের খবরদারি করে বেড়াতে হয় একা আমাকে। সব অপদার্থ! দু'জনের এবার ভাত মারবো ঠিক করেছি।

গঙ্গা ॥ না বাবা, এ দিনে কারো ভাতটাত মেরো না। আচ্ছা বসো, আমি তোমাদের খাবার যোগাড় করিগে।

নারান ॥ না না; আমি খাবোটাবো না—আমার তাড়া আছে। আসবার সময় খবর পেলাম, পুলিসের বড়কর্তা কাল এ থানা দেখতে আসছেন। সেসব জোগাড়-যন্ত্র আমাকেই করতে হবে কিনা।

মহাভারত ॥ কিছু না খেয়ে গেলে চলবে কেন বাবাজি! আমি যে কত আশা করে…

নারান ॥ আশা কি আমারই কম ছিল জ্যাঠামশাই? ভেবেছিলাম, খাবো-দাবো—রাতটা এখানেই কাটাবো। কিন্তু, গেরো দেখুন!

মহাভারত ॥ অন্তত একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে বইকি! [গঙ্গাকে] যাও, তুমি যাও, তুলসীকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও।

গঙ্গা ॥ দিচ্ছি।

[গঙ্গা চলিয়া গেল.]

মহাভারত ॥ তা বাবা, ভেবেছিলাম—তুলসীর সঙ্গে বিয়ের পাকা কথাটা আজই দেবে। বড় আশা করে আমরা অনেকদিন ধরে বসে আছি।

নারান ॥ মুশকিল হয়েছে কি জানেন—বাবা মারা গেছেন—আমাকেও মেরে গেছেন! জোত-জমি কিছুই নেই। বিয়ের এসব খরচপত্তরই বা আসবে কোত্থেকে, আর বিয়ে করেই বা চলবে কী করে? সে কথা ভেবেই আকুল হচ্ছি জ্যাঠামশাই।

মহাভারত ॥ তোমার আবার অভাব। সরকারী চাকরী—তাও আবার পুলিশের চাকরি!

নারান ॥ হ্যাঁ, দশটা গাঁ তাই ভাবছে বটে, কিন্তু—বললে বিশ্বাস করবেন না—স্বদেশীরা ঘুষটুষ দেয় না। দেখাদেখি চোর-চোট্টারাও না। তার ফলে ক্ষমাটমা সব ছেড়ে দিয়েছি। দোষ করেছেন কি গেছেন—সে আপনই হোন আর…

মহাভারত ॥ ওরে বাবা, তা তো বটেই, তা তো বটেই! যাক, ঘুষের জন্যে ভেবো না বাবাজি। মেয়েকে তো শধু-হাতে দেবো না আমি। কিছু জোত-জমি যৌতুক দেবো বইকি।

নারান ॥ ব্যাস—তা হলেই হোলো। মানে, আপনার মেয়ে কষ্ট না পেলেই হোলো।

মহাভারত ॥ বাঁচালে বাবা নারান—তুমি আমাকে বাঁচালে। তোমার এই পাকা কথাটা পাবার জন্যে আমরা কতদিন থেকে বসে আছি। বেশ, দিনক্ষণ ঠিক করে তোমাকে জানাবো'খন।…আঃ, একটু জলখাবার আনতে কেন যে এরা এত

দেরি করছে! এই যে—এনেছে। [তুলসী জল খাবার আনিয়া নারানের সামনে রাখিল] বাড়ি ফিরে আমি এখনো ঠাকুরঘরে যাই নি, আমি ঠাকুর প্রণাম করে আসি।

(মহাভারত চলিয়া গেল। সরবতের গেলাস হাতে নিয়া নারান কহিল—)

নারান ॥ [তুলসীকে] কী, কথা কইছো না যে ?

তুলসী ॥ আপনাকে দেখলে আমার ভয় হয়।

নারান ॥ কেন ?

তুলসী ॥ আপনার কাজ তো লোককে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া।

নারান ॥ [হাসিয়া] হ্যাঁ। এবার বাঁধবো- তোমায়। বেঁধে নিয়ে জেলে পুরবো [নিজের বুকে হাত দিয়া] এই জেলে।

তুলসী ॥ সে তো আজ দু' বছর ধরেই শুনছি। সাধ্যি তো হয়নি।

নারান ॥ এবার হবে, তৈরী থেকো।

তুলসী ॥ সন্দেশটা খান। শুনলাম আপনি এক্ষুনি নাকি চলে যাবেন ?

নারান ॥ হ্যাঁ। পুলিস-সাহেব আসবে যে !

তুলসী ॥ তিনি কি আপনার চেয়েও বড় ?

নারান ॥ হ্যাঁ বড় মানে, আমরা বড় বলে মানি তাই বড়। আচ্ছা, আজ তাহলে চলি। ওই তোমার বাবা আসছেন। কিন্তু শোনো, এতকাল শুধু লোককে বেঁধেছি, এবার নিজেই বাঁধা পড়বো তোমার কাছে। [মহাভারতকে শুনাইয়া] আপনাদের বাড়ির মতো সরবত এ তল্লাটে আর কোথাও খাইনি। যেমন মিষ্টি …তেমনি ঠাণ্ডা।

(মহাভারত আসিল। তাহার পিছনে শহর হইতে সদ্য আনা জামা-কাপড় ও জুতা পরিয়া বলরাম ও নিধিরাম আসিয়া দাঁড়াইল। নারান মহাভারতকে প্রণাম করিল।)

তা হলে আজ চলি। হ্যাঁ, আসল কথাটাই ভুলে গেছি।

মহাভারত ॥ কি বাবাজী ?

নারান ॥ কাঁথির দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করছিলেন আপনার বড় ছেলে রামের কোন খবর জানেন কিনা—মানে, কোথায় আছে—কি করছে, এইসব।

মহাভারত ॥ তার কথা আর আমায় জিজ্ঞাসা কেরো না বাবাজি। কলকাতা শহরে গিয়ে বুড়ো বাবা মাকে সে একেবারে ভুলে গেছে। বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে !

নারান ॥ হ্যাঁ, আমিও তাই বলেছি। [জনান্তিকে] শ্রীধরের ওপর একটু নজর রাখবেন। লোকটা পাগলের মতো থাকে বটে কিন্তু পাগল নয়। আচ্ছা, চলি।

নিধিরাম ॥ দফাদার-সাহেব, আপনার ঘোড়াটা আমায় একদিন চড়তে দেবেন ?

বলরাম ॥ আমাকে দেবেন ?

নারান ॥ আমার ঘোড়ায় চড়তে হ'লে আরো বড় হ'তে হবে।

নিধিরাম ॥ আমিও তাই ভাবি। বড় হয়ে, আপনার মতো দফাদার হয়ে, লোকজনের কোমরে দড়ি বেঁধে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবো—

[মহাভারত ও নারান হাসিয়া উঠিল]

নারান ॥ তা বইকি—তা বইকি। [বলরামকে] আর, তুমি ?

বলরাম ॥ বড় হয়ে আমি তোমার কোমরে দড়ি বেঁধে হিড়্হিড় করে টেনে নিয়ে যাবো।

মহাভারত ॥ [বলরামকে চড় মারিল] যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা !

বলরাম ॥ বাঃ, ওর বেলা দোষ নেই, আমার বেলা দোষ ! [ক্রন্দন]

নারান ॥ না না, ছেলেমানুষ, ওর কথা আপনি ধরেন কেন ? [বলরামকে] আচ্ছা ভাই, বড় হও—তখন দেখা যাবে। আচ্ছা, আসি।

[নারান চলিয়া গেল। মহাভারত ও ছেলেরা তাহার পিছনে পিছনে গেল। মঞ্চ ক্রমশ অন্ধকার হইয়া আসিল। রাত্রি গভীর হইয়াছে। নেপথ্যে শৃগালের রব শোনা গেল। গ্রাম্য চৌকিদার হাঁক দিয়া গেল। এই অন্ধকারের মধ্যে ধীর পদক্ষেপে প্রাঙ্গনে একটি ছায়ামূর্তির মত রাম আসিয়া দাঁড়াইল। খানিকক্ষণ সব চুপচাপ—শুধু ঝিঁঝিঁপোকার শব্দ শোনা যাইতেছে। ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে ঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকিল, "মা—মা !" সাড়া মিলিল না। তখন সে দরজায় করাঘাত করিল। ভিতর হইতে সাড়া পাওয়া গেল, "কে ?"]

রাম ॥ আমি মা—আমি রাম।

[গঙ্গা দরজা খুলিয়া সামনে রামকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল।]

গঙ্গা ॥ রাম ! জয় মা মঙ্গলচণ্ডী ! আয় বাবা, ঘরে আয়।

[রাম মাকে প্রণাম করিল। মহাভারত ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল—]

মহাভারত ॥ কে ওখানে ?

গঙ্গা ॥ [উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে] রাম এসেছে—আমার রাম !

রাম ॥ চুপ ! ভাইবোনেরা সব জেগে উঠবে ! একটা আলো নিয়ে তুমি বাইরে এসো বাবা।

[মহাভারত লণ্ঠন লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল]

মহাভারাত ॥ রাম ! বেঁচে আছিস বাবা ! ঘরে আয়।

[রাম মহাভারতকে প্রণাম করিল]

রাম ॥ না বাবা, আমি লুকিয়ে এসেছি—লুকিয়ে চলে যাবো।

মহাভারত ॥ লুকিয়ে এসেছিস ! মানে ?

রাম ॥ লুকিয়েই রয়েছি যে। আজ ভোরে গাঁয়ে পৌঁছেছি। শ্রীধর কাকার বাড়িতে দিনটা লুকিয়ে কাটিয়েছি। রাতের অন্ধকারে এসেছি বাড়িতে, আবার রাতারাতিই ছুটতে হবে কলকাতায়।

গঙ্গা ॥ বলিস কী ! তবে ওদের সবাইকে ডাকি।

রাম ॥ না, ভাইবোনদের ডেকো না—ওরা ছেলেমানুষ—এ কথা তা হ'লে গোপন থাকবে না, তোমাদের বিপদ হবে। চলো ওই উঠোনটায় বসি।

গঙ্গা ॥ তোমরা বসো, আমি কিছু খাবার নিয়ে আসি।

মহাভারত ॥ আমার হুকো-কলকেটাও এনো। [গঙ্গা চলিয়া গেল। মহাভারত ও রাম প্রাঙ্গণে আসিয়া বসিল] লুকিয়ে এসেছ কেন ?

রাম ॥ আমাদের সঙ্গে সরকারের লড়াই চলছে যে।

মহাভারত ॥ [বিস্মিত হইয়া] লড়াই ! সরকারের সঙ্গে ? রাজার সঙ্গে ? তবে যে শ্রীধর বলে গেলো, সে কথা সত্যি ? তবে তুমিও স্বদেশী ডাকাত হয়েছ ?

রাম ॥ বিদেশীর গোলামি দূর করতে হ'লে, ও ছাড়া আর কোনো পথ নেই বাবা।

মহাভারত ॥ আমি অত-সব বুঝিনা ; কিন্তু এইটুকু বুঝি—ডাকাতি করা পাপ।

রাম ॥ তাই যদি হয় বাবা, তবে সবচেয়ে বড় পাপ করেছে ইংরেজ সরকার। ডাকাতরা ডাকাতি করে চলে যায়, আর এরা আমাদের দেশে ডাকাতি করতে এসে ঘর জুড়ে বসেছে। যাবার কোনো মতলব নেই। শাসন গেড়ে মনের সুখে শোষণ করছে।

মহাভারত ॥ বুঝিনা—আমি অত-সব বুঝিনা। বিলিতী জিনিস না কিনে স্বদেশী কিনতে বলছে—সেটা খানিকটা বুঝি। বাংলাদেশ দু'ভাগ করেছিল—তার জন্যে রাখীবন্ধন হোলো। বিলিতী জিনিস পোড়ানো হোলো—স্বদেশী জিনিস কেনার ধুম পড়ে গেল—তাও ভালো। কারো আপত্তি নেই। কিন্তু বোমা-বাবুদের কারবারে তোমাকে আমি যেতে দিতে পারবো না। এসব ছেড়ে দিয়ে ক্ষেত খামার নিয়ে থাকো—আমার পেছনে দাঁড়াও।

রাম ॥ তার চেয়ে বরং মনে করো—তোমার এ ছেলে মরে গেছে।

মহাভারত ॥ [উত্তেজিতভাবে] হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে আমি তাই মনে করবো রাম।

[গঙ্গা এক হাতে খাবার ও অন্য হাতে হুঁকো লইয়া আসিল]

রাম ॥ এই যে মা, কী খাবার এনেছো দাও, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। আঃ, কতকাল তোমার হাতের খাবার খাইনি।

[রাম দ্রুত খাইতে লাগিল ও মহাভারত নীরবে তামাক টানিতে লাগিল।]

গঙ্গা ॥ হ্যাঁরে, তুই নাকি দেশের জন্যে ডাকাতি করছিস ?

রাম ॥ হ্যাঁ মা !

গঙ্গা ॥ কাজটা কি ভালো হচ্ছে ? [মহাভারতের দিকে তাকাইয়া] তুমি কী বলো ?

মহাভারত ॥ আমার যা বলবার বলেছি।

রাম ॥ হ্যাঁ মা, দেশের কাজে জীবন দেবো—বাবার তাতে আপত্তি নেই।

গঙ্গা ॥ কিন্তু আমার আপত্তি আছে বাবা। দেশের কাজে হেলায় জীবন দেওয়ার চাইতে বেচে থেকে লড়াই করা অনেক বড়। যে বীর—সে মরে না, সে হারে না, সে বাঁচবার জন্যে লড়াই করে। সে হারিয়ে দেয়—হারে না। তুমি আমার সেই ছেলে রাম।

রাম ॥ তোমার কথা আমি মাথায় করে নিলাম মা।

গঙ্গা ॥ দেশের কী কাজ তুমি করছো আমি জানি না, তুমি বললেও হয়তো বুঝবো না। সত্যি কথা বলতে গেলে, দেশ কী তাও আমি জানি না। কিন্তু যে কাজই তুমি করো না কেন—আমার মুখ যেন কখনো হেঁট না হয় বাবা।......আর একটু পায়েস দিই?

রাম ॥ না মা, থাক। আমাকে এখুনি ছুটতে হবে। রাতারাতি কাঁথি ছাড়তে হবে। অনেকদিন তোমাদের দেখিনি। শ্রীধর কাকার কাছে তোমাদের কথা শুনে মন আমার আনচান করে। পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এলাম—তোমাদের দেখতে—পায়ের ধুলো নিতে।

গঙ্গা ॥ আর একটা দিন যদি থেকে যেতিস! লুকিয়েই থাকতিস—আমার মা-মঙ্গলচণ্ডীর ঘরে।

মহাভারত ॥ না।

রাম ॥ না মা, বাবা ঠিকই বলেছেন। গাঁয়ে নাকি নারান দফাদার এসেছে। জানাজানি হ'লেই বিপদ। যাক, এই রাখীগুলো আজ ক'বছর ধরে জমিয়ে রেখেছি।

[মায়ের হাতে রাখী বাঁধিতে বাঁধিতে]

প্রতি বছর তিরিশে আশ্বিন বাঙালীরা বাঙালীর হাতে রাখী বেঁধে বলে—'আমরা এক'। তোমার হাতে এক রাখী বাঁধছি—মনে হচ্ছে, তুমি-আমি এক। এক রক্ত, এক নাড়ী, এক আশা, এক কামনা—আমরা এক থাকবো,—আমাদের দেশ আমাদের—আর কারো নয়। ভাইবোনদের হাতে হাতে আমার হয়ে এই রাখীগুলো তুমি পরিয়ে দিয়ো মা। আসি।

গঙ্গা ॥ যাবি!—এখুনি? এই ঘুটঘুটে অন্ধকার পথে চলতে পারবি?

রাম ॥ আমাকে যেতেই হবে মা।

গঙ্গা ॥ একটা লণ্ঠন দিই।

রাম ॥ না না, লণ্ঠন নয়, বরং দাও একটা দেশলাই। তোমরা দেশী দেশলাই পাচ্ছো?

গঙ্গা ॥ আছে বাবা, আছে।

[গঙ্গা ত্বরিতপদে ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। মহাভারত ও রাম দু'জনেই নিস্তব্ধ। পরক্ষণেই দিয়াশলাই ও সদ্য আনা সেই বিলাতী শাড়ি লইয়া গঙ্গা আসিয়া দাঁড়াইল।]

গঙ্গা ॥ এই নাও দেশলাই, আর এই শাড়িটাও নাও।

রাম ॥ শাড়ি দিয়ে আমি কী করবো মা?

গঙ্গা ॥ অন্ধকারে যখন দিশেহারা হবে, তখন এই দেশলাই দিয়ে বিলাতী এই শাড়ীতে আগুন ধরিয়ে, সেই আলোতে পথ চ'লো, বাবা।

রাম ॥ মা, যে আলো তুমি আমার মনে জ্বেলে দিলে পথ তাতে কখনো হারাবো না। আগুনের চেয়েও বড় আলো তুমি আমায় দিয়েছ মা। তোমাদের পায়ে আমার প্রণাম রইলো। আসি।

[উভয়কে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। গঙ্গার হাত হইতে শাড়ি ও দিয়াশলাই পড়িয়া গেল। সে ক্ষণকাল রামের পথের দিকে চাহিয়া রহিল, তৎপরে তুলসীমঞ্চের সামনে আসিয়া নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল—]

গঙ্গা ॥ মা লক্ষ্মী, কৃপা করো। কাঞ্চন দিয়ে আমি কাচ নেবো না। ঘরের থাকতে আমি পরের নেবো না। শাখা থাকতে আমি কাচের চুড়ি পরবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক। ছেলেমেয়েরা মানুষ হোক।

[গঙ্গার এই প্রার্থনার সময় মহাভারত হুঁকা টানিতে টানিতে কী ভাবিয়া, হুঁকোটি রাখিয়া, দিয়াশলাই জ্বালিয়া শাড়িটাতে আগুন ধরাইয়া দিল। গঙ্গা তুলসীমঞ্চের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়াই উঠিয়া দেখে, শাড়িটি পুড়িতেছে—মহাভারত সেই আগুনে টিকা ধরাইয়া হুঁকো টানিতেছে আর তাহা দেখিতেছে। গঙ্গা তুলসীমঞ্চের উদ্দেশে আবার প্রণাম করিল। যবনিকা নামিল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

(১৯২১)

[১৯২১ সালের এপ্রিল মাস। সকালবেলা। মহাভারত চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে বসিয়া হুঁকো টানিতেছে। মেজছেলে নিধিরাম আসিয়া খবর দিল যে, নারান ও তুলসী আসিতেছে।]

নিধিরাম ॥ বাবা, দিদি এসেছে, জামাইবাবু এসেছে, ঘোড়ায় চড়ে নয়—গোরুর গাড়ীতে।

মহাভারত ॥ তোমার জামাইবাবু দফাদার বলে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়, তাই বলে তোমার দিদিকেও ঘোড়ায় চড়িয়ে আনবে ? এক মেয়ের বাপ হয়েছ—এখনও তোমার ক্যাবলাপনা গেল না ! জামাই-মেয়ে আসছে—যাও তোমার মাকে গিয়ে বল।

নিধিরাম ॥ তা বলছি। তুমি বাবা, এবার জামাইবাবুকে একটু বোলো—না হোক, আমাকে একজন চৌকিদার করে দিক। আঃ, একবার চৌকিদার হ'তে পারলে, গাঁয়ের লোকদের আমি সব দেখে নিতাম !

মহাভারত ॥ চৌকিদার ! তিন তঙ্কা বেতন ! তাও আবার লোকে চৌকিদারী ট্যাক্সো দেবে না ঠিক করেছে ! উনি চৌকিদার হবেন !

নিধিরাম ॥ হবোই হবো—দেখে নিও।

[সস্ত্রীক নারান দফাদারের প্রবেশ। উভয়েই মহাভারতকে প্রণাম করিল।]

মহাভারত ॥ এস মা—এস বাবা, এস।

নিধিরাম ॥ [চীৎকার করিয়া] মা ! শিগ্‌গির এস, জামাইবাবু এসেছেন ! [নারানকে] জামাইবাবু, পেন্নাম হই।

[ধুপ করিয়া নিধিরাম নারানের পায়ের ধুলা লইল। গঙ্গা ও নিধিরামের স্ত্রী লক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্মীর আঁচল ধরিয়া আসিল তাহার পাঁচ বছরের মেয়ে জবা।]

মহাভারত ॥ [নারানকে] তোমরা ভাল আছ তো বাবা ?

নারান ॥ ভাল আছিও, আবার নেইও।

নিধিরাম ॥ জামাইবাবু, আপনার ঘোড়াটা কেমন আছে ? মরে যায়নি তো ?

নারান ॥ মরবে ! মরবে কেন ?

নিধিরাম ॥ [দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া] গোরুর গাড়ীতে এলেন কিনা—তাই।

তুলসী ॥ [জবাকে দেখাইয়া] ওমা, নিধুর মেয়ে এরই মধ্যে এত বড় হয়েছে। ওর নাম কী যেন রেখেছ মা ?

গঙ্গা ॥ ও আমাদের 'জবা'—মা-মঙ্গলচণ্ডীর পায়ের ফুল। আয় মা, ঘরে আয়।

[শুধু নারান ও মহাভারত রহিল, আর সকলে ভিতরে চলিয়া গেল।]

মহাভারত ॥ গাঁয়ে তো মস্ত গণ্ডগোল বাবাজি। সরকার থেকে ইউনিয়ন বোর্ড বসাচ্ছে। চৌকিদারী ট্যাক্সো হয়েছে দশগুণ। যে দুর্দিন পড়েছে, ভাত-কাপড় জোটানোই দায়—এতো ট্যাক্সো লোকে দেবে কী করে ?

নারান ॥ আপনিও কি দেবেন না ঠিক করেছেন ?

মহাভারত ॥ কেন দেব বলতে পার ? লাভটা কী আমাদের ?

নারান ॥ লোকেরা নিজেদের ইউনিয়নে নিজেরাই কর্তা হবে—পথঘাট করবে, ইস্কুল করবে, হাসপাতাল করবে—লাভ নয় ?

মহাভারত ॥ সে যা হবে জানি। চৌকিদার-দফাদারের বেতন দিতেই সব টাকা উড়ে যাবে।

নারান ॥ আপনি বুঝছেন না।

মহাভারত ॥ বেশ, আমি না হয় বুঝছি না, কিন্তু বীরেন শাসমলও কি বুঝছে না ? অতবড় বিলাতের পাস করা উকিল, অতবড় জমিদার, অতবড় বি-এ এম-এ পাস—দেশের একটা মাথা—সেও বুঝছে না ?

নারান ॥ তিনিই তো গণ্ডগোল পাকিয়েছেন। বুঝছেন কই ?

মহাভারত ॥ বুঝছেন না ! তাঁর চেয়ে বুঝনেওয়ালা তুমি নও বাপু।

নারান ॥ বেশ, কিন্তু এই ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্সো আদায়ের জন্যে অনেক বন্দুকধারী পুলিশ আমদানী হয়েছে—সে খবর রাখেন কি ?

মহাভারত ॥ খুব রাখি। থালা ঘটি বাটি গোরু বাছুর খাট বিছানা এত ক্রোক হয়েছে যে, জিনিসের একটা পাহাড় জমে উঠেছে।

নারান ॥ তা হলেই দেখুন, লোকের কী ক্ষতিটাই হ'ল।

মহাভারত ॥ কিন্তু তোমাদের লাভ কী হ'ল ? যেখানকার মাল সেখানেই পড়ে আছে। সরকার এসব মাল যখন নীলামে চড়াল, তখন গোটা কাঁথি মহকুমায় নীলাম ডাকবার জন্যে একজন লোকও এগিয়ে আসে নি। বোঝ ঠ্যালা।

নারান ॥ আমরা বুঝছি। এইবার আপনিও একটু বুঝুন। এই ক্রোক-পরোয়ানাটা দেখুন। জামাই হয়ে শ্বশুরের সম্পত্তি ক্রোক করতে না হয়, তাই চৌকিদার সরিয়ে রেখে আমি আগেভাগেই এসেছিলাম। এখন শেষ কথাটা বলে দিন।

মহাভারত ॥ শেষ কথাটা এখনও মুখে বলতে হবে ? খালি পা দেখে বুঝছ না ? বাড়িতে কোনদিন জুতো পরিনি ঠিক—কিন্তু একজোড়া খড়ম তো পায়ে থাকতো। সে খড়ম কই ? ওই দেখ। [বারান্দায় ঝুলানো খড়মের দিকে নারানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল] ঝুলছে !

নারান ॥ ব্যাপারটা কী, বুঝলাম না তো শ্বশুরমশাই !

মহাভারত ॥ বারো বছর দফাদারি করছ, আজ বুঝছি এত দিনেও কেন জমাদারও হতে পারনি। বীরেন শাসমলের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই পণ করেছে—এ

মুলুকে যতদিন ইউনিয়ন বোর্ড থাকবে ততদিন সবাই খালিপায়ে থাকবে—এ কথাটা শোনেনি বুঝি ?

নারান ॥ ও, তবে আপনি সেই খালিপায়ের দলে ! তা ভালই। দেখছি আপনি আমাকে দারোগা না করে ছাড়বেন না। শ্বশুরের সম্পত্তি ক্রোক করতে পারলে—জমাদার নয়—আমার দারোগা হওয়া কেউ রুখতে পারবে না। বেশ, ক্রোক্ যখন করতেই হবে তখন চৌকিদার ডাকি।

মহাভারত ॥ কী ক্রোক্ হবে ?

নারান ॥ ক্যাট্‌ল্—মানে গোরু-বাছুর।

মহাভারত ॥ গোরু-বাছুর ! [হাসিয়া] তা দিচ্ছি। কিন্তু খেতে বসে দুধ না পেলে যেন আবার রাগ কোরো না, বাবাজি। চল। কাউকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি না করে আমার সঙ্গে চুপটি করে এস দেখি।

নারান ॥ চুপটি করে ! কেন ?

মহাভারত ॥ গোরু ধরতে এসেছ—জানাজানি হ'লে তোমাকে, জামাই না বলে, কসাই বলবে যে সবাই ! এস এস—গোয়ালবাড়ি এস।

[উভয়ে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু তখনই মহাভারত নারানকে একরূপ টানিয়াই লইয়া আসিল।]

নারান ॥ এ কী ! ব্যাপার কী !

মহাভারত ॥ ওঃ, খুব বেঁচে গেছ বাবাজি ! ইস্ ! অল্পের জন্যে ধরা পড়নি। ধরা পড়লে—[জিভ কামড়াইল]।

নারান ॥ ধরা পড়লে ! মানে ?

মহাভারত ॥ তোমার শাশুড়ী ঠাকরুন নিজে দুধ পানাচ্ছেন তোমার জন্যে গোয়ালঘরে। বাঁটের শব্দ শুনেই আমি বুঝি কিনা ! তাই দোর থেকেই তোমায় টেনে আনলাম।

নারান ॥ কিন্তু—

মহাভারত ॥ কিন্তু-টিন্তু কিছু নেই। উনি চলে গেলেই তোমার গোয়ালঘরের পথ খোলসা। কিন্তু খবরদার—জানাজানি না হয়! ব্যাপারটা নিশ্চুপ সমাধা করবে। তা,' এ গাঁয়ে আর কোন্ বাড়িতে গোধন-হরণ হবে বাবাজি ?

নারান ॥ গোধন-হরণ মানে ? আমি কী গোরুচুরি করতে এসেছি ?

মহাভারত ॥ এই—এই ! হ'ল তো ! সরকারী কাজে মাথা গরম ! তবেই তুমি দারোগা হয়েছ ! দিচ্ছি—আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। [উচ্চকণ্ঠে] আরে, ও নিধে ! এই তুলসী ! দিনদুপুরে তোরা সব ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি ? শুকনো মুখে জামাই এখানে বসে আছে—দুধ-সরবত-টরবত নিয়ে আয়।

নারান ॥ না না, এসব কী হচ্ছে ! আমি কিছু খাবোটাবো না—ক্ষিদে নেই।

মহাভারত ॥ আরে বাবা, চ্যাঁচামেচি না করলে তোমার শাশুড়ী ঠাকরুনের ধ্যান ভাঙবে না। ও'র দুধ পানানো, সে এক তপস্যা। তোমারই দেরী হবে। ক্ষিদে

নেই কী হে ! বয়সকালে যখন আমরা শ্বশুরবাড়ী যেতাম, মুখে সবাই বলতো জামাই, আর, মনে মনে বলতো—রাক্ষস।

[গঙ্গা সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, পিছনে দাঁড়াইল তুলসী।]

গঙ্গা ॥ এস বাবা, একটু দুধটুধ খাবে এস।

নারান ॥ না, আমি কিছু খেতে-টেতে পারব না।

গঙ্গা ॥ কেন ?

নারান ॥ না, আমার শরীরটা ভাল ঠেকছে না।

গঙ্গা ॥ তবেই হয়েছে। এদিকে নিধে একটা খাসী কেটেছে, আবার এখন গিয়ে পুকুরে জাল ফেলেছে—

নারান ॥ [চটিয়া গিয়া] এসব বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আমি খাবো না—খাবো না—আমি এখানে খাবো না—আমার কাজ আছে।

মহাভারত ॥ হ্যাঁ, কাজ আছে। [নারানকে ইঙ্গিত] হ্যাঁ, এই সময় এস।

[নারান ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল]

মহাভারত ॥ জামাই তোমার শিগ্‌গির দারোগা হবে। এটা দারোগাগিরির মেজাজ। অ্যাদ্দিন দেখো নি—এইবার দেখবে। [তুলসী আগাইয়া আসিল] হ্যাঁরে, তুলসী, তোর গায়ে হাতটাত তোলে না তো ?

তুলসী ॥ আমার গায়ে হাত তুলবে! আমি মহাভারত মাইতির মেয়ে না ? যেদিন ওপরওলার কাছে লাঠিঝ্যাটা খায়—সেদিন ওর এমনি মেজাজ হয়। আজ এ গাঁয়ে কী সব ক্রোক্ করতে এসেছে, মেজাজ তাই তিরিক্ষি হয়েই আছে।

[নেপথ্যে শ্রীধরের গান শোনা গেল—"এসেছে নতুন মানুষ"—ইত্যাদি। গাহিতে গাহিতে সদলবলে শ্রীধরের প্রবেশ।]

শ্রীধর ॥ এই যে মহাভারতদা, এই যে বউঠান, এই যে তুলসীও রয়েছিস ! [খাঁড়া হাতে নিধিরামের প্রবেশ] আরে নিধিরাম যে ! না না, হাতে আর খাঁড়া ধোরনা। দেশে নতুন ভাবের নতুন জোয়ার এসেছে—কলকাতা থেকে—নাগপুর থেকে। আমি সেই জোয়ারে এই গাঁয়ে ভাসতে ভাসতে এসেছি।

[শ্রীধর সদলবলে কথকতা শুরু করিল]

এসেছে নতুন মানুষ,
তোরা কি জানিস না রে ?
শুনিস নি কি ?
দেশেতে নতুন ভাবের
আনল জোয়ার—
সে গান্ধীজী !
শুনিস নি কি ?

উনিশ-শ'-উনিশ সালে
হ'ল রাউলাট-
আইন প্রচার।
লোককে রাখতে আটক
ধরে খেয়ালমত
না করে বিচার।
গান্ধী বলেন ডেকে,
বে-আইনি আইন
আমরা মানব না।
দেশময় প্রতিধ্বনি
উঠল হেঁকে,
মানবো না—মানবো না-
শুনিস নি কি ?
ডায়ার, ও-ডায়ার মিলে
জালিনওয়ালাবাগের
শুকনো ডাঙা—
নরনারী শিশু মেরে
গুলী করে করল তাদের
রক্তে রাঙা
(উনিশ-শ'-উনিশ সালে
করল রক্তে রাঙা)।
ছড়িয়ে গেল দেশে
আর্তনাদ দিকে দিকে
সে হাহাকার।
গর্জে উঠল সবে—
জালিনওয়ালাবাগের
চাই প্রতিকার,
(খিলাফতের অবিচারের
চাই প্রতিকার),
শুনিস নি কি ?
উনিশ-শ'-বিশ সালে রে
কংগ্রেসের অধিবেশন
নাগপুরেতে।

গান্ধীজী বলেন হেঁকে,
নন্‌-কো-অপারেশন
চালিয়ে যেতে—
(অসহযোগ আন্দোলন
চালিয়ে যেতে)।
চিত্তরঞ্জন আর দিল সায়
লাজপৎ রায়
সে প্রস্তাবে।
সারা দেশ দিল সাড়া
অসহযোগ আন্দোলন
চালিয়ে যাবে।
(নন্‌-কো-অপারেশন চালিয়ে যাবে)
শুনিস নি কি ?
অহিংসার মন্ত্রবলে
বিপ্লবীরা হিংসা ভুলে
জুটলো পতাকাতলে
(কংগ্রেসের পতাকাতলে)
উঁকিল ছাড়ে ওকালতি,
গোলামখানা ছেড়ে এলো
ছাত্রদলে।
অছুতকে বুকে নিয়ে
গান্ধী বলেন, দেশের কাজে
কেউ অশুচি নয়।
কারাভয় তুচ্ছ করে
চরকা হাতে সবাই হাঁকে—
জয় গান্ধীর জয়।
শুনিস নি কি ?

মহাভারত ॥ শুনছি—শুনছি—এসব কথা কিছুদিন ধরে শুনছি। গান্ধীর কথা লোকে খুব বলছে বটে। লোকটির যা হোক বুদ্ধি আছে। আমাদের রামবাবুরা সব লড়াই করছেন! ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার! এঁর পথ দেখছি আলাদা পথ—সোজা পথ। তোমার চৌকিদার-দফাদার-দারোগা কে ? আমরা। তোমার সৈন্য-সামন্ত কে ? আমরা। তোমার উঁকিলমোক্তার কে ? আমরা। তোমার চাকর-বাকর কে ? আমরাই সব। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা গোলামখানায় পড়ছে, পাস করে গোলাম হচ্ছে। আমরা যদি সব সরে দাঁড়াই—হাত গুটিয়ে নিই—কোথায়

দাঁড়াবে তুমি, বিদেশী ভাই ? তল্পিতল্পা গুটিয়ে এখনি বিলেতের টিকিট কাটতে হবে না ? খুব বুদ্ধি বের করেছেন গান্ধীজী। বেঁচে থাকুন গান্ধীজী। উনি পারবেন, শ্রীধর, উনি পারবেন।

শ্রীধর ॥ এই একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যেই স্বরাজ আসবে—গান্ধীজী বলেছেন। তার জন্যে তিনি দেশবাসীর কাছে চেয়েছেন কংগ্রেসের এক কোটি সভ্য, তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে এক কোটি টাকা, আর চেয়েছেন—সবাই অস্পৃশ্যতা ছাড়—স্বদেশী ধর—চরকা চালাও।

"ভোমরায় গান গায় চরকায় শোন ভাই !
খেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই !
ঘর-বার করবার দরকার নাই আর,
মন দাও চরকায় আপনার আপনার।
চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর-ঘর
ঘর-ঘর ক্ষীরসর—আপনার নির্ভর।
পড়শীর কণ্ঠে জাগলো সাড়া
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।"

[সত্যেন্দ্র দত্ত]

[গাহিতে গাহিতে শ্রীধরের প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলেও ছত্রভঙ্গ হইল। রহিল শুধু গঙ্গা ও মহাভারত। নিধিরামকে শ্রীধরের পশ্চাতে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া মহাভারত তাহাকে বাধা দিল।]

মহাভারত ॥ এই, কেথায় যাচ্ছিস ?

নিধিরাম ॥ শ্রীধর কাকা গ্রামে ফিরে এসেছেন—জামাইবাবুকে খবরটা দিয়ে আসি।

মহাভারত ॥ গোয়েন্দা হয়েছ ! গোয়েন্দা ! দেশের লোক যাচ্ছেন একদিকে, ও'রা যাচ্ছেন আর-এক দিকে। শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর ! ওসব ছেড়ে ক্ষেত-খামারটা ধর দেখি। চাকরিতে পেট ভরবে না।

নিধিরাম ॥ ক্ষেত-খামার দেখতে বলছ—দেখছি। তাই বলে চাকরিতে পেট ভরবে না বোলো না। জামাই বাবুকে দিয়েই তো দেখছি। যেমন-তেমন চাকরি, ঘি ভাত।

[নিধিরাম অন্দরে চলিয়া গেল]

মহাভারত ॥ ঘি-ভাত না বিষ !

গঙ্গা ॥ কিন্তু তুমিও একদিন ঘি-ভাতই ভাবতে। তাই না মেয়েকে দফাদারের হাতে দেবার জন্যে পাগল হয়েছিলে। শিখবে—ভালো-মন্দ ওরাও শিখবে। তবে, ঠেকে শিখবে—তুমি যেমন শিখেছ।

[পুঁথিপত্র হাতে লইয়া ছোটছেলে বলরাম ও একটি চরকা কাঁধে করিয়া বড়ছেলে রাম বাড়িতে ঢুকিল।]

মহাভারত ও গঙ্গা ॥ [বিস্ময়ে ও আনন্দে] তোরা !

রাম ॥ হ্যাঁ, আমরা। আমার কাজকর্ম, শ্রীমানের লেখাপড়া—সব সাঙ্গ হ'ল। [চরকা নামাইয়া রাখিল]

[বলরাম বইগুলি বারান্দায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল]

মহাভারত ॥ ব্যাপার কী ? গান্ধীজীর হাওয়ায় উড়ে এলে বুঝি ?

বলরাম ॥ হ্যাঁ বাবা, নন-কো-অপারেশন।

গঙ্গা ॥ সেটা আবার কি ?

বলরাম ॥ নন-কো-অপারেশন মানে—

মহাভারত ॥ লঙ্কাপ্রাশন। মানে…লঙ্কাদহন, মানে রাবণ-রাজ্য আর থাকবে না। [রামকে] কেমন—এই তো ?

রাম ॥ কথাটা মিথ্যে নয়।

মহাভারত ॥ এই লঙ্কাপ্রাশনে ইস্কুল-কলেজে সব খালি হচ্ছে শুনছি। বলরাম বাবাজী যেভাবে পুঁথিপত্র ছুঁড়ে ফেললেন, বুঝলাম, সেই হাওয়াতেই উনি উড়ে এসেছেন। [রামকে] কিন্তু তুমি তো বাবাজী জেলে ছিলে—আমরা তো খরচের খাতায় লিখে রেখেছিলাম ; কিন্তু হঠাৎ জমার খাতায় কি করে ঢুকে পড়লে বল দেখি ?

রাম ॥ কিছুদিন আগে রাজার খুড়ো আমাদের দেশে 'দু'এয়াঁকি শাসন' চালু করলেন, তারই কল্যাণে আমরা বেশির ভাগ বিপ্লবীই ছাড়া পেয়েছি। জেলের বাইরে এসে দেখলাম, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সারা দেশকে মাতিয়ে তুলেছে। ভারতের বিরাট জনসমুদ্র যেন অকূলে কূল পেয়েছে। দেশের সবচেয়ে বড় ব্যারিস্টার সি আর দাশ—মানে, চিত্তরঞ্জন দাশ—মাসিক রোজগার ছিল যাঁর মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা—

মহাভারত ॥ মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা, ওরে বাবা !

রাম ॥ তিনি ব্যারিস্টারী ছেড়ে দিয়ে এই অসহযোগ আন্দোলনে নেতা হয়েছেন। তাঁর কথাতে বিপ্লবীরাও অনেকেই কংগ্রেসের পতাকাতলে এসে দাঁড়িয়েছেন।

মহাভারত ॥ হিংসার পথ থেকে একেবারে অহিংসার পথে ? বলিহারি গান্ধীজী।

গঙ্গা ॥ মাছ-টাছ সব খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস্ নাকি !

রাম ॥ না মা, কিছুই ছাড়িনি। তবে হ্যাঁ—বোমা-বন্দুকগুলো আপাতত শিকেয় তুলে রেখেছি। গ্রামে কাজ করব বলে চলে এলাম। কাঁথিতে এসে দেখি, শাসমল-সাহেবের জয়-জয়কার। ইউনিয়ন বোর্ড তো বয়কট হয়েছেই—তাঁরই নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনও কাঁথিতে জোর চলছে। ইস্কুল সব খালি হয়ে গেছে। দেখি, আমাদের শ্রীমান বলরামও অসহযোগী ছাত্রদের একজন ক্ষুদে নেতা ব'নে গেছে

—জোর পিকেটিং চালাচ্ছে। শহরে আজ কর্মীর অভাব নেই। গ্রামে কাজ করব বলে ওকেও সঙ্গে এনেছি।

মহাভারত ॥ ভালই করেছ—ভালই করেছ। কিন্তু সকাল থেকে এতসব বড় বড় কথা শুনে আমার যে মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।

[বলরাম ছুটিয়া গিয়া জবাকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিল। নিধিরামের স্ত্রী ভাসুরকে প্রণাম করিল। বস্তুত প্রণামের ধূম পড়িয়া গেল। ছেলেরা মা-বাবাকে প্রণাম করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে জামাতা নারান দফাদার আসিয়া উপস্থিত হইল—তাহার পশ্চাতে চারজন চৌকিদার।]

নারান ॥ এই যে রামদা যে, বলরাম আর আপনি একসঙ্গেই এলেন বুঝি?

রাম ॥ হ্যাঁ, একসঙ্গেই এলাম। তুমিও এখন আমাদের সঙ্গে এস নারান। দফাদারী তো অনেক কাল হ'ল, লোকের কোমরে দড়ি বেঁধে বেঁধে হাতে তো কড়া পড়ে গেছে। এবার দুত্তোর বলে আমাদের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড় দেখি দেশের কাজে।

নারান ॥ আজ্ঞে, যা করছি দেশের কাজই করছি। আপনারা ট্যাক্সো দিচ্ছেন, সেই ট্যাক্সোতেই না আমাদের বেতন হচ্ছে। ট্যাক্সো বন্ধ করুন—বেতন বন্ধ হোক—শ্বশুরবাড়ীতেই ঘর বাঁধব দাদা। [মহাভারতকে] আপনার গোরুগুলো আবার গোয়ালে তুলে দিয়ে এলাম। [চালে ঝুলান খড়মজোড়া নামাইয়া মহাভারতের পায়ের কাছে রাখিল।] নিন, এবার আপনি খড়ম পায়ে দিন, কাঁথির জয় হয়েছে—সরকার হেরে গেছে।

মহাভারত ॥ মানে?

নারান ॥ মেদিনীপুর থেকে সরকার এক দিনেই দু'শ'-পঁয়ত্রিশটা ইউনিয়ন বোর্ড তুলে নিয়েছেন আর ক্রোকী মালপত্র সব ফিরিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছেন। এই হুকুম নিয়ে ছোট দারোগা এখানে নিজে চলে এসেছেন।

[সকলে আনন্দে প্রায় লাফাইয়া উঠিল। খড়ম পায়ে দিয়া মহাভারত সোল্লাসে হাততালি দিতে দিতে খটাখট করিয়া হাঁটিতে লাগিল। বলরাম ধ্বনি তুলিল—]

বলরাম ॥ মহাত্মা গান্ধী কী জয়! বীরেন শাসমল কী জয়!

[সকলে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল]

নারান ॥ একটা হুকুম শুনিয়েছি, কিন্তু আর একটা হুকুম আছে।

রাম ॥ আবার কী হুকুম?

নারান ॥ [পকেট হইতে একটি ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া] কাঁথির ইস্কুলে পিকেটিং করার অপরাধে বলরাম মাইতিকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা। এস বললাম, তোমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার জন্যে কাঁথি থেকে ছোট দারোগা সাহেব নিজে এসেছেন, বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। এস।

গঙ্গা ॥ দাঁড়াও। [সকলে থমকিয়া দাঁড়াইল]। [নারানকে] তুমি কি শুধু পুলিশ? আমার জামাই নও?

নারান ॥ জামাই নই মানে?

গঙ্গা ॥ সে বিবেচনা তো তোমার দেখছি না, নারান। নইলে কী করে নিজ হাতে ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছ ?

নারান ॥ আজ্ঞে, আমি হুকুমের চাকর।

রাম ॥ নির্লজ্জ !

নারান ॥ না, লজ্জা কী! চাকরি করছি আপনাদেরই বোনের ঘি-ভাতের জন্যে।

তুলসী ॥ মা, ওকে বলে দাও—ওর ভাত আমি আর খাব না।

বলরাম ॥ [চিৎকার করিয়া উঠিল] মহাত্মা গান্ধী কী জয় !

নারান ॥ [তুলসীকে] তোমার এই বাড় ক'দিন টেঁকে আমি দেখব।

গঙ্গা ॥ তুলসী, তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে যাও মা।

তুলসী ॥ না মা, আমি যাব না।

রাম ॥ তুলসী, তুই যা। তুই গেলে তবে হয়তো লোকটা আবার মানুষ হবে।

নারান ॥ মাপ করুন দাদা, আপনাদের তুলসী আপনাদের মণ্ডেই শোভা পাক। [চৌকিদারদের প্রতি] এই দেখছ কী, আসামী—

[চৌকিদারেরা ছুটিয়া আসিয়া বলরামকে বাঁধিয়া লইল। 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়' বলিয়া বলরাম নারান দফাদারের অনুবর্তী হইল। 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়' ধ্বনির মধ্যে মেয়েরাও তাহাদের অনুগমন করিল। গেল না শুধু মহাভারত। সে খড়মজোড়া বাঁধিয়া আবার চালে ঝুলাইয়া রাখিল। ধীরে ধীরে যবনিকা নামিল।]

তৃতীয় অঙ্ক

(১৯৩০-১৯৩১)

[১৯৩১ সালের ১০ই মে সকালবেলা। মহাভারত মাইতির চণ্ডীমণ্ডপ-প্রাঙ্গণে গ্রামের ছেলেমেয়েরা উপস্থিত। বলরাম কংগ্রেসের পতাকা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শ্রীধর সদলবলে কথকতা শুরু করিয়াছে।]

আমরা পূর্ণ স্বাধীন হ'ব
মোদের জন্মগত অধিকার
নেবোই মোরা নেব—
(আদায় করে নেব)।
উনিশ-শ'-উনত্রিশ সালে
কংগ্রেস লাহোরে
স্থির করিল আন্দোলন
পূর্ণস্বরাজ-তরে।
ছাব্বিশে জানুয়ারী সেই
উনিশ-শ'-ত্রিশ সন'
কংগ্রেসের পতাকাতলে
সারা ভারতের পণ—
এল নতুন জাগরণ
ভাঙব আইন দেব না ট্যাক্স—
করব সত্যাগ্রহ।
(আমাদের) দেশ-ঘেরা এই জলধিজল
রয়েছে নুনে ভরা,
দেবতার এই দানের উপর
চলবে না ট্যাক্স করা।
লর্ড আরুইন বড়লাটকে গান্ধী চিঠি দিয়ে
জানিয়ে দিলেন—লবণ আইন
ভাঙব দণ্ডী গিয়ে।
সবরমতী থেকে দণ্ডী
গেলেন সদলবলে।
আইন ভাঙেন নুন তৈরী
করে সাগরজলে।

(সারা) ভারত জুড়ে আবার এল
নুতন জাগরণ,]
লবণ-আইন ভেঙে মোরা
করব রে লবণ।
গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে
দিল কারাগারে,
তার পিছু যায় নরনারী সব
কাতারে কাতারে।
ও ভাই শোন—শোন
কারাগারেই জন্মেছিলেন
কংস-নিধনকারী—ও ভাই,
সেই কারাতেই দেখা পাব
(ভারতের) ভাগ্য-বিধাতারই।
চল কারাগার পূর্ণ করি,
জাগবে জ্যোতির্ময়।
কারার পানে এগিয়ে চলে,
এগিয়ে চলে রে,
গাহে গান্ধীজীর জয়।

[গান শেষ হইলে বলরাম জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিল।]

বলরাম॥ পাঁচই মে মধ্যরাত্রে গান্ধীজী গ্রেপ্তার হয়েছেন। ভারতের সর্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হয়েছে। দেশবাসী গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে ভীত না হয়ে, মদের দোকানে আর বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করতে আর লবণ-আইন ভঙ্গ করতে কৃত-সংকল্প হয়েছেন।

সকলে॥ আমরাও হয়েছি।

বলরাম॥ কাঁথি মহকুমার অধিবাসীরা চৌকিদারী ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করায়, কাঁথির খোলাখালি গ্রামে গত ছ'ই মে পুলিশ মেয়েদের ওপর যে অত্যাচার করেছে তার তুলনা নেই। জাতীয় পতাকা বহন করার অপরাধে মেয়েদের নগ্ন অঙ্গে তারা বেত মেরেছে।

সকলে॥ ধিক্—ধিক্!

বলরাম॥ ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশমত আজ আমাদেরও সংকল্প—বে-আইনি আইন আমরা মানব না।

সকলে॥ মানব না।

বলরাম॥ সরকারকে কর দেব না।

সকলে॥ দেব না।

বলরাম ॥ লবণ-আইন ভাঙব।

সকলে ॥ আজই ভাঙব।

বলরাম ॥ মহাত্মা গান্ধী কী—

সকলে ॥ জয়।

[বলরাম ও অন্যান্য সকলে শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম-প্রদক্ষিণে চলিয়া গেল। যবনিকা নামিয়া আসিল। আবার যবনিকা উঠিতে দেখা গেল—রাম বারান্দায় বসিয়া চরকায় সূতা কাটিতেছে। নিধিরাম আসিয়া দাঁড়াইল।]

নিধিরাম ॥ দাদা, আমাদের বাড়িতে রুগী দেখতে কবরেজ মশাই আসবেন না।

রাম ॥ রুগী দেখতে আসবেন না আমাদের বাড়িতে কবরেজ মশাই ? কেন ? বাবার চিকিৎসা তো এতদিন তিনিই করেছেন, আজ আসবেন না কেন ?

নিধিরাম ॥ আমি পুলিশে চাকরি নিয়েছি, দফাদার হয়েছি, এই অপরাধ। আমাকে যদি তোমরা তাড়িয়ে দাও, তবে কবরেজমশাই আসবেন এ বাড়িতে—দয়া করে বললেন।

রাম ॥ তোমাকে তাড়িয়ে দিলে কি বাবা বেঁচে থাকবেন ? চিকিৎসাটা তখন কার হবে শুনি ?

নিধিরাম ॥ না দাদা, আমার জন্যে বাবার চিকিৎসা হবে না—মরণকালে পেটে এক বড়ি ওষুধ পড়বে না—এমন কুপুত্তুর আমি নই দাদা। আমি লক্ষ্মী আর জবাকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। বাবাকে বোলো যে, নিধিরাম বদলী হয়ে চলে গেছে। আজ বাবার অসুখ হয়েছে, কাল হয়তো তোমার অসুখ হবে। আমার জন্যে তোমাদের চিকিৎসা হবে না—এ চলবে না।

রাম ॥ তার চেয়ে বরং চাকরিটা ছেড়ে দে না নিধে।

নিধিরাম ॥ চাকরি ! চাকরি আমি ছাড়তে পারব না—আমার এ সাধের চাকরি। ছোটবেলা থেকে আমার সাধ ছিল দারোগা হব—ঘোড়ায় চড়ব। জামাইবাবুকে কত তেল-মালিশ করে তবে না তার সুপারিশে চাকরি পেয়েছি। মলেও এ চাকরি আমি ছাড়তে পারব না দাদা। আমরাই বরং বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি।

রাম ॥ কিন্তু যাবিই বা কোথায় ? কোথায় গিয়ে উঠবি ? কে তোকে বাড়িঘর দেবে ? পুলিশকে এ মল্লুকে কেউ ঠাঁই দেবেনা।

নিধিরাম ॥ তাও তো বটে ! তবে কি হবে ?

রাম ॥ কি আর হবে ? তুই তোর বাড়িতে থাকবি।

নিধিরাম ॥ আমাকে বাড়িতে রাখলে তোমাকেও একঘরে করবে দাদা—ওই বলরামই করবে।

রাম ॥ কেন ? তুই পুলিশের চাকরি করে দেশের যত অহিত করবি—বলরাম আর আমি দেশের কাজ করে তার ততো প্রায়শ্চিত্ত করব ; তবু তিনটি ভাই আমরা একসঙ্গেই থাকব—বাপ-মায়ের ভিটেতে একসঙ্গেই বাঁচব।

নিধিরাম ॥ তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি দাদা ; কিন্তু এই বলরামটাকে

বিশ্বাস নেই। ওটা সাপ, শয়তান, আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে সব বে-আইনি কাজ করছে। যাক, শহর থেকে আমি ডাক্তার এনে গাঁয়ের লোককে একবার দেখিয়ে দিই যে, আমারও ক্ষমতা আছে।

রাম ॥ [হাসিয়া] তোমার ক্ষমতা আছে জানি। কিন্তু বাবার ওষুধের আর দরকার হবে না। জ্বর ছেড়ে গেছে। ভালই আছেন।

[ঘোমটা টানিয়া লক্ষ্মীর প্রবেশ। তাহার হাতে এক গেলাস দুধ, সে ভাসুরের সামনে গেলাসটি রাখিল।]

রাম ॥ বুঝলে ভায়া, তোমার আমি দাদা বটে, কিন্তু বউমা'র কাছে আমি এখন খোকা। সকালে এক গেলাস দুধ না খাইয়ে ছাড়বেন না। পুলিশের লাঠি খেয়ে খেয়ে আমার শরীরটা নাকি ভেঙে গেছে। কিন্তু বউমা, আমার ভায়াকেও রোজ এক গেলাস দুধ খাইয়ো—লাঠি চালাতে গেলে শরীরটা মজবুত রাখা চাই তো !

[রাম দুধ খাইয়া চলিয়া গেল]

নিধিরাম ॥ [লক্ষ্মীকে] বলরামটা কোথায় ?

লক্ষ্মী ॥ কী জানি কোথায় ? একেবারে বয়ে গেছে। রাতদিন শুধু দল পাকাচ্ছে আর হৈ হৈ করছে, ক্ষেতখামার সব গেল। পারো না আচ্ছা করে ঠুকে দিতে ?

নিধিরাম ॥ হচ্ছে—হচ্ছে, তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

লক্ষ্মী ॥ শুনলাম খোলাখালি গাঁয়ে মেয়েদের গায়ে তোমরা বেত মেরেছ ; আর এদের বেলায় তোমরা লাঠি চালাতে পার না ?

নিধিরাম ॥ [গুপ্ত সংবাদ দিবার ভঙ্গীতে] আজ লাঠিই চালাব। আজ বিকেলে ও যখন দল বেঁধে লবণ আইন ভাঙতে যাবে—

লক্ষ্মী ॥ কি সর্বনাশ ! তুমি একা আর ওরা এতটি—তোমাকে তো পিষে মেরে ফেলবে। আমাকে বিধবা না করে ছাড়বে না দেখছি।

নিধিরাম ॥ দুর পাগলী ! ঘটে এতটুকুও যদি বুদ্ধি থাকে। আমি একা যাব বুঝি ! [খুব গোপনে] সদর থেকে বন্দুকধারী একদল পুলিশ নিয়ে জামাইবাবু আসছেন। তুলসী কোথায় ?

লক্ষ্মী ॥ বাবার কাছে। রাতদিন তিনি বাবাকে নিয়েই আছেন। বাপ-মা'র হাতের লাঠি। ধন্যি মেয়ে বাবা। এমনটি আর দেখিনি। সোয়ামীর ঘর না করে বাপ-মায়ের ভাতে পড়ে রইলি !

নিধিরাম ॥ আর এমন স্বামী ! থানার ছোট দারোগা ! কী প্রতাপ ! লক্ষ্মী-ছাড়ী তাকে চিনল না ! ওর কপালে অনেক দুঃখ আছে—দেখো'খন। যাক, বলরামটার ওপর নজর রেখো, মানে, জানা দরকার বোমাটোমা ওরা আমদানী করেছে কিনা। আর শোন, জবাটাকেও একটু চোখে চোখে রেখো। বলরামের কাছে ঘেঁষতে দিও না। আর, পাড়াপড়শীদের সঙ্গেও মিশতে দিও না।

লক্ষ্মী ॥ সে তোমাকে বলতে হবে না। যেটুকু মিশি—পেটের খবর বের করে নেবার জন্যেই মিশি।

নিধিরাম ॥ [লক্ষ্মীর চিবুক নাড়িয়া] দফাদার থেকে যদি দারোগা হই—তোমার জন্যেই হব লক্ষ্মী। চলি।

লক্ষ্মী ॥ এ অবেলায় আবার চললে? তোমাকে যদি একটুও আমি কাছে পাই!

নিধিরাম ॥ পাবে পাবে—যখন দারোগা হব, তখন পাবে। সফরে যাব—তাও ঘোড়ায় তুলে পাশে বসিয়ে নিয়ে যাব-টগবগ-টগবগ-টগবগ।…[জবাকে আসিতে দেখিয়া] যাই, গাঁটা ঘুরে একবার সব দেখে আসি।

[নিধিরাম চলিয়া গেল। জবার প্রবেশ।]

জবা ॥ মা, বাবা এসেই আবার চলে গেলেন কেন? তোমাকে চুপি চুপি কী বলছিলেন?

লক্ষ্মী ॥ বললেন, যে রকম ধিংগী হয়ে তুমি উঠেছ, তোমার বিয়ে না দিলে আর চলে না। একটি চৌকিদার পাত্র খুঁজছেন।

জবা ॥ ভাল হবে না মা, বলে রাখছি।

["কি হল—কি হল" বলিতে বলিতে বলরামের প্রবেশ।]

জবা ॥ দেখছ কাকাবাবু, মা কি সব যা-তা বলছে!

লক্ষ্মী ॥ বাপ ওর জন্যে চৌকিদার পাত্র খুঁজছে—মেয়ের তাতে মন উঠছে না।

বলরাম ॥ এখন লাটসাহেব পাত্র হ'লেও ওর মনে ধরবে না। কিন্তু আমায় কি বলেছে জানো? দেশ আগে স্বাধীন হোক—তখন চৌকিদার-মুদ্দোফরাস যাকে বল বিয়ে করব।

জবা ॥ যাও [ছুটিয়া পলাইল]

বলরাম ॥ বউদি, শিগগির ভাতের ব্যবস্থা করো। আমি পাড়ায় বেরুচ্ছি, ফিরে এসেই ভাত চাইবো। জানো তো আজ বিকেলে…

লক্ষ্মী ॥ শোন ঠাকুরপো। [চারিদিকে সতর্কভাবে তাকাইয়া] সদর থেকে বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে তোমার জামাইবাবু আসছেন। আজ শুধু লাঠি চলবে না—গুলীও চলবে। তোমরা আজকের দিনটা অন্তত ক্ষান্ত দাও।

বলরাম ॥ বউদি, আজ বিকেলে আমরা লবণ-আইন ভাঙব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। সত্যাগ্রহী হয়েও সত্যভঙ্গ করতে বল বউদি?

লক্ষ্মী ॥ অত আমি বুঝিনা। এমন করে তোমায় আমি মরতে দিতে পারি না ঠাকুরপো।

বলরাম ॥ [লক্ষ্মীর আঁচল ধরিয়া] তবে তোমার আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাকি, কি বল?

লক্ষ্মী ॥ [আঁচল টানিয়া লইয়া] ছিঃ ঠাকুরপো, তা কেন? মরতেই যদি হয়, লড়াই করে মর।

বলরাম ॥ লড়াই করেই মরব ; কিন্তু কাউকে মারব না। হিংসা আমাদের পথ নয়—তুমি তো জানো বউদি।

লক্ষ্মী ॥ জানি, কিন্তু মন মানে না। তোমাদের সাহস যে কত বড়, তাও বুঝি। ভেবে অবাক হই। গর্ব হয়। কিন্তু, তবু মন মানে না ঠাকুরপো। না—না, তুমি যাবেনা।

বলরাম ॥ সে কি হয়! ছিঃ বউদি।

লক্ষ্মী ॥ সবাই যখন আমায় দফাদারের বউ বলে ঠাট্টা করে, তখন তা গায়ে মাখিনা শুধু এই ভেবে যে, দফাদারের বউ বটে কিন্তু বলরামের বউদি আমি—সে আমি—আর কেউ নয়।

বলরাম ॥ তবেই দেখ—আজ যদি কাপুরুষের মত তোমার আঁচলের আড়ালে পালিয়ে থাকি, তবে কি আমায় ভালবাসবে বউদি? না বউদি, তোমার প্রীতি, তোমার শ্রদ্ধা যাতে আমি পাই সে-পথে যেতে তুমি আমায় বাধা দিও না। তোমার ভালবাসার আসন থেকে আমায় দূরে ঠেলে দিও না বউদি।

লক্ষ্মী ॥ এস ঠাকুরপো।

বলরাম ॥ লক্ষ্মীদেবী যদি তাঁর বাহন পেঁচাটির মত মুখ ভার করে বলেন, 'এস', তা হ'লে কি করে আমি আসি বল?

লক্ষ্মী ॥ [হাসিয়া] গরম খিচুড়ি তুমি ভালবাস। চট করে হবে। তুমিও চট করে চলে এস।

বলরাম ॥ এই তো আমার বউদি!

[বলরাম ছুটিয়া চলিয়া গেল। অন্যদিক হইতে ছুটিয়া জবার প্রবেশ।]

জবা ॥ মা, ছোটকাকাবাবু কি বলে গেলেন?

লক্ষ্মী ॥ বললেন—জবাকে তৈরী রেখো, দেশ স্বাধীন হ'তে আর দেরী নেই; রাজরানী কি মেথরানী—একটা রানী ওকে হ'তেই হবে!

জবা ॥ যাও!

[লক্ষ্মী চলিয়া গেল। জবা গিয়া চরকায় বসিল।]

জবা ॥ [গান]

চরকা আমার সোয়ামী-পুত,
চরকা আমার নাতি,
চরকার দৌলতে আমার
দুয়ারে বাঁধা হাতি।

[নারান দারোগার প্রবেশ]

নারান ॥ এই মেয়ে, শোন।

জবা ॥ পিসেমশাই, আসুন।

নারান ॥ না, বসব না, খুব তাড়া আছে। শুধু তোমার পিসিমার সঙ্গে দুটো কথা বলে চলে যাব। চুপিচুপি তাকে এখানে একটু ডেকে দাও দেখি।

[জবা চলিয়া গেল। গোরুর জন্য এক আঁটি খড় লইয়া বাড়ির রাখাল শম্ভু গোয়ালঘরে যাইতেছিল।]

নারান ॥ কে, শম্ভু না ?

শম্ভু ॥ আজ্ঞে কত্তা।

[নারানের পায়ের কাছে খড়ের আঁটি রাখিয়া তাহাতে মাথা ঠেকাইয়া উঠিল।]

নারান ॥ কি রে, তোরা নাকি আজ সব নুন তৈরী করবি ?

শম্ভু ॥ নুন ? ও তো ভগবান তৈরী করেছেন কত্তা।

নারান ॥ আরে, তা তো করেছেন, আমি তা বলছি না। আমি বলছি, সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়ে তোরা নাকি আজ বে-আইনী নুন তৈরী করবি ?

শম্ভু ॥ কি বললেন কত্তা ? বে-আইনী নুন ? সেটা আবার কি ? নোন্‌তা নয় বুঝি ?

নারান ॥ তোর মাথা ! যা !

[শম্ভু চলিয়া গেল। তুলসী আসিয়া দাঁড়াইল]

তুলসী ॥ কি বলবে, বল।

নারান ॥ বসতেও বলতে নেই নাকি ?

তুলসী ॥ বসতে বলবার সাহস নেই।

নারান ॥ বেশ, বসব না, বসতে চাইও না। আর এও চাই না যে, এ বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকো। তোমাকে যেতে হবে।

তুলসী ॥ কোথায় ?

নারান ॥ আমার সঙ্গে।

তুলসী ॥ তোমার সঙ্গে ! কোথায় ? থানায় ?

নারান ॥ আমার বাড়িতে।

তুলসী ॥ আমি ভেবে দেখেছি, তোমার বাড়ি আমার বাড়ি নয়।

নারান ॥ নয় ? কেন নয় তুলসী ?

তুলসী ॥ যে বাড়িতে আমার ভাইএর, আমার বোনের, আমার বাপের, আমার মায়ের, আমার দেশের, আমার জাতির শত্রু বাস করে, সে বাড়ি আমার নয়।

নারান ॥ আমি যে কী, আমি যে কে, এ-কথা তুমি জেনেশুনেই আমার ঘরে এসেছিলে তুলসী।

তুলসী ॥ সেদিন তুমি চেয়েছিলে শুধু আমাকে, আমি চেয়েছিলাম শুধু তোমাকে,—আর যে কিছু চাইবার ছিল তা আমরা জানতাম না। আজ আমরা জেনেছি, আজ আমরা শিখেছি, দেশের স্বাধীনতার চাইতে বড় চাওয়া আর কিছুই নেই।

নারান ॥ স্বাধীনতা কে না চায় ? আমিও চাই। কিন্তু স্বাধীনতা চাওয়া মানে কি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে স্বীকার না করা ? ঘর ভেঙে বেরিয়ে আসা ?

তুলসী ॥ ঘর আমি ভাঙতে চাইনি।

নারান ॥ তুমি ভেঙেছ। স্বামীর ঘর ভেঙে এসে বাপের ঘর করছ। কিন্তু

তোমার এ ঘরও আমি ভেঙে দিতে পারি। ভেঙে দিতেই এসেছি। সঙ্গে এসেছে বন্দুক নিয়ে আরো দশজন পুলিশ।

তুলসী ॥ আমাদের গুলী করে মারবে ?

নারান ॥ হুকুম আছে—আজ যারা এখানে বে-আইনী নুন তৈরী করবে, দরকার হ'লে তাদের গুলী করেও তা বন্ধ করব।

তুলসী ॥ অ্যাঁ ! বলরাম যে নুন তৈরী করবে আজ !

নারান ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ! [বিকটভাবে হাসিয়া উঠিল]

তুলসী ॥ না-না—সে কি। না-না—তুমি—তুমি—

নারান ॥ হ্যাঁ, আমি—আমিই গুলী চালাব। কেন চালাব না তুলসী ? আমার ঘর তুমি ভেঙেছ, কোন ঘর আমি রাখব না।

[ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া]

তোমাকে যেদিন বিয়ে করে ঘরে নিয়েছিলাম, সেদিন ভেবেছিলাম, ঘরে আমার লক্ষ্মী এল। সেই লক্ষ্মী যে এমন করে ছেড়ে যাবে তা তো কোনদিন ভাবিনি।

[তুলসী নীরব রহিল]

তোমার ঘরে তুমি ফিরে এস লক্ষ্মী ! এই লক্ষ্মীছাড়াকে দয়া কর।

তুলসী ॥ তুমি অমন করে বোলো না। আমি আমি যাব। এখনি যাব— যদি আমায় নিয়ে, বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে, তুমি এখনি এ গাঁ ছেড়ে চলে যাও।

নারান ॥ আমি রাজী। গিয়ে রিপোর্ট দেবো—আচ্ছা, সে যা দিতে হয় দেব। এস। এস তুমি !

তুলসী ॥ আসছি—আমি মা-বাবাকে প্রণাম করে আসছি।

[তুলসী ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। শম্ভুর প্রবেশ]

নারান ॥ এই শম্ভু, শোন্। এ বাড়ির ছোটবাবু কোথায় রে ?

শম্ভু ॥ ওসব-খবর আমি রাখি না কত্তা। আমাকে জিজ্ঞাসা করেন গোরু-বাছুরের খবর। আচ্ছা কত্তা, এক শালা বাছুর এক গোরুর দুধ চুরি করে খায়, ওই চোরের কী সাজা কত্তা ?

নারান ॥ তোর মুণ্ডু ! যা ভাগ্ !

[শম্ভু চলিয়া গেল। তুলসী আসিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে আসিল মহাভারত, গঙ্গা প্রভৃতি বাড়ির অন্যান্য লোক। নারান শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করিল।]

নারান ॥ [মহাভারতকে] আমি ওকে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনার শরীর এখন কেমন আছে ?

মহাভারত ॥ জ্বরটা আজ ছেড়েছে। আর কি, এখন গেলেই হয়—ঘরে-বাইরে অশান্তি, এ আর ভাল লাগে না।

গঙ্গা ॥ খাওয়া দাওয়া করে যাবে না বাবা ?

নারান ॥ না মা, সে অনুরোধ আর করবেন না। আচ্ছা, আসি। [তুলসীর প্রতি] এস।

[তুলসী অগ্রসর হইল]

গঙ্গা ॥ মেয়েটা কিছু মুখে দিয়ে গেল না! তুমিও না! এমন করে এসে এমন করে নিয়ে গেলে—মনে বড় ব্যথা পেলাম বাবা।

নারান ॥ এ ব্যথা কোন ব্যথা নয় মা-ঠাকরুন। আজ বিকেলে এখানে বে-আইনী নুন তৈরী করবে গ্রামের ছেলেরা। দরকার হ'লে গুলী চালিয়েও তা বন্ধ করার হুকুম ছিল আমার ওপর। মোটরগাড়ী করে একদল বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে আমি গুলী চালাতেই এসেছিলাম। তুলসী যদি আজ আমার সঙ্গে না যেত, তবে আজ আমি এ গ্রামে কাউকে রেহাই দিতাম না। তুলসী আজ গেল—তাই আজ আপনাদের বলরাম বেঁচে গেল। [তুলসীকে] এস—মিটিং হবার আগেই আমাদের মোটর ছাড়তে হবে।

মহাভারত ॥ হ্যাঁ, হবে—এইবার তোমার প্রমোশন হবে বাবা। শুনেছিলাম, তুলসী তোমার ঘর ছেড়ে আমাদের ঘরে এসে রয়েছে বলে সাহেবেরা রুষ্ট হয়ে আছেন। তুলসীকে কত বলেছি, 'যা'—শোনে নি। এবার ওর সুমতি হয়েছে। এস বাবা—এস মা!

[তুলসীর মনে গভীর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল]

তুলসী ॥ আমি যাব না।

নারান ॥ যাবে না?

তুলসী ॥ না। তোমার মতলব আমি বুঝেছি। আমাকে নিতে তুমি আসো নি—তুমি প্রমোশন নিতে এসেছ: তা হবে না। নিজের দেশের লোকের ওপর যে গুলী চালাতে আসতে পারে, সে অমানুষ। তার ঘর আমার ঘর নয়।

[মুখ ফিরাইয়া তুলসী অন্দরের দিকে চলিয়া গেল। অন্যান্য সকলে হতবাক হইয়া রহিল।]

নারান ॥ বেশ, তবে আমার আর দোষ নেই। দেখা যাক কে যায়!

[এই বলিয়া নারান চলিয়া গেল। সকলে শুব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যবনিকা নামিয়া আসিল—ক্ষণপরে আবার উঠিল। যবনিকা উঠিলে দেখা গেল—উঠানের একটি খাটিয়ার উপর বসিয়া মহাভারত হুঁকা টানিতেছে এবং শ্রীধর তাহাকে একটি সংবাদপত্র পড়িয়া শুনাইতেছে।]

শ্রীধর ॥ "সরকার বিভিন্ন অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া সত্যাগ্রহ-আন্দোলন থামাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। প্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলি একে একে বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটিও বাদ যায় নাই। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কারারুদ্ধ হইয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ ছিল—বে-আইনী ঘোষিত হইলেও আন্দোলন যেন না থামে। বিভিন্ন স্থানে 'ডিক্টেটর' অর্থাৎ নির্দেশক নিযুক্ত করিয়া আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে।' যেমন এখানে চালাচ্ছে তোমার বলরাম।

মহাভারত ॥ হুঁ।

শ্রীধর ॥ [আবার পড়িতে লাগিল] "এই পর্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে—এই

আন্দোলন দমন করিবার জন্য পুলিশের গুলীতে একশত-তিনজন হত এবং চারিশত-জন আহত হইয়াছে।"

মহাভারত ॥ আজ এখানেও তাই হচ্ছে। জানিনা—কে থাকবে, কে যাবে।

শ্রীধর ॥ [খবরের কাগজ পড়িতে লাগিল] "সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে ১৪৪ ধারা অমান্য করা দেশবাসীর একটি বিশেষ কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা, এলাহাবাদ, বোম্বাই—ভারতের প্রায় সর্বত্র ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া বহু জনসভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এলাহাবাদে মতিলাল-গৃহিণী শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহরুর উপরেও লাঠি চার্জ করা হইয়াছে। ২৬শে জানুয়ারী কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু আইন অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করায় পুলিশের লাঠিতে আহত হইয়া গ্রেপ্তার হইয়াছেন।"

মহাভারত ॥ আচ্ছা।

শ্রীধর ॥ "সত্যাগ্রহ আন্দোলন একদিকে যেমন প্রবল হইয়া উঠিতেছে, অন্য-দিকে তেমনি, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে, বিপ্লব-আন্দোলন গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। বিপ্লবীরা গত ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিতে যাইয়া ঐতিহাসিক খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ব্যাপার জটিল বুঝিয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নির্দেশে ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইন মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নেতৃবর্গকে মুক্তিদান করিয়া শান্তি-স্থাপনের আলোচনা চালাইতেছেন। আইন-অমান্য ও দমননীতি কিন্তু এখনও পুরা দমে চলিয়াছে।"

[হঠাৎ বাহিরে একটি গুলীর আওয়াজ শুনিয়া উভয়ে চমকিয়া উঠিল।]

মহাভারত ॥ ওই !···কে গেল ! কে গেল শ্রীধর ?

শ্রীধর ॥ আমি গিয়ে দেখে আসব ?

মহাভারত ॥ না ভাই, তুমি থাক। তুমি কাগজ পড়।

[নেপথ্যে জবার চিৎকার—"দাদু, দাদু"। ছুটিয়া জবার প্রবেশ]

জবা ॥ দাদু ! কাকুকে গুলী করেছে ! কী ভীষণ রক্ত পড়ছে ! তুমি এস দাদু, তুমি এস !

['মহত্মা গান্ধী কী জয়' ধ্বনি সহকারে আহত বলরামকে বহন করিয়া পাড়াপড়শীদের প্রবেশ। অন্দর হইতে ছুটিয়া আসিল গঙ্গা।]

মহাভারত ॥ বলরামটা তবে গেল ! শ্রীধর, দেখ তুমি—ওকে দেখ।

[শ্রীধর বলরামকে দেখিতে গেল। মহাভারত হুকা টানিতে লাগিল। নেপথ্যে পুনরায় গুলির শব্দে সচকিতা গঙ্গা মুমূর্ষু বলরামকে ফেলিয়া মহাভারতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

গঙ্গা ॥ ছেলেকে রেখে গেলাম—তুমি দেখো।

মহাভারত ॥ বেঁচে আছে ?

গঙ্গা ॥ বাঁচবে কিনা জানিনা। কিন্তু, আমাকে যেতে হবে।

মহাভারত ॥ কোথায় ?

গঙ্গা ॥ যেখানে গুলী চলছে—ছেলেরা যেখানে প্রাণ দিচ্ছে—মা সেখানে ঘরে বসে থাকতে পারেনা—পারবে না। [প্রস্থান]

বলরাম ॥ মা, আমি যাব, তুমি দাঁড়াও—মহাত্মা গান্ধীকী—

[জোর করিয়া উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেল। মৃত্যু। মহাভারত উঠিয়া দেখিতে আসিল].

মহাভারত ॥ বলরাম——বলরাম——বলরাম——[আর্তনাদ]

[নেপথ্যে গুলীর শব্দ ও জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে যবনিকা নামিয়া আসিল এবং কিছু পরে যখন যবনিকা উঠিল, তখন চারিদিক নিস্তব্ধ। দেখা গেল, মহাভারত একা বসিয়া হুঁকা টানিতেছে। লক্ষ্মী এবং তুলসী বাহির হইতে নিঃশব্দে অবনত মুখে মহাভারতের দুই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।]

মহাভারত ॥ তোরা কোত্থেকে এলি ?

তুলসী ॥ জেল থেকে বাবা।

মহাভারত ॥ ছেড়ে দিলে ?

তুলসী ॥ হ্যাঁ।

মহাভারত ॥ কিন্তু আমার আর-সব ?

[লক্ষ্মী ও তুলসীর মুখে কোন জবাব জোগাইল না]

তাদের ছাড়েনি ?

লক্ষ্মী ॥ ছেড়েছে সবাইকে বাবা। বড়লাট-সাহেবের সঙ্গে গান্ধীজীর এক চুক্তি হয়েছে—সত্যাগ্রহীদের ছেড়ে দিয়েছে। মামলা-মোকদ্দমা সব তুলে নিচ্ছে। বাজেয়াপ্ত জমি সব ফিরিয়ে দিচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা—সমুদ্রের ধারে যাদের বাস, তারা ইচ্ছামত লবণ তৈরী করতে পারবে—বিক্রি করতে পারবে। সরকার আমাদের এ অধিকার স্বীকার করেছে।

মহাভারত ॥ বুঝলাম তোরা জিতেছিস। কিন্তু আমার আর-সব কই ?

তুলসী ॥ দাদা ছাড়া পেয়েছেন। কিন্তু তিনি আর এ বাড়িতে আসবেন না।

মহাভারত ॥ কেন ?

লক্ষ্মী ॥ [ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল] মা নিরুদ্দেশ।

মহাভারত ॥ হুঁ ! নিরুদ্দেশ ! তার মানে তোদের মাকে হারিয়েছিস ! কিন্তু …তবে আমাকেও এ বাড়ি ছেড়ে যেতে হয়। বলরামকে আমি হারিয়েছি।

তুলসী ॥ তুমি গেলে আমরা কার কাছে থাকব বাবা ?

মহাভারত ॥ তা বটে—তাও তো বটে। তুলসী, লক্ষ্মী, জবাকে ডাক তোরা। আমায় তুলে ধর, ধরে আমায় নিয়ে চল।

তুলসী ॥ কোথায় বাবা ?

মহাভারত ॥ সমুদ্রের তীরে। তারা মরে গেছে—কিন্তু আমরা বেঁচে আছি। মৃত্যুমূল্যে যে অধিকার তারা আমাদের দিয়ে গেছে, সেই অধিকারে আমাদের সমুদ্রের জলে আমরা নুন তৈরী করব। সেই হবে তাদের শ্রাদ্ধ—সেই হবে তাদের তর্পণ। আমার খড়ম—আমার খড়ম ?

[কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিতে গেল। তুলসী ও লক্ষ্মী মহাভারতকে তুলিয়া ধরিল। ঝুলান খড়ম নামাইয়া আনিয়া তাহার পায়ের কাছে রাখিল। যবনিকা নামিয়া আসিল।]

চতুর্থ অঙ্ক

(১৯৪২)

[পূর্বোক্ত দৃশ্য। ১৯৪২ সন। যবনিকা উঠিলে দেখা গেল—মহাভারত একা বসিয়া হুঁকা টানিতেছে। দলবল সহ শ্রীধর আসিল।]

শ্রীধর ॥ [দলবলের প্রতি] এস—এস। মহাভারতদা, নতুন গান বেঁধেছি, সবার আগে তোমায় শোনাতে এলাম।

মহাভারত ॥ গাও ভাই।

[শ্রীধর সদলবলে কথকতা শুরু করিল]

শ্রীধর ॥ ইংরেজ আর জার্মানে
বাধলো মহারণ,
বাধলো দ্বিতীয় মহারণ।
গান্ধীজী বলেন ডেকে,
"আমাদের ভারত থেকে
'না এক পাই, না এক ভাই'—
এই আমাদের পণ
এই আমাদের পণ।"
আবার শুরু হ'ল
আমাদের স্বাধীনতার লড়াই
আবার শুরু হ'ল,
নতুন করে শুরু হ'ল।
গান্ধীজী বলেন তখন
বণিক তুমি যাও গো এখন
উনিশ-শ'-বিয়াল্লিশে,
কংগ্রেস বলল যে ভাই তল্পি তোল
ও বণিকগণ, তল্পি তোল,
সমস্বরে শপথ করে দেশের জনগণ
'করব না হয় মরব রে ভাই'
সমস্বরে শপথ করে দেশের জনগণ।

করব পূরণ মন্ত্র সাধন

সমস্বরে শপথ করে দেশের জনগণ।

আগস্টের আন্দোলনে

যত নেতা গান্ধী সনে

কারাবাস করল বরণ

দলে দলে মরণ-বরণ

কারাবাস করল বরণ ॥

সমস্বরে শপথ করে দেশের জনগণ।

'করব না হয় মরব রে ভাই'

সমস্বরে শপথ করে দেশের জনগণ

করব পূরণ মন্ত্র সাধন

সমস্বরে শপথ করে দেশের জনগণ ॥

শ্রীধর ॥ [দলের প্রতি] যাও, তোমরা এগিয়ে যাও, আমি দাদার কাছে গিয়ে একটু বসি।

[দলবল চলিয়া গেল]

গান আর আগের মত জমে না দাদা। বুড়ো হয়েছি, গলার জোর নেই, কথাও যেন আর বাঁধন ধরেনা—ভগবানেব কাছে কাঁদি, বলি—চারিদিকে এত অত্যাচার এত নির্যাতন চলছে, ইচ্ছে হয় গানে গানে আমিও আগুন জ্বালি।...এলেন—আবার সব এলেন।

[পুলিশ ইনস্‌পেকটর ও নিধিরামের প্রবেশ]

পুলিশ ইনস্‌পেকটর ॥ দেখছি দুই বুড়ো। মহাভারত মাইতি কে ?

মহাভারত ॥ আমি।

ইনস্‌পেকটর ॥ ক' বিঘে জমি চাষ কর ?

মহাভারত ॥ পঞ্চাশ বিঘে।

ইনস্‌পেকটর ॥ বছরে ক'মণ ধান পাও ?

মহাভারত ॥ তা—আধিতে শ'-মণ পাই।

ইনস্‌পেকটর ॥ মিছে বোলো না।

মহাভারত ॥ কি ভয়ে মিছে বলব ?

ইনস্‌পেকটর ॥ হুঁ, এখনো বিষদাঁত ভাঙেনি দেখছি! তোমার ক' ছেলে ?

মহাভারত ॥ দু' ছেলে। কিন্তু ভয় নেই সাহেব, তারা আর কেউ নেই। বড় ছেলে রাম—বত্রিশ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়েই নিরুদ্দেশ। ছোটছেলে বলরাম ওই বত্রিশ সালেই পুলিশের গুলী খেয়ে মারা গেছে।

নিধিরাম ॥ .বাবা মিথ্যে বলছেন স্যার, আমিও ওঁর এক ছেলে।

ইনস্‌পেকটর ॥ [মহাভারতের প্রতি] কি হে ?

মহাভারত ॥ হ্যাঁ, ছেলে ছিল। কিন্তু এখন আর আমার ছেলে নয়। বাড়ি-ঘর জোতজমি সব আলাদা করে দিয়েছি।

ইনস্‌পেকটর ॥ [নিধিরামের প্রতি] কি হে ?

নিধিরাম ॥ তা দিয়েছেন—কিন্তু আমার মেয়েটাকে রেখেছেন নিজের দখলে।

ইনস্‌পেকটর ॥ [মহাভারতের প্রতি] কি হে?

মহাভারত ॥ তা ঘটানাটা কি, ওই জবাই বলুক।

ইনস্‌পেকটর ॥ কে জবা ?

[জবা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল]

নিধিরাম ॥ আমার মেয়ে হুজুর।

ইনস্‌পেকটর ॥ [জবাকে] ওই বুড়ো তোমাকে জোর করে ধরে রেখেছে ? বাবা-মায়ের কাছে যেতে দেয় না ?

জবা ॥ বাবাকে দেখবার জন্যে মা আছেন, কিন্তু দাদুকে দেখবার কেউ নেই—তাই আমি যাই না, দাদুর কাছে থাকি। হাঁড়িই শুধু আলাদা, নইলে এক বাড়িতেই আছি।

ইনস্‌পেকটর ॥ [মহাভারতকে] তোমার আর কেউ নেই ?

মহাভারত ॥ সবই তো ছিল। জামাই ছিল ছোট দারোগা। বত্রিশ সালে সে তার নিজের বউকে গ্রেপ্তার করে। মেয়েটা আমার এমন আঘাত পেল যে, পাগল হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। সেই শোকে জামাইও চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে—এখন শুনি বৃন্দাবনবাসী—

ইনস্‌পেকটর ॥ ওহে নিধি, দেখো তুমি আবার তোমার পরিবারকে গ্রেপ্তার করে কাশীবাসী হয়ো না।

নিধিরাম ॥ না হুজুর—আমার পরিবার নামেও লক্ষ্মী, গুণেও লক্ষ্মী। স্বদেশীর ত্রিসীমানাতেও সে নেই হুজুর।

ইনস্‌পেকটর ॥ বেশ ! বেশ ! [মহাভারতকে] তোমরা বোধহয় শুনেছ—জাপানীদের সঙ্গে আমাদের লড়াই চলেছে। জাপান যাতে আমাদের দেশ দখল না করতে পারে সেজন্যে আমাদের সব রকম চেষ্টা করতে হবে। আমাদের সৈন্যদের রসদ জোগাতে হবে। তাই জোতদারদের কাছ থেকে ধান কিনতে এসেছে সরকারের কন্‌ট্রাক্টররা। খোরাকির ধান রেখে, বাকী সব ধান তোমাকে দিতে হবে মহাভারত। লোক তো দেখছি মাত্র তোমরা দুটি। তা' পঁচিশ মণ রেখে, বাকী পঁচাত্তর মণ দাও।

মহাভারত ॥ গাঁয়ের বাইরে ধান চালান দিলে গাঁয়ের লোক না খেয়ে মরবে। গাঁয়ের লোক তাই মিটিং করে ঠিক করেছে—ধান চালান দেওয়া হবে না।

ইনস্‌পেকটর ॥ সরকারের হুকুম—ধান দিতে হবে। লড়াইটা তো জিততে হবে।

মহাভারত ॥ না, এ লড়াই আমাদের লড়াই নয়। লড়াই বাধবার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস ইংরেজ-সরকারের মুখের ওপর বলে দিয়েছে—'না এক পাই, না এক ভাই'।

জবা ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, না এক পাই, না এক ভাই—

[জবা ছুটিয়া বাহিরে গেল বাহিরে বিশাল জনতাধ্বনি শোনা গেল—"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। ইংরেজ—ভারত ছাড়।"]

ইনস্‌পেকটর ॥ ওরা আবার কারা?

[ছোট দারেগা এবং কয়েকজন চৌকিদার ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।]

ছোট দারোগা ॥ স্যার শিগগির আসুন। ধান দেয়নি বলে যাদের গ্রেপ্তার করেছিলাম...পাঁচশ' লোকের এক জনতা তাদের ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এসে দেখুন গুলী না চালিয়ে আর উপায় নেই।

ইনস্‌পেকটর ॥ কথায় কথায় গুলী! ইডিয়ট! শুনছ না—'করঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে?' মাথা ঠাণ্ডা করে এস।

[পুলিশের দল চলিয়া গেল। বাহিরে জবার নেত্রীত্বে ধ্বনি উঠিল—]

জবা ॥ ইংরেজ...

সকলে ॥ ভারত ছাড়!

জবা ॥ করেঙ্গে ইয়ে—

সকলে ॥ মরেঙ্গে!

মহাভারত ॥ পাচশ' লোক সাহস এগিয়ে গেছে বন্দুকের সমেনে! সত্যিই অবাক হই শ্রীধর। কে এদের নেতা?

শ্রীধর ॥ নেতা নয় মহাভারতদা, নেতা-টেতা ছিল আমাদের যুগে। এখন নেতাকে বলে ডিক্টেটর। ডিক্টেটর এখানকার এখন আনন্দ।

মহাভারত ॥ তা বলব—ছেলে তোমার মুখ রেখেছে। আমার বলরামটাও এমনি ছিল। তা যাবে—এক গুলীতেই যাবে।

শ্রীধর ॥ বুড়ো হয়েছি! দুঃখ এই যে, নিজে কিছুই করতে পারলাম না। তবু ছেলেমেয়েদের এত সাহস—এই দেশভক্তি দেখে একটা আকাঙ্ক্ষা মনে জাগে মহাভারতদা—পরাধীন ভারতে জন্মেছিলাম কিন্তু স্বধীন ভারতে যেন মরতে পারি।

মহাভারত ॥ বাচতেই হবে। স্বাধীনতা না দেখে মরলে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হবে না শ্রীধর। চৌকিদারকে সেলাম করেছি! দফাদারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে মান বাড়াতে চেয়েছি! সাহেবসুবোর প্রসাদ পাবার জন্যে পাগল হয়েছি!—এতদূর নীচে নেবে গিয়েছিলাম আমরা!

[হলধর জেলের প্রবেশ, তাহার হাতে একটি নোটিশ]

হলধর ॥ এই যে, শ্রীধর খুড়ো। এনার ছেলে নিধে দফাদার নুটিশ জারি

করল—তিন ঘণ্টার মধ্যে আমার নৌকো আশি মাইল দূরে সাগরদাড়ির ঘাটে নিয়ে যেতে হবে।

শ্রীধর ॥ তিন ঘণ্টায় আশি মাইল! তোর নৌকোকে খুব খাতির করেছে রে হলধর।

মহাভারত ॥ তা করেছে। উড়োজাহাজ বানিয়ে ছেড়েছে। তা চলে যাও!

হলধর ॥ চলে যাও! মগের মুল্লুক নাকি! কেন যাব, বলতে পারো?

শ্রীধর ॥ জাপানীরা আসছে যে! কিন্তু এসে যেন তারা যাতে একদানা ধান না পায়—তোমাদের ডিঙিনৌকো চড়ে মাছ ধরতে না পায়—একেবারে বেকুব ব'নে যায়—বুদ্ধিমান কর্তাদের তাই এ ব্যবস্থা। আজ দু'মাস ধরে কাঁথি, নন্দীগ্রাম আর ময়না থানায় এই নৌকানাশন যজ্ঞ চলছে। মানে, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করছেন এঁরা—বুঝলে হলধর?

হলধর ॥ যদি আমি নৌকো না সরাই?

শ্রীধর ॥ ওরা জলে ডুবিয়ে দেবে।

হলধর ॥ তাই দিক। ডুবুক– সব ভাল করেই ডুবুক!

[হলধর চলিয়া গেল। অদূরে 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়'—'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, 'ইংরেজ ভারত ছাড়' ধ্বনি শোনা গেল।]

শ্রীধর ॥ গুলীগোলার শব্দ যখন পাওয়া গেল না—মনে হচ্ছে, আজকের দিনটা কোনমতে রক্ষা হ'ল।

মহাভারত ॥ কীই বা রক্ষা পাবে? থাকবার মধ্যে রয়েছে আমার শিবরাত্রির সলতে জবাটা। বাপ-মা থেকেও মেয়েটা অনাথা, আমি আজ আছি কাল নেই। কেবলই ভাবি, মেয়েটাকে কে দেখবে—কে ওর ভার নেবে! শ্রীধর, ভাই, আনন্দ যদি ওর চিরদিনের ভার নিতো—আমি নিশ্চিন্ত মনে মরতে পারতাম।

শ্রীধর ॥ আরে, এ তো সত্যি সত্যি আনন্দের কথা মহাভারতদা।

[আনন্দ ও জবার প্রবেশ।

কি, সদর-পুলিশের দল চলে গেল?

আনন্দ ॥ হ্যাঁ, এখন গেল। কিন্তু মনে হচ্ছে, বড় রকম কোন মতলব আছে।

জবা ॥ আনন্দদাকে ওরা রাখবে না। হয় গুলী করে মারবে—না হয় জেলে পুরবে। এ গ্রাম ওরা নিরানন্দ করবেই-করবে।

শ্রীধর ॥ থাক থাক, ওসব কথা থাক। মহাভারতদা, তুমি ওঠ দেখি। আজ যে দুর্গাপূজো—সে কথা সবাই ভুলে গেছ দেখছি। আরে আজ যে মহাষ্টমী।

মহাভারত ॥ পূজো আর কোথায় হচ্ছে যে মনে পড়বে! গাঁয়ে পূজো হচ্ছে কি?

শ্রীধর ॥ ঠাকুরবাড়িতে কোনমতে একখানি পূজো হচ্ছে। তবু তো হচ্ছে।

চল—প্রণাম করে আসি। বছরকার দিন—মন খারাপ করে বসে থাকতে নেই। এস—এস মাকে প্রণাম করে আসি—ছেলে-মেয়েদের জন্যে প্রার্থনা করে আসি—

রূপং দেহি—জয়ং দেহি
যশো দেহি—দ্বিষো জহি।

মহাভারত ॥ চল।

[শ্রীধররে মহাভাবতকে লইয়া প্রস্থান]

আনন্দ ॥ সত্যিই তো—পূজোর কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম!

জবা ॥ ভুলব কেন? পূজো এবার হচ্ছে ঘরে-ঘরে।

আনন্দ ॥ তা সত্যি। এতবড় পূজো আর কখন হয়নি। মাতৃভূমিকে বিদেশী-শাসন থেকে মুক্ত করে আমরা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করব। বন্দেমাতরম্।

[চারিদিক দেখিয়া লইয়া কতকগুলি কাগজপত্র জামার তলা হইতে বাহির করিল।]

জবা ॥ বন্দেমাতরম্।

আনন্দ ॥ এই দেখ—তার সব আয়োজনই আমরা করে ফেলেছি জবা।

জবা ॥ সর্বনাশ! এসব কাগজপত্র তোমার কাছে! বাবার কাছে হুকুম এসেছে এসব কাগজ-পত্র ধরতে—দরকার হ'লে খানাতল্লাসী করতে।

আনন্দ ॥ আজ রাত্রেই পাশের গাঁয়ে এসব কাগজ-পত্র সরাবো। কিন্তু বিপদ হয়েছে, চৌকিদার-দফাদারের কড়া নজরে পড়ে গেছি।...তা ভেব না, ছোটবেলা থেকে কত যাত্রা থিয়েটার করেছি—একবার দ্রৌপদী সেজেছিলাম, কেউ চিনতেই পারেনা যে—সে আমি। সেই বিদ্যেটা আজ রাতের অন্ধকারে কাজে লাগাব। আমার বুকের ধন—তোমায় রাখতে দিচ্ছি জবা।

জবা ॥ আমারও বুকের ধন হয়েই থাকবে।

আনন্দ ॥ রাত বারোটায় আসব।

জবা ॥ এসো।

[আনন্দ চলিয়া গেল। অদূরে পূজার বলির বাদ্য বাজিয়া উঠিল। জবা উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। ধীরে ধীরে যবনিকা নামিল। আবার যবনিকা উঠিলে দেখা গেল—মহাভারতের বাড়ির পূর্বোক্ত প্রাঙ্গণ। রাত্রির অন্ধকারে আলো মিলাইয়া যায় নাই। সশস্ত্র পুলিশ সহযোগে সদরের পূর্বোক্ত ইনস্‌পেক্টর মহাভারতের বাড়ি খানাতল্লাসী করিতেছেন। ইনস্‌পেকটর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার পার্শ্বে নিধিরাম দফাদার দাঁড়াইয়া আছে। দুইজন সশস্ত্র পুলিশ সহ একজন ছোট দারোগা মহাভারতের বৈঠকখানা হইতে কয়েকটি খাতাপত্র নিয়া বাহির হইলেন।]

ইনস্‌পেকটর ॥ পেলে না?

ছোট দারোগা ॥ না।

ইনস্‌পেকটর ॥ এগুলো কি?

ছোট দারোগা ॥ সব জমাখরচের খাতাপত্র।

নিধিরাম ॥ আমি বলছি স্যার, এ বাড়িতেই আছে। দুপুররাতেও আমি তার গলার আওয়াজ শুনেছি। ফিস্‌ফিস করে ভলাণ্টিয়ারদের কি সব বলছিল।

তারপর থেকে চৌকিদার দিয়ে আমি সারা রাত বাড়ির চারিদিকে পাহারা রেখেছি। স্বচক্ষে দেখেছি বলেই না হুজুরের ক্যাম্পে খবর পাঠিয়েছি।

ইনস্‌পেকটর ॥ দেখা যাক।

[আরও দুইজন সশস্ত্র পুলিশ সহ আর-একজন ছোট দারোগা মহাভারতের ঘর হইতে আসিলেন। পশ্চাতে মহাভারত।]

ইনস্‌পেকটর ॥ পেলে না ?

ছোট দারোগা ॥ না স্যার, এ ঘরে তো নেই।

ইনস্‌পেকটর ॥ এই বুড়ো, আনন্দ মাইতি কোথায় লুকিয়ে আছে বল।

মহাভারত ॥ লুকিয়েই যদি থাকে—কাউকে বলেকয়ে লুকোবার ছেলে সে নয়।

ইনস্‌পেকটর ॥ তোমার বিষদাঁত না ভেঙে আমি ছাড়বো না বুড়ো। [চপেটাঘাত করিলেন] তোমার সেই ধিঙ্গি নাতনীটি কোথায় ?

মহাভারত ॥ কোথায়—খুঁজে দেখ।

ইনস্‌পেকটর ॥ কোন ঘরে শোয় ?

নিধিরাম ॥ ওই পাশের ঘরে স্যার।

ইনস্‌পেকটর ॥ নবাব নন্দিনী কি এখনো ঘুমুচ্ছেন ? তোলো তাকে। নিশ্চয় ছোঁড়াটার খবর জানে।

[দুইজন পুলিশ জবার ঘরের দিকে গেল। পশ্চাতে পশ্চাতে গেলেন পুলিশ ইনস্‌পেকটর। সশঙ্কচিত্তে নিধিরাম তাঁহার অনুসরণ করিল। পুলিশ দরজায় লাথি মারিতে লাগিল। দরজা খুলিয়া দিল জবা। সদ্য-নিদ্রোত্থিতা জবার অসংযত বসন। দুইজন পুলিশ ঘরে ঢুকিতেছিল।]

ইনস্‌পেকটর ॥ দাঁড়াও, ওর বাবাকে সঙ্গে নাও। [নিধিরামকে] যাও।

[নিধিরাম সহ পুলিশ দুইজন ঘরে ঢুকিল]

জবা ॥ [ইনস্‌পেকটরকে] কি হয়েছে ?

ইনস্‌পেকটর ॥ আনন্দ মাইতিকে চাই।

জবা ॥ আনন্দ মাইতি থাকবে কুমারী-মেয়ের ঘরে—রাত্রে ?

[দুইজন পুলিশ সহ নিধিরাম বাহির হইয়া আসিল]

প্রথম পুলিশ ॥ না নেই। আর একটি মেয়ে ওর বিছানায় ঘুমোচ্ছে।

নিধিরাম ॥ ও আমারই এক মেয়ে—মানে শালীর মেয়ে, টগর। কাল পূজো দেখতে এসেছে।

[পুলিশ ইনস্‌পেকটর রাগ করিয়া প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলে আসিল। শুধু জবা বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল।]

ইনস্‌পেকটর ॥ অনর্থক শেষরাত্রে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে টেনে নিয়ে এসেছে। ইডিয়ট! প্রমোশন! প্রমোশন! [মুখ ভ্যাংচাইয়া] 'প্রমোশন চাই, স্যার!' সারা জীবনেও তোমার দফাদারী ঘুচবে না। চল।

[ইনস্পেকটর সদলবলে চলিয়া গেলেন। নিধিরাম তাহাদের পশ্চাদনুবর্তী হইল। কিন্তু খানিকদূর গিয়া পায়ে আর জোর পাইল না—টলিতে টলিতে আসিয়া বারান্দায় বসিয়া পড়িল।]

মহাভারত ॥ [জবার প্রতি] টগরটা কে? ওর কোন্ শালীর মেয়ে? কখন এলো?

জবা ॥ তুমি থামোতো দাদু!

[নিধিরাম কোনমতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মহাভারতের কাছে আসিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল—]

নিধিরাম ॥ বাবা, চাকরি গেলে চাকরি পাব; কিন্তু জাত গেলে জাত ফিরে পাব না। এদের বিয়ে দিয়ে দাও।

মহাভারত ॥ কাদের বিয়ে?

নিধিরাম ॥ জবার সঙ্গে আনন্দের।

মহাভারত ॥ কোথায় আনন্দ?

[পরচুলা খুলিতে খুলিতে ঘর হইতে আনন্দ বাহির হইয়া আসিল]

আনন্দ ॥ এই যে দাদু। আর কোনো উপায় ছিল না। থিয়েটারী বুদ্ধিতেই আজ বেঁচে গেছি, রক্ষা পেয়েছে আমাদের যথাসর্বস্ব।

নিধিরাম ॥ বিয়ে তোমাদের হোক। কিন্তু, তোমার বাবা তোমাকে আশীর্বাদ করতে পারলো না জবা।

[নিধিরাম চলিয়া গেল]

মহাভারত ॥ না পারলো! বাবার বাবা আশীর্বাদ করছে।

[জবা ও আনন্দ মহাভাবতকে প্রণাম করিল]

নিশ্চিন্ত হলাম—আজ আমি নিশ্চিন্ত হলাম। শুধু দুঃখ এই—আজ আমার বুড়ীটা নেই—বলরামটা নেই—রামও নেই। দুঃখ এই—এতবড় একটা শুভকাজে শাঁখ বাজবে না—উলু পড়বে না—পুরুত আসবে না—চারিদিকে পুলিশ ওত পেতে রয়েছে! তা, আজ আমি তোদের দু'হাত এক করে দিচ্ছি।

[দুইজনের হাত এক করিয়া দিল। উভয়ের মহাভারতকে প্রণাম। যবনিকা। পরে যখন যবনিকা উঠিল, দেখা গেল—একটি লণ্ঠন বারান্দায় ঝুলিতেছে। তাহারই আলোতে স্বল্পালোকিত প্রাঙ্গণ। লণ্ঠনের ঠিক নীচে বারান্দায় একটি খাটিয়ায় বসিয়া হুঁকা টানিতেছে মহাভারত। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। রাত্রির গভীরতা এবং আলোছায়া দৃশ্যটিকে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। মহাভারত কলিকাতে ফুঁ দিয়া ভাল করিয়া আগুন ধরাইয়া লইতেছে। সেই আলোতে তাঁহার চোখমুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। এমন সময় ধীরে ধীরে লক্ষ্মী মহাভারতের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল—তাহার হাতে একটি টর্চ।]

লক্ষ্মী ॥ বাবা!

মহাভারত ॥ কে? লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ বাবা।

মহাভারত ॥ কি বউমা?

লক্ষ্মী ॥ এত রাত হয়ে গেল, তার ওপর আকাশে কী ভীষণ মেঘ করেছে—

মহাভারত ॥ হ্যাঁ, ঝড় উঠবে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

লক্ষ্মী ॥ জবা তো এখনো ফিরল না—আনন্দও না।

মহাভারত ॥ ওরা পূজো দেখতে গিয়েছিল না ?

লক্ষ্মী ॥ না বাবা, ওরা আজ এক সর্বনাশের পূজোয় গেছে। একদল গেছে পথঘাট কেটে নষ্ট করতে—যাতে গাঁয়ে মিলিটারী ঢুকতে না পারে ; আরেক দল গেছে ভরাকুলের ইউনিয়ন আপিস পোড়াতে।

মহাভারত ॥ জবার বাবা কোথায় ? দফাদারসাহেব ?

লক্ষ্মী ॥ আজ নাকি এ গাঁয়ে মিলিটারী আসবে—তারই খবরদারি করতে সারাদিনই তো আজ বাড়ি নেই।

মহাভারত ॥ মিলিটারী তবে আসছে ! আকাশে তাই এত দুর্যোগ ! হুঁ ! মন বলছে, মহাপূজোয় না-জানি কী মহাপ্রলয় হবে ! তা, ভেবে কি করবে ? তুমি যাও মা। গিয়ে শোও। তবে জেগে থেকো—সাবধানে থেকো। মিলিটারী আসছে !

লক্ষ্মী ॥ আপনি আমার জন্য ভাববেন না বাবা। গাঁয়ের সব বউ-ঝিরা আমার ঘরেই আজ ঠাঁই নিয়েছে। আনন্দ আমাদের সবাইকে একখানা করে ছোরা দিয়ে গেছে।

মহাভারত ॥ মিলিটারীর বন্দুকের কাছে ছোরাতে আর কি হবে মা ?

লক্ষ্মী ॥ না বাবা, মেয়েদের ওরা মেরে ফেলতে চায় না—চায় অসম্মান করতে। আনন্দ বলেছে—হাতে ছোরা নিয়ে দল বেঁধে থাকলে মেয়েদের কাছে ওরা এগোতে সাহস পায় না। তমলুকে মেয়েরা এখন এমনি করেই ইজ্জত রক্ষা করছে। আচ্ছা বাবা, আমি চলি। জবা ফিরে এলে তাকেও আজ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন !

মহাভারত ॥ দেবো—যদি ফিরে আসে—দেবো। কিন্তু—কিন্তু মিলিটারী আসছে—সে কি আর ফিরতে পারবে !

[লক্ষ্মী চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় অদূরে ক্রমাগত গুলীর শব্দ শুনিয়া দাঁড়াইল।]

লক্ষ্মী ॥ [আতঙ্কিত কণ্ঠে] বাবা, মিলিটারী এসে পড়েছে।

মহাভারত ॥ চুপ ! শিগগির চলে যাও ঘরে। কেউ কোন শব্দ কোরো না।

[লক্ষ্মী চলিয়া গেল। মেঘগর্জন হইতে লাগিল। ঝড়ের লক্ষণ সুস্পষ্ট হইতে লাগিল। জবা পতাকা হাতে ছুটিয়া আসিল।]

জবা ॥ দাদু, মিলিটারী···মিলিটারী আমাকে তাড়া করেছে ! এলো বলে ! দাদু, সর্বনাশ হয়েছে—আনন্দ গুলি খেয়ে পড়ে গেছে !

মহাভারত ॥ কে ? আনন্দ ?

জবা ॥ হ্যাঁ দাদু—আনন্দ ?

মহাভারত ॥ মরেছে ?

জবা ॥ বেঁচে আছে কি মারা গেছে জানি না। জীবনের চেয়ে তার পতাকা বড়। সেই পতাকা—পাছে ওরা পুড়িয়ে ফেলে তাই আমার হাতে তুলে দিয়েছে। পতাকা নিয়ে আমি ছুটে আসছি। মিলিটারী আমাকে তাড়া করেছে।

মহাভারত ॥ তুই তোর মা'র কাছে চলে যা—এখনি।

জবা ॥ না, পাড়ার মেয়েরা সেখানে রয়েছে, আমার একার জন্যে তাদের আমি মরতে দেবো না—না—না—না। ওরা পশু, ওরা শয়তান—আমার সম্মান যাক কিন্তু পতাকার সম্মান রাখতেই হবে। [আর্তনাদ করিয়া] ঐ আসছে।

[জবা লণ্ঠনটি নিভাইয়া দিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। কয়েকটি ভারী বুটের পদশব্দ নিকটবর্তী হইল। বিদ্যুৎচমকে দেখা গেল—মহাভারত মড়ার মত পড়িয়া আছে।]

[চার-পাঁচজন মিলিটারী ভিতরে ঢুকিয়া টর্চ ফেলিয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের দৃষ্টিতে তাহাদের শিকার খুঁজিতে লাগিল। মহাভারতকে দেখিয়া লাথি মারিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। লাথি মারিয়া ঘরের দরজা জানালাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ঘরে ঢুকিল। কিন্তু শিকার না পাইয়া তখনই বাহির হইয়া আসিল। এদিকে তখন সাইক্লোন শুরু হইয়াছে। মিলিটারী-দের একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—"Cyclone! Cyclone! Clear out! Hey, clear out!" মিলিটারীরা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।]

[ঝড়ের বেগ ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। মনে হইল প্রলয় শুরু হইয়াছে। মহাভারত হামাগুড়ি দিয়া কিছুদূর যাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পড়িয়া গেল—আবার উঠিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ-চমকে দেখা গেল—প্রাঙ্গণস্থিত পাতকুয়া হইতে সিক্তবসনা জবা পতাকা-হস্তে উঠিয়া আসিয়া মহাভারতের কাছে ছুটিয়া গেল এবং প্রাণপণ চেষ্টাতে পতাকাটি মাটিতে পুঁতিয়া দুইজনে পতাকার দুই পার্শ্বে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। মহাভারত আকাশের দিকে তাকাইয়া অট্টহাস্য করিতে লাগিল এবং প্রলয়কে আহ্বান করিতে লাগিল প্রাণপণে কণ্ঠস্বর তুলিয়া।]

মহাভারত ॥ "আও! আও! আও!......হাঃ—হাঃ—হাঃ! ডুবিয়ে দাও—ভাসিয়ে দাও—ভেঙেচুরে খানখান কর! হাঃ—হাঃ—হাঃ!"

[যবনিকা নামিল]

পঞ্চম অঙ্ক
(১৯৪৪—১৯৪৬)

[পূর্ববর্ণিত দৃশ্য। ১৯৪৪ সাল, জুলাই মাস। মহাভারতের সেই গৃহপ্রাঙ্গণ। কিন্তু তাহা আজ চিনিবার উপায় নাই। পূর্ববর্ণিত সাইক্লোনের প্রকোপে ঘরগুলি পড়িয়া গিয়াছে। বন্যার প্রকোপও সুস্পষ্ট। অদূরে যে গাছগুলি দেখা যাইত আজ তাহা নাই। একটি বড় গাছও প্রাঙ্গণের উপরে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এতদিনে অবশ্য তাহার ডালপালা শুকাইয়া গিয়াছে। গত সাইক্লোনে কাঁথি মহকুমায় যে বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে, এই দৃশ্যটি দেখিলেই তাহার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। প্রকৃতির সেই তাণ্ডব যে প্রলয়-নৃত্য শুরু করিয়াছিল, আজ তাহা শান্ত হইলেও কাঁথিবাসীর জীবনে তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

খানকতক টিন দিয়া একটি ছাউনি বাঁধা হইয়াছে, তাহারই তলায় ঘর-সংসারের সামান্য যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা স্থান পাইয়াছে। গোটাদুই খাটিয়া প্রাঙ্গণে পড়িয়া আছে, তাহার একটিতে জরাজীর্ণ মহাভারত পড়িয়া আছে। জীবিত কি মৃত ভাল বোঝা যায় না। ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ডে বসিয়া রহিয়াছে বিধবা জবা এবং খানদুই মাদুরে গ্রামের একদল কর্মী বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদের হাতে কিছু কাগজপত্রও আছে। গ্রামের বর্তমান কংগ্রেস-সম্পাদক রঞ্জন জানা একটি লিখিত আবেদন পড়িয়া শোনাইতেছে।]

রঞ্জন ।। "দেশবাসীর নিকট আমাদের আবেদন—১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবরের নিদারুণ ঘূর্ণিবাত্যায় মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ৩৫ হাজার লোক মারা যায়। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয় এবং শস্যাদি নষ্ট হওয়ায় অন্নভাবে কষ্ট পায়। এদিকে জাপানের অগ্রগতিতে বৃটিশ-কর্তৃপক্ষ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন। সৈন্যদের রসদ জোগাইবার জন্য এবং জাপানীরা যদি আসিয়াই পড়ে—তাহাদের ভাতে মারিবার জন্য, লোকের সুখদুঃখের দিকে না তাকাইয়া শস্যপূর্ণ জেলাগুলি হইতে গভর্ণমেণ্ট উচ্চমূল্যে খাদ্যশস্য-ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। এইসকল ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইল পঞ্চাশের মন্বন্তর। প্রাচুর্যের মধ্যেও দেখা দেয় মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। আগস্ট আন্দোলনে মেদিনীপুরবাসীর উপর যে দমননীতি চলিতেছিল—এত বিপর্যয়ে কিন্তু তাহা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।"

জবা ।। জার্মান-অধিকৃত দেশগুলোতে জার্মানদের অত্যাচারের কথা বৃটিশ-প্রভুরা তারস্বরে প্রচার করেছেন—কিন্তু মেদিনীপুরে তাঁরা নিজেরা যে অত্যাচার চালিয়েছেন, তা জার্মান-অত্যাচারকেও হার মানিয়েছে।

রঞ্জন ।। [পড়িতে লাগিল] "কোন সভ্যদেশে এ কথা শোনা যায় না যে—গোটা গ্রাম সৈন্যেরা ঘিরিয়া ফেলিয়া বাড়ির পুরুষদের হয় গ্রেপ্তার করিয়াছে নতুবা গুলী করিয়া মারিয়াছে ; তাহার 'পর মেয়েদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাইয়াছে।"

সকলে ।। বৃটিশরাজ ধ্বংস হোক !
বৃটিশরাজ ধ্বংস হোক !!
বৃটিশরাজ ধ্বংস হোক !!!

রঞ্জন ।। [পড়িতে লাগিল] "এই জঘন্য অত্যাচারে জনসাধারণের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। তাহারাও নাশকতামূলক কার্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইহার উত্তর দেয়। থানা চড়াও করিয়া তাহারা অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লয় এবং থানার কর্মচারীদের আটক করে। সরকারী ও আধা-সরকারী ঘরগুলি পোড়াইতে থাকে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটিয়া দেয় ও চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বহু থানার দারোগা এবং সিপাইশান্ত্রীকে তাহারা গ্রেপ্তার করিয়াছে। বহু সরকারী কর্মচারী কাজে ইস্তফা দিয়াছেন। বৃটিশের শাসনযন্ত্র বিকল করিয়া পটাশপুরে, খেজুরীতে, রামগড়ে, ভগবানপুরে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশবাসী ভাইসব, জাতীয় সরকারের পতাকাতলে সমবেত হও—জাতীয় সরকারকে দীর্ঘজীবী কর।"

সমবেত ধ্বনি ।। জাতীয় সরকার জিন্দাবাদ !
জাতীয় সরকার জিন্দাবাদ !!
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক !!!

[হঠাৎ অদূরে একটি বন্দুকের গুলীর শব্দ শোনা গেল। সকলে চমকিয়া উঠিল।]

জবা ।। তোমরা দেখ। রঞ্জন, তুমি থাকো।

[জবার আদেশ পাইয়া সকলে বাহিরের দিকে ছুটিল, জবার আদেশে রঞ্জন থামিল।।]

জবা ।। আমি জানতাম রঞ্জন, সদর থেকে পুলিশ আজ এ গাঁ ঘেরাও করবে। তারা মরীয়া হয়ে এসেছে—কিন্তু আমাদেরও আজ মরীয়া হয়ে নেতাজীর সম্মান রক্ষা করতে হবে।

রঞ্জন ।। নেতাজীর সম্মান! আপনি কি বলছেন জবাদি ?

জবা ।। রঞ্জন, ভেতরে যাও।

রঞ্জন ।। কেন ?

জবা ।। কথার সময় নেই। গিয়ে দেখে এস—ওখানে কে রয়েছেন।

[রঞ্জন বিনা বাক্যব্যয়ে ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গেল এবং পরক্ষণেই বাহির হইয়া আসিয়া সবিস্ময়ে জবাকে জিজ্ঞাসা করিল।]

রঞ্জন ।। একটা অপরিচিত লোক অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আমি চিনতে পারলাম না—কে।

জবা ।। ওকে ধরতেই সদর থেকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর এই শুভাগমন রঞ্জন।

রঞ্জন ।। কিন্তু কে উনি ?

জবা ।। আমার জ্যাঠামশাই রাম মাইতি—মৃত্যুপথ যাত্রী বৃদ্ধের জ্যেষ্ঠপুত্র।

রঞ্জন ।। তাঁর কথা শুনেছি বটে, কিন্তু তিনি তো বত্রিশ সালে নিরুদ্দেশ হন।

জবা ।। হ্যাঁ, আজীবন বিপ্লবী ছিলেন জ্যাঠামশাই। লবণ-সত্যাগ্রহে ছোটভাই আর মাকে হারিয়ে মর্মাহত হয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে চলে যান জাপানে—আবার বিপ্লবের পথে। টোকিওতে গিয়ে রাসবিহারী বসুর দলে যোগ দেন।

রঞ্জন ॥ এসব কথা তুমি জানতে ?

জবা ॥ কি করে জানব ? বাড়ির সঙ্গে কোন যোগাযোগই উনি রাখেননি। কাল রাত্রে বাড়িতে এসে আত্মপ্রকাশ করতে তবেই না জানতে পেরেছি—ভারতের বাইরে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কী বিরাট আয়োজন হয়েছে !

রঞ্জন ॥ সে না হয় পরে শুনব, কিন্তু পুলিশ বাহিনীর হাত থেকে ওঁকে কি রক্ষা করতে হবে না, জবাদি ? উনি কি ঘুমিয়েই থাকবেন ? আমাদের কি কোন কর্তব্যই নেই এখন ?

জবা ॥ যারা গেছে তারা ফিরে আসুক। সব-কিছু না জানা পর্যন্ত ওকে এখান থেকে সরিয়ে দিলে হয়তো ওঁকে বিপদের মুখেই ফেলে দেওয়া হবে। ওঁর শরীরের অবস্থা যা বুঝেছি, তাতে নড়বার শক্তি আর নেই। ঘুমটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

রঞ্জন ॥ ঠিক বলেছ। এইবার বল ওঁর সব কাহিনী।

জবা ॥ একচল্লিশ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী জামিনে মুক্ত থাকা কালে সুভাষচন্দ্র কলকাতা থেকে অকস্মাৎ উধাও হন।

রঞ্জন ॥ জানি। জনরব শুনেছিলাম, জার্মানীতে তিনি হিটলারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

জবা ॥ বার্লিন থেকে তিনি চলে যান টোকিওতে—বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করতে। তেতাল্লিশ সালের একুশে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে রাসবিহারী বসু প্রভৃতি বিপ্লবীদের সহযোগিতায় 'আজাদ হিন্দ সরকার' গঠিত হয়। তার সর্বাধিনায়ক হন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। জ্যাঠামশাই এই আজাদ হিন্দ ফৌজের নৌ-বাহিনীতে যোগ দেন। চট্টগ্রামের কাছে আরাকান অঞ্চলে, চুয়াল্লিশের পঁচিশে মার্চ 'দিল্লী চল' এই আওয়াজ তুলে আজাদ হিন্দ ফৌজ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত ভূমিতে আমাদের জাতীয় পতাকা তুলে ধরে। তারপর শুরু হয় 'ইম্ফল-অভিযান'। প্রথমে বৃটিশ হেরে যায় ; কিন্তু উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র আর রসদের অভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ বাধ্য হয়ে পিছু হটে। এসবের খবর আজাদ হিন্দ রেডিওতে প্রচার করেছিল—কিন্তু আমরা গ্রামে বসে তা' পাইনি।

রঞ্জন ॥ কিন্তু জ্যাঠামশাই এখানে এলেন কি করে ? কোত্থেকে ?

জবা ॥ নেতাজীর একটা গুপ্ত সামরিক সংবাদ বহন করে এক সাবমেরিনে এসেছেন নেতাজীর চারজন বিশ্বস্ত অনুচর। সেই সাবমেরিন আমাদের সমুদ্রের উপকূলে ভিড়েছে চারদিন আগে। সেই সাবমেরিনের একজন চালক আমার জ্যাঠামশাই।

রঞ্জন ॥ এখনো কেউ ধরা পড়েনি ?

জবা ॥ কেউ কেউ ধরা পড়েছে। আজ জ্যাঠামশায়ের পালা। কিন্তু ওদের ফিরতে এত দেরী হচ্ছে কেন রঞ্জন ?

রঞ্জন ।। হয়তো পুলিশ-বাহিনী এদিকে না এসে অন্য দিকে চলে গেছে। ওরা তাদের পিছু নিয়েছে। জবাদি…ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনছি!

জবা ।। ঘোড়ার পায়ের শব্দ! ঘোড়া! তবে হয়ত সদ্য দারোগাগিরিতে প্রমোশন-প্রাপ্ত পিতৃদেব! রঞ্জন, রিভলভারটা বাগিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যাও। জ্যাঠামশায়ের কাছেও অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে। আমি 'শুট্' না বললে তোমরা গুলী চালাবে না। যাও।

[রঞ্জন ছুটিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। ঘোড়ার পায়ের শব্দ নিকটতর হইতে লাগিল। জবা চট্ করিয়া মহাভারতের কাছে গিয়া বসিল এবং তাহাকে একখানি পাখা দিয়া হাওয়া করিতে লাগিল। ক্ষণপরে ছোট দারোগা নিধিরামের প্রবেশ।]

নিধিরাম ।। [চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া] বাবাকে দেখতে এলাম জবা। বাবার নাকি এখন-তখন?

জবা ।। রোজই জ্বর হচ্ছে কিনা—বড় দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

নিধিরাম ।। চিকিৎসা কিছু হচ্ছে?

জবা ।। গাঁয়ের কবরেজ মশাই যা করছেন।

নিধিরাম ।। তোমার গর্ভধারিণী বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, কাঁথিতে তোমাদের নিয়ে যেতে।

জবা ।। ভিটে ছেড়ে উনি যাবেন না—ও'র প্রতিজ্ঞা।

নিধিরাম ।। তা হলে আর কোনো আশাই নেই, কি বলিস জবা?

জবা ।। কিন্তু ও'র এখনো আশা আছে—উনি দেশের স্বাধীনতা দেখে তবে মরবেন।

নিধিরাম ।। ভালো—ভালো! স্বাধীনতার পথে তোরা তো অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিস! গাঁয়ে গাঁয়ে সব জাতীয় সরকার হয়েছে! তোরা তো আমাদের আর মানতেই চাস না! তা তোরা মানিস আর না মানিস—আমরা আছি আর থাকবোও। জার্মানীর নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছি, এবার জাপানের পালা।

জবা ।। চেঁচিও না বাবা, যদি বাপের নাভিশ্বাস না দেখতে চাও।

নিধিরাম ।। ও, তাও তো বটে। যাক্, ডেকে আর বিরক্ত করলাম না। বলিস আমি এসেছিলাম—প্রণাম জানিয়ে গেছি। হাজার হ'লেও—বাপ তো।

জবা ।। কিন্তু বাপের শেষ কাজটা করতে পারবে তো? আমার একলার ওপর ও ভারটা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকো না বাবা। উনি আবার একটা উইল করে রেখেছেন।

নিধিরাম ।। উইল!

জবা ।। হ্যাঁ, উইল।

নিধিরাম ।। ও'র আবার কিছু আছে নাকি?

জবা ।। নেই? আর কিছু না থাক, একটা দেমাক তো আছে—যে দেমাক ছিল আমাদের বীরেন শাসমলের। বীরেন শাসমলের মত দাদুও উইল করেছেন—

জীবনে যে-মাথা কারও কাছে নোয়ান নি—শ্মশানেও সে মাথা যেন খাড়া রেখে তাঁকে দাহ করা হয়।

নিধিরাম ॥ এটা উইল করেছেন ?

জবা ॥ হ্যাঁ বাবা।

নিধিরাম ॥ [হেসে উঠে] ও বাবা। তা বেশ, তাই হবে। দেখ, টাকা-পয়সা তোদের আমি কিছু দিয়ে যেতে পারি—যদি কাউকে তোরা না বলিস।

জবা ॥ না বাবা, জানাজানি হলে তোমার প্রমোশন বন্ধ হবে। থাক।

[একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। রাম ঘরে ঘুমাইতেছিল কিন্তু তাহার নাসিকাগর্জন হঠাৎ এত প্রবল হইয়া উঠিবে তাহা কেহ আশঙ্কা করে নাই। নিধিরামের কান খাড়া হইল, চোখও ঘরের দিকে ক্ষণকালের জন্য নিবদ্ধ হইল; কিন্তু সদ্য প্রমোশনপ্রাপ্ত এই দারোগা তাহার ভাবাবেগ দমন করিতে সক্ষম হইল বিশেষ করিয়া এইজন্য যে, সে শুনিয়াছিল—যাহার খোঁজে সে আসিয়াছে তাহার কাছে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র আছে।]

নিধিরাম ॥ হ্যাঁ, তোর বুদ্ধি আছে বলতে হবে। হ্যাঁ রে, এ গাঁয়ে কোন নতুন লোক দেখেছিস আজকাল ?

জবা ॥ নতুন লোক ? না।

নিধিরাম ॥ বাপের কাছে মিথ্যে বলতে নেই জবা। তোদের গাঁয়ের কোন লোকের কথা তো জিজ্ঞেস করছি না। বিদেশী কোন লোক এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করছি। তা বলতে বাধা কি ? বিদেশী লোক—যার সঙ্গে তোদের কোনো সম্বন্ধ নেই—এমন কোনো লোক দেখেছিস এ গাঁয়ে ?

জবা ॥ বাবা, তুমি বিশ্বাস করছ না মেয়েকে !

নিধিরাম ॥ আমার গা ছুঁয়ে বলতে পারিস ?

জবা ॥ কেন পারব না ? [আগাইয়া আসিল]

নিধিরাম ॥ থাক্ থাক্, তবে ঠিক বলেছিস। টাকা-পয়সা খরচ করে কী যে সব স্পাই রেখেছি আমরা ! আমি রিপোর্ট করবো। আচ্ছা, তবে চলি। সব সাবধানে থাকিস।

[নিধিরাম যাইবার সময় ঘরের দিকে একবার তাকাইয়া গেল। জবার সতর্ক দৃষ্টি তাহা লক্ষ্য করিল। ঘোড়ার পদশব্দ মিলাইয়া গেলে রঞ্জন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।]

রঞ্জন ॥ জ্যাঠামশাইএর নাক ডাকছিল ! শুনতে পাওয়া গেছে নাকি ?

জবা ॥ তা আর যায় নি ! সর্বনাশ হ'ল !

রঞ্জন ॥ কিন্তু তোমার বাবা হয়তো শোনেননি। শুনলে কখনো চলে যেতেন না।

জবা ॥ চলে গেছেন দলবলকে নিয়ে আসতে। স্পাইদের কাছে হয়তো এ খবর পেয়েছেন—যাকে খুঁজছেন তাঁর হাতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র আছে।

রঞ্জন ॥ তা হ'লে জ্যাঠামশাইকে এখনি তুলতে হয়—সরিয়ে দিতে হয়।

জবা ॥ সরিয়ে দিলে হয়তো বাঘের মুখেই ঠেলে দেওয়া হবে। জানি না ওরা

কোথায় ওত পেতে বসে আছে। হয়তো কাছেই আছে। শুনেছ তো—স্পাইরাও সঙ্গে আছে। আমাদের আটঘাঁট পুলিশ নিশ্চয়ই জেনেছে। [খানিক নীরব থাকিয়া] ওঃ, আমি কি ভুল করেছি! কি ভুল করেছি রঞ্জন!

রঞ্জন ।। ভুল করেছ! তুমি! কি ভুল করেছ দিদি?

জবা ।। যতক্ষণ বাবা টের পাননি ততক্ষণ কোনো ভুল করিনি, কিন্তু বাবা যখন টের পেলেন—ভুলটা করেছি তখন।

রঞ্জন ।। বাপকে গুলী করে মারো নি—এই ভুলটা কি দিদি?

জবা ।। বাপকে গুলী করার মত ভুল আমি করতাম না রঞ্জন। গুলীর শব্দে পুলিশ বাহিনী ছুটে আসতো। শুধু বাপকে হারাতাম না—জ্যাঠামশাইকেও। না—না, সে ভুল নয় রঞ্জন।

রঞ্জন ।। তবে?

জবা ।। মা'র কাছে শুনেছি, প্রাণের ভালবাসা ছিল চিরকাল এই দুই ভাইএর মধ্যে। জ্যাঠামশাইও সে কথা বলেছেন কাল রাত্রে। বলেছেন, "তোর বাপের সঙ্গে যদি একটি বার দেখা হোতো, একটি চড়ে আমি ওর চাকরি ঘুচিয়ে দিতাম!" কতখানি ভালবাসা থাকলে এ কথা বলা চলে রঞ্জন! বাবা যখন টের পেলেন যে ঘরে কেউ রয়েছে—কেন আমি তখন বললাম না—"বাবা, সে তোমারই ভালবাসার দাদা।" হয়তো বা তা' হলে জ্যাঠামশাই বেঁচে যেতেন—বাবাকেও আমরা ফিরে পেতাম!

রঞ্জন ।। কিন্তু জ্যাঠামশাইএর পরিচয় বাবাকে তো এখনো দিতে পার জবাদি!

জবা ।। পারি—যদি তিনি একা আসেন—আশে পাশে তাঁর দলবল কেউ না থাকে। কিন্তু তা হবে না—তা হবে না রঞ্জন! তুমি যাও—তুমি যাও রঞ্জন,— জ্যাঠামশাইকে তোল, তৈরী হও।

[রঞ্জন ছুটিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। এদিকে মহাভারত একখানি হাত তুলিয়া জবাকে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল। জবা ছুটিয়া তাহার কাছে গেল। ওদিকে ঘরের ভিতরে রঞ্জন রামের ঘুম ভাঙ্গাইবার সাধনায় নিযুক্ত হইল। তাহার সশব্দ আভাস পাওয়া গেল।]

জবা ।। কি দাদু?

[মহাভারত ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠে কি বলিল তাহা অন্য কেহ না বুঝিলেও জবার বুঝতে বিলম্ব হইল না। জবা যথাসম্ভব তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিতে লাগিল।]

জবা ।। হ্যাঁ, বাবা চলে গেছে।···না, জ্যাঠামশাইকে ধরেনি।···হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই ঘুম থেকে উঠেছেন।···হ্যাঁ, খাবার এনে রেখেছি।···হ্যাঁ, পায়েস রেঁধে দেবো।···না, দেশ এখনো স্বাধীন হয়নি।···না না, মরলে চলবে না···হ্যাঁ, দেশ স্বাধীন হলেই জানাব।···হ্যাঁ, উইলের কথা সবাইকে বলেছি—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, [কাঁদিয়া ফেলিল] তোমাকে খাড়া করে দাঁড় করিয়েই আমরা পোড়াব।...আচ্ছা—আচ্ছা, আমিই তোমার মুখে আগুন দেবো।

[হঠাৎ বাহিরে হুইসিল বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির চারিদিক হইতেই পুলিশ গুলী বর্ষণ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, বাড়ি ঘেরাও হইয়াছে। একজন সশস্ত্র পুলিশ প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর হইতে নিক্ষিপ্ত একটি গুলী তাহাকে ভূপতিত করিল। তৎক্ষণাৎ আরও দুইজন সশস্ত্র পুলিশ বাহির হইতে সেখানে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু তাহারাও ভিতর হইতে নিক্ষিপ্ত অব্যর্থ গুলীতে ভূপতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে প্রথমে রাম ও তৎপরে রঞ্জন পলাইবার উদ্দেশ্যে প্রাঙ্গণের দরজার দিকে ছুটিল। সেই সময় নিধিরাম দেয়াল ঘেসিয়া সন্তর্পনে রিভলবার লইয়া প্রাঙ্গণের দিকে আসিতেছিল। রাম তাহাকে লক্ষ্য করিতেই গুলী করিতে যাইবে এমন সময় নিধিরাম চীৎকার করিয়া উঠিল।]

নিধিরাম ॥ দাদা! তুমি!

[তৎক্ষণাৎ ভাইকে চিনিতে পারিল। গুলি করিতে উদ্যত হাতটি রাম নামাইয়া নিল। সে আবেগে চীৎকার করিয়া নিধিরামকে জড়াইয়া ধরিল]

রাম ॥ নিধিরাম! ভাই! তুই!

[সঙ্গে সঙ্গে আহত এক পুলিশ উঠিয়া পশ্চাৎ হইতে রামকে ধরিয়া ফেলিল। রঞ্জন এই পুলিশটিকে গুলী করিবার সুযোগ পাইতেছে না এইজন্য যে, রামের সহিত তাহার ধস্তাধস্তি হইতেছে—গুলী করিলে হয়তো রামও মারা যাইতে পারে। এমন সময় ভূপতিত আরেকজন পুলিশের গুলীতে রঞ্জন ভূপতিত হইল। রাম ততক্ষণ বন্দী হইয়াছে এবং পুলিশ তাহার হাতে হাতকড়ি পরাইয়া দিয়াছে। এমন সময় এক অঘটন ঘটিল। নিধিরাম উন্মাদের মত তাহার পোশাক খুলিয়া ফেলিল এবং চীৎকার করিয়া উঠিল।]

নিধিরাম ॥ দাদা, আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি; এই শয়তানী নোকরী আমি ছেড়ে দিলাম!

রাম ॥ তবে চেঁচিয়ে বল্ নিধে—'দিল্লী চলো'—'চলো দিল্লী'—'জয়হিন্দ'!

নিধিরাম ॥ 'দিল্লী চলো', 'জয়হিন্দ'।

জবা ॥ 'দিল্লী চলো'—'জয়হিন্দ'!

[এমন সময় একজন পুলিশ অফিসার সদলবলে আসিয়া নিধিরামের সামনে রিভলবার উঁচাইয়া ধরিল এবং একজন কনষ্টেবল আসিয়া তাহার হাতে হাতকড়ি পরাইয়া দিল। "জয়হিন্দ"—"দিল্লী চলো" ধ্বনি করিতে করিতে রাম ও নিধিরাম পুলিশদের সহিত চলিয়া গেল। মহাভারত দারুণ উত্তেজনায় যতটা সম্ভব ঠেলিয়া উঠিয়াছে। সে তাহার কম্পমান দক্ষিণ হস্ত উর্ধ্বে তুলিয়া পুত্রদের আশীর্বাদ জানাইল। ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল।]

[যবনিকা পুনরায় উঠিলে দেখা গেল—মহাভারত পূর্ববৎ খাটিয়ায় শুইয়া আছে। প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা। পার্শ্বে রহিয়াছে শ্রীধর। শ্রীধর গাহিতেছে:]

শ্রীধর ॥ "সুরলোকে বেজে উঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।

উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়,
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।" —রবীন্দ্রনাথ

[বাহির হইতে জবা কিছু ফলমূল, দুধ এবং একখানি সংবাদপত্র হাতে লইয়া ত্বরিতপদে আসিয়া দাঁড়াইল।]

জবা ॥ [শ্রীধরকে] আছেন ?

শ্রীধর ॥ ব্যস্ত হোয়ো না। দুধ এনেছো ?

জবা ॥ এনেছি। এখনি ফুটিয়ে দিচ্ছি। কলকাতা থেকে কোন্ বড় নেতা আসছেন—গাঁয়ে সভা করবেন। সবাই আমাকে বলে—'তুমি থাকো, অভ্যর্থনা করতে হবে।' আমি বললাম—'দাদুর এখন-তখন, আমি পারব না,—যতবড় নেতাই আসুন —আমি পারব না। আজ কাগজে স্বাধীনতার কি খবর আছে শুনলাম। পড়তে পারিনি। আপনি বড় করে পড়ুন-না, আমি শুনি।

[কাগজখানি শ্রীধরের হাতে দিয়া জবা দুধ গরম করিবার কাজে লাগিয়া গেল। শ্রীধর পড়িতে লাগিল।]

শ্রীধর ॥ "১৯৪৬ সালের ২৪শে মার্চ অচল অবস্থার অবসানকল্পে বৃটেনের শ্রমিক-গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধিদল দিল্লী আসিয়া পৌঁছেন। ভবিষ্যৎ ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রায় সাড়ে-তিনমাস কাল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া তাঁহারা একটি প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটিতে গণ-পরিষদের মারফত রাষ্ট্রব্যবস্থা যে পর্যন্ত কার্যকরী না হয় সে পর্যন্ত দেশ-শাসনের কাজ সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দেরই দ্বারা গঠিত একটি অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার কথা বলা হয়। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কংগ্রেস কিন্তু সর্তাধীনে উহা গ্রহণ করে। অন্তবর্তী ব্যবস্থার ভার বৃটিশ-গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসের হাতে ছাড়িয়া দেয়।"

[জবা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল]

জবা ॥ 'জয়হিন্দ' ! 'জয়হিন্দ' ! দাদু, শোন—শোন—

[সে ছুটিয়া আসিয়া শ্রীধরের হাত হইতে কাগজটি একরূপ কাড়িয়াই লইল এবং মহাভারতের কাছে যাইয়া উত্তেজিতভাবে চীৎকার করিয়া পড়িতে লাগিল।]

"অন্তবর্তী গভর্নমেণ্টের ভাইস প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ৭ই সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লী হইতে বেতার যোগে ঘোষণা করেন—'বন্ধুগণ, ভারতের আজ একটি নূতন গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার উচ্চ শিখরে আরোহণের পথে ইহা একটি সোপান স্বরূপ।" দাদু ! দাদু ! তুমি শুনছো—স্বাধীনতার দুয়ারে আমরা পৌঁছেছি—স্বাধীনতার দুয়ারে আমরা পৌঁছেছি দাদু !

[কোন সাড়া না পাইয়া জবা গায়ে হাত দিয়া বুঝিল মহাভারতের প্রাণের উত্তাপ নাই। তৎক্ষণাৎ নাড়ী ধরিল—নাড়ী পাইল না। মুহূর্তে জবার সমস্ত আকুলতা স্তব্ধ হইয়া গেল।]

শ্রীধর ॥ জবা! তবে কি—!

জবা ॥ শেষ—সব শেষ—আমার সব শেষ।

[জবা ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বাহির হইতে কলিকাতার নেতাকে লইয়া এক শোভাযাত্রা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা মুহূর্তকাল এই দৃশ্য দাঁড়াইয়া দেখিল। স্থানীয় একজন বয়স্ক লোক শ্রীধরকে জিজ্ঞাসা করিল —]

জনৈক ॥ শ্রীধরদা। তবে কি— ?

জবা ॥ শেষ—সব শেষ।

নেতা ॥ সভা করতে এসেছিলাম। এ গাঁয়ের নেত্রী আপনি। আপনি কেন উপস্থিত থাকতে পারেননি, শুনলাম। শুনলাম আপনার দাদুর কথা। শুনলাম আপনাদের রাম-নিধিরাম-বলরামের কথা—মহাপ্রাণ আনন্দের কথা। তুলসীর কথা জানলাম, গঙ্গার কথা শুনলাম। শুনে মনে হ'ল, মহাভারত আর কোথায় ? এই তো আমাদের মহাভারত! স্বাধীনতার সৌধ রচনা করতে অস্থিদান করেছে কারা ? প্রতি গ্রামের এইসব মহাভারত আর তাদের গোষ্ঠী। হে স্বাধীনতাসংগ্রামের অখ্যাত, অজ্ঞাত মহান সৈনিক, আজ তোমার পুণ্য বেদীতলে আমরা প্রণাম করি। আশীর্বাদ কর, যে পতাকা তোমরা আজ আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেলে—আমরা যেন তার যোগ্য হই, তা বহন করার শক্তি পাই—স্বাধীনতা যেন সত্যিকার স্বাধীনতা হয়।

[সকলে মহাভারতের উদ্দেশ্যে নতজানু হইয়া প্রণাম জানাইল। ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল।]

সমাপ্ত

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Press Note, Calcutta.

U. N. 1124 (200) Pub, September 4, 1957

"MAHABHARATI"

West Bengal Government Drama Unit's Success

On an invitation from the Government of India, the Folk Entertainment Section of the West Bengal Government gave three shows of the Hindi version of Manmatha Ray's "Mahabharati" on the 24th and 25th August at New Delhi in connection with 1857 Contennial Celebration organised by the Song & Drama division, All India Radio. "Mahabharati" as is so at well known is a dramatic record of the common man's struggle for freedom in Bengal, right from 1857 to the transfer of power by the British to India hands in 1947. The Delhi Press and the public unanimously acclaimed the performance as an outstanding achievement. The Hindusthan Standard, New Delhi, wrote that it was more a piece of human document of history than a mere play" and added "the success of the drama owes to each and individual artiste's sincere efforts. To single out a few names would be invidious and unjust to the rest". The 'Hindusthan Times' comment was that "the acting was of a fairly high standard and aided by superb background music. Some of the climatic scenes attained rare dramatic intensity—at once lyrical and tragic". A third appreciation came from the Times of India and ran as follows —''Competency dripped from all over this play-from the writing, the directing and the acting. The script bore the impress of a seasoned dramatist who alone could handle the very ambitious theme, the saga of the Indian freedom movement over a period of forty years, phase by phase, campaign by campaign". The Statesman, New Delhi described the drama as "A Cavalcade in which we see, four generations of a Bengali village house fighting for the freedom of India. It has a tremendous cast biggest yet met in Delhi. It must make a grand entertainment in the villages'...

"এই ধরনের বিরাট পটভূমিকায় ইতিপূর্বে আর কোন সামাজিক নাটক-রচনার চেষ্টা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই এবং এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে নাট্যকারের প্রয়াস সার্থক হয়েছে।"—"**প্রবাসী**", চৈত্র, ১৩৬১

"নাট্যজগতে অজন্মার দিনে এমন একটি বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নাটকের যে মূল্য আছে, সে কথা অনস্বীকার্য। নাটকটি এমন ভাবে রচিত, দৃশ্যপটগুলির প্রবর্তনও এমনভাবে করা হয়েছে যাতে সাধারণ রঙ্গমঞ্চেই শুধু নয় শৌখিন রঙ্গমঞ্চেও এ নাটকের অভিনয় করার পক্ষে কোন বাধা নেই।"—"দেশ"

The Folk Entertainment Section of the West Bengal Government's Directorate of Publicity deserves congratulation on the Production of "Mahabharati" a Playlet depicting the different phases of India's struggle for freedom and conceived as a tribute to the unkown martyrs to the great cause. Stamped with the genius of the well-known dramatist, Sri Manmatha Roy who has written the drama and the musician Sri Pankaj Kumar Mallick who has produced the play and set tunes to the songs, this has a special importance and significance as a production directly under the auspices of the State Government. In a sense it is free India's gratefull tribute to the unknown martyrs who served the country with selfless devotion and fell in the battle in order to make the country free. Quite appropriately a leaf has been taken out of the history of Contai in the district of Midnapore. But the Official enterprise shuld not end at that. This is a play which we would like to be shown in every village in West Bengal. The State Government should in any case make special arrangement whithout consideration of expenditure to show this play in the villages of Midnapore where the intrinsic merits of the production reinforced by the local appeal will receive the widest appreciation.

(Editorial comments in the "Hindusthan Standard" dated the 18th August, 1955.)

ধর্মঘট

বাংলার নাট্যজগতের

"মহর্ষি"

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

পুণ্যস্মৃতির বেদীমূলে

শ্রদ্ধার্ঘ

মন্মথ রায়

মহালয়া ঃ

১৩৬৩

২২৯সি, বিবেকানন্দ রোড

কলিকাতা-৬

ধর্মঘট

প্রথম প্রকাশঃ বঙ্গশ্রী (মাসিকপত্র) মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র
১৩৩০
প্রথম অভিনয়ঃ বহুরূপী ; রংমহল, ৯/১২/১৯৫৩

প্রথম দৃশ্য

[কলিকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরের প্রান্তভাগে 'রাজছত্র লিমিটেড' নামক ছাতা ও ওয়াটার প্রুফের কারখানা অঞ্চলে রাজছত্র লিমিটেডের ক্লাব-ভবন—"মিলন-মন্দির"স্থ সভা কক্ষ। কক্ষটি প্রশস্ত। মধ্যভাগে একটি মঞ্চ রহিয়াছে। মঞ্চের উপর খানকয়েক চেয়ার রহিয়াছে এবং নীচে দুই পাশে বহু ফোল্ডিং চেয়ার সাজানো রহিয়াছে। কক্ষের বড় বড় জানালাগুলি উন্মুক্ত। প্রাচীর-গাত্রে ছাতা ও ওয়াটার-প্রুফের রঙ-বেরঙের নানা পোষ্টার শোভা পাইতেছে। কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান দীনবন্ধু চৌধুরীর তৈলচিত্র এবং গান্ধী, জহরলাল, সুভাষচন্দ্রের সুদৃশ্য ছবি টাঙানো রহিয়াছে। একটি প্ল্যাকার্ডে "সত্যমেব জয়তে"—নীতিবাক্য দেওয়াল-গাত্রে শোভা পাইতেছে। একটি বড় দেওয়াল-ঘড়ি সময় নির্দেশ করিতেছে।

১৯৫৩ সালের জুলাই মাসের এক সন্ধ্যারাত্রে এই সভাকক্ষে কোম্পানীর শ্রমিক সংঘের কার্য্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ এবং কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ একটি গুরুতর বিষয়ে আলোচনা-রত।

মঞ্চের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছেন—কোম্পানীর চেয়ারম্যান—দীনবন্ধু চৌধুরী, ফ্যাক্টরীম্যানেজার—লোহারাম দাস, লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার—সুমঙ্গল সেন এবং আরো দুই একজন প্রধান কর্মচারী। মঞ্চের নিম্নে শ্রমিক সংঘের কার্য্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ওয়াটারপ্রুফ বিভাগের হেডমেকানিক্—জনার্দন দত্ত, ছাতা বিভাগের হেডমেকানিক—মহম্মদ ইব্রাহিম, ইব্রাহিমের পুত্র—লাল মিঞা, শ্রমিক সর্দার—হারাণ দাস, আকবর মিঞা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মিলন-মন্দির ক্লাব-ভবনের তত্বাবধায়ক(care-taker) মহম্মদ উইলিয়াম নটবর গোস্বামী মঞ্চের নিম্নে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ একটু অদ্ভুত ধরণের, হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টান—এই তিন ধর্মেরই ছাপ তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদে প্রতিভাত।]

শ্রমিক সদস্যগণ॥ [একযোগে]

—"এ সব কথা আমরা জানি, কিন্তু ছাঁটাই করা চলবে না।"

—"কাজকর্মের অবস্থা ভালো নয়, এতো চিরকালের বুলি—চিরকালই শুনছি।"

—"যুদ্ধের বাজারে যখন লাখ-লাখ টাকা লাভ করেছেন, সেই অনুপাতে কি আমাদের মাইনে বেড়েছিল ? তবে ?"

—"আমাদের এক কথা,—ছাঁটাই করা চলবে না, চলবে না।"

দীনবন্ধু চৌধুরী [চেয়ারম্যান]॥ অর্ডার ! অর্ডার !! চেঁচামেচি করলে কোনো আলোচনা চলে না। [গোলমাল থামিল।] তোমরা যাঁর তত্বাবধানে কাজ কর, যিনি কোম্পানীর অবস্থা এবং তোমাদের অবস্থা সবই জানেন,—ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার শ্রীলোহারাম দাস, তিনি কি বলেন—তোমরা স্থির হ'য়ে শোনো। মিষ্টার দাস—

লোহারাম দাস॥ মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং আমার প্রিয় সহকর্মিগণ ! আমাদের এই কোম্পানীর নামটা কি ? রাজছত্র লিমিটেড। বিবেচনা করুন, ছাতা আর ওয়াটারপ্রুফ তৈরীর ব্যবসায়ে একদিন আমাদের একচ্ছত্র আধিপত্যই ছিল। বিবেচনা করুন, এ ব্যবসায়ে রাজছত্র আমরাই এককালে ধারণ করেছি ! কিন্তু গেল বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ব্যাঙের ছাতার মতোই অলি-গলিতেও গজিয়ে গেল সব ছাতার কোম্পানী। বিবেচনা করুন, তখন থেকেই সুরু হয়েছে আমাদের দুর্দশা। বিবেচনা করুন, যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক সংকটও এসে গেছে এদেশে। বিবেচনা করুন, দেশের লোকের ক্রয় ক্ষমতা কী সাংঘাতিক ভাবে কমে গেছে !

ইব্রাহিম॥ জানি স্যার, এসব কথা বলবেন জানি। কিন্তু যুদ্ধের সময় যে লাখ লাখ টাকা মুনাফা হয়েছে, সেটাও বিবেচনা করুন।

জনার্দন॥ সে অনুপাতে আমাদের বেতন আর ভাতা কোম্পানী বাড়াবার কথা বিবেচনা করেননি।

লালমিঞা॥ হিয়ার, হিয়ার।

লোহারাম॥ কিন্তু কোম্পানী বলেন, যুদ্ধের পর থেকে এ কয়েক বছর ক্রমাগত যে লোকসান হয়েছে, সে লোকসান কোম্পানী মুখ বুঁজে ঘাড় পেতে সয়ে গেছেন। বিবেচনা করুন, আপনাদের বেতন বা ভাতা সে জন্য কিছু কমাননি।

ইব্রাহিম॥ সে কথা মানছি। কিন্তু লড়াই এর বাজারে লাভ এতো করেছেন যে, দুধ তো দূরের কথা, এখনো জলেই হাত পড়েনি। না, না, ও ছাঁটাই-টাটাই চলবে না।

শ্রমিকগণ॥ [ঘন ঘন করতালি] ঠিক, ঠিক। হিয়ার ! হিয়ার !

সুমঙ্গল সেন॥ [লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার] [চেয়ারম্যানের প্রতি] স্যার আমি দু' একটা কথা বলতে পারি ?

দীনবন্ধু॥ অর্ডার ! অর্ডার !! [গোলমাল থামিল] তোমাদের শ্রমিককল্যাণ কর্তা শ্রীসুমঙ্গল সেন কিছু বলতে চান, শোনো। বলুন মিষ্টার সেন—

সুমঙ্গল॥ লোকসানের বছরেও কোম্পানী বেতন আর ভাতা কমাননি। বরং আমি বলবো, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সেটা বেড়েছে।

শ্রমিকগণ॥ [ব্যঙ্গহাস্য করিয়া] হাঃ হাঃ হাঃ !

কোন কোন শ্রমিক ॥ [ব্যঙ্গ সহকারে] বলুন, বলুন। প্রাণ যা চায় বলুন।

লালমিঞা ॥ হ্যাঁ, মুখের ওপর তো আর ট্যাক্সো নেই। বলুন—

সুমঙ্গল ॥ হ্যাঁ বলবো। কেন বলবো না? এই যে "মিলন-মন্দির"—যে ক্লাবঘরে বসে আপনারা সভা করছেন,—এতোবড় এই বিল্ডিংটা—একটা কলোনী করে দিয়ে তাতে আপনাদের বসবাসের জন্যে কোয়ার্টার ক'রে দেওয়া হ'য়েছে—সেটা—

লালমিঞা ॥ হ্যাঁ, কতকগুলো পায়রার খোপ। [শ্রমিকদের হাসি]

সুমঙ্গল ॥ তবু মাথা গোঁজবার ঠাঁই—আজকাল লোকে যা পায়না—তাছাড়া ধর্মকর্মের জন্যে কলোনীতে একটা মন্দির, একটা মসজিদ—ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া শেখাবার জন্যে একটা ফ্রী প্রাইমারি স্কুল—নিরক্ষর বয়স্কদের জন্যে একটা Adult Education Centre—একটা দাতব্য ডাক্তারখানা।

লালমিঞা ॥ হোমিওপ্যাথিক! [সকলে হাসিয়া ওঠে]

সুমঙ্গল ॥ এ সব কোম্পানী নিজের খরচায় গড়ে দেননি?—যার সুখ সুবিধা আপনারা ষোলআনা ভোগ করছেন।

হারাণ ॥ তা' অবিশ্যি দিয়েছেন। কিন্তু প্রসূতি সদনটা? কদ্দিন থেকে আমরা চাইছি। কোম্পানী স্পষ্ট 'না' বলে দিয়েছে। কোম্পানী চান না যে, আমাদের ছেলে-মেয়ে ভালোভাবে হোক। কোম্পানীর মতলব শ্রমিকের বাচ্চাগুলো আঁতুড়েই শেষ হয়ে যাক।

লালমিঞা ॥ সেম্! সেম্!!

হারাণ ॥ কিন্তু শকুনের শাপে গরু মরে না। আমাদের বাচ্চারাও মরবে না। আমরা নিজেরাই প্রসূতিসদন গড়ে তুলবো। আমাদের ইব্রাহিম সর্দারের সোণার চাঁদ ছেলে—এই লালমিঞা, সেজন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে "মহুয়া" পালা গানের টিকিট বিক্রী করে টাকা তুলছে। শ্রমিকের বংশবৃদ্ধি ধনিক রোধ করতে পারবে না—পারবে না।

জনার্দন ॥ আঃ থামো হারাণ। এ সব বাজে কথা রাখো। আমাদের দাবী—কোন ক্রমেই ছাঁটাই করা চলবে না। একজন শ্রমিকও যদি ছাঁটাই হয়, তাহলে ধর্মঘট করবো।

সকলে ॥ আমরা ধর্মঘট করবো—আমরা ধর্মঘট করবো।

[দীনবন্ধু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।]

দীনবন্ধু ॥ অর্ডার! অর্ডার! [গোলমাল থামিল] এবার আমি কিছু বলতে চাই,—তোমরা স্থির হয়ে শোন। আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে সামান্য মূলধন নিয়ে আমি দীনবন্ধু চৌধুরী একা ছাতা তৈরী ব্যবসাতে নেমেছিলাম। সেদিন যে সব শ্রমিকরা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, আনন্দের কথা—আজও তাদের প্রায় সকলেই আমার সঙ্গেই আছে। শুধু আছে বলবো না, কোম্পানীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। যে ছিল সামান্য

শ্রমিক, সে হয়েছে আজ এক এক বিভাগের মাথা। যেমন—ওয়াটারপ্রুফ বিভাগের হেড মেকানিক্ ওই জনার্দন দত্ত, ছাতা তৈরী বিভাগের হেড মেকানিক্ ওই মহম্মদ ইব্রাহিম। এ কথা খুবই সত্য, এতোকাল আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ সহযোগিতা ছিল বলেই এতো ঝড়-ঝাপটা সয়েও আজও আমরা টিঁকে আছি। একথা আমি ভুলবো না,—ভুলতে পারিনা। কিন্তু কোম্পানীর সামনে আজ চরম সংকট এসে দাঁড়িয়েছে। আয়-ব্যয়ের ছাপানো হিসাব তোমরা দেখেছো। বছরের পর বছর লোকসান সয়েও আমরা আজ পর্যন্ত একজন শ্রমিকও ছাঁটাই করিনি, যখন কারখানায় কারখানায় ছাঁটাই হচ্ছে অথবা হবে ঠিক হয়েছে।

আকবর ॥ চেয়ারম্যান সাহেবের জয় হোক্। দোহাই আপনার, আপনি ছাঁটাই করবেন না। বাল বাচ্চা নিয়ে আমরা তবে কী খাবো? কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো?

দীনবন্ধু ॥ আমি জানি, আমি বুঝি। আমারও বালবাচ্চা আছে। কিন্তু উপায় কী? যে ছাতা, যে বর্ষাতি গুদামে এখনো মজুত রয়েছে,—বাজারে আজ যা' চাহিদা তা' দুবছরেও কাটবে কিনা সন্দেহ। নতুন অর্ডার পাচ্ছি না। কোম্পানীর অস্তিত্ব রক্ষা করাই আজ দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু ছাঁটাই করে কোম্পানীটাকে ধরে রাখা যায় কিনা আমরা সেই কথাই ভাবছিলাম। কোম্পানী উঠে গেলে সবই গেল।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল ইব্রাহিম।]

ইব্রাহিম ॥ কোম্পানী যদি উঠে যায়, আমরাও যাবো। একসঙ্গে শুরু করেছিলাম, এক সঙ্গেই শেষ হবো।

জনার্দন ॥ যদি যাই, সব একসঙ্গেই যাবো। ছাঁটাই চলবে না।

সকলেই ॥ হ্যাঁ, ছাঁটাই চলবে না।

দীনবন্ধু ॥ বেশ, আরো বছরখানেক হয়তো আমরা লড়তে পারি যদি তোমরা সকলে আর একটু বেশী মেহনৎ কর, ছাতা তৈরী, ওয়াটার প্রুফ তৈরী ছাড়াও যদি আর একটা কাজ হাতে নাও।

আকবর ও হারাণ ॥ আমরা নেবো, আমরা নেবো।

জনার্দন ॥ কী কাজ?

দীনবন্ধু ॥ দশহাজার লাঠি—বাঁশের লাঠি!

শ্রমিকগণ ॥ [সবিস্ময়ে] লাঠি!

দীনবন্ধু ॥ হ্যাঁ, ছাতার বাঁট তৈরী করার জন্যে বাঁশের কারবার তো আমাদের আছেই। কাজেই দশহাজার লাঠির অর্ডার সাপ্লাই করা আমাদের পক্ষে খুব দুঃসাধ্য নয়।

ইব্রাহিম ॥ দশহাজার লাঠির অর্ডার! কার?

দীনবন্ধু ॥ চুক্তি আছে—সেটা গোপন থাকবে।

ইব্রাহিম ॥ পুলিশের লাঠি,—কী বলুন স্যার?

লালমিঞা ॥ শ্রমিক ঠ্যাঙাবার দাওয়াই নয় তো?

দীনবন্ধু ॥ এ সব কথা উঠছে না, ওঠা উচিতও নয়। কার অর্ডার তা' নিয়ে তোমাদের এতো মাথাব্যথা কেন?

জনৈক শ্রমিক ॥ মাথাটা ফাটবার ভয় আছে কিনা স্যার।

[সকলে হাসিয়া উঠিল।]

দীনবন্ধু ॥ অর্ডার! অর্ডার!

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, যখন জীবন-মরণের কথা হচ্ছে, তখন আমাদের এ হাসাহাসিটা শোভা পায়না।

সুমঙ্গল ॥ এই অর্ডার সাপ্লাই করার ওপরেই ছাঁটাইএর প্রশ্ন নির্ভর করছে। এটা হাস্য-পরিহাসের বিষয় নয়। শ্রমিক-মঙ্গল এর সঙ্গে জড়িত।

জনার্দন ॥ [শ্রমিকদের প্রতি] তোমরা থামো। [চেয়ারম্যানের প্রতি] আপনি বলুন।

দীনবন্ধু ॥ এই দশহাজার বাঁশের লাঠি এক মাসের মধ্যে সাপ্লাই দিতে হবে। এতো অল্প সময়ের মধ্যে এতো মাল তৈরী করতে গেলে তোমাদের হপ্তায় ৪৫ ঘণ্টার বদলে ৪৮ ঘণ্টা কাজ করতে হবে।

জনার্দন ॥ ৪৫ ঘণ্টার জায়গায় ৪৮ ঘণ্টা?

দীনবন্ধু ॥ হ্যাঁ, তা না হলে কণ্ট্রাক্ট বাতিল হয়ে যাবে। ভুলো না, তোমাদের নিয়ে আমাদের টিঁকে থাকতে হলে এই অর্ডার সাপ্লাই কোম্পানীর অপরিহার্য। ছাঁটাই করা না করা এখন তোমাদের ওপরেই নির্ভর করছে।

ইব্রাহিম ॥ এই বাড়তি ঘণ্টার জন্যে আমরা বাড়তি মজুরী পাবোতো?

দীনবন্ধু ॥ না, কোম্পানীর বর্তমান অবস্থায় বাড়তি মজুরী দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

জনার্দন ॥ বাড়তি কাজ করবো, অথচ বাড়তি মজুরী পাবো না?

দীনবন্ধু ॥ অবশ্য ছাঁটাই করে সেটা দেওয়া যেতে পারে।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা।

দীনবন্ধু ॥ এখন তোমাদের সামনে এই দুটো পথ খোলা রয়েছে,—হয় ছাঁটাই, না হয় বাড়তি মজুরী ছাড়া বাড়তি কাজ। এর যে-কোনো একটা তোমরা বেছে নাও।

হারাণ ॥ ছাঁটাইএর চেয়ে বাড়তি কাজটাই ভালো। নাইবা পেলুম বাড়তি মজুরী। চাকরীটাতো থাকবে।

আকবর ॥ তা বটে! তা বটে!

ইব্রাহিম ॥ না, তা' হ'বে না। ওই দুটোর কোনটাই চলবে না। ছাঁটাইএর ভয় দেখিয়ে বাড়তি কাজ করিয়ে নিয়ে বাড়তি মজুরী না দেবার মালিকদের এটা একটা ফিকির—এ আমরা বুঝি।

লালমিঞা ॥ সেম্! সেম্!

দীনবন্ধু ॥ অর্ডার! অর্ডার! আমার যা বলবার—বলেছি। এবার তোমাদের যা' বলবার আছে, তোমাদের ইউনিয়নের তরফ থেকে আমাকে লিখিতভাবে আজই

জানিয়ে দাও। কাল কলকাতায় আমাদের বোর্ডের মিটিং-এ সেটা আলোচনা করা হবে।

জনার্দন ॥ বেশ, তাই আমরা জানাবো। খেলার মাঠে আমাদেরও শ্রমিক জমায়েৎ হয়েছে আজ। আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে তারা। আপনাদের বক্তব্য আমরা সেখানে গিয়ে পেশ করছি। আমাদের সাধারণ সভায় যা সিদ্ধান্ত হয়, আপনাকে লিখিত-ভাবেই তা' জানাচ্ছি। কোথায় জানাবো ?

দীনবন্ধু ॥ [লোহারামের প্রতি] মিলন-মন্দিরে আজ আর কী কী প্রোগ্রাম আছে ? কেয়ার-টেকার কোথায় ?

[মহম্মদ উইলিয়াম নটবর গোস্বামী ছুঠিয়া আসিল। দেহটিকে Right angle এ সন্নিবেশ করিয়া হাত দুইখানি সম্মুখে সমান্তরালে প্রসারিত করিয়া চেয়ারম্যানকে অভিবাদন জানাইয়া স্প্রীংয়ের পুতুলের মতো চট্ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।]

নটবর ॥ ইয়েস্ স্যার !

দীনবন্ধু ॥ [লোহারামের প্রতি] ইনি কে ?

লোহারাম ॥ আমাদের নতুন কেয়ার-টেকার—নটবর গোস্বামী।

দীনবন্ধু ॥ গোস্বামীর এই চেহারা ?

নটবর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, ও গোস্বামীও বলতে পারেন—উইলিয়ামও বলতে পারেন—আবার মহম্মদও বলতে পারেন।

লালমিঞা ॥ যাকে বলে সর্বধর্ম-সমন্বয় স্যার। [হাসি]

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, নামে কী আসে যায় ? লোকটি কাজে খুব ভালো। এই অল্প সময়ের মধ্যে—বিবেচনা করুন, এই মিলন-মন্দিরের অনেক উন্নতি করে দিয়েছেন—বলুন মিষ্টার গোস্বামী, মিলন-মন্দিরে আজ আর কী কী প্রোগ্রাম আছে। সায়েব জানতে চাইছেন।

নটবর ॥ এই সভা ভাঙলেই এখানে হবে "মহুয়া" পালা-গানের ড্রেস রিহার্সাল।

দীনবন্ধু ॥ সেটা আবার কী ? কারা করছে ?

লালমিঞা ॥ পালাগানটা করছি আমরা—শ্রমিকদেরই ছেলে-মেয়েরা। যে প্রসূতি-সদন আপনাদেরই তৈরী করে দেওয়া উচিত ছিল স্যার,—অথচ দিলেন না, সেই প্রসূতি-সদন গড়ে তোলবার জন্যে আমরা এই অভিনয়ের আয়োজন করেছি। শহরের ভদ্রলোকদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য জানিয়ে আমরা টিকিট বিক্রী করেছি। সকলে একবাক্যে আমাদের সাধুবাদ করেছেন আর আপনাদের দিয়েছেন ধিক্কার।

দীনবন্ধু ॥ তা দিন। তবুও আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, তাঁরা এমন একটা সৎকার্যের জন্যে টিকিট কিনে অর্থ সাহায্য করেছেন। কোম্পানীর তরফ থেকে আমরা এ বিষয়ে কিছু করতে পারিনি বলে আমি বিশেষ দুঃখিত। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে একশো টাকার একখানা টিকিট কিনছি।

লালমিঞা ॥ সেতো আমরা আপনাকে দিতে পারবো না স্যার।

দীনবন্ধু ॥ কেন?

লালমিঞা ॥ পাঁচ টাকার বেশী আমাদের টিকিট নেই।

দীনবন্ধু ॥ ও—তা একশো টাকায় যে ক'খানা হয় তাই দিও।

লোহারাম ॥ Donation আর কি—সাহেব Donation দিচ্ছেন।

দীনবন্ধু ॥ হ্যাঁ। [নটবরের প্রতি] তারপর—মিষ্টার মহম্মদ উইলিয়াম নটবর গোস্বামী? এই রিহার্সালের পর এখানে আর কী প্রোগ্রাম?

নটবর ॥ আজ আর কিছু নেই স্যার।

দীনবন্ধু ॥ [লোহারামের প্রতি] বেশ তৎক্ষণে তোমাদের ডিনার-পার্টিও বোধ হয় শেষ হয়ে যাবে—কী বল দাস?

লোহারাম ॥ হ্যাঁ স্যার, তা হবে।

দীনবন্ধু ॥ [শ্রমিকদের প্রতি] পালাগানের রিহার্সালের পর আবার আমরা এই "মিলন-মন্দিরে"ই সমবেত হবো এবং আশা করি তোমাদের কাছ থেকে যে উত্তর পাবো, তাতে আমাদের মিলনের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হবে। এখনকার মতো সভা ভঙ্গ।

[সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। কর্তৃপক্ষ মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। শ্রমিকগণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া আলাপ করিতে করিতে চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে হারাণ লালমিঞাকে বলিল—]

হারাণ ॥ কী হে লালমিঞা, দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাবে না? এসো।

লালমিঞা ॥ [চেয়ারম্যানকে দেখাইয়া] একশো টাকা দেবেন বলেছেন।

হারাণ ॥ তা যখন বলেছেন ও তো পেয়েই গেছো।

লালমিঞা ॥ না, ওরকম অনেকেই বলেন—কিন্তু দেন না, তাই দাঁড়িয়ে আছি। আপনারা যান না—মিটিং করুন। আমরা হচ্ছি গিয়ে সব soldiers—যা হুকুম হবে, তামিল করবো।

হারাণ ॥ ও—আচ্ছা।

[হারাণ চলিয়া গেল। কর্তৃপক্ষ ততক্ষণে নীচে অবতরণ করিয়াছেন। দীনবন্ধু ও লোহারাম ব্যতীত তাহারাও চলিয়া গেলেন। লালমিঞা দীনবন্ধুর সামনে গিয়া টিকিটের খাতা পকেট হইতে বাহির করিল।]

লালমিঞা ॥ একশো টাকার একখানা টিকিট নেবেন বলেছিলেন স্যার।

দীনবন্ধু ॥ [লোহারামকে] মিষ্টার দাস, আমার একাউন্ট থেকে টাকাটা দিয়ে দেবেন। [লালমিঞার নিকট হইতে টিকিটটি লইয়া] মহুয়া! ব্যাপারটি কী বল তো? কার লেখা—বঙ্কিম বাবুর? না শরৎ চাটুজ্যের?

লালমিঞা ॥ আজ্ঞে না। ওরা তখনও জন্মাননি। সাড়ে তিন শো বছর আগে পূর্ববঙ্গের দ্বিজ কানাই নামে এক পল্লী-কবি এই "মহুয়া" পালাটা লেখেন। হুমড়া নামে এক বেদে দল-বল নিয়ে নদেরচাঁদ নামে এক ব্রাহ্মণ জমিদারের বাড়ি খেলা

দেখাতে আসে। হুমড়ার পালিত কন্যা মহুয়ার খেলা দেখে নদেরচাঁদ মহুয়াকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে যায়।

দীনবন্ধু ॥ Very interesting! বিয়ে হলো?

নালমিঞা ॥ না স্যার। মহুয়া রাজী হলো, কিন্তু হুমড়া বেঁকে বসলো। বললে,—বেদে—বেদে, ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ। তেলে-জলে কখনো মিশ খায় না।

দীনবন্ধু ॥ That's right!

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, হিন্দু-মুসলমান আর কি। কিন্তু স্যার, পার্টিতে যাবার সময় হয়ে এলো।

দীনবন্ধু ॥ আচ্ছা যদি কখনও সময় করতে পারি, তোমাদের পালাগান শুনতে আসবো। হ্যাঁ, তোমাদের পালাগানটা কবে?

লালমিঞা ॥ পরশু, রবিবার।

দীনবন্ধু ॥ আচ্ছা, আসবো আসবো—

লালমিঞা ॥ ভুলবেন না স্যার। আচ্ছা—আদাব! কেয়ারটেকার স্যার—

নটবর ॥ [কাছে ছুটিয়া আসিয়া] বলুন স্যার, বলুন।

লালমিঞা ॥ আজ আমাদের পোষাক পরে রিহার্সাল হবে। লাইটগুলো সব ঠিক আছে তো?

নটবর ॥ সে আর বলতে হবে না স্যার। সে যা করেছি, তাক্ লাগিয়ে দেবো।

লালমিঞা ॥ তাক্ দুভাবেই লাগাতে পারেন—কিছু করে অথবা কিছু না করে। দেখা যাক্।

[লালমিঞা মঞ্চের পার্শ্বে অবস্থিত কক্ষের অভিমুখে চলিয়া গেল। দীনবন্ধু দেওয়ালের ছবি ও পোষ্টারগুলি দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন। নটবর খুব উৎসাহী ও তৎপর হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি দীনবন্ধুর নিকটে গেল।]

দীনবন্ধু ॥ [নটবরের প্রতি] এই সব ছবি-টবি আগে ছিল না! কিন্তু এ বেশ হয়েছে।

নটবর ॥ আমার এরকম অনেক পরিকল্পনা আছে স্যার। একটা পোষ্টার করাচ্ছি যে, ছাতা যে কেবল রোদ আর বৃষ্টি থেকে বাঁচায়, তা নয়—পাওনাদারও ঠেকায়। হ্যাঁ, এক সময় আমাকেও ঠেকিয়েছে।

দীনবন্ধু ॥ বেশ, বেশ। এতো নতুন idea হে, নতুন angle থেকে।

নটবর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, এ সব আপনাকে দেখতে হবে না। দেখবেন, রাজছত্র কোম্পানীর গৌরবময় গোটা ইতিহাসটাই আমি ছবিতে আর চার্টে ঝুলিয়ে দেবো স্যার।

দীনবন্ধু ॥ বেশ, বেশ! কিন্তু আপনার এই গৌরবময় নামটির ইতিহাসটা কী বলুন দেখি, শুনি।

নটবর ॥ মানে স্যার, সাত ঘাটের জল খেয়েছি। দস্তুরমতো একটা করুণ কাহিনী।

দীনবন্ধু ॥ বটে ?

নটবর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

দীনবন্ধু ॥ শুনতে পাই ?

নটবর ॥ নিশ্চয় স্যার। বৈরাগীর ঘরে জন্মেছিলাম। বড় গরীব ছিলাম, কিন্তু খুব ভালো কীর্তন গাইতে পারতাম। একদিন এক মিশনারী সাহেব আমার গান শুনে মোহিত হয়ে আমায় ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর চার্চে।

দীনবন্ধু ॥ ছিলেন বৈরাগী,—হলেন খৃষ্টান ?

নটবর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। ছিলাম নটবর বৈরাগী,—হয়ে গেলাম উইলিয়াম। ভাত কাপড়ের দুঃখ ঘুচলো। বেশ ভালোই ছিলাম। কিন্তু তারপর—[মাথা নিচু করিল]

দীনবন্ধু ॥ হ্যাঁ, তারপর ? থামলেন যে ?

নটবর ॥ তারপর—মানে—বয়স যখন একটু বাড়লো—তখন—মানে—[লোহারামের প্রতি] আপনি তো জানেন, আপনিই বলুন স্যার।

লোহারাম ॥ তারপর একটু কেলেঙ্কারী ব্যাপার—মানে, বিবেচনা করুন স্যার, একটি মুসলমান বিধবার প্রণয়াসক্ত হয়ে—বিবেচনা করুন, মুসলমান হ'তেই হলো।

দীনবন্ধু ॥ বিধবার প্রণয়াসক্ত !

নটবর ॥ না, না, বিয়ে হলো স্যার।

দীনবন্ধু ॥ [হাসিয়া উঠিয়া] ও-আচ্ছা, আচ্ছা, তা' হলেন মহম্মদ। তা' মহম্মদ হলো—উইলিয়াম হলো—এখন বাকী থাকলো গোস্বামী ! তা—তারপর ?

নটবর ॥ তারপর স্যার, এলো ছে'চল্লিশের হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা। আমাদেরই এক হিন্দু চাকর,—যাকে আমরা ছেলের মত মানুষ করেছিলাম, ছেলের মতই দেখতাম, সে কিনা আমার চোখের সামনে আমার বিবিকে কচুকাটা করলো দলবল ডেকে এনে ! ধন-সম্পত্তি যা ছিল, সব লুট হলো। আমি শুদ্ধি হ'য়ে কোনমতে প্রাণে বেঁচে গেলাম,—হয়ে গেলাম গোস্বামী। হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া একবার বাঁধলে,—আমি দেখেছি, কারুর কোন জ্ঞান থাকে না স্যার। দয়া, মায়া, ভালবাসা সব চলে যায়। সবাই পশু হ'য়ে যায়।

দীনবন্ধু ॥ [একটি নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়া] ঠিক, ঠিক ! তুমি ঠিক বলেছো। ইংরেজ এই ঝগড়াটা চালু রেখেই এতোকাল রাজত্ব করতে পেরেছিল।

[ইতিমধ্যে মহুয়ার সাজে সজ্জিতা মায়া এবং নদেরচাঁদের সাজে সজ্জিত লালমিঞা পার্শ্বকক্ষ হইতে বাহির হইয়া দীনবন্ধুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উহাদের দেখিয়া দীনবন্ধু বলিলেন]—

দীনবন্ধু ॥ ও বাবা ! এরা আবার কারা ?

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, চিনতে পারছেন না স্যার ? লালমিঞা—নদেরচাঁদ সেজেছে। আর এ হলো গিয়ে মায়া, আমাদের ওয়াটারপ্রুফ ডিপার্টমেণ্টের হেড মেকানিক জনার্দন দত্তের মেয়ে—মহুয়া সেজেছে।

দীনবন্ধু ॥ বা: ? বেশ তো !

[মায়া নমস্কার করিল]

লালমিঞা ॥ আমাদের পালাগান শুনতে সময় করে আসবেন—এ ভরসা আমরা রাখি না। পোষাক পরেই এখনি আমরা রিহার্সাল দেবো। দলের সবাই তাই বলছে, যদি সময় করে আজই দেখে যেতেন, একশো টাকার টিকিটটার অন্ততঃ কিছু উশুল হতো।

দীনবন্ধু ॥ অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আজ কিছুতেই পারছি না। আসবো—প্লের দিন আমি নিশ্চয়ই আসবো।

লালমিঞা ॥ সেই ভালো স্যার। এসো মায়া—

দীনবন্ধু ॥ এখানকার মেয়েরা দেখছি বেশ ফরওয়ার্ড !

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, সবাই নয়। তবে হ্যাঁ, ওই মেয়েটি একটু বেশী-রকম ফরওয়ার্ড। মানে, বাপের শাসন নেই। বিবেচনা করুন, এ জন্যে অনেক কেলেঙ্কারীও হচ্ছে—মানে, ঐ লালমিঞার সঙ্গে।

দীনবন্ধু ॥ বিয়ে-টিয়ে হবে নাকি ?

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, ওদের দুজনের যেরকম মেলা-মেশা,—আর কানা-ঘুষো যা' শুনি, বিয়ে বোধ হয় হয়েই গেছে,—তবে গোপনে।

দীনবন্ধু ॥ কেন, গোপনে কেন ?

লোহারাম ॥ জনার্দন লোকটা ভারী গোঁড়া—সইবে না। বিবেচনা করুন, প্রকাশ হলে শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানে একটা দাঙ্গা বেধে যেতে পারে।

দীনবন্ধু ॥ দাঙ্গা ? বটে ! মারামারি ! কাটাকাটি ! রক্তারক্তি !

[দীনবন্ধুর মুখে ভাবান্তর দেখা গেল]

নটবর ॥ হ্যাঁ স্যার। আপনাকে তো বলছিলাম, তখন আর কোন জ্ঞান থাকে না,—সব পশু হয়ে যায় !

দীনবন্ধু ॥ আমি জানি—আমি জানি। সবাই জানে কিন্তু মজা এই,—কথাটা আবার সব সময়ে মনে থাকে না। চল দাস—ও হ্যাঁ, আমার ব্যাগ আর ওয়াটারপ্রুফটা ?

নটবর ॥ আমি নিচ্ছি স্যার।

[মঞ্চের উপর টেবিলে জিনিষ দুইটি ছিল। নটবর সেই দিকে ছুটিল।]

দীনবন্ধু ॥ নাঃ, লোকটা বেশ জ্ঞানী। বেশ একটা দামী কথা মনে করিয়ে দিয়েছে হে। তোমার সেই দালাল দুটি ঠিক আছে তো ?

লোহারাম ॥ রীতিমত টাকা খাচ্ছে,—বিবেচনা করুন, কেন ঠিক থাকবে না ? তাদের তো দেখলেন, শ্রমিকদের পক্ষে কেমন গরম গরম বক্তৃতা দিলে। বিবেচনা করুন, ওই আকবর মিঞা আর হারাণ বিশ্বাস।

দীনবন্ধু ॥ কিন্তু বাড়াবাড়িটা ভাল নয়। ওই করেই সব ধরা পড়ে।

[ইতিমধ্যে নটবর উক্ত জিনিষ দুইটি লইয়া আসিয়াছে। তাহার হাত হইতে ওই দুইটি লইয়া দীনবন্ধু বলিলেন—]

দীনবন্ধু ॥ Thanks ! তোমার সঙ্গে আলাপ করে বেশ খুসী হলাম।

নটবর ॥ নিজের জীবনের অনেক বাজে কথা বলে আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করেছি। ক্ষমা করবেন স্যার।

দীনবন্ধু ॥ না, না, এ তোমার একার জীবনের কথা নয়। হিন্দু-মুসলমান— এ দুটো জাতের মধ্যে বিরোধ লাগাতে পেরেছিল বলেই তো ইংরেজ রাজত্ব করে গেল এতকাল—এত বড় দেশটায় ! ওদের নীতিই ছিল—Divide and Rule ! অথচ ইতিহাসের এই শিক্ষা আমরা ভুলে যাই। এসো দাস—আমার খাসকামরায় এসো।

[দীনবন্ধু, লোহারাম চলিয়া গেলেন। নটবর ষ্টেজে লাইটিংএর নির্দ্দেশ দিতে লাগিল।]

নটবর ॥ লণ্ঠন—! এই ন্যাড়া-বাবা আলোটা ফ্যাল—আর একটু—আর একটু···। ওহে গবু তুমিও আলোটা দাও। হ্যাঁ, হ্যাঁ,—আর একটু বড় করে দাও। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে।

[লালমিঞার প্রবেশ]

নটবর ॥ নাঃ ! তোমরা সব দেরী করে ফেললে। [ঘড়ি দেখিয়া] আর দশ মিনিটের মধ্যে ড্রপ তুলতে হবে—খেয়াল থাকে যেন।

লালমিঞা ॥ আপনিতো এখানে। ওদিকে গ্রীণরুমে হাতের কাছে কেউ কোন জিনিষ পাচ্ছে না বলে হৈ চৈ হচ্ছে।

নটবর ॥ হৈ চৈ করা ওদের স্বভাব। নইলে সবইতো রয়েছে। আমি দেখছি।

[মায়ার প্রবেশ]

নটবর ॥ [মায়াকে দেখিয়া] এই তো—এই তো সাজগোজ সব হয়ে গেছে। দেখি—[মায়াকে নিরীক্ষণ করিয়া] ঠিক আছে। তবে—পাউডারটা আর একটু—আচ্ছা থাক। [লালমিঞাকে] লালমিঞা, তুমি ফার্ষ্ট সীনের জিনিষপত্রগুলো সাজিয়ে ফ্যালো। [মায়াকে] মায়া, এখানেও ওর পাশে তোমার দাঁড়ানো উচিত ; মানে— এসব কাজে সব কিছুই সবাইকে দেখতে হয়। মানে—'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—মনে রেখো।

[নটবর গ্রীণরুমের দিকে চলিয়া গেল। লালমিঞা কাজে লাগিয়া গিয়াছে। মায়াও তাহার সহিত যোগ দিতে গেল।]

মায়া ॥ [লালমিঞাকে একা পাইয়া—হঠাৎ—] শোনো, এ আর আমি সইতে পারছিনা।

লালমিঞা ॥ [বিস্ময়ে] কি—কি সইতে পারছো না মায়া ?

মায়া ॥ তোমার আমার বিয়ে নিয়ে এই যে সবাই কানাঘুষো করছে। বিয়ে করাই যদি আমাদের ইচ্ছা—তবে আর দেরী নয়।

লালমিঞা ॥ আমরা ধর্মঘট করবো বলেই দেরী হচ্ছে।

মায়া ॥ কী আশ্চর্য্য ! ধর্মঘটের সঙ্গে বিয়ের কি সম্বন্ধ ?

লালমিঞা ॥ গুরুতর সম্বন্ধ।

মায়া ॥ কী গুরুতর সম্বন্ধ ?

লালমিঞা ॥ বলবো—সে তোমাকে বলবো। সেটা বলবার সময় এখন নয়। নাও—নাও—ওটা নিয়ে চল দেখি।

মায়া ॥ বলবে! তুমি কখন বলবে ? কখন তোমাকে আমি একলা পাব ? না, না, তুমি আমাকে বল।

লালমিঞা ॥ তোমাকে আমি বিয়ে করলে তোমার বাবা ক্ষেপে যাবেন। হিন্দুরা ক্ষেপে যাবে। হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধবে। শ্রমিকের একতা নষ্ট হবে। ধর্মঘট ফেল করবে।...বিয়ে আমি তোমাকে করবোই। কিন্তু ধর্মঘটটা আগে ভালোয় ভালোয় চুকে যাক্।...কে ?

[লণ্ঠনের প্রবেশ]

লণ্ঠন ॥ আজ্ঞে আমি লণ্ঠন। কেয়ারটেকারবাবু কইলেন, এখানে আলো কম হইছে।

লালমিঞা ॥ আলো কম হয়েছে! আলো কম হয়েছে তো তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকো। লণ্ঠন জ্বলুক। এসো মায়া—

লণ্ঠন ॥ তা যদি হতো দাঁড়াতাম। সেদিন কি আর আছে। লণ্ঠনের আলোতে এখন আর কারোর মন ওঠেনা। যাই—আমি কই কেয়ার-টেকার বাবুরে—

[লণ্ঠনের প্রস্থান]

মায়া ॥ ধর্মঘট যদি ধর্ম হয়, আমাদের বিয়েটাও অধর্ম নয় লালুদা। আমি এটা কিছুতেই বুঝতে পারছিনা—পারছিনা আমি—একটা সত্য—একটা ধর্ম—আমরা যদি পালন করি, আর একটা সত্যে—আর একটা ধর্মে কেন আঘাত লাগবে। বুঝিনা—বুঝিনা আমি লালুদা।

লালমিঞা ॥ তা ঠিক, কিন্তু তবু—

[নটবরের প্রবেশ]

নটবর ॥ এই কম লাইটে তোমরা দুটিতে এখানে কি করছো বল দেখি। এদিকে যে সব—

লালমিঞা ॥ এই একটু—

নটবর ॥ বুঝেছি—বুঝেছি—লাভ্‌সিনটা ঝালিয়ে নিচ্ছিলে। কিন্তু আর কতো রিহার্সাল দেবে। এখন আসল কাজটা সেরে ফ্যালো দেখি। টাইম হয়ে গেছে।

লালমিঞা ॥ [ঘড়ি দেখিয়া] আমি কিন্তু এক্ষুনি সীন্ তুলছি।

নটবর ॥ আলো নিভিয়ে দাও।

[আলো নিভিয়া গেল। নটবর বাঁশী বাজাইল। দ্বিতীয় দৃশ্যে মহুয়া পালা নাটক সুরু হইল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গিয়া যখন পুনরায় আলোকিত হইল, তখন দেখা গেল, হুমড়া বেদের দল পালাগান বর্ণিত সাজ-সজ্জা লইয়া খেলা দেখাইতে যাইতেছে লোক-সঙ্গীত ও লোক-নৃত্যের মাধ্যমে। পালাগানের সঙ্গে মূক অভিনয়।]

—পালাগান—

[হুমড়া বাইদ্যা ডাক দিয়া বলে মাইন্‌কিয়া ওরে ভাই।
ধনু কাটি লইয়া চল তাম্‌সা করতে যাই॥
যখন নাকি হুমড়া বাইদ্যা ডুলে মাইলো বাড়ী।
নদ্যাপুরের যত মানুষ লাগলো দৌড়াদৌড়ি॥
একজনে ডাক দিয়া কয়রে আর এক জনের ঠাই।
ঠাকুর বাড়ী বাইদ্যার তাম্‌সা চল দেইখ্যা আই॥

* * *

যখন নাকি বাইদ্যার ছেরি বাশে মাইলো লাড়া।
বইস্যা আছিল নদ্যার ঠাকুর উঠ্যা ঐল খাড়া॥
দাঁড় বাইয়া উঠ্যা যখন বাশে বাজী করে।
নইদ্যার ঠাকুর উঠ্যা কয় পইর‍্যা নাকি মরে॥]
করতালের ঝুনুঝনু ডুলে মাইলো তালি।
গান করতে আইলাম আমরা নদ্যা ঠাকুরের বাড়ী॥

[নৃত্য-গীত শেষ হইল। মহুয়া যাদুকরী মূর্ত্তিতে নদেরচাঁদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার পশ্চাতে করজোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল হুমড়া বেদে।]

বাজী করলাম তাম্‌সা করলাম ইনাম বক্সিস চাই।
মনে বলে নদ্যার ঠাকুর মন যেন তার পাই॥
হাজার টেকার শাল দিল আরো টেকা কড়ি।
বসত করতে হুমড়া বাইদ্যা চাইল একখান বাড়ী॥
ডাইল দিল চাইল দিল রসুই কইর‍্যা খাইও।
নতুন বাড়ীতে যাইয়া তোমরা সুখে নিদ্রা যাইও॥

[বেদের দল আনন্দচিত্তে নৃত্য-গীত সহকারে চলিয়া গেল। মহুয়া ছিল সর্বপশ্চাতে। নদেরচাঁদ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ডাকিল। মহুয়া দাঁড়াইল।]

নদেরচাঁদ॥ শুন শুন কইন্যা ওরে আমার কথা রাখ।
মনের কথা কইবা আমি একটু কাছে থাক॥
সন্ধ্যা বেলায় চান্নি উঠে সূরয বইসে পাটে।
হেন কালেতে একলা তুমি যাইও জলের ঘাটে॥
সইন্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে একলা যাইও তুমি।
ভরা কলসী কান্ধে তোমার তুল্যা দিয়াম আমি॥

মহুয়া ॥ সাপ খেলা দেইখবে গো—আইসো—আইসো—

[মহুয়া রহস্যময় ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইয়া ছুটিয়া পালাইল। নদেরচাঁদ মুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।]

—পালাগান—

কলসী করিয়া কান্ধে মহুয়া যায় জলে।
নদ্যার চান ঘাটে গেল সেইনা সন্ধ্যাকালে ॥

[মঞ্চ পুনরায় আলোকিত হইলে দেখা গেল, জলভরা কলসী কাঁখে মহুয়া ও তাহার সম্মুখে নদের চাঁদ দাঁড়াইয়া আছে।]

নদেরচাঁদ ॥ জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ।
হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥
কেবা তোমার মাতা কইন্যা কেবা তোমার পিতা।
এই দেশে আসিবার আগে পূর্বে ছিলি কোথা ॥

মহুয়া ॥ নাহি আমার মাতা পিতা গর্ভ সুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই ॥
কপালে আছিল লিখন বাইদ্যার সঙ্গে ঘুরি।
নিজের আগুনে আমি নিজে পুইর‍্যা মরি ॥
এই দেশে দরদী নাইরে কারে কইবাম কথা।
কোন জন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেথা ॥
মনের সুখে তুমি ঠাকুর সুন্দর নারী লইয়া।
আপন হালে করছ ঘর সুখেতে বান্ধিয়া ॥

নদেরচাঁদ ॥ কইন্যা তোমার শানে বান্ধা হিয়া।
মিছা কথা কইছ তুমি না কইরাছি বিয়া ॥

মহুয়া ॥ কঠিন তোমার মাতা পিতা কঠিন তোমার প্রাণ।
এমন যইবন তোমার যায় অকারণ ॥
কঠিন তোমার মাতা পিতা কঠিন তোমার হিয়া।
এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া।

নদেরচাঁদ ॥ কঠিন আমার মাতা পিতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া ॥

মহুয়া ॥ লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর ॥

নদেরচাঁদ ॥ কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি ॥

[মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।]

—পালাগান—

[একজন হয় গহীন্ গাঙ্—আর একজন তাতে ডুইব্যা মরে। এইসব কথা কি কখনও ছিপা থাকে? এক কান থাইকা পাঁচ কান হয়। শ্যাষে হুমড়া বাইদ্যাও খবরটা পায়। পাইয়া ভীষণ বিপদগ্রস্ত হইয়া তার দোস্ত মাইন্‌কিয়ারে ডাইক্যা কয়—]

হুমড়া ॥ শুন শুন মাণিক ভাইরে বলি যে তোমাই।
এই না দেশ ছাইড়া চল অন্য দেশে যাই ॥
কি করবো ভাই বাড়ী ঘরে থাইবাম ভিক্ষা মাগে।
আমার কন্যা পাগল হইছে নদ্যার ঠাকুরের লাগে ॥

তখন সেই বাইদ্যার দল—

কনক ॥ বাঁশ লইল দড়ী লইল সকল লইয়া সাথে।
পলাইল বাইদ্যার দল আইন্ধ্যারিয়া রাতে ॥
যখন নাকি নদ্যার ঠাকুর এই কথা শুনিল।
বাইদ্যার নারীর লাগ্যা ঠাকুর বৈদেশী হইল ॥
কিসের গয়া কিসের কাশী কিসের বৃন্দাবন।
বাইদ্যার কন্যা খুজতে ঠাকুর ভরমে তিরভুবন ॥

[খুঁজতে খুঁজতে গহন বনে মহুয়ার সন্ধান পেল নদের ঠাকুর। প্রেমের হলো জয়। মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে মহুয়া তার প্রাণপতি নদেরচাঁদের হাত ধরে বেদের দল থেকে পালিয়ে গেল দূরে—দূরে— —বহুদূরে। কতো আপদ, কতো বিপদ—সব কিছু কাটিয়ে তারা বন-দম্পতি হয়ে যখন স্বর্গ-সুখে বাস করছিল, তখন অকস্মাৎ একদিন—]

[মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।]

—পালাগান—

কনক ॥ চৌদিকে চাইয়া দেখে শিকারী কুকুর!
সন্ধান করিয়া বাদ্যা আইল এত দূর ॥
সামনেতে হুমড়া বাদ্যা যম যেন খারা।
হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছে বিষলক্ষের ছুরা ॥

[মঞ্চ আলোকিত হইলে দেখা গেল, নদেরচাঁদ ও মহুয়ার সামনে সদলবলে হুমড়া দাঁড়াইয়া আছে। হুমড়ার হাতে শাণিত ছুরিকা।]

হুমড়া ॥ প্রাণে যদি বাঁচ কন্যা আমার কথা ধর।
বিষলক্ষের ছুরি দিয়া দুষ্মনেরে মার ॥
আমার পালক পুত্র সুজন খেলোয়ার।
বিয়া তারে কর কন্যা চল মোদের সাথ ॥

মহুয়া ॥ কেমনে মারিব আমি পতির গলায় ছুরি।
খারা থাক বাপ তুমি আমি আগে মরি ॥
কেমন করি যাইবাম দেশে বন্ধুরে মারিয়া।
তোমার সুজনে আমি না করবাম বিয়া ॥
আমার বন্ধু চান্দ সুরুজ কাণ্ঢা সোনা জ্বলে।
তাহার কাছে সুজন বাদ্যা জোনাকি যেন জ্বলে ॥
সোনার তরুয়া বন্ধু একবার পেখ।
আমার চক্ষু তুমি নিয়া নয়ান ভইরা দেখ ॥

[হুমড়া গর্জিয়া উঠিয়া বিষলক্ষের ছুরি মহুয়ার হাতে দেয়। মহুয়া সেই ছুরি লইয়া একবার সখী পালং এর দিকে চাহিল, পরে নদেরচাঁদের দিকে চাহিয়া বলিল—]

মহুয়া ॥ শুন শুন প্রাণপতি বলি যে তোমারে।
জন্মের মত বিদায় দেওগো এই মহুয়ারে ॥
শুন শুন মাও বাপ বলি হে তোমায়।
কার বুকের ধন তোমরা আইনাছিলা হায় ॥
ছুট কালে মা বাপের কুল শূন্য করি।
কার কুলের ধন তোমরা কইরেছিলে চুরি ॥
জন্মিয়া না দেখলাম কভু বাপ আর মায়।
কর্ম দোষে এতদিনে প্রাণ মোর যায় ॥

[মহুযার নিজের বক্ষে ছুরিকা আঘাত ও পতন। হুমড়ার আদেশে বেদের দল কর্তৃক নদেরচাঁদের প্রাণবধ। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে লালমিঞার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—]

লালমিঞা ॥ আলো—আলো—শীগ্‌গীর আলো—আমার কপালে লেগেছে।

[মঞ্চ পুনরায় আলোকিত হইলে দেখা গেল, লালমিঞা হুমড়া দলের অস্ত্রাঘাতে সত্য সত্যই আহত হইয়াছে এবং তাহার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। সে হাত দিয়া ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিল।]

লালমিঞা ॥ কনক, এ তোমাদের কি কাণ্ড? আমার কপালটা কেটে ফেলেছো ?

[সকলে ছুটিয়া আসিল]

১ম জন ॥ তাই তো !

২য় জন ॥ উঃ, কী ভিষণ রক্ত পড়ছে !

মায়া ॥ আপনাদের কী কাণ্ড বলুন তো ! প্লে করতে এসে মানুষ খুন করে ফেললেন !

[এমন সময়ে দীনবন্ধু, লোহারাম ও নটবর উইংস-পথে সেখানে ছুটিয়া আসিল। দীনবন্ধুর হাতে পোর্টফলিও ও ওয়াটারপ্রুফ।]

দীনবন্ধু ॥ কপাল কেটে গেছে দেখছি—First Aid ! First Aid !

লোহারাম ॥ গোস্বামী—First Aid—

নটবর ॥ Yes Sir !

লালমিঞা ॥ কিন্তু আপনারা—এখন—এখানে !

দীনবন্ধু ॥ প্লের পর আমাদের তো এখানে একটা সভা হবে কথা ছিল। এসে দেখি, তোমাদের শেষ দৃশ্য প্লে হচ্ছে। চমৎকার লাগছিলো। কিন্তু তোমাদের প্লেটা যে এতো মারাত্মক রকম ভালো হ'বে—এতো ভাবতে পারিনি। থাক, তুমি আর দেরী করো না। গোস্বামী, তুমি একে এখনি ডিস্‌পেন্সারীতে নিয়ে যাও।

নটবর ॥ হ্যাঁ স্যার। [লালমিঞাকে] আপনি আসুন। ডাক্তারের আবার বাড়ী চলে যাওয়ার সময় হয়েছে।

লালমিঞা ॥ না না, এতো ঘাবড়াবার কিছু হয়নি।

লোহারাম ॥ বিলক্ষণ ! ঘাবড়াবার ব্যাপার নয় ? বিবেচনা কর, সেপ্‌টিক্ হয়ে যেতে পারতো !

মায়া ॥ তুমি একা যাবে লালুদা ?

লালমিঞা ॥ [হাসিয়া] আরে না না, তোমাদের ব্যস্ত হবার মতো কিছুই হয়নি। আমি একাই যাচ্ছি। তোমরা এখনি ষ্টেজটা খালি করে দাও, মিটিং হবে। দেখছো না, ওঁরা সব এসে পড়েছেন। [নটবরকে] না, না, আপনাকেও আসতে হবে না। আপনি পোষাক-টোষাকগুলো kindly বুঝে নিয়ে তুলে রাখুন।

[লালমিঞার প্রস্থান]

দীনবন্ধু ॥ [মায়ার প্রতি] তুমি এতো ভালো অভিনয় করতে শিখলে কোত্থেকে?

মায়া ॥ [নমস্কার করিয়া] যদি ভালো করে থাকি, সে প্রশংসা লালুদার প্রাপ্য। আর যদি খারাপ হয়ে থাকে সে দোষটা আমার।

দীনবন্ধু ॥ আমি যেটুকু দেখেছি, খুবই ভালো লাগলো। নাঃ, সবাই সত্যি খুবই ভালো করেছে।

[নটবর ইতিমধ্যে পার্শ্বকক্ষ হইতে দুইখানি চেয়ার আনিয়া হাজির করিয়াছে।]

নটবর ॥ বসুন স্যার। আমি মিটিং-এর এখনি সব ঠিক করে দিচ্ছি ! [অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দকে] আসুন, আসুন, আপনারা সব ষ্টেজ থেকে সরে আসুন। এটাকে এখনি মিটিংএর জায়গা করতে হবে। লণ্ঠন, লণ্ঠন—আঃ, কোথায় যে সব থাকে ! সব কাজ একা আমাকে করতে হবে !

[নটবর পার্শ্বকক্ষে চলিয়া গেল। অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দ তাহাকে অনুগমন করিল। মায়াও চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে দীনবন্ধু তাহাকে ডাকিলেন।]

দীনবন্ধু ॥ [মায়াকে] শোন, শোন,—তুমি এত ভাল অভিনয় করতে শিখলে কোত্থেকে ?

মায়া ॥ লালুদা শিখিয়েছে।

[লণ্ঠনের প্রবেশ]

লণ্ঠন ॥ মায়াদি—কে ?

মায়া ॥ আমি। কেন ?

লণ্ঠন ॥ আপনার মার শূল-বেদনা হয়েছে। আপনাকে এখনি বাড়ি যেতে বলেছেন।

মায়া ॥ শূল-বেদনা হয়েছে ? কে বললে ?

লণ্ঠন ॥ পাড়ার কেউ হবে ! আমি নতুন লোক,—চিনি না। নাম বললো আবদুল !

মায়া ॥ আবদুল ! ইব্রাহিম কাকার শালা। কোথায় সে ?

লণ্ঠন ॥ যখন এসেছিল, তখন প্লে হচ্ছিল। বলে গেল প্লে ভাঙলেই আপনাকে চলে যেতে। বললো, ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।

মায়া ॥ সে কি ! আমি যাচ্ছি।

[মায়া যাইতে গিয়া পোষাকের কথা মনে পড়ায় পার্শ্বকক্ষের দিকে ফিরিল]

দীনবন্ধু ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও [লণ্ঠনকে] ওহে ছোকরা, কোথায় থাক ? গোস্বামীবাবু একা একা খেটে মরছেন। যাও, ভেতরে তাঁর কাছে যাও।

[লণ্ঠন এই তাড়াতে ভিতরে পালাইল।]

দীনবন্ধু ॥ [মায়াকে] কলিক্‌পেন উঠেছে তোমার মার। তা এক কাজ কর। আমার গাড়ী রয়েছে,—তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে ?

মায়া ॥ তাহ'লে খুব ভাল হয়। সাজ-সজ্জা ছাড়তে, রঙ তুলতে অনেক সময় লাগবে। গাড়ীটা পেলে আমি এসব নিয়েই বাড়ি ছুটতে পারি।

দীনবন্ধু ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়—এখনি। [লোহারামকে ইঙ্গিত] দাস, তুমিই ড্রাইভারকে বলে দিয়ে এসো।

মায়া ॥ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

[লোহারামের সহিত মায়ার প্রস্থান। দীনবন্ধু চেয়ারে বসিলেন এবং পকেট হইতে সিগারেট কেস বাহির করিয়া তাহা হইতে একটি সিগারেট লইয়া তাহা ধরাইলেন। অদূরে সমবেত কণ্ঠে "ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনি শোনা গেল। ছুটিয়া লোহারামের প্রবেশ।]

লোহারাম ॥ স্যার, মিটিং ভেঙেছে—ওরা সব আসছে। বিবেচনা করুন,—আমাদের আর একটু দেরী হলেই সব ভেস্তে যেতো।

দীনবন্ধু ॥ গাড়ীটা আশা করি ওদের পথে পড়বে না।

লোহারাম ॥ না স্যার।

[নেপথ্যে "ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনি শোনা গেল। জনার্দন ও ইব্রাহিমের প্রবেশ।]

জনার্দন ॥ মিটিংটা শেষ হতে আমাদের একটু দেরী হয়ে গেল। আপনি হয়তো অপেক্ষা করছেন।

দীনবন্ধু ॥ [হাতঘড়ি দেখিয়া] তা' করছি বটে, কিন্তু তাতে আমার ক্ষতি হয়নি। ছেলে-মেয়েদের পালাগানের শেষ দৃশ্য দেখছিলাম। সত্যি, ওরা বেশ করে। কিন্তু তোমরা মাত্র দু'জন এলে ? আর সব।

ইব্রাহিম ॥ আমাদের দু'জনকেই তারা প্রতিনিধি পাঠিয়েছে।

দীনবন্ধু ॥ বেশ, বেশ। [জনার্দনকে] হিন্দুদের প্রতিনিধি বুঝি তুমি ? [ইব্রাহিমকে] আর মুসলমানের প্রতিনিধি বুঝি তুমি ?

জনার্দন ॥ না, না, হিন্দু মুসলমান হিসেবে আমরা আসিনি। খেটে-খাওয়া মজুরের কি আর কোন জাত আছে ? মজুর—আমিও মজুর।

ইব্রাহিম ॥ দুনিয়ায় দুটো মাত্র জাত আছে স্যার। শ্রমিক আমরা, আর ধনিক আপনারা। এ ছাড়া আর কোন জাত নেই।

দীনবন্ধু ॥ [হাসিয়া] ওহে আমরাও শ্রমিক—খেটেই খেতে হয়। বেশ, বেশ ! কিন্তু জাতিতত্ত্বের কথা ছেড়ে এখন মিটিং-এ কী সিদ্ধান্ত হলো, সেইটেই আমি জানবার জন্যে উৎসুক।

জনার্দন ॥ বাড়তি মজুরী না পেলে বাড়তি কাজ আমরা করবো না।

দীনবন্ধু ॥ তাহ'লে ছাঁটাই অনিবার্য্য।

ইব্রাহিম ॥ না, তাও চলবে না। তা আমরা সইবো না।

জনার্দন ॥ একজন লোকও যদি ছাঁটাই হয়, তাহ'লে আমরা ধর্মঘট করবো।

দীনবন্ধু ॥ [হাসিয়া] বেশ ! এ সব সিদ্ধান্ত তোমরা সব দিক ভেবেচিন্তেই করেছ, আশা করি।

জনার্দন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা ভেবে দেখেছি যে, গুদামে যখন ছাতা অনেক জমেই রয়েছে, তখন তো আর পুরো কাজ করার কোম্পানীর দরকার নেই। কাজেই হপ্তায় ৪৫ ঘণ্টার মধ্যেই কোম্পানী অর্ডারী লাঠি তৈরী করে নিতে পারবে।

দীনবন্ধু ॥ পারে কি না পারে, সেটা বোধ হয় আমরাই বেশী বুঝি। বেশ, তোমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের বোর্ডের মিটিং-এ কালই পেশ করবো এবং আমাদের সিদ্ধান্ত তোমাদের জানতে কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না। আচ্ছা, অনেক রাত হয়েছে, —আমি উঠি। আমাকে আবার এই রাত্রেই কলকাতায় ছুটতে হবে।

ইব্রাহিম ॥ আপনার মোটরটা চলে গেল দেখে আমরা ভাবছিলাম, আমাদের দেরী দেখে আপনি বোধ হয় চলেই গেলেন।

দীনবন্ধু ॥ [হাসিয়া] সিদ্ধান্তটা না জেনে কী করে যাই ? মোটরটা পেট্রোল আনতে গেছে।

ইব্রাহিম ॥ আপনাদের সিদ্ধান্তটা আমরা কবে জানতে পারবো ?

দীনবন্ধু ॥ পরশু। আর একটু রিহার্সাল দেখে আমি এতো খুসী হয়েছি যে, পরশু ছেলে-মেয়েদের পালাগান শুনতে আমি নিজেই আসছি। এরা করলো বেশ, কিন্তু বিষয়টা বড় সেকেলে। বেদের মেয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণের ছেলের বিয়ে হলো না,—অথচ উভয়েই পরস্পরকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আজকালকার দিনে এটা অচল—নয় কি ? রিহার্সাল দেখতে দেখতে দাশসাহেবই বলছিলেন, তোমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে হবে কিম্বা হয়েই গেছে।

জনার্দন ॥ কই, না তো।

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, আমি কানাঘুষা যা শুনেছি, তাই বলেছি স্যার।

জনার্দন ॥ আমি প্রতিবাদ করছি। এ রকম কোন কথা হয়নি, হতে পারে না। ইব্রাহিম তুমিই বল।

ইব্রাহিম ॥ না, এ সব কথা মিথ্যা। একসঙ্গে ওরা খেলাধূলা করেছে, মানুষ হয়েছে। মেলামেশাতে তাই ওদের কোনো বাধা নেই।

দীনবন্ধু ॥ তাই বল। আমিও ভাবছিলাম, এ কী হতে পারে!

[এমন সময়ে মোটর পৌছিবার শব্দ শোনা গেল]

লোহারাম ॥ ওই গাড়ী এসে গেছে।

[গাড়ীর শব্দ শুনিয়া লণ্ঠন ও নটবর ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল]

লোহারাম ॥ [লণ্ঠনকে] সাহেবের জিনিষগুলো গাড়ীতে তুলে দে।

[লণ্ঠন চেয়ারে রক্ষিত ওয়াটারপ্রুফ ও পোর্টফোলিও তুলিয়া লইল।]

দীনবন্ধু ॥ [জনার্দনকে] তোমার স্ত্রীর খুব অসুখ শুনে গেলাম। কলিকপেন্ হলেও অবহেলা করা ভাল নয়। ডাক্তার দেখিও। আচ্ছা চলি।

জনার্দন ॥ আমার স্ত্রীর কলিকপেন্? কই না। কে বললো?

দীনবন্ধু ॥ এই ছেলেটা এসে তোমার মেয়েকে খবর দিতেই তোমার মেয়ে ছুটে বাড়ি চলে গেল।

জনার্দন ॥ [লণ্ঠনকে] তোকে কে বললে?

লণ্ঠন ॥ প্লের সময় একটা লোক এসে মায়াদিকে নিজে বলতে না পেরে আমাকে বলে গেল। নাম বললো আবদুল।

ইব্রাহিম ॥ আমার শালা?

জনার্দন ॥ আমার স্ত্রীর কলিক্‌পেন্! কোনোকালে তো হয়নি!

দীনবন্ধু ॥ হয়নি—হ'তে কতক্ষণ। কলিকপেনের কথা বলা যায় না। কলিকের সময় অসময় নেই। না, আজ দিনটাই খারাপ। তোমার মেয়ে তো ওই খবরে পাগল হয়ে বাড়ি ছুটলো। তুমিও যাও—আর দেরী করো না—দ্যাখ গিয়ে কি হলো।

জনার্দন ॥ কলিকপেন্! ইব্রাহিম আমি যাই তাহ'লে—তুমি থাকো—কথাবার্তা শেষ করে নাও।

ইব্রাহিম ॥ না-না আমিও যাই।

জনার্দন ॥ না। তুমি এখাকার কাজ শেষ করেই এসো।

[জনার্দনের প্রস্থান]

দীনবন্ধু ॥ নাঃ! আজকের দিনটাই খারাপ। তোমার ছেলেও তো আবার কপাল কেটে গেছে বলে দৌড়ালো ডাক্তারের কাছে।

ইব্রাহিম ॥ আমার ছেলে—লাল? কপাল কেটে গেছে তার?

দীনবন্ধু ॥ হ্যাঁ, এইতো রিহার্সাল দিতে দিতে কি করে কাটলো—রক্তারক্তি ব্যাপার! তুমিই বা আর থেকে কি করবে? যাও—দেখ—

ইব্রাহিম ॥ কপাল কাটলো—আচ্ছা, তবে আমি যাই। দেখি আবার।

[ইব্রাহিমের প্রস্থান]

দীনবন্ধু ॥ [লোহারামের দিকে তাকাইয়া ও ইউনিয়নের চিঠি পড়িতে পড়িতে] কী দাস ওরা ধর্মঘট করবেই? আচ্ছা করুক।

তৃতীয় দৃশ্য

[কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত শ্রমিক-কলোনীর মধ্যে একটি উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত গোল ঘর। গোলঘরের উপরে চালা ও চারিধারে কেন্দ্রাকারে বাঁধানো বেদী। এখানে কথকতা, লোক-সঙ্গীত, ছোটোখাটো সভাসমিতি, গল্পগুজব প্রভৃতি হয়। এককথায়, সর্বশ্রেণীর শ্রমিকরা এখানে আসিয়া মেলামেশা করে।

রবিবার বৈকালে জনার্দন বেদীতে বসিয়া চিন্তিত মনে মাঝে মাঝে হুঁকা টানিতেছে ও মাঝে মাঝে কি যেন ভাবিয়া লইতেছে। পার্বতী তাহার বাসা হইতে এখানে আসিল, কিন্তু জনার্দন তাহার উপস্থিতি লক্ষ্য করিল না। তখন পার্বতী বিরক্ত হইয়া জনার্দনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।]

পার্বতী ॥ বেহুঁস হয়ে এখানে বসে বসে হুঁকো টানলেই চলবে? মেয়ে হারিয়েছে শুক্রবার রাত্রে। আজ রোববারের রাত এসেগেল—মেয়ের কোনো পাত্তা নেই। কোন্ আক্কেলে তুমি এখনও বসে আছো! মজা দেখছো—না?

জনার্দন ॥ খুঁজতে কেউ বাকী রাখেনি। ইব্রাহিম দলবল নিয়ে শুধু আমাদের কলোনী নয়, আশেপাশে সব জায়গায় খুঁজেছে। না পাওয়া গেলে কপালের দোষ বল।

পার্বতী ॥ রাখো তোমার ইব্রাহিম। আবদুলকে বেত মারো—জুতো মারো—ওর টুটি চেপে ধরো। ওর মুখ থেকে বেরুবে কোথায় আমার মেয়ে। কতো বড়ো শয়তান। আমার হয়েছে শূলবেদনা! ওকে ধর—ওকেই শূলে দাও।

জনার্দন ॥ আবদুল এর মধ্যে থাকতেই পারে না। একেবারে বাজে কথা। কতোবার তোমাদের বলবো যে, আবদুল তখন আমার পাশেই বসে ছিল আমাদের মাঠের মিটিংএ। তাছাড়া আবদুলকে আমরা এতোকাল দেখে আসছি, তার স্বভাব চরিত্তির আমরা নাজানি তা নয়। ওসব কথা রাখো। আমার এখন মনে হচ্ছে মেয়েটা নিজেই পালিয়েছে। কিন্তু কেন পালালো বুঝছি না। এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে আমার —এ নির্বুদ্ধির কাজ কেন করলো!

পার্বতী ॥ তা যদি পালিয়ে থাকে, তাহ'লে বলবো সে জন্যে দায়ী তুমি। মেয়েকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছিলে। দুপাতা লেখাপড়া শিখেছে বলে মেয়ে ঘর গেরস্থালীর কাজ ছেড়ে পাড়ায় পাড়ায় লেক্‌চার দিয়ে বেড়ায় কার আস্কারায়? তোমার। ধাড়ী ধাড়ী ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করে, গান বাজনা করে, থ্যাটার করে। বাধা তো দাওনিই,—বরং তারিফ করেছো। মেয়েছেলের মাথা এতে ঠিক থাকে—ওই সোমত্ত মেয়ের? এখন হলো তো! মুখে চুনকালী পড়লো তো!

জনার্দন ॥ বুঝছি না কোত্থেকে কী হয়ে গেলো। আমাদের ছেলে নেই—সে জন্যে দুঃখ করিনি কোনদিন। মেয়েটাই ছিল আমার ছেলে—ছিল আমার হাতের লাঠি। কেন যে হঠাৎ তার এ দুর্বুদ্ধি হল!

পার্বতী ॥ যতো দুর্বুদ্ধিই থাক, আমি বলবো মেয়ে আমার পালায়নি। দোষ

তার ছিল অনেক কিন্তু বাপ মা বলতে সে ছিল অজ্ঞান। আমার মন বলছে, মেয়েকে কেউ চুরি করেছে—জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। তুমি ওঠো। বসে থাকলে আর চলবে না। থানায় যাও, পুলিশে খবর দাও। আবদুলের পিঠে চাবুক পড়ুক। ঘরে ঘরে খানা তল্লাসী হোক্। মেয়ে আমার যাবে কোথায়!

[ইব্রাহিমের প্রবেশ]

ইব্রাহিম ॥ এই যে বৌদি! তোমার কাছেই আসছি। আচ্ছা, আবদুল কি পরশুদিন কোনো সময়ে তোমাদের বাড়ীতে এসেছিল?

[পার্বতী ইব্রাহিমের দিকে ঘৃণায় তাকাইল না, তাহার কথার উত্তরও দিল না। সে সোজা জনার্দনকে বলিল]

পার্বতী ॥ আমার যা বলার তোমায় বলেছি। তে-রাত্রির মধ্যে আমি আমার মেয়ে চাই। নইলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।

[পার্বতীর প্রস্থান]

ইব্রাহিম ॥ একথা বললে বৌদিকে আমরা দোষ দিতে পারিনা দাদা। দোষ আমাদেরই। একশোবার বলবো দোষ আমাদের। আমাদের মেয়ে—আমাদের চোখের ওপর থেকে হারিয়ে যাবে? এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের সমাজ! তুমি আবার ভেবে বল দাদা, আবদুলকে কি তুমি সেদিন ওই মিটিংএ আগাগোড়া দেখতে পেয়েছিলে? আমি যতদূর মনে করতে পারছি, আমি তাকে গোড়ায় দেখেছিলাম, কিন্তু শেষে দেখিনি!

জনার্দন ॥ শেষে [একটু চিন্তা করিয়া]—শেষের কথা আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। কিন্তু প্রথমটায়—হ্যাঁ আমার স্পষ্ট মনে হচ্ছে, আবদুল আমার কাছাকাছিই দাঁড়িয়েছিল। মিটিংএ যখন একটা গোলমাল শুরু হলো, তখন তা থামাতে আমি এগিয়ে গেলাম, তুমিও আমার সঙ্গে গেলে—হ্যাঁ,—না—তারপর তো আর দেখিনি।

ইব্রাহিম ॥ আরো কয়েক জনকে জেরা করে এটা বার করেছি, শেষের দিকে মিটিংএ ওকে কেউ দেখেনি। ওকে কেউ দেখেনি। ওকে আমি এখানে ধরে আনতে বলেছি। ওই এসেছে—[হারাণ, আকবর, আশু, বিশু প্রভৃতি কয়েকজন হিন্দুমুসলমান শ্রমিক আবদুলকে ধরিয়া লইয়া আসিল]

আকবর ॥ কিছুতেই আসতে চায় না, ধরে এনেছি।

ইব্রাহিম ॥ বটে।

আবদুল ॥ খোদার কশম নিয়ে বলছি, আমি কিছু জানিনা। লষ্ঠন হলফ করে তোমাদের কাছে বলেছে, যে লোক সেদিন তার কাছে গিয়ে কলিকের কথা বলেছিল, সে লোক আমি নই। তবু বারবার আমার ওপর এ জুলুম কেন বলতে পার?

ইব্রাহিম ॥ রেখে দে তোর লষ্ঠন। তাকে তুই ঘুষ দিয়েছিস, তাই সে মিথ্যা কথা বলছে।

আবদুল ॥ এতো বড়ো কথা তুমি বলছ মিঞা?

ইব্রাহিম ॥ হ্যাঁ, বলছি এইজন্যে যে, আমি প্রমাণ পেয়েছি, সেদিনকার মিটিং-এ তুই গোড়ায় ছিলি, শেষটায় ছিলি না।

হারাণ ॥ না, না, একথা সত্যি নয়। আমরা ওকে মিটিং-এ বরাবরই দেখেছি, ভাঙবার সময়েও দেখেছি। কীহে, তোমরা দ্যাখোনি ?

আকবর ॥ না সর্দার, তোমার একথা সত্যি নয়। মিটিং-এ আবদুল আগাগোড়াই ছিল।

জনার্দন ॥ না বাবা আবদুল, এরা অনর্থক তোমাকে হয়রানী করেছে। তোমাকে তো আমি জানি বাবা। তোমরা সকলে আমার মেয়েকে বোনের মতো দেখতে। কিছু মনে ক'রো না বাবা। মায়াকে হারিয়ে আমাদের কারুর মাথার ঠিক নেই। যাও বাবা, যাও—কাজে যাও।

আবদুল ॥ কাজ আর কী করবো সর্দার। কে যে কেন আমার নামে এই কেচ্ছা রটালো, আমি তো ভেবে পাই না। তুমি বলছো, মায়া আমার বোন। আমি বলছি মায়া আমার মা। সেবার যখন আমার বসন্ত হয়েছিল, তখন কে আমার সেবাশুশ্রূষা করেছিল ? তোমারই ওই একরত্তি মেয়ে। আজও আমি তা ভুলতে পারি না।

[অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আবদুল চলিয়া গেল। সমবেদনায় কয়েকজন তাহার সহিত গেল। ইব্রাহিম ও কয়েকজন রহিল]

ইব্রাহিম ॥ তোমরা এখানে বসলে কেন ? যাও খুঁজে দ্যাখ।

আশু ॥ আর কোথায় দেখবো ? খুঁজে দেখার কি বাকী আছে ?

ইব্রাহিম ॥ একটা কিছু করো। মেয়েটাকে তো খুঁজে বার করতেই হবে।

আশু ॥ বলছো যখন—দেখি আবার।

[অন্যান্য সকলেই চলিয়া গেল। রহিল শুধু জনার্দন, ইব্রাহিম ও হারাণ]

ইব্রাহিম ॥ সত্যিই আজ আমাদের মাথার ঠিক নেই। কী যে করবো, কিছুই বুঝছি না।

জনার্দন ॥ আমি ভেবে দেখছি, পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই।

ইব্রাহিম ॥ সে কথা তো আমি আগেই বলেছিলাম দাদা, তখন তুমি শুনলে না।

জনার্দন ॥ মায়াকে আবদুল সরিয়েছে, একথা আমার কোন সময়েই বিশ্বাস হয়নি। আমি তাই বাধা দিয়েছিলাম। আজ বুঝছি, মায়াকে কেউ সরায়নি। মায়া পালিয়েছে। আমাদের সবার মুখে এমন করে চুণকালি দিয়ে সে পালিয়ে যাবে ? চল ইব্রাহিম, থানায় চল।

ইব্রাহিম ॥ না দাদা, তা' হবে না। পুলিশে খবর দেওয়া চলবে না। যদি সে পালিয়েই থাকে, কোথায় যাবে ? দুদিনেই আমাদের কাছে ধরা পড়বে। পুলিশে খবর দিয়ে মিছে কেলেঙ্কারী করে লাভ নেই। মনে রেখো দাদা, মায়াকে তোমার বিয়ে দিতে হবে। লালমিঞা বলে গেছে, যেখান থেকেই হোক্ সে মায়াকে

খুঁজে বের করবে। আমিও তোমায় বলে যাচ্ছি, মায়াকে বের না করা পর্যন্ত দানা-পানি আমি মুখে নেবো না। মায়া শুধু তোমার নয়,—আমাদেরও।

[ইব্রাহিম চলিয়া গেল]

হারাণ॥ তোমাদের তো বটেই, সেই জন্যেই তো পুলিশে খবর দিতে এতো আপত্তি।

জনার্দন॥ কী বললে হারাণ?

হারাণ॥ বলছিলাম—মানে—অনেকেই বলছে ব্যাপারটা নিয়ে একটা ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় খেলা চলছে। মানে—অনেক কিছু ঘটছে, যা' আমাদের মতো সোজা লোকেরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। আর তাতেই ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

জনার্দন॥ তোমার ওই বাঁকা বাঁকা কথা ছেড়ে দাও হারাণ। কী বলতে চাইছো, সোজা কথায় বলো।

হারাণ॥ আমি কিছুই বলতে চাই না। তবে যারা এই সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, তাদের অনেকেই বলছে,—হ্যাঁ, সে একটা বেশ গল্পের মতো।

জনার্দন॥ কী বলছে?

হারাণ॥ লালমিঞা নাকি মায়াকে সাদি করতে চেয়েছিল—

জনার্দন॥ কথাটা আজ এই তিনদিন ধরে শুনছি বটে, কিন্তু আমিতো বলেছি, আমি বা মায়ার মা এ বিষয়ে কিছু জানি না।

হারাণ॥ তোমরা জানলে তো আর সাদিটা হয় না, তাই তোমাদের জানবার কথাও নয়।

জনার্দন॥ জানলেই যে সাদি হতো না, তারও কোনো মানে নেই হারাণ। মেয়ে যদি নাবালিকা হতো, তবে অবশ্য এ বিয়েতে আমরা কখনো রাজী হতাম না। কিন্তু মেয়ে এখন সাবালিকা। তার মত হলে—এ বিয়েতে অন্ততঃ আমি কোন বাধা দিতাম না।

হারাণ॥ গল্পটা হচ্ছে এই,—মায়ারও এতে মত ছিল না। কাজেই নাকি মায়াকে সরানো হয়েছে।

জনার্দন॥ কে সরিয়েছে? লালমিঞা?

হারাণ॥ গল্পটা এখন সেই রকমই দাঁড়িয়েছে। লালামিঞা যে শুধু মায়াকে সরিয়েছে তা নয়, নিজেও এখন সরে পড়েছে।

জনার্দন॥ তুমি বলছো কী!

হারাণ॥ এ যা' বলছি, এ কিন্তু গল্প নয়। খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, কাল সন্ধ্যে থেকে লালামিঞা হাওয়া। আর লালমিঞা হাওয়া হয়েছে বলেই পুলিশে খবর দিতে আমাদের এতো আপত্তি,—বুঝলে সর্দার?

জনার্দন॥ [ক্রুদ্ধস্বরে] হারাণ!

হারাণ॥ চোখ রাঙালে আমি না হয় চুপ করে থাকবো সর্দার, কিন্তু হিন্দুদের

মধ্যে অনেকে এ-ব্যাপারে এতো ক্ষেপে উঠেছে যে, তারা থামবে না। আমরা শ্রমিক—আমরা সব একজোট, কিন্তু তাই বলে মুসলমানের ছেলের সঙ্গে তো আর হিন্দুর মেয়ের গাঁটছড়া বাঁধা যায় না। এই কথাই তারা বলছে!

জনার্দন ॥ লালমিঞা কলোনীতে নেই?

হারাণ ॥ আশ্চর্য যে, সে কথা ইব্রাহিম সর্দার তোমার কাছে চেপে গেছে। না চাপলে তুমিও একথা এতক্ষণ জানতে। কিন্তু একী! স্বয়ং মালিক আসছেন এখানে।

[দু'জনে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দীনবন্ধু, লোহারাম আরও কয়েকজন আসিয়া উপস্থিত। জনার্দন ও হারাণ তাঁহাদিগকে নীরব অভ্যর্থনা জানাইল]

হারাণ ॥ কেউ নেইও এখানে। খানকয়েক চেয়ার—আচ্ছা, আমি—

দীনবন্ধু ॥ না না, ও সব থাক্। জনার্দন, তোমার মেয়ে নাকি চুরি হয়েছে?

[জনার্দন নীরব রহিল]

দীনবন্ধু ॥ আমি আজ এসেছিলাম পালাগান শুনতে, ওরা সব এতো করে বলেছিল। এসেই শুনি পালা-টালা সব বন্ধ। হিরোইন নেই, হিরোও নেই। পালাগান চুলোয় যাক্। কিন্তু আমাদের কলোনীতে এ সব কী কাণ্ড!

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, কী সাংঘাতিক ব্যাপার!

সুমঙ্গল ॥ এই জন্যেই আমি কলোনীতে একটা ছোটখাটো মন্দির আর মস্‌জিদ তৈরী করার স্কীম্ দিয়েছিলাম স্যার। মানে,—ধর্মাধর্ম জ্ঞানটা এ যুগে একেবারে চলে গেছে।

নটবর ॥ না স্যার, আমি নিবেদন কববো, ওই মন্দির-মস্‌জিদ নিয়ে মাতামাতি করলেই রক্তারক্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

হারাণ ॥ মন্দির-মসজিদ না গ'ড়েই যা দাঁড়িয়েছে, সেও বড়ো কম ব্যাপার নয়। মেয়েছেলে নিয়ে টানাটানি এসব কী ব্যাপার মশাই?

দীনবন্ধু ॥ পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে?

হারাণ ॥ না স্যার। ইব্রাহিম মিঞা সে পথ বন্ধ করে গেছে। সর্দারকে বুঝিয়েছে, ব্যাপারটা পুলিশে গেলে যে কেচ্ছা বেরুবে—ওর মেয়ের আর বিয়ে হবে না।

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, ব্যাপারটা পুলিশে না দিলেই বুঝি সব কেচ্ছা চাপা পড়বে।

সুমঙ্গল ॥ শ্রমিক-মঙ্গলের দিক থেকে আমি বলছি, মালিকেরই এ ব্যাপারটা হাতে নেওয়া উচিত—এখনই।

নটবর ॥ নিশ্চয় স্যার। দেখছি তো মেয়েছেলের গায়ে হাত দিতেই riot বেধে গেছে। এ তো গায়ে-হাতের বাবা! একেবারেই লোপাট। riot যে এখনো বাধেনি, এই আশ্চর্য।

লোহারাম ॥ বিবেচনা করুন, সে হবে খুব সাংঘাতিক স্যার। ব্যাপারটা আপনি এখনই হাতে নিন।

সুমঙ্গল ॥ শ্রমিক-কল্যাণের দিক থেকে আমি বলছি, বিষাক্ত অঙ্গটা এখনি ছেঁটে না ফেললে শ্রমিক-সমাজের গোটা দেহটাই বিষাক্ত হয়ে যাবে।

দীনবন্ধু ॥ কিন্তু আশ্চর্য, যার মেয়ে এ ব্যাপারে সে কোন কথা বলছে না। তবে কি বুঝবো এ ব্যাপারে তার কোন অভিযোগ নেই ?

জনার্দন ॥ প্রতিকার পাবো জানলে অভিযোগ আমার আছে বৈকি !

দীনবন্ধু ॥ প্রতিকার নেই মানে ? তুমি কি ভাবছো, এই দুর্নীতি আমি সইবো ? আমায় ফ্যাক্টরী, আমার কলোনী—প্রতিকার করতে আমি বাধ্য এবং আমি তা করবো। ভেবেছিলাম, আগামীকাল আমাদের বোর্ডের সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের জানানো হবে। কিন্তু দাস, এ যা ব্যাপার, তাতে আর আমি অপেক্ষা করতে পারছি না। শোনো জনার্দন, তোমাদের কোনো প্রস্তাবেই বোর্ড সম্মত হয়নি। বাড়তি কাজের জন্যে বাড়তি মজুরী বোর্ড দেবে না। কাজেই ছাঁটাই অনিবার্য। কাদের ছাঁটাই করতে হবে, সেইটেই ছিল আমার সমস্যা ! আমি—আমি বিষাক্ত অঙ্গটাই ছাঁটাই করবো।

হারাণ ॥ তবেই আমরা বাঁচি—তবেই আমরা বাঁচি।

দীনবন্ধু ॥ তোমরাই বাঁচবে না আমরা সবাই বাঁচবো। বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করবো। কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমি Home minister-এর সঙ্গে দেখা করবো। স্পষ্ট বলবো, এই মেয়ে-চুরির বিহিত না হ'লে এখানে শান্তিভঙ্গ হ'তে বাধ্য।

জনার্দন ॥ হ্যাঁ, শান্তি ভঙ্গ হ'তে বাধ্য। আমি আমার মেয়ে ফিরে চাই।

দীনবন্ধু ॥ মেয়েকে যখন চুরি করেছে, তখন তার জীবন সম্পর্কে আমি কোন আশংকা করি না। আশংকা শুধু বেইজ্জতের।

জনার্দন ॥ মৃত্যুর চেয়েও সেটা বেশী। ওই ইব্রাহিম,—তারই ছেলে—ওদের জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারতাম। কিন্তু এখন যদি ওদের আমি পাই আমি ওদের প্রাণ নেবো।

দীনবন্ধু ॥ না না, কোনো Violence নয়।...দাঙ্গা হাঙ্গামা নয়। আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। তিনি বলেছেন, হিংসার পথ—পথ নয়। অহিংসা পরম ধর্ম—এটা তোমরা ভুলো না। এসো দাস, ছাঁটাইয়ের অর্ডারটা এখনি বের করতে হবে। কিন্তু তার আগে—জনার্দন, আমি জানতে চাই, তোমাদের মঙ্গলের জন্যেই যদি বিষাক্ত অঙ্গ ছেঁটে ফেলে দিই, তোমরা কোনো আপত্তি করবে না—তোমরা ধর্মঘট করবে না।

জনার্দন ॥ না, করবো না। যাদের নিয়ে ধর্মঘট করতাম, তারা আজ আমাদের সঙ্গে অধর্ম করেছে। ধর্মঘট আমরা করবো না।

নটবর ॥ আমি জানি, আমি দেখেছি,—তেলে জলে কখনো মিশ খায় না।

দীনবন্ধু ॥ এসো দাস—

[দীনবন্ধু তাহার দলবল লইয়া চলিয়া গেলেন]

হারাণ ॥ লোকটা ঠিকই বলেছে। সব রকমই দেখেছে কিনা। আমরাও তো দেখলাম, এতো করেও মিশ খেলো না। নইলে ওই লালমিঞা—মুসলমানের ছেলে বলে তফাৎ ভাবিনি কোনদিন। সেই কিনা শেষে কালসাপ হ'য়ে এমন করে ছোবল মারলো! তোমার সোণার ঘরে আগুন জ্বেলে দিলো সর্দার।

জনার্দন ॥ তা দিয়েছে—তা দিয়েছে।

হারাণ ॥ তবে আমরাই বা ছেড়ে দেব কেন? আমাদের ছেলেরা তো সব রুখে রয়েছে। কী কষ্টে যে আমি তাদের ঠেকিয়ে রেখে এসেছি, সে শুধু হরিই জানেন। আমি শুধু তোমাকে একবার বলতে এসেছি। আগুন জ্বালতে আমরাও জানি—আমরাও জানি।

জনার্দন। না, না, শোনো, শোনো।

হারাণ ॥ কী আবার শুনবো? তোমার মেয়ে ওদের ঘরেই আছে। ইব্রাহিমের ঘরে না থাকে আর কারুর ঘরে আছে।

জনার্দন ॥ এদ্দূর সাহস হবে ওদের? এদ্দূর?

হারাণ ॥ তাইতো দেখছি। মেয়ে উধাও হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা' জানা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে যাকে বলে গরু খোঁজা খুঁজেছি। কোন হদিশ মেলেনি। খুঁজে দেখা হয়নি শুধু ওই ইব্রাহিমের বাড়ী, তল্লাসী হয়নি শুধু ওদের পাড়া। আবার বলছি, মেয়েটাকে ওদের ঘরেই গুম করে রেখেছে। ছোঁড়াটা দুদিন ভাল মানুষ সেজে লোক-দেখানো খোঁজাখুঁজি করেছে। আর ওই খোঁজাখুঁজির অছিলাতেই এখন গা-ঢাকা দিয়ে মেয়ের সঙ্গে গিয়ে জুটেছে।

জনার্দন ॥ আর ইব্রাহিম তা জেনেও আমার কাছে গোপন করে গেল।

হারাণ ॥ এ ব্রতের এই নিয়ম সর্দার,—এ ব্যাপারে এই হয়ে থাকে।

[ইব্রাহিম ও আকবরের প্রবেশ]

ইব্রাহিম ॥ লোহারাম ম্যানেজারের মুখে শুনলাম, আমরা নাকি ছাঁটাই হয়েছি, আর তোমরা নাকি তবু কাজ করবে বলেছো?

জনার্দন ॥ কোনো কথার আগে আমি জানতে চাই, তোমার ছেলে কোথায়? লালমিঞা?

ইব্রাহিম ॥ লালমিঞার খোঁজ আমিও পাচ্ছি না।

জনার্দন ॥ লালমিঞা কোথায় তুমি জানো?

হারাণ ॥ শুধু লালমিঞা কেন, মায়া কোথায় তা-ও তুমি জান।

ইব্রাহিম ॥ চোপরও কুত্তা।

আকবর ॥ [ইব্রাহিমকে] সর্দার হুকুম দাও,—আমি ওর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলছি।

জনার্দন ॥ খবরদার! চোরের মার বড় গলা!

ইব্রাহিম ॥ চোর!

জনার্দন ॥ হ্যাঁ, চোর। তোমরাই আমার মেয়ে চুরি করেছো। বেইমান্‌।

ইব্রাহিম ।। চোর ! বেইমান ! আমরা !

আকবর ।। স্ট্রাইকের হলফ নিয়ে তলে তলে আমাদের ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা করে বেইমানী করেছিস তোরা !

হারাণ ।। করে থাকি, বেশ করেছি।

ইব্রাহিম ।। বেশ করেছো ! জান কবুল, কী করে তোমরা কাজে যাও আমরা দেখে নেবো।

[আকবরকে লইয়া ইব্রাহিম প্রস্থানোদ্যত]

জনার্দন ।। ইব্রাহিম—ইব্রাহিম—[ইব্রাহিম ফিরিল] আকবর, তুমি চলে যাও। হারাণ তুইও চলে যা।

[আকবর ও হারাণ পরস্পর ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া গেল]

ইব্রাহিম, আমরা ভুল করছিনাতো ? নিজের অজান্তে অন্য কারুর হাতে পুতুল হয়ে নাচছিনা তো ?

ইব্রাহিম ।। নাটকতো ভালই করো দেখা যায়। চোর-বেইমান বলে গাল দিয়ে এ আবার কী সুর ধরলে ?

জনার্দন ।। কি করি, কি বলি—কিছুই ঠিক নেই। আমার মুখের কথা ধরিসনে ভাই। আমি ভাবছি, তোর আর আমার এতো দিনের এই যে—বলতে গেলে আত্মীয়তা—এ অমনি আজ একটা তুচ্ছ কারণে ভেঙে যাবে ?

ইব্রাহিম ।। কেন যাবে ? তুমি রাখলেই থাকবে। আর তুমি যদি পরের কথায় নাচো, তাহ'লে—তুমি জেনে রেখো—তোমার ওই হারাণ লোক সুবিধের নয়।

জনার্দন ।। না, না, হারাণ—অবিশ্যি হারাণ যে লোক ভালো নয়, তা আমি জানি ! কিন্তু এ ব্যাপারে আমিতো তার কোন দোষ দেখি না। বরং আমি বলছি, তোমার ওই আকবর—ও আকবরও খুব—

[ছুটিয়া আকবরের প্রবেশ]

আকবর ।। [ইব্রাহিমকে] সর্দার, তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো ? ওরা যে তোমার ঘরে আগুন দিলো।

ইব্রাহিম ।। আগুন ! আমার ঘরে আগুন ! কে দিলো ?

আকবর ।। ওই ওরা—ওরা। আগুন—আগুন—

[ছুটিয়া আকবরের প্রস্থান]

ইব্রাহিম ।। [জনার্দনের প্রতি] বাঃ— !

[ইব্রাহিমের প্রস্থান]

জনার্দন ।। আগুন—ইব্রাহিমের ঘরে—

[দৌড়াইয়া হারাণের প্রবেশ]

হারাণ ।। সর্দার, তুমি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছো ? ওরা যে সব আগুন দিয়ে দিলো !

জনার্দন ।। ইব্রাহিমের ঘরে আগুন কে দিলো ?

হারাণ ॥ ইব্রাহিমের ঘরে ? ইব্রাহিম না—ইব্রাহিম না—ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথের ঘরে আগুন দিলো।

জনার্দন ॥ তবে যে আকবর বললো—

হারাণ ॥ আকবর বললো আর তুমি বিশ্বাস করলে সর্দার। আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম—ইন্দ্রনাথের ঘরে আগুন দিলো আকবরের ভাই তাহের মিঞা...দাউদাউ জ্বলছে আগুন...হায়, হায়, সর্দার সব পুড়ে গেল—ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সব সর্দার—সব সাফ হয়ে গেল। পাড়াকে পাড়া সব এতোক্ষণে সাফ হয়ে গেল।

জনার্দন ॥ সাফ হয়ে গেল—সাফ হয়ে গেল। তবে সাফই করে ফ্যাল্—সব—সব জঞ্জাল আজ সাফ করে ফ্যাল্।

হারাণ ॥ [সোল্লাসে] হ্যাঁ, হ্যাঁ এই তো আমি চাইছিলাম।

জনার্দন ॥ য়্যাঁ ?

হারাণ ॥ ঐ তোমার হুকুমটাইতো চাইছিলাম। সব সাফ করে ফেলবো আজ। হিন্দু ভাই সব—

[হারাণের প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে একটি বোমা ফাটিল]

জনার্দন ॥ য়্যাঁ ! এ আমি কি করলাম ! হারাণ—হারাণ—পার্বতী—

চতুর্থ দৃশ্য

[কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত শ্রমিক কলোনীর মধ্যে পূর্বোক্ত গোলাঘর। নেপথ্য হইতে "মার-মার কাট-কাট" শব্দ, "আগুন—আগুন" চীৎকার, "গেলাম-গেলাম" আর্তনাদ ও মাঝে মাঝে বোমা ফাটার শব্দ শোনা যাইতেছে। জনার্দন দাঁড়াইয়া হুঁকা টানিতেছে ও উত্তেজিত হারাণ তাহার নিকট দাঙ্গার বর্ণনা দিতেছে।]

হারাণ ॥ কেষ্টদাসের ছেলে নীলু—ওই অতোটুকু ছেলে,—দোকানে যাচ্ছিল। একা পেয়ে তাকে ছোরা মেরেছে। ছেলেটাকে ডাক্তারখানায় দিয়ে এলাম। দিয়ে এলাম বটে, কিন্তু এতোক্ষণে বোধ হয় হয়ে গেছে।

জনার্দন ॥ ওরা সব পারে—সব পারে।

হারাণ ॥ আমাদের ছেলের দল ক্ষেপে গিয়ে কসাইয়ের দোকানটায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দোকানটা বোধ হয় এতোক্ষণ শেষ। জোর লড়াই চলছে। ভয়ের কথা এই, আমাদের বোমাগুলোর চেয়ে ওদের বোমাগুলো ফাটছে বেশী জোরে আর আওয়াজও বেশী।

জনার্দন ॥ কিন্তু দলে ভারী আমরা। কতোক্ষণ দাঁড়াবে ?

হারাণ ॥ আজ তাহ'লে সর্দার আমরা কাজে যাবো না ?

জনার্দন ॥ না। ওরা ছাঁটাই হয়েছে। আমরা সব কাজে গেলে সেই ফাঁকে ওরা আমাদের ঘর লুঠ করবে...মেয়ে-ছেলেগুলো যাবে।

হারাণ ॥ শুনলাম, চেয়ারম্যান সাহেব এই জন্যেই পুলিশে খবর পাঠিয়েছেন আজ সকালে,—যাতে পুলিশ এসে ওদের শায়েস্তা করে, ফ্যাক্টরীর কাজ চলে।

জনার্দন ॥ চুলোয় যাক্ ফ্যাক্টরী। সব চেয়ে বড়ো কথা,—আমি আমার মেয়ে ফিরে চাই। আমার ইজ্জৎ গেছে হারাণ,—আমার ইজ্জৎ গেছে।

হারাণ ॥ পুলিশ এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ওদের ঘর খানা-তল্লাস হলেই আমাদের মেয়ে আমরা ফিরে পাবো। ওদের হাতে দড়ি পড়লেই আমাদের ফ্যাক্টরীর কাজ চলবে—লাঠিগুলো এমাসেই ডেলিভারী হ'বে—কোম্পানী বাঁচবে। আমরাও বাঁচবো।

জনর্দন ॥ ফ্যাক্টরীর কথা ভুলে যাও হারাণ। এখন ইজ্জতের কথা ভাবো। ওই শোনো গোলমাল বাড়ছে।

হারাণ ॥ আমি যাচ্ছি। চেয়ারম্যান তোমাকে একটা কথা বলতে বলেছিলেন সর্দার। বলেছিলেন, ফ্যাক্টরীর কাজ বন্ধ করো না, যতো বেশী লাঠি যতো তাড়াতাড়ি তৈরী হবে, ততোই মঙ্গল। বলেছেন, কণ্ট্রাক্টের বাড়্তি লাঠি আমাদেরই হাতে তুলে দেবেন—দুষমন্‌দের শায়েস্তা করতে। আর তোমাকে গোপনে বলে যাচ্ছি সর্দার, অর্ডারটা পুলিশের। কাজেই পুলিশ আসবে, আর নিশ্চয়ই দেখবে যাতে ফ্যাক্টরীর কাজ চালু থাকে। মানে—ওরা গেছে।

[ছুটিয়া পার্বতীর প্রবেশ]

পার্বতী ॥ ওগো কী সর্বনাশ! ওরা মেথর পাড়ায় আগুন দিয়েছে।

জনার্দন ॥ কী! শেষে মেথরদের ওপর অত্যাচার? ওরাতো শুধু আমাদের নয়, ওদেরও। ইব্রাহিম এতো নীচে নেমে গেছে। হারাণ, আগুন লাগাও ইব্রাহিমের বাড়ী।

হারাণ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! সর্দার, এই আমি চেয়েছিলাম—এই আমি চেয়েছিলাম।

[হারাণের প্রস্থান]

পার্বতী ॥ না, না, না, এ আমরা চাই না। আর আগুন জ্বালাতে চাই না। এ আগুনে সব যাবে,—ওদেরও, আমাদেরও। এ আগুন নিভিয়ে দাও সর্দার, এ আগুন নিভিয়ে দাও।

জনার্দন ॥ আমার মেয়ে যখন ফিরে পেলাম না, আর তা' হয় না। এ আগুন নিভবে না।

পার্বতী ॥ চাইনা আমার মেয়ে। আমার এক মেয়ের জন্যে আর দশজনের ছেলে মেয়ে মরবে, এ আমি চাই না।

জনার্দন ॥ তেরাত্রির মধ্যে তুমি তোমার মেয়ে ফিরে চেয়েছিলে—আমি তা হয়নি বলেই জ্বেলেছি এই আগুন। যাক্—সব যাক্।

পার্বতী ॥ বুঝিনি—আমি তখন বুঝিনি। এখন বুঝছি,—মারামারিতে মারামারিটাই বেড়ে যায়। হারান ধন ঘরে আসে না। মাঝ থেকে ঘরের ধন হারিয়ে যায়।

[নেপথ্যে রাইফেলের শব্দ। মুহূর্তে নেপথ্যের সকল গোলমাল স্তব্ধ হইয়া যায়।]

জনার্দন ॥ বন্দুকের গুলি—তবে পুলিশ এসেছে।

[এমন সময়ে রুদ্ধশ্বাসে কনকের প্রবেশ]

কনক ॥ সর্দার, সর্দার, তোমার এখানে পুলিশ আসছে। আর একদল ওদিকে গুলি চালাচ্ছে। সামনে যাকে পাচ্ছে, তাকেই ধরছে। জ্যাঠাইমা, তুমি ঘরে যাও।

জনার্দন ॥ [উভয়কে লক্ষ্য করিয়া] আমাদের কলোনীতে যারা বাইরে আছে, ছুটে গিয়ে তাদের ঘরে যেতে বল। কখন কী হয় বলা যায় না।

[কনক ও পার্বতীর প্রস্থান। জনার্দন বসিয়া হুঁকা টানিতে লাগিল। এমন সময়ে জনৈক পুলিশ-ইন্‌স্‌পেক্টার, ইব্রাহিম ও কয়েকজন কনেষ্টবলসহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিল হিন্দু-মুসলমানের কতিপয় মাতব্বর। তাহাদের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া হারাণও আছে। ইহাদের আসিতে দেখিয়া জনার্দন হুঁকাটি রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

ইন্‌স্‌পেক্টর ॥ চারিদিকে দাঙ্গা হাঙ্গামা! মাঝখানে নির্বিকার হয়ে হুঁকো টানছেন—এ মহাত্মাটি কে?

ইব্রাহিম ॥ এই সেই জনার্দন সর্দার হুজুর—পালের গোদা।

ইন্‌স্‌পেক্টর ॥ থামো। [জনার্দনকে] তুমি জনার্দন সর্দার?

জনার্দন ॥ হ্যাঁ হুজুর।

ইন্‌স্‌পেক্টর ॥ তোমারই মেয়ে চুরি গেছে?

জনার্দন ॥ হ্যাঁ হুজুর [ইব্রাহিমকে দেখাইয়া] ওই ইব্রাহিমের ছেলে—লালমিঞা চুরি করেছে। আর তাদের দুজনকেই লুকিয়ে রেখেছে ওই ইব্রাহিম। ওর বাড়ি খানাতল্লাসী করুন হুজুর, এখনই বেরিয়ে পড়বে সব।

ইন্‌স্‌পেক্টর ॥ তোমাদের মালিকের অভিযোগ—মেয়ে চুরির জন্যেই এই দাঙ্গা। আমি এসে শুধু দাঙ্গা থামাইনি। ইব্রাহিমের এলাকা তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাসী করেছি। কিন্তু কই, পেলামনাতো। তোমাদের মালিক মিষ্টার চৌধুরী সদল বলে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মেয়ে ওদের কাছে নেই।

ইব্রাহিম ॥ নেই,—তাও আমার ছেলেকে ওই জনার্দন সর্দার ধরে আটকে রেখেছে। আজ তিনদিন আমি তাকে খুঁজে পাচ্ছি না হুজুর।

জনার্দন ॥ মিথ্যে কথা—ডাহা মিথ্যে কথা। হুজুর, আসুন, আমার ঘর-বাড়ি, আমার এলাকা খানাতল্লাসী করুন।

ইন্‌স্‌পেকটর ॥ [হাসিয়া] ইব্রাহিম যতোটা চালাক, তুমি তার চেয়েও বেশী, এ তোমার চেহারা দেখেই বোঝা যায় সর্দার সাহেব। তোমরা কেউ কম নও; এতবড় দাঙ্গা হলো, হাতে নাতে কাউকেই ধরা গেল না। অনর্থক খানাতল্লাসী করে আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করে লাভ নেই। ওর ঘরে তোমার ছেলেও যে পাওয়া যাবে না সে আমি ভালই জানি। কিন্তু তোমাদের দুজনকেই একটা কথা বলবো,—মন দিয়ে শোনো।

কয়েকজন ॥ বলুন স্যার, বলুন।

ইন্‌স্‌পেক্টর ॥ ব্যাপারটা যা শুনলাম, তাতে দেখছি—ওই "মহুয়া" পালাগানটাই সত্য আর সব মিথ্যে।

কয়েকজন ॥ সে কী স্যার ?

ইন্‌স্‌পেক্টর ॥ হ্যাঁ, ঐ পালাগানে আছে—বিয়েতে বাধা ছিল দেখে, মহুয়া আর নদেরচাঁদ পালিয়ে গিয়েছিল জঙ্গলে। এ যুগের জঙ্গল হচ্ছে কলকাতা। খোঁজ করো তাদের সেখানে—কোনো হোটেলে। এবং এও জানি, যখন তাদের ধরবো, তখন দেখবো, তারা গলাগলি ধরে সিনেমার গান গাইছে, আর তোমরা কিনা এখানে এ ওর গলা কাটবার জন্যে ছুরি শাণ দিচ্ছো। পুলিশের চাকরী করে চুল পাকিয়েছি। আমার কথাটা মিথ্যে নয়। ঝগড়াঝাঁটি ছেড়ে দাও। ফের ঝগড়াঝাঁটি করছো খবর পেয়েছি কি তোমরা গেছো। লাঠিপেটা করবো সব।

ইব্রাহিম ॥ জানি হুজুর। সে লাঠি ওরাই তৈরী করে দিচ্ছে।

ইন্‌স্‌পেক্টর ॥ সে জন্যে তোমার আফশোষ করার কিছু নেই। যদি দরকার হয়, সে লাঠি ওদের পিঠেও পড়বে।

[জনার্দন ও হারাণ ব্যতীত সকলে চলিয়া গেলেন।]

হারাণ ॥ সর্দার বুঝছো না—ডানহাত বাঁহাতের ব্যাপার হয়ে গেছে। নাঃ, ওই দুষমণটাকে কিছুতেই শায়েস্তা করা যাচ্ছে না। তোমার হুকুম পেয়ে মরিয়া হয়ে আমরা দল বল নিয়ে যখন ইব্রাহিমের ঘরে আগুন ধরাতে যাবো, ঠিক সেই সময় পুলিশ এসে গেল—পালাতে পথ পাইনা সর্দার। [এমন সময় পুলিশ ভ্যান চলিয়া যাওয়ার শব্দ শোনা গেল] কিন্তু এই তো পুলিশ চলে গেল, এখন ওদের কে বাঁচায় দেখি ?

জনার্দন ॥ না, না, দাঁড়াও। শোনো।

হারাণ ॥ কী বলবে বল।

জানার্দন ॥ আচ্ছা, পুলিশ সাহেব যা বলে গেল,—মানে, মায়া আর লালমিঞা আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে কলকাতায় চলে গেছে—তোমার কী মনে হয়, এ সত্যি ?

হারাণ ॥ তা' হতে পারে। কিন্তু মায়া ইচ্ছা করে গেছে, এ কখনও সত্যি নয়। মায়াকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে লালমিঞা। দস্তুরমতো নারীহরণ সর্দার, দস্তুর-মতো নারীহরণ।

[কনকের প্রবেশ]

কনক ॥ হারাণখুড়ো, তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। পুলিশ যেতে না যেতেই তোমার ঘরে ওরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে—খোলা জানালা দিয়ে পেট্রোল ছড়িয়ে।

হারাণ ॥ বলিস্ কী কনক ! সর্বনাশ !!

[হারাণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল]

কনক ॥ সর্দার, তৈরী হও। আজ এস্পার কি ওস্পার—

[কনকও ছুটিয়া চলিয়া গেল। নেপথ্যে পুনরায় আগের ন্যায় কোলাহলধ্বনি উঠিল]

জনার্দন ॥ সত্যিই আজ এস্পার কি ওস্পার। [পার্বতীর উদ্দেশ্যে] পার্বতী—পার্বতী—আমি চললাম—

[জনার্দন উত্তেজিতভাবে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে বিপরীত দিক হইতে ছুটিয়া আসিল লালমিঞা। ব্যাকুলকণ্ঠে সে ডাকিল।]

লালমিঞা ॥ সর্দার! সর্দার!!

[জনার্দন ঘুরিয়া লালমিঞাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে সেখানে পার্বতীও আসিয়া দাঁড়াইল]

লালমিঞা ॥ জ্যাঠাইমা!

জনার্দন ॥ মায়া কোথায়?

পার্বতী ॥ বল, আমার মেয়ে কোথায়?

লালমিঞা ॥ তার খোঁজেই গিয়েছিলাম—মেদিনীপুরে নন্দীগ্রামে।

জনার্দন ॥ [রুদ্রমূর্তিতে লালমিঞার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া] কোথায় সে?

লালমিঞা ॥ সেখানেও যায়নি সে।

জনার্দন ॥ কেন সে যাবে সেখানে? সে আছে সেখানে—যেখানে তুমি তাকে ধরে নিয়ে গেছো। যদি বাঁচতে চাও, সত্য বল কোথায় সে?

লালমিঞা ॥ জীবন বিপন্ন করে তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলতে আসিনি জ্যাঠামশাই। যখন কোথাও তাকে খুঁজে পেলাম না আমরা, তখন আমার মনে হলো, জ্যাঠাইমার বকুনী খেয়ে অভিমান করে মায়া একবার পালিয়ে গিয়েছিল তারই মাসীর বাড়ি মেদিনীপুরে ওই নন্দীগ্রামে। যায়নি জ্যাঠাইমা?

পার্বতী ॥ গিয়েছিল। তোমাকে আর পল্টুকে আমি পাঠিয়েছিলাম তাকে নিয়ে আসতে।

লালমিঞা ॥ তাই এবারও মনে হলো, হয়তো কারুর ওপর কোন অভিমানে এবারও সে পালিয়েছে সেখানে।

জনার্দন ॥ মিথ্যা কথা। আমরা তাকে বকিনি।

পার্বতী ॥ না। আমি বকেছিলাম। ওর এখন বয়েস হয়েছে। তোমার সঙ্গে ওর এতো বেশী মেলামেশা, পাঁচজনে পাঁচকথা বলে। পালাগানের আগের দিন আমি ওকে বকেছিলাম।

জনার্দন ॥ তুমি কোনো অন্যায় করোনি। [লালমিঞাকে] তোমার নন্দীগ্রামে যাওয়ার কারণ না ছিল তা নয়। কিন্তু তুমি সেখানে গেছো, এ আমি বিশ্বাস করিনা।

লালমিঞা ॥ শোন জ্যাঠামশাই, আমি জানি তোমাদের সকল ক্রোধ আজ আমার ওপর। ফিরে এসে দেখি আমারই জন্য কলোনীতে দাঙ্গা লেগেছে। শুনলাম মায়াকে নিয়ে আমি পালিয়েছি সন্দেহে শ্রমিকদের একতা গেছে ভেঙে—একদল

হয়েছে ছাঁটাই, তবু আর একদল যাচ্ছে কাজে। ভাইএ ভাইএ শুরু হয়েছে দাঙ্গা। জীবন যাচ্ছে—ঘরবাড়ি পুড়ছে। আমার মাথা চাইছো তোমরা—জেনে শুনেও আমি এসেছি—মিথ্যা বলতে নয়।

পার্বতী ॥ আমি বিশ্বাস করছি বাবা, আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি। তুমি শুধু একটিবার বলো—মায়াকে যে আমরা পাচ্ছি না, তাতে তোমার কোন হাত নেই।

লালমিঞা ॥ শুধু ওই কথাটুকু—ওই কথাটুকু বলতেই আমি এসেছি জ্যাঠাইমা-জ্যাঠামশাই। যদি বিশ্বাস করো, আবার আমি বেরুবো মায়াকে খুঁজতে। এজন্য পৃথিবীর ওপারে—জীবনের ওপারেও যদি যেতে হয়, তাও যাবো। আর যদি বিশ্বাস না করো, আমি এখানে আছি, আমি এখানে থাকবো—থাকবো তোমাদের সামনে—জীবিত অথবা মৃত, শুধু এই আশায় যে, একদিন তোমরা বলতে বাধ্য হবে যে আমি মিথ্যা বলিনি।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

লালমিঞা ॥ জ্যাঠামশাই !—আমি যাবো, না থাকবো ?

জনার্দন ॥ থাকবে।

লালমিঞা ॥ আমাকে তবে তুমি বিশ্বাস করলে না জ্যাঠামশাই !

জনার্দন ॥ তোমাকে আমি বিশ্বাস করছি, লাল। কিন্তু আমার দলবলকে আমার বিশ্বাস নেই। [পার্বতীর প্রতি] পার্বতী, ওর চোখ-মুখ দেখে তুমি বুঝছো না, না খেয়ে আছে।

পার্বতী ॥ এসো বাবা এসো—[লালমিঞা যায় না, পার্বতী কাছে আসিয়া সস্নেহে বলে] আয় বাবা লাল।

লালমিঞা ॥ তুমি আমাকে শুধু এক গ্লাস জল দাও।

[নেপথ্যে কনকের উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল—"সর্দার ! সর্দার !!" পরক্ষণেই সে ছুটিয়া আসিয়া লালমিঞাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।]

কনক ॥ লাল ! তুমি !

লালমিঞা ॥ বলছি।

কনক ॥ কী আর বলবে ! বাঘের গুহায় এসেও যখন তুমি বেঁচে আছো, তাতেই সব বলা হয়েছে। [জনার্দনের প্রতি] এইবার আমি যা বলতে এসেছি, শোনো। লালমিঞা তোমার এখানে—ওরা কী করে জানতে পেরেছে। তোমার হাত থেকে ওকে উদ্ধারের জন্যে ইব্রাহিম সর্দার দলবল নিয়ে মরিয়া হয়ে ছুটে আসছে। পথের দুধারের ব্যারাকে পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন লাগাচ্ছে। দেখে এলাম, হারাণ খুড়োর বাড়ি দাউ দাউ জ্বলছে।

পার্বতী ॥ হারাণের বাড়ি ! দাউ দাউ জ্বলছে !!

জনার্দন ॥ জ্বলুক। হারাণ একা থাকতো ; সে নিশ্চয়ই এতোক্ষণ সরে পড়েছে। আগুনের ভয় আমাকে দেখিয়ে লাভ নেই। আমার মেয়েকে না পেলে আমি যে আগুন জ্বালাবো, ইব্রাহিম তা সইতে পারবে না। সে আগুন—ওই লালমিঞা।

[ইব্রাহিমের প্রবেশ। সে একা...হাতেও কোনো অস্ত্র নাই।]

ইব্রাহিম ॥ সর্দার! না, না, চমকাবার কিছু নেই। আমি এসেছি একা—কোন হাতিয়ার নিয়েও আসিনি আমি।

জনার্দন ॥ শয়তানীটা তোমার কোথায়, ঠিক ধরতে পারছি না, ইব্রাহিম।

ইব্রাহিম ॥ আমি আমার ছেলে চাই।

জনার্দন ॥ আমি আমার মেয়ে এখনও ফিরে পাইনি, ইব্রাহিম। শুধু তাই নয় আমার ডান হাত হারাণ—তার বাড়িতে তুমি আগুন দিয়েছো।

ইব্রাহিম ॥ তোমার ডান হাত! য্যাদ্দিন আমি ছিলাম সর্দার। যাক্ সে কথা। আজ তোমার ডান হাত হারাণ—তার বাড়ি আমি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছি···তার বাড়ি আমি লুঠ করে এসেছি। লুঠ করে সেখানে যে ধন পেয়েছি, আমি তা' তোমাকে দিচ্ছি। বিনিময়ে তুমি আমাকে আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও।

জনার্দন ॥ হাসালে ইব্রাহিম।

ইব্রাহিম ॥ হাসো। আমার হাসার সময়ও আসছে। হ্যাঁ ওই এসেছে।

[কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান আগুনে ঝল্‌সানো মায়াকে কোলপাঁজা করিয়া এখানে আনিয়া গোলঘরের বেদীর উপর রাখিল]

জনার্দন ॥ একী!

পার্বতী ॥ মায়া! তুই!

[পার্বতী ছুটিয়া মায়ার কাছে গেল। লালমিঞাও]

মায়া ॥ মা, একটু জল। আমায় একটু জল দাও মা।

কনক ॥ আনছি—আমি আনছি।

[কনক জল আনিতে ছুটিয়া গেল]

পার্বতী ॥ [জনার্দনের প্রতি] ওগো, দ্যাখো এসে। আমার মেয়ের সারা শরীর আগুনে ঝলসে গেছে। [মায়ার প্রতি] এ দশা তোর কে করলো মা?

[জনার্দন রুদ্রমূর্তিতে চকিতে ইব্রাহিমের নিকট ছুটিয়া গিয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—]

জনার্দন ॥ তুমি।

[লালমিঞা মায়ার নিকট হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পিতার দিকে রোষকষায়িত নেত্রে তাকাইল]

লালমিঞা ॥ তুমি?

মায়া ॥ [মরিয়া হইয়া চীৎকার করিয়া] না, না, ও নয়। ওর দলেরও কেউ নয়।

জনার্দন ॥ [ইব্রাহিমের হাত ছাড়িয়া দিয়া] কে? তবে কে?

[কনক জল লইয়া আসিয়া মায়াকে জল পান করিতে দিল]

মায়া ॥ বলছি।

[মায়া জল পান করিতে লাগিল। নিস্তব্ধতা]

মায়া ॥ আরো দাও—আরো—

[কনক পুনরায় জল দিল। মায়া তাহা পান করিতে লাগিল। সকলে চঞ্চল কিন্তু নিস্তব্ধ।]

মায়া ॥ জ্বলে গেল! আমার গোটা শরীর জ্বলে গেল।

জনার্দন ॥ তুই আমায় বল, কার জন্যে তোর এই দশা।

মায়া ॥ হারাণ—হারাণ—তোমাদেরই হারাণ।

জনার্দন ॥ হারাণ! কী বলছিস্ তুই মায়া,—হারাণ।

মায়া ॥ হারাণ—শয়তান—কিন্তু আমি আর পারছি না—! মা! আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও।

কনক ॥ লাল, তুমি আর জ্যাঠাইমা ওকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে যাও। আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি।

[কনক ছুটিয়া গেল। পার্বতীর সাহায্যে লালমিঞা মায়াকে কোলপাঁজা করিয়া তুলিয়া লইয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেল। সঙ্গে গেল পার্বতী। সকলের দৃষ্টি যখন সেদিকে নিবদ্ধ, সেই সময়ে দেখা গেল, হারাণকে ধরিয়া লইয়া কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, ইব্রাহিম তাহা দেখিল।]

জনার্দন ॥ [গম্যমানা মায়ার উদ্দেশ্যে চীৎকার করিয়া] হারাণ! হারাণের জন্যে তোর এই দশা! কিন্তু কী করে তা' সম্ভব হয়?

ইব্রাহিম ॥ কী করে তা' হলো, সেটা হারাণ নিজেই বলুক।

[হারাণের সম্মুখে গিয়া ইব্রাহিম দাঁড়াইল। তাহার পার্শ্বস্থ এক যুবকের কটিদেশে রক্ষিত একটি ছোরা চট করিয়া তুলিয়া লইয়া তাহা নাচাইতে নাচাইতে ইব্রাহিম বলিল,—]

ইব্রাহিম ॥ তোমার বাড়ি যখন আমরা আক্রমণ করি, তুমি ঘরের ভেতর ছুটে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দাও। কিন্তু ঘরে তখন আগুন ধরেছে। আগুনের তাপ সইতে না পেরে বাধ্য হয়ে তুমি দরজা খুলে দাও। আমরা লুঠের জন্যে তোমার ঘরে ঢুকে দেখি, তুমি একা নও, হাত-পা-মুখ বাঁধা একটি মেয়ে—মেঝেতে পড়ে আগুনের তাপে ছট্‌ফট্ করছে। মুখের বাঁধন খুলে দিতেই দেখি, সে আমাদের মায়া। তোমার সর্দার জানতে চাইছেন, কী করে তা' সম্ভব হয়। বলো।

হারাণ ॥ তুমি ওই ছুরিটা অমন করে আমার চোখের সামনে নাচিও না। ওটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দাও। আর এক গেলাস জল আমাকেও খেতে দাও—আমি সব বলছি—সব বলবো।

ইব্রাহিম ॥ দাও—এক গ্লাস জল দাও।

[একজন ছুটিয়া গিয়া জল আনিয়া দিল। হারাণ তাহা পান করিল।]

ইব্রাহিম ॥ [ছুরিটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া] বলো। হাত বাঁধা, পা বাঁধা, মুখ বাঁধা মায়া—তোমার ঘরে! কী করে তা' সম্ভব হয়?

হারাণ ॥ টাকায় সবই সম্ভব হয়। আমি টাকা খেয়েছিলাম।

ইব্রাহিম ॥ কার টাকা?

হারাণ ॥ দুনিয়ার বন্ধু দীনবন্ধু চৌধুরীর।

ইব্রাহিম ॥ আশ্চর্য হচ্ছি না। কিন্তু মতলবটা জানতে চাই। মায়াকে সে চেয়েছিল ?

হারাণ ॥ না।

ইব্রাহিম ॥ তবে ?

হারাণ ॥ কেন, জানো না ? একগোছা কঞ্চি—অতো বড়ো জোয়ান তুমি,—একসঙ্গে ভাঙতে পারো ? পারো না। গোছাটা দু'ভাগ করে ফ্যালো। আমার মতো কমজোরী মানুষও তা' টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে। ওঁরা বুঝে ছিলেন, তোমাদের স্ট্রাইক বন্ধ করতে আর কোন পথ ছিলনা। ছিল এই একটি মাত্র পথ। মায়াকে সরিয়ে ফেলে দুই দলে একটা দাঙ্গা বাধানো। তাই আমাদের কয়েকজনকে টাকা খাইয়ে হাত করে—মায়ের কলিক হয়েছে বলে মেয়েকে থিয়েটার থেকে বাড়ী পাঠিয়ে দেন নিজের মোটরে, যে মোটরে রুমালে ক্লোরোফর্ম মাখিয়ে লুকিয়ে বসে-ছিলাম আমি।

[এমন সময়ে দূরে ফ্যাক্টরীর ভোঁ বাজিয়া উঠিল]

ইব্রাহিম ॥ [জনার্দনকে] সর্দার ! কারখানার ভোঁ বাজছে। তোমাদের কাজে যাবার সময় হলো।

[জনার্দন ধীরে ধীরে ইব্রাহিমের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং হঠাৎ তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—

জনার্দন ॥ ইব্রাহিম ! ভাই আমার ! আমাকে ক্ষমা কর্। চল্—আমরা গিয়ে বলি, দুনিয়ায় শুধু দুটো জাত—হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খৃষ্টান্ নয়, বৌদ্ধ নয়—দুনিয়ায় শুধু দুটো জাত—ধনিক আর শ্রমিক। আমরা সেই শ্রমিক। এ দু'জাতই পাশাপাশি সুখে শান্তিতে বেশ বেঁচে থাকতে পারে—যদি অন্যায় না হয়,—জুলুম না হয়। বাড়তি কাজের জন্যে মজুরী চাই। না পেলে কাজে আমরা যাবো না।

ইব্রাহিম ॥ তুমি আমাদের সর্দার,—যা বলতে হয়, গিয়ে তুমি বল। আমি চললাম—মায়াকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু তারও আগে আর একটা কাজ আছে। [হারাণের উদ্দেশ্যে] তুই দালাল,—তুই কুত্তা—তোর গায়ে হাত দোব না—তোকে ছোঁব না। তোর মুখে থুতু দেব।

[ইব্রাহিম হারাণের মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিল।]

॥ যবনিকা ॥

বন্দিতা

সেকালের নাটুকে বন্ধু

একালের ধন্বন্তরী

ডাঃ সুধীরচন্দ্র বোস

বি এস সি, এম বি, এফ আর সি এস, এফ আর সি ওজি,

শ্রীকরকমলেষু

সখ্যগর্বিত

মন্মথ রায়

শ্রীপঞ্চমী :

১৩৬৬

বন্দিতা

॥ প্রথম প্রকাশ ॥

বিশ্বরূপা নাট্য পরিকল্পনা মুখপত্র

Mercury প্রথম সংখ্যা ৫-৫-৫৯

প্রথম দৃশ্য

[১৯৪১ সাল। কাশীধামে বাঙালীটোলায় স্থানীয় একটি কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক সত্যশরণ রায়ের উপবেশন কক্ষ। কক্ষের ডাইনে এবং বাঁয়ে আরো দুইটি কক্ষ। প্রথমটি অধ্যাপকের তরুণীকন্যা বন্দিতার শয়ন ও পাঠ-কক্ষ। উপবেশন কক্ষটির পশ্চাৎভাগে, মধ্যস্থলে একটি দরজা—উহা অন্দরে যাইবার পথ। এতদ্ভিন্ন অধ্যাপকের শয়ন কক্ষের পার্শ্ব দিয়া আর একটি পথ—এই পথে বাড়ির বাহিরে যাতায়াত চলে। উপবেশন কক্ষে সোফাসেট এবং পুস্তকের আলমারি, বসিয়া লেখাপড়ার জন্য ছোট একটি টেবিল-চেয়ার।

অধ্যাপক রায় মধ্যবয়সী, গান্ধীপন্থী—লোকশিক্ষাদানে প্রবল আগ্রহ। অধ্যাপকের স্ত্রী কৃপাময়ী দেবী কিন্তু আদৌ কৃপাময়ী নহেন, কঠোরভাষিণী কলহপ্রিয়া বলিয়া সকলে তাঁহাকে ভয় করে। রায় দম্পতির একমাত্র সন্তান বন্দিতা—অষ্টাদশী এবং সুদর্শনা—পিতার কলেজের আই-এ ক্লাশের ছাত্রী। গৃহ ভৃত্য রামধন এই সংসারের সুখ দুঃখ ভাগী বিশ্বস্ত পরিজন।

সন্ধ্যা রাত্রি। অন্দর হইতে দৈনন্দিন লক্ষ্মীপূজার শংখধ্বনি শোনা গেল। ভৃত্য রামধন অন্ধকার উপবেশন কক্ষটিতে আলো দিবার জন্য লণ্ঠন হাতে আসিয়া দেখে সোফাতে বন্দিতা এবং অধ্যাপকের প্রিয় ছাত্র রমেশ মুখোমুখি বসিয়া রহিয়াছে। কাহারো মুখে কোন কথা নাই। বিমর্ষ বন্দিতা নত মুখে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে, রমেশ উদাসীনভাবে সিগারেট টানিতেছে। রামধন আসিতেই লণ্ঠনের আলোতে কক্ষটি আলোকিত হইয়াছে। রামধন দৃশ্যটি নির্বিকারভাবে দেখিল এবং যথাস্থানে লণ্ঠনটি রাখিয়া অন্দরে চলিয়া গেল।]

রমেশ ॥ আচ্ছা, আজ তা'হলে উঠি বন্দিতা !

বন্দিতা ॥ [রমেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া] না।

রমেশ ॥ তোমাদের চাকরটা না জানি কি মনে করে গেল !

বন্দিতা ॥ আমাদের এসব ও নতুন দেখছে না রমেশ।

রমেশ ॥ তোমার বাবার বাড়ি ফেরবার সময় হয়েছে বন্দিতা।

বন্দিতা ॥ [হাসিয়া] তুমি না তাঁর কাছেই পড়তে এসেছ রমেশ ! [হঠাৎ গম্ভীর হইয়া] আমার বড় ভয় করছে। [সানুনয়ে] আমায় তুমি বাঁচাও রমেশ।

রমেশ ॥ আমাকে অনেক কিছু ভেবে দেখতে হবে বন্দিতা। মাথার ওপর রয়েছেন বাপ-মা। আমি এখনো বি-এ পাশ করিনি। নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই আমার। অনেক কিছু ভেবে দেখবার আছে।

বন্দিতা ।। রমেশ !

রমেশ ।। আমার এক বন্ধু সবে মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে ডাক্তার হয়েছে। আমি ভাবছি—

[ধূপ-ধুনা দিতে কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন অধ্যাপক-পত্নী কৃপাময়ী। তিনি আড় চোখে ইহাদের একবার দেখিয়া লইলেন এবং কক্ষ-মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধূপের ধোঁয়া দিতে লাগিলেন।]

বন্দিতা ।। সমবায় আন্দোলনের গোড়ার কথাটা হচ্ছে—

রমেশ ।। সেটা প্রফেসর রায় দু'কথায় বলে দিয়েছেন—"সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" কিন্তু তিনি তো এখনো বাড়ি ফিরলেন না। আজ তা'হলে আমি উঠি বন্দিতা।

কৃপাময়ী ।। বুঝি আমি, সব বুঝি। যত বোকা আমাকে তোমরা ঠাওরাও, আমি তত বোকা নই। আমি ধানের চালেরই ভাত খাই।

বন্দিতা ।। এসব তুমি কি বলছো মা !

কৃপাময়ী ।। [রমেশকে] বলি তুমি কার কাছে পড়তে আসো ? আমার স্বামীর কাছে না আমার মেয়ের কাছে ? সেই বুড়োর কাছে না এই ছুঁড়ীর কাছে ? আমার নাম কৃপাময়ী। কৃপা করে সব সয়ে থাকি। নইলে সব ঝেঁটিয়ে বিদায় করতাম।

[বিড় বিড় করিতে করিতে অন্দরে চলিয়া গেলেন।]

রমেশ ।। এরপর আর আমার থাকা চলেনা বন্দিতা।

বন্দিতা ।। কিন্তু এসব তুমি নতুন শুনছো না রমেশ। বরং তোমার মুখে আমিই আজ নতুন কথা শুনছি। যাবে যাও কিন্তু আমাকে বলে যাও, এখন আমি কি করবো।

রমেশ ।। আমি তো বলেছি, ভেবে দেখ্‌ছি।

বন্দিতা ।। কিন্তু ভেবে দেখবারও সময় বুঝি আর নেই। কত লোভ—কত প্রলোভন—কত স্বপ্ন তুমি আমায় দেখিয়েছিলে রমেশ। সে সব তুমি ভুলো না—ভুলো না রমেশ।

[বাহিরে দরজায় করাঘাত]

রমেশ ।। বোধ হয় তোমার বাবা।

[রমেশ গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। কক্ষে প্রবেশ করিল সুরেশ—রমেশেরই সতীর্থ যুবক বন্ধু।]

ও; তুমি !

সুরেশ ।। প্রফেসর রায় বুঝি বাড়ি ফেরেননি ?

রমেশ ।। না সুরেশ এবং আশা করি সেজন্যে তুমি দুঃখিত হবে না। [বন্দিতাকে] আচ্ছা, আমি তাহলে চলি। [সুরেশকে] সমবায় আন্দোলনের গোড়ার কথাটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হচ্ছিল—তুমি এবার সেটা শেষ কর সুরেশ।

[রমেশ চলিয়া গেল। দরজা বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে সুরেশ বন্দিতার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।]

সুরেশ ॥ কি বলে গেল ঐ রাস্কেলটা ? বিয়ে করতে রাজি হ'ল না ?

[বন্দিতা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল]

বন্দিতা ॥ তুমি আমায় বলেছিলে সুরেশদা। আমি তখন বিশ্বাস করিনি। তোমার সব কথা মিলে গেছে। আমার সামনে একটিমাত্র পথ খোলা আছে—আত্মহত্যা।

[বাহিরের দরজায় পুনরায় করাঘাত।]

সুরেশ ॥ [বন্দিতাকে] কে ?

বন্দিতা ॥ জানিনা। তোমাকে আজ আমার বড় দরকার সুরেশদা।

[পুনরায় দরজায় করাঘাত। প্রফেসর সত্যশরণ রায় আসিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'এখন সন্ধ্যে না রাত দুপুর ?']

বন্দিতা ॥ বাবা !

[অন্দর হইতে ছুটিয়া আসিল রামধন। সে সুরেশ এবং বন্দিতার প্রতি অর্থপূর্ণ তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ছুটিয়া গেল দরজায়। দরজা খুলিয়া দিল। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কক্ষে ঢুকিলেন প্রফেসর সত্যশরণ রায়। উত্তেজিত ভাবে কক্ষে পাদচারণা করিতে করিতে তিনি তাঁর বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সুবিধামত, ফাঁকে ফাঁকে রামধন প্রফেসর রায়ের হাত হইতে ছাতা, লাঠি এবং ব্যাগ সংগ্রহ করিতে লাগিল। বক্তৃতার মাঝেই ক্রমে ক্রমে তিনি ঘড়ি-চেন খুলিয়া দিলেন, জামাও খুলিয়া দিলেন। এই সব দ্রব্যাদি সংগ্রহান্তে রামধন অন্দরে চলিয়া গেল।]

সত্যশরণ ॥ এই যে বাবা সুরেশ—বন্দিতা মাও রয়েছিস দেখছি। বড় ভাল হ'ল। কাশী-কংগ্রেসের সমাজসেবক শাখা আজ একটা সভা ডেকেছিল। কলেজ থেকে আমায় ধরে নিয়ে গেল সেই সভায়! সভায় নামকরা সব নেতারা ছিলেন। তাঁরা বলেন—স্বরাজ আন্দোলনই আজ সবচেয়ে বড় সমাজসেবা। আমি বললাম, কোনো আন্দোলনই সার্থক হবে না, হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা একতাবদ্ধ হচ্ছি, আর সে একতাবদ্ধ হওয়ার একমাত্র উপায় সমাজে সমবায়-মূলক জীবনযাত্রা গড়ে তোলা। জীবিকার তাগিদ জীবনের সব চেয়ে বড় তাগিদ। সমবায়ের ভিত্তিতে আমরা যদি জীবিকা নির্বাহের আয়োজন করি, প্রতিটি মুহূর্তে আমরা অনুভব করবো, 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' যে ঐক্য তখন আমাদের আসবে তার শক্তি হবে প্রচণ্ড, সে শক্তি দুর্ণিবার গতিতে লড়াই করবে বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে, হ্যাঁ,—বিচ্ছিন্নভাবে নয়, বিভক্ত হয়ে নয়, সুসংহত, ঐক্যবদ্ধ, সামাজিক শক্তিতে।...তোমাদের কি মনে হচ্ছে ? আমি মিথ্যা বলেছি ? অন্যায় বলেছি ?

সুরেশ ॥ না স্যার।

সত্যশরণ ॥ কিন্তু ওরা আমাকে 'হুটআউট' করে দিল হে! কেউ আমার কথা শুনতেই চাইলো না। ওদের সকলের গলার স্বর ডুবিয়ে দিয়ে আমি চেঁচিয়ে

বললাম, এ বিষয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন, আপনারা জানেন ? অনেক আগে যে কথা তিনি বলেছেন, আজ এই ১৯৪১ সালেও তাঁর সে কথার প্রতিটি অক্ষর স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু তা' শোনাবার আর অবকাশ পেলাম না আমি। সভাভঙ্গের ঘোষণা করে দিলেন সভাপতি। কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথের বাণী চাপা পড়বে না। সত্যের আগুন চিরকাল জ্বলবে।

[ইতিমধ্যে এক অঘটন ঘটিয়া গেল। অধ্যাপক পত্নী কৃপাময়ী এক গামলা নোংরা জল হাতে লইয়া আসিয়া এখানে দাঁড়াইয়া অধ্যাপকের এই উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি গামলার ঐ নোংরা জল স্বামীর গায়ে নিক্ষেপ করিলের।

সত্যশরণ ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] একি !

কৃপাময়ী ॥ আগুনটা নেভে কিনা আমি দেখলাম।

সত্যশরণ ॥ আঃ

[গা' হইতে জল ঝাড়িয়া ফেলার চেষ্টা।]

বন্দিতা ॥ এক গামলা নোংরা জল তুমি বাবার গায়ে ঢেলে দিলে মা !

কৃপাময়ী ॥ আগুন নেবাতে হলে, জলই ঢালতে হয়—যত বোকা হই না কেন, এটুকু জ্ঞান আমার আছে। যতটুকু সময় বাড়িতে থাকবে লোকটা, কেবল গর্জন আর গর্জন।

সুরেশ ॥ মেঘ গর্জনের পরেই হয় বর্ষণ।

সত্যশরণ ॥ [হাসিয়া] যা' বলেছ। তা' ভালোই হ'ল। আজ চান করবার সময় পাইনি। সেটা হয়ে গেল।

সুরেশ ॥ আপনি সক্রেটিস হয়ে গেলেন স্যার। তাঁর জীবনীতে পড়েছি, তাঁর স্ত্রী জ্যানথিপিও এমনি—

[এই কথা শুনিয়া কৃপাময়ী সুরেশের প্রতি অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সুরেশ থতমত খাইয়া ভয়ে বলিয়া উঠিল—]

তিনিও এমনি সৎব্যবহার করতেন স্বামীর সঙ্গে।

সত্যশরণ ॥ [চমৎকৃত হইয়া সুরেশের প্রতি] হ্যাঁ-হ্যাঁ, যা বলেছ !

[এর মধ্যে কৃপাময়ী তাঁর স্বামীকে পাকড়াইয়াছেন।]

কৃপাময়ী ॥ চলে এস।

সত্যশরণ ॥ কোথায় ?

কৃপাময়ী ॥ আগুনে সেঁকতে হবে না এখন ?

সত্যশরণ ॥ কা'কে ?

কৃপাময়ী ॥ আর কা'কে ? তোমাকে ! না সেঁকলে রক্ষে আছে। নিউমনিয়া বাধিয়ে বসবে না।

সত্যশরণ ॥ কিন্তু তাই বলে—

কৃপাময়ী ॥ ভালো চাও তো এসে জামাকাপড় ছাড়ো।

বন্দিতা ॥ হ্যাঁ বাবা, ভেতরে যাও। ভদ্রলোকের বাড়ি—যা সব হ'চ্ছে—এ আর দেখা যায় না।

[কৃপাময়ী সত্যশরণকে লইয়া অন্দরের দিকে যাইতেছিলেন—বন্দিতার এই কথায় হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। রুখিয়া উঠিয়া বলিলেন—]

কৃপাময়ী ॥ কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ খুকি। ভদ্রলোকের বাড়ি, কিন্তু তুমি যা করেছ তাতে ইচ্ছে হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরি। নির্লজ্জ—বেহায়া—

সত্যশরণ ॥ কি হ'ল? ও আবার কি করলো?

কৃপাময়ী ॥ [অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় তীব্র কণ্ঠে স্বামীকে] এ-স—

[এক হেঁচকা টানে স্বামীকে অন্দরে টানিয়া লইয়া গেলেন।]

বন্দিতা ॥ এরপর—এর পরেও কি আর আমার বেঁচে থাকা চলে সুরেশদা?

সুরেশ ॥ মা তবে জেনেছেন?

বন্দিতা ॥ মা অন্ধ নন সুরেশদা। আর, এখন জানবেন বাবা। দেবতার মত ঐ লোকটা......না না, তাঁর জানবার আগেই আমি—তুমি যাও—তুমি চলে যাও সুরেশদা—

সুরেশ ॥ তুমি আমাকে কোনোদিনও ভালোবাসনি বন্দিতা। কিন্তু আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

বন্দিতা ॥ এসব কথা আর আমি শুনতে চাইনা—আমি সইতে পারি না—তোমাদের দেখলে আমার এখন ঘৃণা হয়। [বমির উদ্রেক হইল, কিন্তু কোনমতে তাহা চাপিয়া] চলে যাও—Get-out!

সুরেশ ॥ না। আমি যাব না। চমকে উঠোনা বন্দিতা, আমি আজ বলতে এসেছি—তোমাকে বিয়ে করবো—আমি।

বন্দিতা ॥ সুরেশদা!

সুরেশ ॥ হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালবাসি বন্দিতা। আমি প্রমাণ করতে চাই আমার এ প্রেম মিথ্যা নয়।

বন্দিতা ॥ কিন্তু—কিন্তু—তুমিতো সব জানো!

সুরেশ ॥ হ্যাঁ, জানি। আমার এ চাঁদে কলঙ্ক আছে জানি।

বন্দিতা ॥ তবু!

সুরেশ ॥ তবু!...আমাকে নিয়ে তুমি বাঁচবে—তোমাকে নিয়ে আমি বাঁচবো।

বন্দিতা ॥ তোমাকে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে সুরেশদা।

সুরেশ ॥ তোমার বাবাকে ডেকে আনো। আমি তাকে বলছি।

বন্দিতা ॥ না।

সুরেশ ॥ না! কেন! কেন বন্দিতা?

বন্দিতা ॥ আমি অশুচি, আর তুমি দেবতা। আমাকে দিয়ে দেবতার পূজা চলে না সুরেশদা।

সুরেশ ॥ শোন বন্দিতা—

বন্দিতা ॥ না। তোমাকে আমি জানলাম, তোমাকে আমি সত্যি করে চিনলাম,। আজ এইটুকুই আমার জীবনে পরম লাভ। ভেবেছিলাম মরব, কিন্তু না, আমি মরব

না। আমার কলঙ্কের বোঝা সারা জীবন তুমি বইতে রাজি ছিলে, অথচ সে কলঙ্কের জন্য এতটুকু দায়ী তুমি নও। তাই ভাবছি, যে কলঙ্কের জন্য আমি নিজে দায়ী, সে কলঙ্কের বোঝা আমি নিজেই বইবো সারাজীবন, আর কারো ঘাড়ে তা আমি চাপাবো না সুরেশদা।

সুরেশ ॥ তোমার এ Sentimentটা আমি না বুঝি তা' নয়। [হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া] এ যেন মহত্ত্বের একটা Competition চলছে। আমি তোমার সব জেনে শুনে তোমাকে বিয়ে করতে চাইছি, আর তুমি তাতে রাজি হচ্ছ না শুধু এই জন্য যে 'সুরেশদা, তুমি যদি এত মহৎ হতে পারো, আমিই বা কেন কম যাব।'…কিন্তু বন্দিতা, এটা মহত্ত্বের প্রশ্ন নয়। I love you with all thy faults.

[বন্দিতা স্তম্ভিত হইল। কি যেন ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল।]

বন্দিতা ॥ না-না, এ হয় না—এ হতে পারে না—এ হবে না। আমার মাথা ঘুরছে। চলে যাও—চলে যাও সুরেশদা।

সুরেশ ॥ [বন্দিতার হাত চাপিয়া ধরিয়া পরম আবেগে] বিশ্বাস কর—বিশ্বাস কর—আমি তোমাকে ভালবাসি বন্দিতা!

বন্দিতা ॥ [হাত ছাড়াইয়া লইয়া] কিন্তু আমি তোমাদের আর বিশ্বাস করি না। তোমাদের সব কিছু ছলনা। আমার বাবার কাছে পড়বার নাম করে এসে—প্রেমের পড়া পড়েছ তোমরা আমার সঙ্গে। আমার সর্বনাশ করেছ তোমরা। তোমাদের সবাইকে আমি ঘৃণা করি। —ঘৃণা করি—

[বন্দিতার বমির উদ্রেক হওয়াতে কোনো রকমে তাহা চাপিয়া ছুটিয়া অন্দরে চলিয়া গেল। সুরেশ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিলেন অধ্যাপক সত্যশরণ রায়।]

সত্যশরণ ॥ এই যে! এই যে বাবা সুরেশ, তুমি আছো? বাঁচা গেল। আমাদের বড় বিপদ। তুমি ডাক্তার ত্রিবেদীকে এখনি একবার এখানে—

[কৃপাময়ীর প্রবেশ।]

সুরেশ ॥ আমি যাচ্ছি স্যার—আমি যাচ্ছি।

কৃপাময়ী ॥ না। ডাক্তার ডাকতে হবে না।

সত্যশরণ ॥ কিন্তু—কিন্তু—বন্দিতা মা'র যা অবস্থা দেখছি তাতে—

কৃপাময়ী ॥ আমি বলছি ডাক্তার ডাকতে হবে না। ডাক্তার এলে আমি অনর্থ করে ছাড়বো বলে দিচ্ছি। তোমাকে আমি যা করতে বলেছি, তুমি তাই করো। আর তা যদি না করো, আমি বিষ খাবো বলে রাখছি।

[অন্দরে চলিয়া গেলেন।]

সত্যশরণ ॥ ও! আচ্ছা।

[সত্যশরণ মুহূর্তের জন্য শান্ত সমাহিত চিত্তে কি ভাবিয়া লইলেন।]

সত্যশরণ ॥ সুরেশ, তুমি বাবা একটু বসো। না-না, আর ডাক্তার ডাকতে হবে না। আমি আমার কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছে একটা চিটি লিখে দিচ্ছি, দয়া করে আজই সেটা পৌঁছে দেবে তাঁর কাছে।

[সুরেশ বসিল। সত্যশরণ কাগজ কলম লইয়া ত্বরিৎ গতিতে একটা চিঠি লিখিয়া সুরেশের হাতে দিলেন।]

আমি কলেজের কাজে ইস্তফা দিয়ে সপরিবারে আজই রাত্রে যাচ্ছি কাশী ছেড়ে।

সুরেশ ॥ সে কি স্যার !

সত্যশরণ ॥ না-না—নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে বাবা। যাওয়ার আগে তোমাকে আর একটি কাজের ভার দিয়ে যেতে চাই সুরেশ—[আলমারী হইতে একটি মাসিকপত্র টানিয়া লইয়া রবীন্দ্রনাথের সমবায় সম্পর্কিত একটি রচনা বাহির করিয়া] আজকের সভাতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই বাণীটির কথাই আমি বলতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সভাপতি তা না শুনে সভা ভেঙে দেন। তুমি বাবা এই রচনাটি সভাপতির হাতে পৌঁছে দেবে কালই সকালে। তাঁকে পড়তে বলো—বিশেষ করে এই জায়গাটা, যেখানে তিনি বলছেন—"আজ যাঁহারা জীবধাত্রী পল্লীভূমির রিক্ত স্তনে স্তন্য সঞ্চার করিবার জন্য সমবায় ব্রত লইয়াছেন, তাঁহারা নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে আলো আনিবার জন্য প্রদীপ জ্বালিতেছেন, মঙ্গলদাতা বিধাতা তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ; ত্যাগের দ্বারা, সেবা দ্বারা, পরস্পর মৈত্রী বন্ধন দ্বারা, বিক্ষিপ্ত শক্তির একত্র সমবায়ের দ্বারা, ভারতবাসীর বহুদিন সঞ্চিত মূঢ়তা ও ঔদাসীন্যজনিত অপরাধরাশির সঙ্গে সঙ্গে রুষ্ট দেবতার অভিশাপকে সেই সাধকেরা দেশ হইতে তিরস্কৃত করুন এই আমি একান্ত মনে কামনা করি।"

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হিমালয়ের বুকে কোন একটি পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস। চারিদিকে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য তুষারশুভ্র হিমালয়ের অপরূপ শোভা। অধ্যাপক সত্যশরণ রায়ের ভাড়া করা কটেজের উপবেশন কক্ষ। সূর্যকিরণ-উদ্ভাসিত প্রভাত। বাহির হইতে অধ্যাপক সত্যশরণ রায় প্রাতঃভ্রমণ অন্তে ঘরে ফিরিলেন। তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল একটি পাহাড়ী যুবক, তাহার হাতে কিছু কাঠের ও বেতের তৈরী রঙিন খেলনা।]

সত্যশরণ ॥ [গৃহ ভৃত্যকে] বাহাদুর !

[গৃহাভ্যন্তর হইতে ছুটিয়া আসিল বাহাদুর। সত্যশরণ ওভারকোট, লাঠি টুপিটি খুলিয়া তাহার হাতে দিলেন।]

সত্যশরণ ॥ [বাহাদুরকে] হামলোককো চা দেও।

বাহাদুর ॥ জী হুজুর।

[বাহাদুর পোষাকাদি লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।]

পাহাড়ী যুবক ॥ খেলনাগুলো দেখুন স্যার।

সত্যশরণ ॥ কিন্তু তার আগে আমি তোমার কাছে জানতে চাই, এ বাড়িতে তুমি কেন খেলনা আনলে ?

পাহাড়ী যুবক ॥ [হাসিয়া] এ বাড়িতে খোকার কান্নার আওয়াজ শুনলাম। ওতে মালুম হ'ল, এ বাড়িতে বাচ্ছা আছে।

সত্যশরণ ॥ তুমি তো দেখছি বেশ বুদ্ধিমান ছোকরা হে! [সামনের চেয়ারটি দেখাইয়া] বোস।

পাহাড়ী যুবক ॥ না সার, আমি দাঁড়িয়েই থাকবো।

সত্যশরণ ॥ তুমি দেখছি বাংলা শুধু বোঝ না, কিছু কিছু বলতেও পারো!

পাহাড়ী যুবক ॥ দশ বছর আমি কোলকাতায় নকরী করলাম। বাবাটা আমার এখানে মারা গেলো। খবর পেলাম, নকরী ছেড়ে চলে এলাম। না এলে আমার বুড়ি মাটাকে কে দেখবে?

সত্যশরণ ॥ আহা! তোমার বাবা মারা গেছেন! কি করে এখন তোমার চলছে বাবা?

পাহাড়ী যুবক ॥ এখানকার মিশন ইস্কুলে আমি বেয়ারার কাজ করি, দশটা থেকে পাঁচটা। মাত্র দশটা টাকা আমি বেতন পাই। উতে চলে না। তাই খেলনা তৈরি করি, বেচি—

সত্যশরণ ॥ বাঃ বাঃ! তোমার নাম কি বাবা?

পাহাড়ী যুবক ॥ খড়্গ বাহাদুর।

সত্যশরণ ॥ বাঃ বেশ নাম। খেলনা তৈরি আর বিক্রি করে তোমার চলে বাবা?

পাহাড়ী যুবক ॥ আগে ভাবলাম চলবে—তাই না এ কাজটা আমি ধরলাম। কাজটা আমার এমনি ভালোও লাগে খুব। তা এখন দেখি মিছিমিছি আমি খেটে মরি।

সত্যশরণ ॥ কেন! কেন? খেলনা বিক্রি হয় না তোমার?

পাহাড়ী যুবক ॥ বিক্রি হবে না, খুব হবে। আমার হাতের কাজ যে দেখবে সে নিবে। এই তো সব আমার কাজ দেখুন। পছন্দ হয় কিনা আপনি বলেন।

[খড়্গ বাহাদুর খেলনাগুলি অধ্যাপকের সামনে ধরিল।]

সত্যশরণ ॥ চমৎকার?

[বাহাদুর চা এর ট্রে লইয়া আসিয়া টেবিলে রাখিল। সঙ্গে এক প্লেট কেক ও বিস্কুট। বাহাদুর বাহিরের দিকে কাজে চলিয়া গেল।]

এসো, চা খেতে খেতে তোমার খেলনা দেখি। [খড়্গ বাহাদুর ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া, সত্যশরণ তাহাকে টানিয়া আনিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিলেন] ভয় কেন বাবা? সারাজীবন তোমাকে লড়াই করতে হবে। কি করে তুমি তা করবে, যদি একটা চেয়ারে বসতে ভয় পাও, যদি আমার সঙ্গে এক পেয়ালা চা খেতে ভয় পাও, অথচ তোমার নাম হ'ল কিনা খড়্গ বাহাদুর। [হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া চা ঢালিতে লাগিলেন] নাও, চা খাও, কেক খাও, বিস্কুট খাও। [চা খাইতে খাইতে] এইবার বলো খড়্গ বাহাদুর খেলনা তোমার বিক্রি হয় অথচ তোমার তেমন আয় হয় না, কেন?

পাহাড়ী যুবক ॥ মহাজনের কাছে ধার করে টাকা নিব, তবে আমার খেলনা তৈরি হবে।

সত্যশরণ ॥ মহাজন! মহাজনের কাছে টাকা ধার নিয়ে তবে তোমার ব্যবসা? আর আমাকে তোমার কিছু বলতে হবে না। আসল দূরে থাক সারাজীবনেও মহাজনের সুদই তুমি শোধ করে উঠতে পারবে না। এ শহরে যারা খেলনা তৈরি করে সবাই কি তোমার মত মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নেয় খড়্গ বাহাদুর?

পাহাড়ী যুবক ॥ সবাই নেয় সাব্। আর তা' না নিলে কোথায় পাব আমরা টাকা?

সত্যশরণ ॥ বুঝেছি, বুঝেছি। তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না খড়্গ বাহাদুর। গোটা দেশটা ছেয়ে গেছে এই পাপে। এ পাপ থেকে বাঁচবার একটা পথ আছে খড়্গ বাহাদুর, সেটা হ'ল সমবায়ের পথ। আজ সন্ধ্যায়, এ শহরে যারা খেলনা তৈরি করে, তাদের সবাইকে ডেকে আনতে পারবে আমার বাড়িতে? বলবে চা খেতে আমি তাদের ডেকেছি। আসবে তারা?

পাহাড়ী যুবক ॥ সবাই আসবে সাব্।

সত্যশরণ ॥ বেশ, বেশ। সবাই এসো। উঠছো যে?

পাহাড়ী যুবক ॥ আমার ইস্কুলের কাজের টাইম্ এসে গেলো সাব্। এ খেলনাগুলো?

সত্যশরণ ॥ এ আমি সব রাখলাম খড়্গ বাহাদুর! কত দাম?

পাহাড়ী যুবক ॥ [সবিস্ময়ে] সব? সবগুলো নেবেন সাব্? [হাসিয়া] বাচ্ছাতো আপনার মেয়ের একটা।

সত্যশরণ ॥ হ্যাঁ, একটা। কিন্তু এমন খেলনা ও সবাই ভালবাসে।

পাহাড়ী যুবক ॥ তা লোকতো সাব আপনারা দু'জন। আপনি আর আপনার লেড়কি। আপনার বহুটা তো মারা গেল সেদিন।

সত্যশরণ ॥ ওঃ, হ্যাঁ। আমার স্ত্রী মারা গেছেন। কিন্তু—কিন্তু তুমি তা জানলে কি করে খড়্গ বাহাদুর?

পাহাড়ী যুবক ॥ আমি এই পাড়াতেই থাকি সাব। মড়া নিয়ে যেতে আমি দেখলাম। পাড়ার সব খবরই রাখি সাব। আমি তবে এখন আসি।

সত্যশরণ ॥ কিন্তু দামটা নিয়ে যাও। [পকেট হইতে একটি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া] এই নাও, ধর।

পাহাড়ী যুবক ॥ দাম হ'ল ছ' রুপেয়া।

সত্যশরণ ॥ তা হোক। তুমি এই দশ টাকাই নাও বাবা।

পাহাড়ী যুবক ॥ না সার। দামটাই আমি নেবো। ভিক্ষাতো আমি নেবো না সাব্।

সত্যশরণ ॥ ভিক্ষা বলছো কেন? আমি তো খুশী হয়ে তোমায় দিচ্ছি বাবা।

পাহাড়ী যুবক ॥ খুশী হয়ে তুমি আমাকে চা খেতে দিয়েছ সাব্‌ সেটা আমি খেয়েছি।

সত্যশরণ ॥ সাবাস-সাবাস। [পকেট হইতে ছয়টি টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিয়া] এই নাও তোমার খেলনার দাম। বেঁচে থাকো বাবা।

[বাহির হইতে বাহাদুর আসিয়া দাঁড়াইল।]

বাহাদুর ॥ ডাক্তার সাব।

সত্যশরণ ॥ কই, কোথায়? আসুন, আসুন ডাক্তার সাহেব। [পাহাড়ী যুবককে চুপি চুপি] তোমরা সব কিন্তু আজ সন্ধ্যায় এসো বাবা।

পাহাড়ী যুবক ॥ আসবো, আসবো সাব্‌।

[পাহাড়ী ডাক্তার আসিয়া দাঁড়াইলেন। খড়্গ বাহাদুর চলিয়া গেল। গৃহ ভৃত্য বাহাদুর চায়ের ট্রেটি লইয়া অন্দরে চলিয়া গেল।]

ডাক্তায় ॥ গুডমর্ণিং মিষ্টার রায়!

সত্যশরণ ॥ গুড্‌মর্ণিং ডাক্তার সাব। আসুন, বসুন।

ডাক্তার ॥ [বসিতে গিয়া টেবিলের উপরে রক্ষিত খেলানাগুলি দেখিয়া] খেলনার দোকান দেখছি। কলকাতার মেডিকেল কলেজে যখন পড়তাম তখন সেখানে এক নার্সকে দেখতাম হাতে পয়সা এলেই সে কিনতো খেলনা। কিনতো কিন্তু বিলোতো না। ঘর ভরে সাজিয়ে রাখতো। তার ঘরে গেছেন কি মনে হবে কোন খেলনার দোকানে এসেছি। বিচিত্র নয় কি মিষ্টার রায়?

সত্যশরণ ॥ সত্যিই বিচিত্র। ছেলে মেয়ে ছিল কি ছিল না?

ডাক্তার ॥ কাহিনীটা খুব করুণ মিষ্টার রায়। অনেক কষ্টে আমরা রহস্যটার সন্ধান পেয়েছিলাম।

সত্যশরণ ॥ রহস্য! কি রহস্য?

ডাক্তার ॥ নার্সিং পড়ার সময় কুমারী ঐ মেয়েটির মাতৃত্বের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ঔষধ প্রয়োগে সেই সম্ভাবনা থেকে মুক্তি পায় মেয়েটি।

সত্যশরণ ॥ য়্যা?-

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়াটা হয় সাংঘাতিক।

সত্যশরণ ॥ কী?

ডাক্তার। মেয়েটি রোজ রাত্রে স্বপ্ন দেখা শুরু করে, যে শিশুটিকে মেরে ফেলা হ'ল, সে যেন মরেনি। সে যেন তার কোলে শুয়ে আছে।

সত্যশরণ ॥ বলেন কি?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ। রোজ রাতে মেয়েটি দেখে এই স্বপ্ন। শিশুটি যেন ক্রমে ক্রমে বড় হয়, তারই কোলে, তারই স্নেহে। তারই কান্না থামাতে, তাকেই খেলা দিতে, দরকার হয় খেলনার। রাতের স্বপ্ন দিনের আলোতেও যায় না মুছে। দিনের পর দিন মেয়েটি তাই কিনে চলে খেলনা।

সত্যশরণ ॥ বটে!

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ।

সত্যশরণ ॥ A magnificent obsession !

ডাক্তার ॥ বলতে পারেন।

সত্যশরণ ॥ সত্যিই ব্যাপারটা বড় করুণ।

ডাক্তার ॥ না না, এখন পর্যন্ত ব্যাপারটা তত করুণ নয় যত করুণ, শেষে।

সত্যশরণ ॥ বলুন। এখনও কি তিনি, দিনের পর দিন খেলনা কিনেই চলেছেন ? না পাগল হয়ে গেছেন ?

ডাক্তার ॥ না। পাগল তিনি হন নি। কয়েক বছর আগে কলকাতায় গিয়ে দেখি সেই নার্সের কাজই তিনি করে যাচ্ছেন। বেশ বহাল তবিয়তেই আছেন। কিন্তু খেলনা আর কেনেন না।

সত্যশরণ ॥ কেনেন না ?

ডাক্তার ॥ না। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "কি হ'ল ? খেলনা কেনা বন্ধ কেন ?"

সত্যশরণ ॥ কি বললেন ?

ডাক্তার ॥ খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। মাথা নিচু করে আমায় বললেন, তার সে শিশুটি মারা গেছে।

সত্যশরণ ॥ সত্যি—সত্যি, ব্যাপারটা অতি করুণ।

ডাক্তার ॥ কিন্তু জীবনটা অতি বিচিত্র মিঃ রায়। আজ সেই মেয়েটির মত হাসিখুশী মহিলা আপনি আর দেখতে পাবেন না। কারণ এবার তার সত্যি সত্যিই ছেলে হয়েছে। সেই ছেলেকে নিয়ে তার কি গর্ব ! এবারে এই পাহাড়ের "বেবী শো"তে তার ছেলেটাই হয়েছে ফার্ষ্ট।

সত্যশরণ ॥ তিনি তবে এখন এখানে ?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ মিষ্টার রায়। তিনি এখন আমার স্ত্রী।

সত্যশরণ ॥ সাবাস—সাবাস। আপনি আমাকে অবাক করেছেন ডাক্তার সাহেব। আপনার স্ত্রীকে আমি দেখতে চাই—আর আপনাকেও আমি নমস্কার করি। আপনার সৎসাহস আছে। আপনার মনে আছে উদারতা, আছে দয়া। কিন্তু···আমি জানি এমন এক Scoundrel-কে, এমন এক Rascalকে—আমি যদি কখনও পাই তাকে, টুঁটি চেপে মেরে ফেলবো—

[অন্দর হইতে শশঙ্কিতা বন্দিতার প্রবেশ।]

বন্দিতা ॥ কী হয়েছে—কী হয়েছে বাবা ?

ডাক্তার ॥ না না, কিছু হয়নি মিসেস্ চৌধুরী। আমার কাছে একটা গল্প শুনে আপনার বাবা ভারী উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন এই যা। [সত্যশরণের প্রতি] মিঃ রায়। আপনি শান্ত হোন। নইলে মিসেস চৌধুরী হাসবেন। চলুন মিসেস চৌধুরী, আপনার মেয়েটিকে দেখে আসি।

বন্দিতা ॥ না ডাক্তার সাহেব। বড়কষ্টে আমার মেয়েকে এইমাত্র ঘুম পাড়িয়ে

রেখে এলাম। আপনি দেখতে গেলে আবার যদি ওঠে, আবার তাকে ঘুম পাড়াতে লাগবে পুরো একটি ঘণ্টা। আর খুকু আজ বেশ ভালই আছে।

ডাক্তার ॥ না না—তবে থাক। কালও তো দেখেছি। Crisis পার হয়ে গেছে। এইবার নিশ্চিন্ত মনে মিস্টার চৌধুরীকে কন্যার মুখ দর্শনের জন্যে আসতে লিখে দিন মিঃ রায়।

[ডাক্তারের এই একটি কথাতে উপস্থিত আর দুইটি প্রাণীর মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। ডাক্তার তাহাদের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন।]

ডাক্তার ॥ ও, হ্যাঁ, না—তা হয়তো এখন উচিত হবে না। মিসেস রায়কে যদি আমি চিকিৎসা করে বাঁচাতে পারতাম তবেই আমার এ কথা বলার অধিকার ছিল—বললে শোভাও পেত। সত্যি মিসেস চৌধুরী, আপনার deliveryর আগেই আপনার মা যে অমনভাবে হার্টফেল করে মারা যাবেন এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। বেশ সেরেই তো উঠছিলেন তিনি। যাকে বলে 'হরিষে বিষাদ' এ যেন হয়ে গেল তাই। আচ্ছা, আজ তবে উঠি।

সত্যশরণ ॥ না—আপনাকে আর একটু বসতে হবে।

ডাক্তার ॥ [হাতঘড়ি দেখিয়া] কিন্তু কথায় কথায় দেখছি অনেক বেলা হয়ে গেছে। আমার কিছু urgent কাজও আছে। তার চেয়ে বরং সন্ধ্যেবেলা আসবো মিঃ রায়। আর আপনি আমার স্ত্রীকে দেখতে চেয়েছিলেন—তাঁকেও বরং সঙ্গে নিয়ে আসবো। কিন্তু একটা কথা মিসেস চৌধুরী, তিনি এসে যখন দেখবেন আধুনিক ফ্যাসান করতে গিয়ে আপনি মাথায় সিঁদূর পরেন না, চটে না গেলেও, দুঃখিত হবেন তিনি নিশ্চয়ই। কথাটা কিন্তু আমি আগে থেকেই জানিয়ে রাখলাম মিসেস চৌধুরী, বেয়াদপী মাফ্ করবেন।

বন্দিতা ॥ না ডাক্তার সাহেব। আপনি আপনার স্ত্রীকে আনবেন। আমি আজ মাথায় সিঁদূর পরবো।

[অন্দরে শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শোনা গেল।]

বন্দিতা ॥ এই সেরেছে। উঠেছে। আচ্ছা আসি, নমস্কার।

[বন্দিতা ছুটিয়া অন্দরে গেল।]

সত্যশরণ ॥ আপনার স্ত্রীকে আজ সন্ধ্যায় আনবেন না ডাক্তার সাহেব। আর আপনিও না এলেই ভাল হয়, কারণ আজ সন্ধ্যায় আমি এখানকার কয়েকজন পাহাড়ীকে ডেকেছি যারা খেলনা তৈরি করে। সেই সম্পর্কেই আপনার কাছে আমার কিছু জানবার ছিল! আর অন্ততঃ পাঁচ মিনিট যদি দয়া করে বসেন—

ডাক্তার ॥ [বসিয়া] আমি বসছি। পাঁচ মিনিট কেন? আপনার যখন দরকার আমি বসছি। ব্যাপার কি বলুন।

সত্যশরণ ॥ এখানকার পাহাড়ীদের মধ্যে দুটো শ্রেণী দেখি। একটা শ্রেণী বেশ সুশিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন। শিল্পের কাজেও দেখি তারা খুব পটু। জীবন যাত্রার মানও তাদের উঁচু! অথচ খোঁজ নিয়ে জেনেছি তাদের অনেকেই এখানকার এক

orphanageএ মানুষ। আর এক শ্রেণী দেখি যারা এর ব্যতিক্রম—অত্যন্ত গরীব। কাজেই বোধ হয় অত অশিক্ষিত, রোগগ্রস্ত, জীবিকা নির্বাহে অপারগ। মহাজনের কাছে দেনাগ্রস্ত, দেনার দায়ে পিষ্ট, ক্লীষ্ট। চরম দুর্দশাগ্রস্ত।

ডাক্তার ।। আপনার কথা মিথ্যা নয়। এখানকার orphanageটি খুব ভাল। অবশ্য তাকে orphanage বলা হয় না—তাকে বলা হয় Home। সমাজে অবাঞ্ছিত অনেক অনাথ, আতুর সেখানে আশ্রয় পায়। আশ্রয় পেয়ে মানুষ হয়। এখানকার এই Home সমাজ কল্যাণের একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান। আপনি দেখতে যাবেন একদিন ?

সত্যশরণ ।। যাব—যাব ডাক্তার সাহেব। আপনি যদি দয়া করে নিয়ে যান আমি যাব। শুনুন ডাক্তার সাহেব, আমি যদি ওখানে একটি অনাথ শিশুকে রাখতে চাই—আর তার জন্যে উপযুক্ত Donationও দিতে চাই—সেটা কি সম্ভব ?

ডাক্তার ।। আমি যতদূর জানি সম্ভব। আর Homeএও যদি সম্ভব না হয়, ভাল অনাথ আশ্রমও আছে এখানে আর একটি। যার পরিচালক মণ্ডলীতে রয়েছি আমি। সে আশ্রমটিও আমার সঙ্গে গিয়ে আপনি দেখতে পারেন। আর দেখে যদি খুশী হন, Homeএ কেন, আমাদের আশ্রমেই দেবেন আপনার সেই অনাথ শিশুটিকে।

সত্যশরণ ।। য়্যা !

ডাক্তার ।। হ্যাঁ। আমরা আদর করেই তাকে নেব। সে শিশুটি কোথায় ?

সত্যশরণ ।। না না, আমি শুধু জেনে রাখলাম। কত লোকে কত সময় এমনি আশ্রমের খোঁজ করে—হ্যাঁ আমার কাছেই করে। এখন সব জেনে রাখলাম—দরকার হলে আপনাকে বলবো।

ডাক্তার ।। বেশ তো, বেশ তো। [হাত ঘড়ি দেখিয়া] এইবার তাহলে আমি উঠতে পারি মিঃ রায় ?

সত্যশরণ ।। নিশ্চয়—নিশ্চয়। আপনার জরুরী কাজে না জানি কত দেরী হ'ল।

ডাক্তার ।। [হাসিয়া] আর এতক্ষণ যে কথাবার্তা হ'ল সেটা বুঝি কোন কাজ নয় ? একটা অনাথ শিশুর ভবিষ্যতের চেয়ে জগতে কোন কিছু জরুরী নয় মিঃ রায়। আচ্ছা নমস্কার।

সত্যশরণ। নমস্কার।

[পাহাড়ী ডাক্তার চলিয়া গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে আওয়াজ আসিল "জরুরী তার হ্যায় সাব"।]

সত্যশরণ ।। টেলিগ্রাম ! [চিৎকার করিয়া] ভেতরে এসো পিওন।

[পিওন ভিতরে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল এবং টেলিগ্রামটি অধ্যাপক সত্যশরণ রায়কে দিল। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে তিনি রসিদে সই করিয়া দিলেন। পিওন সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। সত্যশরণ টেলিগ্রামটি কম্পিত হস্তে খুলিয়া পড়িলেন। বন্দিতার প্রবেশ।]

বন্দিতা ।। কার টেলিগ্রাম বাবা ? দেখছি Urgent.

সত্যশরণ ॥ [পাঠ] "You are appointed as Professor of Economics. Stop. Kindly join by Twenty third.

Principal
Barasat College."

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত দিয়েছিলাম। তা দেখছি চাকরি হয়ে গেল।

বন্দিতা ॥ বারাসত কলেজ! বারাসত! নাম তো শুনি নি বাবা।

সত্যশরণ ॥ হ্যাঁ, বারাসত। কলকাতার কাছে একটা পল্লীগ্রাম।

বন্দিতা ॥ এতকাল শহরে চাকরি করে শেষটায় একটা পাড়াগাঁয়ে যাবে বাবা!

সত্যশরণ ॥ না না—পাড়াগাঁই ভাল। শহরের উচ্ছৃঙ্খলতা আর আমি সইতে পারিনা। তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখেছেন, কত বার পড়েছি, আবার পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে—

[টেবিলের ড্রয়ার হইতে চট্ করিযা একটি মাসিকপত্র টানিয়া বাহির করিয়া রবীন্দ্রনাথের একটি রচনার অংশ খুঁজিয়া লইয়া তাহা পাঠ।]

"মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই; এইখানেই প্রাণের নিকেতন, লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন। সেই আসন প্রস্তুত হয় নাই। ধনপতি কুবের দেশের লোকের মনকে টানিয়াছে শহরের যক্ষপুরীতে। শ্রীকে তাঁহার অন্নক্ষেত্রে আহ্বান করিতে আমরা ভুলিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে সৌন্দর্য গেল, স্বাস্থ্য গেল, বিদ্যা গেল, আনন্দ গেল, প্রাণও অবশিষ্ট আছে অতি অল্পই। আজ পল্লীর জলাশয় শুষ্ক, বায়ু দূষিত, পথ দুর্গম, ভাণ্ডার শূন্য, সমাজবন্ধন শিথিল, ঈর্ষা কলহ কদাচার লোকালয়ের জীর্ণতাকে প্রতি মুহূর্তে জীর্ণতর করিয়া তুলিতেছে। সময় আর অধিক নাই।"

বন্দিতা ॥ কিন্তু বাবা, পাড়াগাঁয়ের আরও ভয়ানক চিত্র এঁকেছেন শরৎচন্দ্র তাঁর পল্লীসমাজে। বারাসতের ঐ পল্লীসমাজে তোমার এই মেয়ে মিসেস চৌধুরী সেজে দু'দিনও ধোপে টিকতে পারবে না বাবা।

সত্যশরণ ॥ কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। শুধু জীবিকার তাগিদে নয়, আমার আদর্শের আহ্বানে।

বন্দিতা ॥ তুমি কলকাতায় চাকরি নাও বাবা—হ্যাঁ বাবা, যদি আমাকে আর আমার মেয়েকে তুমি বাঁচাতে চাও। লক্ষ লক্ষ লোকের শহর কলকাতায় কেউ কাউকে নিয়ে মাথা ঘামায় না—সত্যি কথা বলতে কি, সত্যিকার কোন সমাজই নেই কলকাতায়।

সত্যশরণ ॥ না বন্দিতা, বারাসত আমাদের যেতেই হবে। আমি এখনই 'তার' করে দিচ্ছি। কালই রওনা হচ্ছি।

বন্দিতা ॥ বারাসত আমি যাব না বাবা।

সত্যশরণ ॥ জীবনের অনেক আদর্শ আমাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে এরই মধ্যে, ভুলো না বন্দিতা।

বন্দিতা ॥ তার জন্য কি একা আমি দায়ী বাবা ? দেশের লোককে তুমি মানুষ করতে গেছ কিন্তু ঘরের মেয়েকে তুমি মানুষ করতে পারনি।

সত্যশরণ ॥ এ কথাটা আমি তোমার কাছে আশা করিনি মা। আঠারো বছর বয়সে পরিপূর্ণ শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে যদি তুমি বিপথে পা বাড়াও তার ফলভোগ তোমাকে করতেই হবে মা। আর ফলভোগ শুধু তুমি একা করছো না, ফলভোগ করছেন তোমার মা। মরে তিনি বেঁচেছেন। ফলভোগ করছি আমি—হ্যাঁ আমিও করছি, আমার সত্যশরণ নামই আজ মিথ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে মিসেস বন্দিতা চৌধুরী !

বন্দিতা ॥ [হাসিয়া] এ কথার পর আমার আত্মহত্যা করা উচিত ছিল—[হঠাৎ ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল] কিন্তু আজ আর আমি তা পারবো না—আমি তা পারবো না। আমি মরলে আমার ঐ মেয়েটাকে কে দেখবে বাবা।

[বন্দিতা ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সত্যশরণ উত্তেজিত ভাবে পদচারণা করিতেছিলেন, বন্দিতার ঐ মানসিক যন্ত্রণা তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে বন্দিতার কাছে আসিয়া তাহার অশ্রুস্নাত মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন।]

সত্যশরণ ॥ তুই মরলে আমিও কি বাঁচবো মা ? তুই শুধু তোর মেয়ের কথাই ভাবছিস্ ? এই বুড়ো ছেলের কথা ভাবছিস না বন্দিতা ?

[বন্দিতা দুই হাতে বাপের গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।]

সত্যশরণ ॥ শোন্ মা, শোন্। [অনেকটা চুপি চুপি] এখানে খুব ভাল একটা অনাথ আশ্রম আছে যার পরিচালক হচ্ছেন ঐ ডাক্তার সাহেব। পরম দয়াল তিনি, অতি উদার তার মন। তাঁকে আমি সব কথা খুলে বলি। তোর ঐ শিশু মানুষ হোক তাঁর সেই আশ্রমে। মিসেস চৌধুরী নাম মুছে যাক্—আবার কুমারী বন্দিতা রায় ফিরে আসুক বাপের বুকে।

বন্দিতা ॥ [এই প্রস্তাবে চমকাইয়া উঠিয়া] বাবা !

সত্যশরণ ॥ এ আশ্রমে কোন খরচাই লাগে না, তবু তোর এই মেয়েকে খুব ভাল করে মানুষ করতে যত টাকা লাগে আশ্রমে আমি দান করবো মা।

বন্দিতা ॥ [মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে] না বাবা।

সত্যশরণ ॥ প্রতি ছুটিতে তুই আর আমি এখানে চলে আসবো মা। প্রাণভরে দেখে যাব তাকে।

বন্দিতা ॥ [ভাঙিয়া পড়িয়া আর্তকণ্ঠে] ওকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্তও থাকতে পারবো না বাবা।

সত্যশরণ ॥ [কঠোর ভাবে] পারবে না ?

বন্দিতা ॥ না। না বাবা, না।

সত্যশরণ ॥ বেশ। মেয়ে নিয়ে চল আমার সঙ্গে। কিন্তু কলকাতায় আমি থাকবো না। থাকবো আমি বারাসতে।

বন্দিতা ॥ তাতেই আমি রাজী বাবা।

সত্যশরণ ॥ কিন্তু তোমার ঐ মিসেস চৌধুরী নামে আর আমি রাজী নই। কুমারী বন্দিতা রায়ই থাকবে তোমার পরিচয়।

বন্দিতা ॥ সে কি করে হবে বাবা!

সত্যশরণ ॥ হয়—হয়। হতে পারে—হবে। তোমার মেয়েকে তুমিই নিজে হাতে মানুষ করতে পারবে—মানুষ করবে—কিন্তু মা হয়ে নয়, দিদি হয়ে। আমি বলবো, ওর মা ওকে জন্ম দিয়েই মারা গেছে। এ তুমি সইতে পারবে বন্দিতা?

বন্দিতা ॥ [এ আঘাতও সহ্য করিয়া] পারবো বাবা।

সত্যশরণ ॥ কাল বেলা দশটায় রওনা হতে হবে। সব গুছিয়ে নাও মা।

বন্দিতা ॥ জীবনের চরম শাস্তি তুমি আমায় দিলে। কিন্তু আমিও তা বরণ করেই নিলাম বাবা, শুধু ঐ মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে।

সত্যশরণ ॥ শাস্তি শুধু একা তোমারই নয় মা। কিন্তু আমিও তা বরণ করে নিচ্ছি, আমার মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে।

বন্দিতা ॥ বাবা।

[বাপের বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।]

সত্যশরণ ॥ মা।

[তিনিও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।]

তৃতীয় দৃশ্য

[সতের বৎসর পর, ১৯৫৮ সাল। বারাসতে অধ্যাপক সত্যশরণ রায়ের বাসভবন—অনেকটা কাশীতে যেরূপ বাসভবন ছিল, তাহারই অনুরূপ। অধ্যাপকের বয়স এখন সত্তরের কাছাকাছি। বন্দিতার বয়স পঁয়ত্রিশ এবং বন্দিতার কনিষ্ঠা ভগ্নীরূপে পরিচিতা, কন্যা নন্দিতার বয়স সতের বৎসর। কলেজের অধ্যাপনা এবং গ্রাম-অঞ্চলে সমবায় আন্দোলনের প্রচার, এই দুই কাজে অধ্যাপক মাতিয়া রহিয়াছেন। সমবায় আন্দোলনে বন্দিতা এখন পিতার দক্ষিণ হস্ত। নন্দিতা পিতার কলেজেই আই, এ, পড়িতেছে এবং তাহাব রূপমুগ্ধ সতীর্থ বন্ধুর সংখ্যাও কম নয়, যেমন বন্দিতারও ছিল একদিন।

সন্ধ্যা। ভৃত্য জগবন্ধু অন্ধকার উপবেশন কক্ষটিতে আসিয়া ইলেকট্রিক বাতি জ্বালিয়া দিল এবং সবিস্ময়ে দেখিল নন্দিতা এবং তাহার কলেজ বন্ধু পার্থ সরকার মুখোমুখি হইয়া সোফাতে উপবিষ্ট। সেন্টার টেবিলে দু'জনের হাত যুক্ত ছিল। জগবন্ধু আলো জ্বালিতেই উহা বিযুক্ত হইল।]

নন্দিতা ॥ আবার বাতি জ্বাললে জগবন্ধুদা'—উঃ!

জগবন্ধু ॥ বড় দিদিমণি বললেন, তাই জ্বাললাম। নইলে আর জ্বালবো কেন? তুমি বাতি না চাও—নিবিয়ে দিচ্ছি। বড় দিদিমণিকে গিয়ে বলছি।

পার্থ ॥ [হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া] না না বাতি নিবাতে হবেনা জগবন্ধুদা। নন্দিতার মাথাটা খুব ধরেছে কিনা তাই—

জগবন্ধুদা ॥ ও—তাই তুমি মাথাটা টিপে দিচ্ছিলে। গিয়ে বলছি বড় দিদিমণিকে, ওষুধ-টষুধ যদি কিছু দেন।

নন্দিতা ॥ না। তোমার বড় দিদিমণিকে কিছু বলতে হবে না। মাথাধরা আমার কমে গেছে।

পার্থ ॥ বন্দিতা দেবী কোথায়? কি করছেন?

জগবন্ধু ॥ সন্ধ্যাবেলা যা করার তাই করছেন। [অন্দরে শংখধ্বনি শুনিয়া] ঐ যে—লক্ষ্মী পূজো শেষ হ'ল।

[জগবন্ধু অন্দরে চলিয়া গেল।]

পার্থ ॥ আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি নন্দিতা।

নন্দিতা ॥ [পার্থের হাত চাপিয়া ধরিয়া] না।

পার্থ ॥ তোমাদের চাকরটা না জানি কি মনে করে গেল।

নন্দিতা ॥ আমাদের এসব ও নতুন দেখছে না পার্থ।

পার্থ ॥ তোমার বাবার বাড়ি ফেরবার সময় হয়েছে নন্দিতা।

নন্দিতা ॥ [হাসিয়া] তুমি না তাঁরই কাছে পড়তে এসেছ পার্থ। বরং এসো আমরা এখন পড়ি। বাবা এসে দেখলে খুশীই হবেন।

পার্থ ॥ [হাসিয়া] কিন্তু আমরা প্রেমে পড়েছি, এটা দেখলে কি তিনি খুশী হবেন নন্দিতা!

নন্দিতা ॥ অতটা দেখার মত চোখ বাবার নেই পার্থ। সে চোখ রয়েছে আমার দিদির—তোমাদের ঐ বন্দিতা দেবীর।

পার্থ ॥ আমি সেটি লক্ষ্য করি।

নন্দিতা ॥ বিয়ে-থা না করলে মেয়েরা যেমন হয়। আমাদের কলেজেই দেখনা—দু'দুজন অধ্যাপিকা, কুমারী জয়ন্তী সেন আর কুমারী সান্ত্বনা বোস। ওঁদের ধারণা কোন ছাত্র-ছাত্রীই পড়ছে না—শুধু প্রেমেই পড়ছে। দেখতে পারি না আমি এই বুড়ী কুমারীদের।

পার্থ ॥ চুপ! তোমার দিদিও তো বুড়ী কুমারী। শুনবেন।

নন্দিতা ॥ আমি তার মুখের ওপরেই এ কথা বলি।

পার্থ ॥ চটে যান না?

নন্দিতা ॥ চটা দূরের কথা, শুনে হাসে। তাতেই আমার পিত্তি যায় আরো জ্বলে।

[ঘরে ধূপ ধুনা দিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন বন্দিতা দেবী।]

নন্দিতা ॥ [নিজেকে সামলাইয়া লইয়া] এই যে দিদি, ধূপ দিতে এসেছ? দাও দিদি দাও।

"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চায় ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চাহে সুরে।"

বন্দিতা ॥ ধূপ নিয়ে রবি ঠাকুরের আরো একটি কবিতা আছে। তুমি সে কবিতাটা জানো পার্থ ?

পার্থ ॥ "এই করেছ ভাল নিঠুর,
এই করেছ ভাল
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।
এই করেছ ভাল নিঠুর
এই করেছ ভাল।"

কেমন, এইটা তো।

বন্দিতা ॥ হ্যাঁ পার্থ।

নন্দিতা ॥ পার্থদা যখন তোমার পরীক্ষায় পাশ করেছে, ওকে এক পেয়ালা কফি খাইয়ে দাও দিদি। আর যদি দয়া হয় সেই সঙ্গে আমাকেও দিও এক পাত্র।

বন্দিতা ॥ দিচ্ছি। ধূপ আর গন্ধের অবাধ মিলনে ধূপকে পুড়তে হয়। কিন্তু বাবার আসবার সময় [illegible]য়েছে—এইবার পড়াশোনা শুরু কর। পরীক্ষাটা যে অতি কাছে, সেটা তোমরা দু'জনেই ভুলে গেছ আমি দেখছি।

[বন্দিতা অন্দরে চলিয়া গেলেন।]

নন্দিতা ॥ বললাম না, উনি দেখেন—সব দেখেন। সব কিছু না দেখলে, যেন ওঁর ভাতই হজম হয়না পার্থ।

[সদর দরজায় করাঘাত]

নন্দিতা ॥ [সচকিত ভাবে] বাবা !

[আলমারী হইতে খান-কয়েক বই চট করিয়া বাহির করিয়া পার্থের সামনে রাখিয়া।]

তুমি বইগুলো খোল—আমি দরজাটা খুলছি।

[উভয়ের তথাকরণ। নন্দিতা দরজা খুলিতেই বাহির হইতে অধ্যাপক সত্যশরণ রায় কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হাতে একটি পুঁথি-ভরা পুরানো চামড়ার ব্যাগ। তিনি পার্থকে দেখিয়াই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।]

সত্যশরণ ॥ এই যে পার্থ, তুমি তবে আছ ? আমার আশঙ্কা হচ্ছিল, আমি এসে হয়তো তোমাকে পাবোনা। তোমাকে আমার বড় দরকার। [ব্যাগটি নন্দিতার হাতে দিয়া] দরজাটা বন্ধ করে দে তো মা নন্দিতা। একটা আলোচনা আছে—Confidential.

[নন্দিতা দরজাটি বন্ধ করিয়া ব্যাগটি যথাস্থানে রাখিল। সত্যশরণ প্রায় ছুটিয়া পার্থের সম্মুখস্থিত সোফায় মুখোমুখি হইয়া বসিলেন। নন্দিতা সত্যশরণের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।]

সত্যশরণ ॥ ব্যাপারটা বড়ই delicate—কিন্তু না বলেও পারছি না। আজই তোমার সঙ্গে বিষয়টা আলোচনা করবো বলে আমি ছুটে এলাম। হ্যাঁ, হাঁপিয়ে পড়েছি আমি।

[কফির ট্রে লইয়া অন্দর হইতে বন্দিতার প্রবেশ]

সত্যশরণ ॥ এই যে বন্দিতা, তুমিও এসে গেছ—হ্যাঁ, এ আলোচনায় তোমারও থাকা দরকার।

বন্দিতা ॥ কফি খাবে বাবা ?

সত্যশরণ ॥ কফি! দেখছি আমার দরকারটা তুই যত বুঝিস, আমি নিজেও তত বুঝি না। একটা সভায় এতক্ষণ চেঁচামেচি আর ঝগড়া করে গলা আমার শুকিয়ে গেছে মা। এখন যে আলোচনাটা হবে, সেটাও হবে সাংঘাতিক। ঢাল্ কফি। কফি খেলে হয়তো গলায় খানিকটা জোর পাব। [এক চুমুক কফি পান করিয়া] তাহলে পার্থ, এবার শুরু হোক আমাদের কথাবার্তা।

নন্দিতা ॥ আমার মাথাটা ধরেছে বাবা! আমাকেও কি থাকতে হবে ?

সত্যশরণ ॥ থাকা উচিত—থাকা উচিত—তোমারও থাকা উচিত নন্দিতা। বসো, গরম এক পেয়ালা কফি খাও। সঙ্গে একটা এ্যাস্পিরিন খেয়ে নাও মা।

[পকেট হইতে এ্যাসপিরিনের শিশি বাহির করিয়া নন্দিতার পেয়ালায় একটি বড়ি ফেলিয়া পেয়ালাটি নন্দিতার হাতে দিলেন।]

নন্দিতা ॥ খাচ্ছি বাবা। [নন্দিতা বড়ই বিপদে পড়িল বোঝা গেল।]

সত্যশরণ ॥ পার্থ, তুমি আমাদের কলেজের বি, এ, ক্লাসের সেরা ছাত্র। অর্থনীতি পড়াতে গিয়ে আমি দেখেছি, তোমার মাথা বেশ পরিষ্কার। তা ছাড়া, আমার সমবায় আন্দোলনে তোমার নিষ্ঠা আর উৎসাহ দেখে ভারি খুশী হয়েছিলাম আমি। বাড়িতে এসে পাঠ নিতে বলেছিলাম—পুত্রবৎ জ্ঞান করতাম আমি তোমাকে। করিনি ?

পার্থ ॥ করেছেন।

সত্যশরণ ॥ কিন্তু এখন আমি দেখছি, প্রদীপের নীচেই সব চেয়ে বেশী অন্ধকার।

পার্থ ॥ আমি বুঝতে পারছি না, আপনি এ কথা কেন বলছেন স্যার।

বন্দিতা ॥ আমি বরং বুঝতে পারছিলাম না, বাবা এ কথা এদ্দিন কেন বলেন নি। এখন দেখছি তিনিও অন্ধ নন। নন্দিতাকে আমি সাবধান করতে গেলে নন্দিতা বলেছে—আমার যদি কোন দোষ হয়ে থাকে, অন্যায় হয়ে থাকে, বাবা বলবেন, তুমি বলবার কে ?

সত্যশরণ ॥ বটে! এতবড় কথা তুই বলিস বন্দিতাকে ? যে তোকে মায়ের মত পালন করেছে, যেদিন তুই ভূমিষ্ঠ হয়েছিস সেদিন থেকে। [বন্দিতাকে] প্রদীপের নীচে অন্ধকার, এ কথা তুমিই বা বলতে গেলে কেন নন্দিতাকে ? আমি বলছি, পার্থকে।

বন্দিতা ॥ [কঠোর হইয়া] এক হাতে তালি বাজে না। ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা, অবৈধ প্রেম আমি সইতে পারি না বাবা।

সত্যশরণ ॥ তা অবশ্য কেউ সইতে পারবে না, আমিও না। কিন্তু—কিন্তু—

পার্থ ॥ [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] আমাদের প্রেম যাতে অবৈধ না হয় সে জন্য আমার প্রার্থনা—আমার সঙ্গে নন্দিতার বিয়ে দিন। এ প্রার্থনা শুধু আমার একার নয়, নন্দিতারও।

বন্দিতা ॥ [অধীর আনন্দে] এ্যাঁ। এ আমি আশা করিনি—এতটা আমি আশা করতে পারিনি। আমার নন্দিতার এমনি একটি পাত্র হয়, মনে মনে এই কামনাই ছিল আমার। আমি দেখতাম, আমি লক্ষ্য করতাম, পার্থ নন্দিতাকে ভালবাসে, নন্দিতার জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু কেন যেন মনে হ'ত আমার, এ সবই বুঝি পার্থের অভিনয়। কিন্তু আজ দেখছি আমারই ভুল—আমারই ভুল। পার্থ, তুমি আমাকে ক্ষমা কর ভাই, আর নন্দিতা তুইও আমায় ক্ষমা করিস। পার্থের মত রত্ন আমরা ঘরে পাব, এ আমাদের কত বড় সৌভাগ্য।

নন্দিতা ॥ এখন সৌভাগ্য।

সত্যশরণ ॥ [স্তম্ভিত হইয়া] কি আশ্চর্য! পাগলের মত তোমরা সবাই এসব কি বলছো? তোমাদের মধ্যে এত সব ব্যাপার ঘটেছে—এ তো আমি কিছুই জানি না।

বন্দিতা ॥ পার্থের সঙ্গে নন্দিতার মেলামেশার বিষয়েই তো তুমি আলাপ করতে চাইছিলে বাবা!

সত্যশরণ ॥ না। মোটেই না। এ সব কথা তো আমার মাথাতেই আসেনি কোনদিন।

পার্থ ॥ প্রদীপের নীচে অন্ধকার বলাতে আমি কিন্তু তাই বুঝেছিলাম স্যার। মনে হয়েছিল, আপনি আমার চরিত্র সম্বন্ধেই কটাক্ষ করছেন।

সত্যশরণ ॥ না—না, সে আমি বলেছিলাম সম্পূর্ণ অন্য একটা কারণে। এসব কোন ব্যাপার তো নয়! কিন্তু এখন দেখছি কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ উঠলো।

বন্দিতা ॥ না-না, সাপ নয়। উঠেছে সাতরাজার ধন এক মাণিক।

নন্দিতা ॥ এখন মাণিক।

পার্থ ॥ আপনি তবে আমার সঙ্গে কি আলোচনা করতে চেয়েছিলেন স্যার?

সত্যশরণ ॥ তোমার বাবার নাম কুবের সরকার?

পার্থ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

সত্যশরণ ॥ বারাসত থেকে আট মাইল দূরে 'হাঁসপুকুরে' তোমাদের বাড়ি?

পার্থ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

সত্যশরণ ॥ তোমার বাবা—ঐ শ্রীকুবের সরকার মহজনী ব্যবসা করেন?

পার্থ ॥ হ্যাঁ স্যার।

সত্যশরণ ॥ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নিয়ে থাকেন?

পার্থ ॥ নিশ্চয় নেন।

সত্যশরণ ॥ বর্ষাকালে যখন চাষীর ঘরে ধান চাল কিছুমাত্র থাকে না, তখন তাদের ধান কর্জ দেন এই সর্তে যে—সেই ধান তাঁকে ফেরৎ দিতে হবে দেড়ি বা দুনো হারে। ফলে দাঁড়ায় এই যে, সে বছর খাতক যদিও বা খেয়ে বাঁচে, পরের বছর ঐ দেনা শুধ্‌তে না পারায় তার ভিটে-মাটি, জোত জমি সবকিছু চলে যায় তোমার বাবার হাতে—ডিক্রি জারীতে। এ কথা সত্য পার্থ ?

পার্থ ॥ সত্য।

সত্যশরণ ॥ বুঝলাম, আজকের কৃষক-সমবায় সভাতে ওখানকার চাষীরা তবে তোমার বাবার সম্বন্ধে মিথ্যা কিছু বলেনি। ওদের কথা শুনে আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, স্বাধীন ভারতে এতবড় হৃদয়হীন বর্বরতা চলতে পারে না। এর বিরুদ্ধে আমাদের সত্যাগ্রহ শুরু করতে হবে। তখনই আমাকে একটা চরম আঘাত হানলেন সভারই আর একজন বক্তা।

বন্দিতা ॥ কি আঘাত বাবা ?

সত্যশরণ ॥ তিনি বলে উঠলেন, 'আপনি বলছেন বটে সত্যাগ্রহ শুরু করবেন, কিন্তু জানেন কি আপনি, যে মহাজন কুবের সরকারের বিরুদ্ধে আপনার এই আস্ফালন, তারই একমাত্র পুত্র পার্থ সরকার আপনার প্রিয়তম ছাত্র।' শুনে আমি চমকে উঠলাম। মনে হ'ল, যে পার্থ আমার ঘরে প্রদীপের মত জ্বলে তারই তলে এত অন্ধকার! এখন দেখছি, সত্যি সত্যিই অন্ধকার।

বন্দিতা ॥ পার্থ, আমি দেখেছি, সমবায় নীতিতে তোমার কি অসীম বিশ্বাস। আমার বিশ্বাস যদি বা কখনো টলেছে, তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করেছ। তর্ক করে শেষে আমায় বুঝিয়ে দিয়েছ—মহাজনের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে সমবায় ভিন্ন কৃষকদের হাতে আর কোন অস্ত্র নেই। সে কি তুমি আমার সঙ্গে অভিনয় করতে পার্থ ?

পার্থ ॥ [হাসিয়া] আপনার মুখে এ সব কথা শুনে আমার কেবলই মনে হচ্ছে বন্দিতা দেবী, মানুষের কাছে আপনি বড় বেশী ঠকেছেন, মানুষকে আপনি তাই বিশ্বাস করতে পারেন না। আমাকেও তাই এই সন্দেহ।

বন্দিতা ॥ আমরা আমাদের উত্তর পেয়ে গেছি বাবা !

সত্যশরণ ॥ [পার্থকে] আজ যদি আমি তোমার পিতার মহাজনী পাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সত্যাগ্রহ শুরু করি তোমাদের গ্রামে, তুমি আমার পাশে দাঁড়াবে পার্থ ?

পার্থ ॥ তার উত্তরে আমি বলবো স্যার, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ আপনি ভুলে গেছেন। ভুলে গেছেন যে, গুরুর পথই শিষ্যের পথ।

সত্যশরণ ॥ [মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া হঠাৎ 'হো হো' করিয়া হাসিয়া উঠিয়া] এ্যা ! "মহাজন যেন গত স পন্থা" নয় ? মানে, মহাজন যে পথে হাঁটেন, তুমি সে পথে হাঁটবে না পার্থ ?

পার্থ ॥ [হাসিয়া] না। তা' হাঁটবো না। গুরুর পথই আমার পথ।

সত্যশরণ ॥ লোকে বলে থাকে তুমি আমার প্রিয়তম ছাত্র। আমি সগর্বে বলব সে কথা সত্য। নন্দিতাকে তুমি বিয়ে করতে চাইছো, নন্দিতাও তাই চায়, বন্দিতার কামনাও তাই। আর জেনে রাখো আমারও তাতে সম্মতি আছে। কিন্তু তোমার পিতা সম্মতি দেবেন কি এ বিয়েতে?

পার্থ ॥ আমি জানি না। আমি জিজ্ঞেস করে, জেনে বলবো।

সত্যশরণ ॥ তোমার পিতা যদি সম্মতি না দেন তবু কি এ বিয়ে হতে পারে পার্থ?

পার্থ ॥ না।

অন্য সকলে ॥ না!

পার্থ ॥ ছেলেবেলাতেই আমি আমার মাকে হারিয়েছি। বাবার স্নেহে মায়ের অভাব আমি বুঝতে পারিনি কোনদিন। তাঁর অমতে বিয়ে করে তাঁকে আমি আঘাত দিতে পারবো না। আর সে বিয়েতে না হবে সুখ, না হবে শান্তি। নন্দিতা আর আমার, দু'জনের জীবনেই সেটা হবে একটা অভিশাপ।

সত্যশরণ ॥ বাপের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করলে কি তোমার জীবনে সে অভিশাপ আসবে না পার্থ?

পার্থ ॥ না, তা আসবে না।

বন্দিতা ॥ কেন আসবে না পার্থ? এতেও তো পড়বে তাঁর দীর্ঘশ্বাস!

পার্থ ॥ আমি জানি, তাঁর মহাজনী ব্যবসাটাই পাপ। পাপের সেই নরক থেকে যদি আমি তাঁকে মুক্ত করতে পারি—পুত্রের কাজই আমি করবো তাতে বরং পুণ্যই হবে আমার।

সত্যশরণ ॥ সাবাস! সাবাস! এই তো ছেলে। তুমি চলে যাও পার্থ তোমার বাবার কাছে। তিনি তোমাদের সদর বাসা বাড়িতেই আজ আছেন।

পার্থ ॥ আপনি কি করে জানলেন স্যার!

সত্যশরণ ॥ আজকের ঐ সভাতে হরনাথ উকিলও তো একজন বক্তা ছিলেন। তিনিই সভাতে জানিয়ে দিলেন—তোমার বাবা শ' দেড়েক ডিগ্রী জারীর মামলা করতে আজই সদর বাসা বাড়িতে এসে পৌঁছেছেন।

পার্থ ॥ কথাটা সত্য। অতগুলো লোকের ভিটেমাটি, হাল-বলদ যাবে দেখে আমি তাঁর হাতে-পায়ে ধরতেও বাকী রাখিনি। কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না। রাগ করে বাড়ি ছেড়ে আমি চলে এসেছি এখানে।

সত্যশরণ ॥ তুমি যে এখানে এসেছ, তা তিনি জানেন?

পার্থ ॥ বিকেলে আমি আপনার কাছে পড়তে আসি, তিনি জানেন বৈ কি! নন্দিতার সঙ্গে আমার বিয়েতে আপনাদের যখন সম্মতি পেয়েছি, যাচ্ছি তাঁর কাছে। গিয়ে সব বলছি।

সত্যশরণ ॥ হ্যাঁ, গিয়ে বলো। আর সেই সঙ্গে আমাদের সত্যাগ্রহের সংকল্পটা

বলতেও ভুলো না কিন্তু। তাতেও যদি তিনি নন্দিতার সঙ্গে তোমার এ বিয়েতে সম্মতি দেন, আবার এখনি ফিরে এসো বাবা।

বন্দিতা ॥ আর যদি সম্মতি না দেন—তুমিই বলেছ এ বিয়ে হবে না। আর যদি বিয়েই না হয়—এ বাড়িতে তুমি আর এসো না পার্থ।

নন্দিতা ॥ দিদি!

বন্দিতা ॥ হ্যাঁ নন্দিতা। বিয়ে না হলে এমন অবাধ মেলামেশায়, আমার আপত্তি আছে। বাবা, আশাকরি তোমারও।

পার্থ ॥ এবং আমারও।

সত্যশরণ ॥ সাবাস! সাবাস পার্থ সাবাস! [বাহিরের দরজায় করাঘাত] কে!

[নিজে গিয়া দরজা খুলিলেন। বৃদ্ধ মহাজন কুবের সরকার কক্ষ মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। শয়তান হইলেও বৈষ্ণব বিনয়ের একটি অবতার বলা চলে।]

কুবের ॥ [সবিনয় নমস্কারান্তে] আপনিই কি সত্যশরণ বাবু?

সত্যশরণ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

কুবের ॥ আ-হা, সত্যশরণ! এমন নামই ধারণ করেছেন যে নামেই মোক্ষ এ নরাধম হাঁসপুকুরে গ্রামের কুবের সরকার। আমি আমার গাধাটার খোঁজে এসেছি।

সত্যশরণ ॥ য়্যা!

পার্থ ॥ গাধাটা—মানে আমি।

সত্যশরণ ॥ [হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন] তা বেশ তো, বেশ তো—খোঁজ যখন মিলেছে তখন আর চিন্তা কি? দয়া করে বসুন।

কুবের ॥ সৌভাগ্য! হরিহে, এ কি সৌভাগ্য আমার! [বসিলেন এবং চতুষ্পার্শে তাকাইয়া দেখিলেন] আহা-হা, সব কি মনোরম! এ যেন নব বৃন্দাবন!

সত্যশরণ ॥ এ দুটি আমার মেয়ে। বন্দিতা আর নন্দিতা।

[বন্দিতা ও নন্দিতা কুবেরকে নমস্কার করিল।]

কুবের ॥ বন্দিতা আর নন্দিতা। আহা! মা রাধারাণীরই যেন দুই হ্লাদিনী শক্তি! গাধাটা বলে বটে—আজ বুঝছি মিথ্যা বলে না।

[বন্দিতা ও নন্দিতা অন্দরে চলিয়া গেল।]

সত্যশরণ ॥ [হাসিয়া] আপনি ওকে গাধা বলে লজ্জা দেন কেন বলুন তো সরকার মশাই। বিশ বছর ধরে আমি শিক্ষকতা করছি, হাজার হাজার ছাত্র আমার হাতে পার হয়েছে, কিন্তু আপনার ঐ ছেলের মত এমন একটি রত্ন আমি খুব কমই দেখেছি।

কুবের ॥ গাধা কি সাধে বলি! নইলে নিজের প্রশংসা হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি কেউ শোনে! [পার্থকে] যাও, বাইরে গিয়ে একটু হাওয়া খাও। কিন্তু হাওয়া হয়ো না বাবা। আমি দু' চারটে কথা সেরেই আসছি।

[পার্থের প্রস্থান]

কুবের ॥ আপনার নাম সত্যশরণ। বলেছি তো, এমন নাম যে নামেই মোক্ষ। এখন দয়া করে বলুন দেখি, ঐ গাধাটাকে সত্যই কি আপনি রত্ন মনে করেন?

সত্যশরণ ॥ না না, সরকার মশাই, মনে এক—মুখে আর এক, এ আমার প্রকৃতি নয়। রূপে গুণে পার্থের মত ভাল ছেলে আমি বড় একটা দেখিনি।

কুবের ॥ হরির অপার কৃপা বলতে হবে। লোকে বলে, বড় লোকের ছেলে বেশীর ভাগই অধঃপাতে যায়। গাধাটা যে তা যায়নি, এই রক্ষে। কারণ, বড়লোক হয়ত নই, কিন্তু হরির কৃপায় আমার দু' পয়সা আছে।

সত্যশরণ ॥ এটা আপনার বিনয়। আপনার নাম কুবের সরকার—আমি জানি সত্যি সত্যিই ধনকুবের আপনি।

কুবের ॥ ও! আজকের ঐ সভায় বুঝি শুনে এসেছেন? তা' দেখুন সত্যশরণ বাবু, আসর গরম করতে সভায় অনেক কিছুই অনেকে বলেন। তার কতটা সত্য আর কতটা মিথ্যা তা' জানেন একমাত্র শ্রীহরি। সে সব আলোচনা আজ থাক। আপনি পার্থের গুরু—আপনার কাছে একটা পরামর্শ চাই।

সত্যশরণ ॥ বলুন।

কুবের ॥ দেখতেই তো পাচ্ছেন, বয়েস হয়েছে। আজ আছি—কাল নেই। শেষ জীবনটা বৃন্দাবনে গিয়ে রাধা কৃষ্ণের পায়ে পড়ে থাকার বাসনা আছে। কিন্তু গাধাটাকে সংসারী করে না রেখে গেলে বংশটাই যে লোপ পায়। জানেন তো, ওই-ই আমার একমাত্র সন্তান।

সত্যশরণ ॥ বিয়ে দিতে চান?

কুবের ॥ জ্ঞানী লোক--ঠিক বুঝেছেন! এবার দয়া করে এই জিনিষ দুটি দেখুন। [কোটের পকেট হইতে ছোট একটি পকেট ডিক্সনারী বাহির করিয়া তাঁহার সামনে ধরিয়া] দেখুন তো, কি পুঁথি এটা?

সত্যশরণ ॥ 'সরল বাংলা পকেট অভিধান'।

কুবের ॥ [বইটি সত্যশরণের হাতে দিয়া] এইবার পুঁথিটা খুলুন—

[সত্যশরণ অভিধানটি খুলিতেই একটি ফটো বাহির হইল। ফটোটি নন্দিতার]

সত্যশরণ ॥ একি! ফটো! নন্দিতার!

কুবের ॥ ফটোটি নন্দিতার—আপনার মেয়ের। কিন্তু, বইটি ঐ গাধার—আমার ছেলের।

সত্যশরণ ॥ কিন্তু ছেলের বই বাপের পকেটে এল কেন মশাই!

কুবের ॥ আদালতের নতুন হাকিমের নাম দীব্যজ্যোতি ব্রহ্ম। লেখবার দরকার হয়েছিল একটা দরখাস্তে। বানান করতে গিয়ে সবাই গলদঘর্ম। আনতে হ'ল ছেলের টেবিল থেকে তুলে ঐ অভিধান। খুলতেই এই দীব্যজ্যোতি লাভ হ'ল। শ্রীহরির কি ইচ্ছা এইবার বুঝুন সত্যশরণ বাবু।

সত্যশরণ ॥ এ বিয়েতে আমাদের কোন আপত্তি নেই সরকার মশাই।

কুবের ॥ জয় শ্রীহরি। হরি হে তুমিই সত্য। গাধাটার এতদিনে হয়তো একটা হিল্লে হ'ল।

সত্যশরণ ॥ কিন্তু তবু আমার শেষ কথা বলা হয়নি সরকার মশাই।

কুবের ॥ বলুন—বলুন—

সত্যশরণ ॥ বিয়ে হলেও কিন্তু মহাজনী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বন্ধ হবেনা আমাদের।

কুবের ॥ সেটা বুঝবেন আপনার মেয়ে জামাই। আমি বিয়ে দিয়েই খালাস। বৃন্দাবনে আমার ঘর ভাড়া হয়ে গেছে যে! আমি আর ক'দিন! তা হলে, গাধাটাকে ডাকি।

সত্যশরণ ॥ না না, ওকে আমাদের সামনে গাধা বলে লজ্জা দেবেন না। আমি ওকে ডাকছি।

[কিন্তু ডাকিবার পূর্বেই পার্থ ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। ওদিকে, অন্দর হইতে নন্দিতাকে লইয়া বন্দিতাও আসিয়া উপস্থিত। তিনজনেই উঁকি-ঝুঁকিতে এখানকার কথাবার্তা শুনিতেছিল।]

সত্যশরণ ॥ এই যাঃ! না ডাকতেই সবাই এসে হাজির!

কুবের ॥ তাই তো দেখছি! তার মানে—তার মানে—হরির ইচ্ছায় দেওয়ালেরও কান আছে!

সত্যশরণ ॥ যা বলেছেন! [হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে] আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম যে দেওয়ালের কান আছে!

[প্রণাম ও আলিঙ্গনের পালা শুরু হইল।]

চতুর্থ দৃশ্য

[বারাসত মহকুমায় হাঁসপুকুর গ্রামে মহাজন কুবের সরকারের গৃহস্থিত বৈঠকখানা সংলগ্ন প্রাঙ্গণ। বৈঠকখানার বারান্দায় একদিকে চেয়ার টেবিল, বেঞ্চি প্রভৃতি সুসজ্জিত, অন্য দিকে তক্তপোষের উপর তাকিয়া সমন্বিত ফরাশ। অন্দর হইতে বৃন্দাবন যাত্রার জন্যে প্রস্তুত কুবের সরকার এবং তৎসহ ট্রাঙ্ক, বিছানা, জলের কুঁজো ইত্যাদি লইয়া একজন ভৃত্য বৈঠকখানায় আসিয়া দাঁড়াইল। পশ্চাতে পশ্চাতে আসিল কুবেরের পুত্রবধূ নন্দিতা।]

কুবের ॥ [ভৃত্যের প্রতি] রেল-ষ্টেশনে যাবার জন্য সাইকেল রিক্সা এসেছে?

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা।

কুবের ॥ লট-বহর তুলে দে রিক্সায়।

নন্দিতা ॥ কিন্তু একটা রিক্সাতে এতসব মালপত্র নিয়ে আপনি যাবেন কি করে ষ্টেশনে? [ভৃত্যের প্রতি] আর একটা রিক্সা ডাকতে হবে।

কুবের ॥ না না, হরির ইচ্ছায় একটা রিক্সাতেই হবে এখন মা। [ভৃত্যকে] তুই যা। মালপত্রগুলো তুলে দে। [ভৃত্যের তথাকরণ] বৃন্দাবন যাবার আগে তোমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছি মা, তার মধ্যে আমার বড় উপদেশটাই ভুলে যাচ্ছ, সেটা হ'ল গিয়ে অপব্যয় করোনা। বুঝলে মা, রক্ত জল করে, কত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, তবে এই বিরাট বিষয় সম্পত্তি তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি। কথাটা

সব সময় তোমরা মনে রাখবে—গাধাটা না রাখুক, তোমাকে রাখতে হবে মা। আর তাছাড়া বৃন্দাবন হচ্ছে দেড় দিনের পথ—তুমি যা জিনিষপত্র বেঁধে ছেঁদে আমার সঙ্গে দিয়েছ মা, এ যেন আমাকে বিলেত পাঠাচ্ছো।

নন্দিতা ॥ [হাসিয়া] চলুন না বাবা, একবার বিলেতটা আমরা ঘুরে আসি।

কুবের ॥ বিলেত যেতে থার্ড ক্লাসের ভাড়া কত মা ? পঞ্চাশ-ষাট টাকা যেদিন হবে, সে দিন বলো।...কিন্তু গাধাটা তো এখনো এল না! আক্কেলটা দেখেছ ? তিন মাসের জন্য বৃন্দাবন যাচ্ছি, যাবার আগে কত সব বলে যাবার ছিল। সামনে তামাদি। খুব কম করে শ' পাঁচেক হ্যাণ্ডনোট আর তমঃসুকের মামলা দায়ের করতে হবে—কত কথাই না বলে যাবার ছিল। তা' হতভাগাটা বারাসতে বসে রইল! আমি আজ এই ট্রেণে রওনা হচ্ছি জেনেও বাড়ি ফিরল না! ফিরি কি না ফিরি তার ঠিক নেই। যাবার আগে একটা প্রণাম করে আশীর্বাদটা নিতেও এল না ?

নন্দিতা ॥ বারাসতে কি যে এত কাজ আমি বুঝি না। আমি কম করে তিনখানা চিঠি দিয়েছি পত্র পাঠ চলে আসতে। বলবেন হয়তো পরীক্ষার পড়া। পরীক্ষার পড়া যা পড়ছেন, সে আমি জানি বাবা। রাত দিন বাবা আর দিদির সঙ্গে বসে শুধু সমবায় আর সমবায়।

কুবের ॥ সে তোমরা জানো মা। হরির কি ইচ্ছা জানি না। তাঁর যদি এই ইচ্ছা হয়, সব চেয়ে আপনজন তোমাদের পথে বসাতে উঠে পড়ে লাগবেন ঐ মহাজন-মারী সমবায় আন্দোলন করে—হোক, হরির ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। বৃন্দাবন চন্দ্রের চরণছায়ায় বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর আমার কি করার আছে বলো! না—আর অপেক্ষা করা চলে না। আটটা বেজে গেল—সাড়ে আটটায় ট্রেণ। অমৃতযোগটাও যাই যাই করছে। কিন্তু ধনঞ্জয়ই বা ফিরছে না কেন! বারাসত থেকে সাইকেলে ফিরতে এত দেরী ? দেখছো তো মা, এই সব লোক নিয়ে আমাকে এতকাল চলতে হয়েছে, তোমাকে আবার চলতে হবে।

নন্দিতা ॥ ঐ যে বাবা, তিনি এসে গেছেন।

[সাইকেল সহ ধনঞ্জয়ের প্রবেশ। সাইকেলটি এক পাশে রাখিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ইঁহাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

কুবের ॥ বারাসত থেকেই আসছো তো ?

ধনঞ্জয় ॥ হ্যাঁ কর্তা!

কুবের ॥ পার্থের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

ধনঞ্জয় ॥ না কর্তা। তিনি বাসা বাড়িতে নেই।

নন্দিতা ॥ আমাদের বাড়িটা দেখে এসেছেন ?

ধনঞ্জয় ॥ হ্যাঁ। আপনাদের বাড়িতে কেউই নেই। চাকর বললে ও'রা আজ দিন সাত হ'ল গ্রামে গ্রামে মিটিং করতে গেছেন।

কুবের ॥ আমার গাধাটাও কি সেই সঙ্গে গেছে ?—সেটা কি জেনে এসেছ ?

ধনঞ্জয় ॥ হ্যাঁ কর্তা। তিনিও ঐ সঙ্গে আছেন।

নন্দিতা ॥ বাবা, আপনার বৃন্দাবন যাত্রা বন্ধ করুন। আপনি বৃন্দাবন যাবেন এই সুযোগটাই ও'রা চাইছিলেন।

কুবের ॥ [হাসিয়া] আজ বৃন্দাবন না গিয়ে আমি পারবো না মা। আমি আমার মানত রাখতে যাচ্ছি। না গেলে মহা অকল্যাণ হবে।

নন্দিতা ॥ না, না বাবা, আপনি না থাকলেই বরং মহা অকল্যাণ হবে। মহাজনী ব্যবসার বিরুদ্ধে চাষীদের ক্ষেপিয়ে তোলবার জন্য আসছেন ওঁরা।

কুবের ॥ ওঁরা মানে—[হাসিয়া] তোমারই বাবা, তোমারই দিদি, এবং তাদের সঙ্গে তোমারই স্বামী। এ'রা যদি তোমারই সর্বনাশ করে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারেন, আমি আর কি করতে পারি মা। ও'রা একদিন আসতেনই—সেটা আমি জানতাম। আমার গাধাটার মতিগতিও আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম। এই বিপদটা এড়াবার আর কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে—জলডুবি লোকের মত যে কাঠ আমি আঁকড়ে ধরেছি—সে হচ্ছ মা তুমি। আমাকে দেখলে এ'রা আরো ক্ষেপে যাবেন মা, কিন্তু একা তুমি সামনে পড়লে, তাঁরা হয়ত ভাববেন, তাইতো ! আমরা কার বিরুদ্ধে যাচ্ছি—কার সর্বনাশ করছি ! [ধনঞ্জয়কে] ওহে ম্যানেজার বাবু, তুমি তো জানো, আমি এরই মধ্যে উইল করেছি, আমার অবর্তমানে আমার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি— আমার এই বৌমার। আমি থাকতেও পাওয়ার অব এ্যাটর্ণি দিয়েছি এ'কেই। বহু-কালের কর্মচারী তুমি। বৌমার কথামত চলো। যখন যা' পরামর্শ দরকার তাও দিও। [যাত্রার জন্যে পা বাড়াইয়া] আসি মা। আর দেরী হলে বারবেলা পড়ে যাবে।

[নন্দিতা ও ধনঞ্জয় কুবেরকে প্রণাম করিলেন। কুবের তাহাদের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন।]

কুবের ॥ গাধাটাকেও মনে মনে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি মা। হরির ইচ্ছায় সে নাকি আজ দেশের একটা রত্ন। শুধু তোমার বাপই এ কথা বলেন না, আমাকে বহু লোক এ কথা বলে। আনন্দে আর গর্বে তাতে আমার বুক ভরেই ওঠে। মা হারা ঐ ছেলেকে কি কষ্টেই না আমি মানুষ করে তুলেছি। এত যে সব বিষয় সম্পত্তি যা কিছু করেছি, ওর জন্যেই করেছি। আমার এই কীর্তি সে যদি নষ্ট করে, তাতে সে আমাকেই হত্যা করবে মা—পরশুরাম যেমন করেছিল পিতৃহত্যা ! পিতৃহত্যা ! হরিহে ! তোমার কি ইচ্ছা তুমিই জানো।

[বাহিরে চলিয়া গেলেন কুবের। পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন নন্দিতা ও ধনঞ্জয়।]

*　　　*　　　*

[পূর্বোক্ত দৃশ্য। আসন্ন সন্ধ্যা। বৃদ্ধ খাতক হলধর মণ্ডল এবং তাহার যুবকপুত্র সুবল করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া চেয়ারে আসীন ধনঞ্জয়ের সহিত কথোপকথনরত। নন্দিতাও অদূরে একখানি চেয়ারে উপবিষ্টা।]

হলধর ॥ আপনাদের খাতক শুধু আমরাই নই হুজুর ! পরাণ মণ্ডল, যুধিষ্ঠির দাস, নকুল প্রামাণিক, হারাধন বিশ্বাস—

ধনঞ্জয় ॥ আরে, এ গাঁয়ে আমাদের খাতক কে নয়, তাই বলো।

হলধর ॥ তাদেরও কি একথা বলা হয়েছে হুজুর ?

ধনঞ্জয় ॥ জনে জনে ডেকে আমি প্রায় সবাইকে এ প্রস্তাব দিয়েছি।

হলধর ॥ স্বীকার হয়ে গেছে তারা ?

নন্দিতা ॥ কেউ কেউ হয়নি। কিন্তু বেশীর ভাগই রাজি হয়েছে আমাদের কথায়।

সুবল ॥ তারা বলে গেছে সমবায় মিটিং বয়কট করবে ?

নন্দিতা ॥ হ্যাঁ, বলে গেছে।

সুবল ॥ ব্যাপারটা আমরা এখনো বুঝতে পারছি না ঠাক্‌রুন ! সমবায়ের মিটিং করতে আসছেন এই বাড়িরই ছোটকর্তা পার্থ দাদাবাবু। সঙ্গে আসছেন আপনারই বাবা আর বোন। তাঁরা যখন মিটিং করবেন, সে মিটিং কেনই বা বয়কট করবো ?

ধনঞ্জয় ॥ তাঁরা যেই হোন, বুড়োকর্তা হুকুম দিয়ে গেছে, এ গাঁয়ে ওঁদের এ মিটিং হতে দেওয়া হবে না।

হলধর ॥ অবাক কাণ্ড !

সুবল ॥ এখন আমরা যেখানেই যাই সেখানেই শুনি, সমবায় ছাড়া মহাজনের হাত থেকে গরীব চাষীদের বাঁচানোর আর কোনো পথ নেই। এই তো আমাদের বারাসতের ব্লক ডেভলপ্‌মেণ্ট-এর লোকেরা, গ্রাম সেবক সেবিকারা গাঁয়ে গাঁয়ে এই জন্য মিটিং করছেন।

নন্দিতা ॥ তা' আমিও জানি। আমার বাবার মুখে ছোট বেলা থেকে এই শুনতে শুনতেই আমি মানুষ হয়েছি।

ধনঞ্জয় ॥ সেই বাবাই ওঁকে বিয়ে দিয়েছেন এই মহাজনের ঘরে।

নন্দিতা ॥ [ধনঞ্জয়কে] আপনি থামুন ! আজ আমাদের সামনে একটিমাত্র প্রশ্ন—আত্মরক্ষার প্রশ্ন। আমি মহাজন—আমি বাঁচতে চাই। তোমরা খাতক—তোমরা বাঁচতে চাও। চলছে একটা বাঁচবার লড়াই। দেনার দায়ে তোমাদের ভিটেমাটি আমাদের হাতে বাঁধা। ডিক্রী জারি দিলেই তোমরা গেছ। কেমন ?

হলধর ॥ এ কথা মা সত্যি।

নন্দিতা ॥ ছেলে-বৌয়ের হাত ধরে, পথে দাঁড়াবে এ-ই কি তোমরা চাও ?

হলধর ॥ না।

সুবল ॥ কিন্তু বাবা—

হলধর ॥ তুই ব্যাটা থাম ! দু'পাতা লেখাপড়া শিখে খুব একটা বল্‌নে-কউনেওয়ালা হয়ে গেছিস্‌, না ? ভিটে-মাটির মর্ম তুই কি বুঝিস ?

সুবল ॥ সে মান্ধাতার আমল আর নেই বাবা। জমিদার-মহাজন এতকাল গরীব চাষীর রক্ত শুষে যে পাপ করেছিলেন, এসে গেছে তার প্রায়শ্চিত্তের দিন। এ বাড়ির ছোটকর্তা সেই প্রায়শ্চিত্ত করতেই আসছেন।

নন্দিতা ॥ [হাসিয়া] এ সব কথা মিথ্যে নয় ভাই। কিন্তু বুড়ো কর্তা এখনো জীবিত। এ লড়াইয়ের শেষ মরণকামড়টা দিতে বলে গেছেন আমাদের। তাই আমাদের হুকুম, সমবায়ের কোনো মিটিংয়ে তোমরা যেতে পারবে না। যদি যাও, আমরা ডিক্রী জারি দিয়ে তোমাদের ভিটে মাটি নিলাম করে নেব। তোমরা পথে বসবে। আর যদি আমাদের বাধ্য থাকো তোমরা, ডিক্রী জারি বন্ধ থাকবে—এ কথা আমি তাদেরও দিয়েছি, তোমাদেরও দিচ্ছি।

হলধর ॥ [সুবলকে] চল্, ঘরে চল্।

ধনঞ্জয় ॥ কি স্থির করলে, বলে যাও মণ্ডল।

সুবল ॥ শুনতে তো স্যার কিছুই বাঁকি রইলো না। নিজেদের ভাল মন্দ নিজেরাই বুঝে নেব। আর দশজন যা' করে আমরাও তাই করবো। চল বাবা।

[হলধরকে লইয়া সুবলের প্রস্থান।]

ধনঞ্জয় ॥ ছেলেটার মাথার ভূত এখনো ছাড়েনি দেখছি।

নন্দিতা ॥ কি করে ছাড়াবো ধনঞ্জয় খুড়ো—যে শর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়াবো, সেই শর্ষেতেই রয়েছে ভূত। [ম্লান হাস্য] শুধু তো তাই নয়, আমার রক্তেও রয়েছে সে ভূত। কেন যে আজ আমি এ লড়াই করছি, নিজেই ভেবে পাই না। আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে আমারই লোক—আমারই লোক।

ধনঞ্জয় ॥ আচ্ছা মা, ওঁদের মিটিংই না হয় আমরা বয়কট করাচ্ছি, কিন্তু ওঁরা যদি এ বাড়িতে আসেন, কে কি করে ওদের রুখবে মা!

নন্দিতা ॥ রুখবে! আপনি কি বলছেন ধনঞ্জয় খুড়ো! আমার বাড়িতে যদি আমার বাবা আসেন, ছোটকর্তা যদি আসেন তাঁর নিজের বাড়িতে, আমরা রুখবো কেন তাঁদের। আপনি সদর দরজায় একটা তোরণ তৈরী করুন। বসিয়ে দিন দু'ধারে মঙ্গল ঘট। ফুলের মালারও যোগাড় রাখুন। আর, হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে গিয়েছি—সাইকেলে লোক পাঠিয়ে যেমন করে যেখান থেকে হোক আনুন এক টিন কফি। আমার বাবা খেতে বড় ভালবাসেন।

* * * *

[পূর্বোক্ত দৃশ্য। পরদিন সকালবেলা। অধ্যাপক সত্যশরণ রায় অতি প্রত্যুষেই নন্দিতার সহিত গ্রাম পরিদর্শনে বাহির হইয়াছেন। পার্থ বারান্দায় বসিয়া একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। বন্দিতা একটি চায়ের ট্রে আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া পার্থের মুখোমুখি বসিয়া পেয়ালায় চা ঢালিতে লাগিল।]

বন্দিতা ॥ খাবারও তৈরী করেছি। যে সব খাবার নন্দিতা খেতে ভালবাসে। কিন্তু তা' এখন তোমাকে দেবো না পার্থ। বাবা আর নন্দিতা বেড়িয়ে ফিরে আসুন—সব একসঙ্গে বসে খাওয়া যাবে।

পার্থ ॥ তুমি নিজ হাতে খাবার তৈরী করেছো দিদি আজ! কেন? এ বাড়িতে কি আর লোক ছিল না?

বন্দিতা ॥ কেন থাকবে না ভাই। তাদের সরিয়ে দিয়েই আমি জোর করে রান্নাঘরে ঢুকেছি। নন্দিতাকে আজ কতদিন খাবার তৈরী করে খাওয়াই না! মনটা যেন কেমন করতো। আমার সঙ্গে ও যত ঝগড়াই করুক আমার হাতের খাবার পেলে আনন্দে ওর মুখখানি ভরে ওঠে।

পার্থ ॥ তাহলে দিদি তোমাকে এই বাড়িতেই বেঁধে রাখতে হয়। অন্তত তোমার হাতের খাবার খাইয়ে ওর মুখে হাসি ফোটানো যাবে। আশ্চর্য! ও যেন রাতদিন এখন ক্ষেপেই থাকে—বিশেষ আমার ওপর।

বন্দিতা ॥ তার কারণ যে না আছে তাও তো নয় পার্থ।

পার্থ ॥ কি কারণ থাকতে পারে দিদি? আমি মহাজনী পাপের বিরুদ্ধে তোমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়ছি। এ যে আমি লড়বো সেটা আমাদের বিয়ের আগে নন্দিতার অজানা ছিল না দিদি। তোমাদের মনে হয়তো বা এজন্যে সন্দেহ ছিল। হয়তো বা এটা আমার অভিনয়, এ ধারণাও তোমাদের একদিন ছিল। আমাকে ভুল বোঝার কোন অবকাশই আমি কোনদিন নন্দিতাকে দিইনি। তবু কেন এ অশান্তি বল দেখি?

বন্দিতা ॥ অশান্তির কারণ, হয়তো, এই দিদি।

পার্থ ॥ কথাটা আমিও ভেবেছি দিদি। মেয়েরা চায় যে, তাদের স্বামীরা তাদের হাতের মুঠোয় থাকে। মেয়েদের এমন একটা সময় আসে যখন তারা স্বামীকে রাখে চোখে চোখে আর লক্ষ্য করে অন্য মেয়েদের সঙ্গে স্বামীর ঘনিষ্ঠতা। সে ঘনিষ্ঠতা আজ তোমার সঙ্গে আমার খুবই বেশী এটা সত্য।

বন্দিতা ॥ [বিচলিত হইয়া] পার্থ!

পার্থ ॥ কিন্তু মেয়েদের চরিত্রটা এমনি অদ্ভুত যে, অন্য মেয়ের সঙ্গে স্বামীর এই ঘনিষ্ঠতা একটিবার বিশ্লেষণ করেও দেখতে চায় না।

বন্দিতা ॥ আমি ওর দিদি বটে, কিন্তু এ কথা নন্দিতা কেন মনে করে না—কেন ভুলে যায়—যে আমি ওকে মায়ের মতনই কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি!

পার্থ ॥ কিন্তু আমাকে তো তুমি তা করো না দিদি?

বন্দিতা ॥ [পুনরায় বিচলিত হইয়া] পার্থ!

পার্থ ॥ হ্যাঁ দিদি, এই ভুল বোঝাই হ'ল এ বয়সের মেয়েদের স্বভাব। তুমি বিয়ে করলে না—স্বামী নিয়ে ঘর করলে না—যদি করতে তবে তুমিও হয়তো একদিন এমনি ভুলই করতে।

বন্দিতা ॥ [একটু বিরক্ত হইয়া] আমি কি করতাম—না করতাম সে কথা এখন থাক পার্থ। কথা হচ্ছে নন্দিতাকে নিয়ে—তোমাকে নিয়ে।

পার্থ ॥ তোমাকেও নিয়ে দিদি। আমি অস্বীকার করবো না, ভাল আমি তোমাদের দু'বোনকেই বাসি। তোমাকে যে আমি ভালবাসি সেটা হ'ল গিয়ে আমার শ্রদ্ধা আর তাকে যে আমি ভালবাসি তার নাম প্রেম। এই তফাৎটা তাকে আমি কি করে বোঝাই—কি করে বোঝাই দিদি!

[বাহির হইতে সত্যশরণ সহ নন্দিতার প্রবেশ।]

সত্যশরণ ॥ চমৎকার গ্রাম—চমৎকার গ্রামটি। ছবির মত দেখতে হ'ত যদি গাঁয়ের লোকেরা দুঃখে-দৈন্যে এমন হতাশ হ'য়ে না পড়ে থেকে, একটা সমবায় পল্লী সংস্কার সমিতি গড়ে তুলত। আজকের মিটিঙে এসব আমি বলবো—বুঝলে পার্থ! আমি একটা স্কীম এখনই তৈরী করে ফেলছি।

বন্দিতা ॥ তোদের ফিরতে এত দেরী হ'ল যে নন্দিতা?

নন্দিতা ॥ সেজন্য আশা করি তোমরা দুঃখিত হওনি দিদি। চা তো তোমরা যথাসময়েই খেয়েছো দেখছি।

সত্যশরণ ॥ [কি যেন ভাবিতেছিলেন] হ্যাঁ, ওটা মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ স্কীম করাই ভাল। আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেমনটি চাইছে। পার্থ—এসো দেখি তোমার পড়ার ঘরে—আমাকে কাগজ-কলম দাও—আমি লিখবো

[কাহারও কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া সত্যশরণ অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। পার্থ তাহার অনুগামী হইল।]

বন্দিতা ॥ বাবার কফিটা তৈরী করতে হবে।

[বন্দিতাও অন্দরে যাইতেছিলেন কিন্তু নন্দিতা তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া আটকাইল।]

নন্দিতা ॥ আমার বাড়িতে কফি তৈরী করার লোকের অভাব নেই দিদি। কখন কোথায় কাকে সেটা দিতে হবে সেটাও বলা আছে। তুমি এখানে একটু বোস দিদি। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

বন্দিতা ॥ নিরিবিলিতে একটু কথা বলার সুযোগ আমিও খুঁজছিলাম নন্দিতা। কাল-সন্ধ্যায় আমরা এসেছি। খাওয়ার পরও রাতদুপুর পর্যন্ত চললো বাবার সব জল্পনা। তুই যে কখন উঠে গেলি আমি জানতেও পারিনি। আজ ভোরে উঠে এসে দেখি তুই এই বারান্দার তক্তপোষে শুয়ে ঘুমোচ্ছিস। কেন বলতো?

নন্দিতা ॥ গভীর রাতে যদি অন্য কোন মেয়ের উচ্ছ্বসিত বন্দনা স্বামী-স্ত্রীর আলাপকে ছাপিয়ে ওঠে—তাহলে সেই স্বামীর পাশে আর শোওয়া চলে কি?

বন্দিতা ॥ কি ভুল যে তুই করছিস নন্দিতা তা' আমি তোকে কি করে বোঝাই —কি করে বোঝাই!

নন্দিতা ॥ বুঝতে কি আর কিছু বাকী আছে দিদি! শুনতে খারাপ লাগে কিন্তু না বলেও তো পরছি না। আমার সারাটা জীবন তুমি বিষিয়ে তুলেছো।

বন্দিতা ॥ তোর জীবন বিষিয়ে তুলেছি! আমি!

নন্দিতা ॥ জানি—জানি এখনই তুমি বলবে, তোকে আমি মায়ের মত মানুষ করেছি নন্দা।

বন্দিতা ॥ তা কি সত্যি নয় নন্দা?

নন্দিতা ॥ কিন্তু এটাও কি সত্যি নয় দিদি যে, শুধু সেই অধিকারে আমাকে খর্ব করতে গেছ তুমি পদে পদে? লোকে বলতো তোমার চেয়েও সুন্দরী হয়েছি

আমি। পারনি তুমি তা' সইতে। আমি সাজগোজ করে থাকতে ভালবেসেছি। তুমি গেছ চটে। ছেলেরা কেউ আমার প্রশংসা করলে তোমার মুখ হ'ত অন্ধকার। এ যুগের মেয়ে হলেও তুমি আমাকে ঘবের মধ্যে বন্ধ করে রাখতে চেয়েছিলে। এটা ছিল তোমার হিংসা। পার্থ যে আমাকে ভালবাসতো সেটাও তুমি সইতে পারনি দিদি! আজ যদি আমি বলি সেটা শুধু হিংসা নয়—হিংসার চেয়ে আরও কিছু—বেশী মিথ্যা হবে সেটা?

বন্দিতা ॥ ওরে তুই থাম—থাম। তোকে আজ আমি শুধু একটা কথা বলবো, তুই শোন। তুই আমার বোন কিন্তু সারা জীবন তোকে আমি দেখে এসেছি মেয়ের মত। আর ঐ পার্থকে দেখি ছেলের মত।

নন্দিতা ॥ এসব কথা আজ তোমার কাছ থেকে নতুন শুনছি না দিদি। এমন করে তুমি বল যে, যখন শুনি তখন বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হয়। তখন মনে হয়, না জানি তোমার ওপর কি অবিচারই আমি করছি! না-না তুমি কেঁদো না দিদি। তোমার সঙ্গে যত ঝগড়াই আমি করি না কেন কিন্তু তোমার চোখের জল আমি কোন দিনই সইতে পারিনি দিদি—এখনও পারছি না। [বন্দিতাকে বুকে টানিয়া আনিয়া] দিদি! মা যে কী, তা আমি জানি না। একটা কথা তুমি শুধু ভেবে দেখো লক্ষ্মী দিদিটি আমার, আজ মা যদি বেঁচে থাকতেন তিনিও কি আমার সঙ্গে এই ব্যবহার করতেন—তুমি যেমন করছো?

বন্দিতা ॥ সে শুধু জানেন ঈশ্বর!

[ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। অন্দব হইতে পার্থেব প্রবেশ। পার্থকে দেখিযাই বন্দিতা দ্রুত অন্দবে চলিয়া গেলেন।]

পার্থ ॥ একি! দিদি—দিদি—

[পার্থ বন্দিতার অনুগমন কবিতেছিল।]

নন্দিতা ॥ দাঁড়াও।

[পার্থ দাঁড়াইল]

তোমার ধারণা আমি তোমার দিদিকে অপমান করেছি। ঘৃণা আব রাগে তাই আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে তুমি ছুটেছিলে ও'র কাছেই। কিন্তু জেনো, কোন অপমানই আমি ওঁকে করিনি।

পার্থ ॥ [হাসিয়া] তুমি তোমার দিদিকে সইতে পারোনা আমি জানি। কিন্তু তাই বলে আজ যখন তিনি তোমার অতিথি, তাঁকে তুমি অপমান করবে, এত ছোট তুমি যে নও আমি জানি। কিন্তু তাঁর চোখে জলই বা কেন, এটাও তো আমার জানা দরকার নন্দা?

নন্দিতা ॥ সেটা আমার মুখেও তুমি শুনতে পারো পার্থ। দিদিকে আমি বলছিলাম, মা কী আমি জানি না। তুমি বল মায়ের মত তুমি আমায় মানুষ করেছ। মা যদি থাকতেন তিনি কি আমার সঙ্গে ঠিক তোমারই মত ব্যবহার করতেন দিদি?

পার্থ ॥ উত্তরটা আমি শুনেছি। কাঁদতে কাঁদতে বলে গেলেন 'সে জানেন শুধু ঈশ্বর'!

নন্দিতা ॥ কথাটা জিজ্ঞাসা করে আমি কি তাঁর অপমান করেছি ?

পার্থ ॥ না। বরং তাঁকে জানাবার সুযোগ দিয়েছ আজ, তিনি কতটা ভালবাসেন তোমাদের। আর উত্তরটা যখন পেয়েছো চোখের জলে আর ঈশ্বরের নামে, আশা করি, আর তাঁকে ভুল বুঝবার কোন কারণ নেই তোমার। কি বল নন্দরাণী ?

নন্দিতা ॥ তা' ঠিক। তাঁকে আর আমি ভুল বুঝবো না। এটা ঠিক। কিন্তু তোমাকে আমি আজও বুঝে উঠতে পারছি না পার্থ। আমাকে কি তোমার এতটুকু ভাল লাগে না ? ভাল লাগে কি শুধু ওঁকে ? তোমার যত আলাপ, যত আলোচনা, যত পরামর্শ সব দেখি ওঁর সঙ্গে। আমাকে বিয়ে করে এনে এই সংসারের কারাগারে বন্দী রেখে তুমি ছুটে চলে গেলে বারাসতে দিদির কাছে! কিন্তু কেন—কি দোষ আমি করেছি তোমার কাছে ?

পার্থ ॥ কথাটা যখন তুলেছো মিথ্যা আমি বলবো না। বিয়ের পর এ বাড়িতে তোমাকে নিয়ে এসেই দেখলাম, এত ধনদৌলত দেখে তুমি যেন আত্মহারা হয়ে গেছ। আমার বাবা তোমাকে পেয়ে বসলেন। তুমি জান, আমি চিরদিন তোমাকে বলেছি মহাজনী পাপে, গরীবের রক্তে গড়ে উঠেছে আমাদের এই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বুনিয়াদ। এ বুনিয়াদটা ভাঙতে চাই আমি। কিন্তু দেখলাম তোমার তাতে আপত্তি আছে।

নন্দিতা ॥ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কে না চায় পার্থ ?

পার্থ ॥ সেটা আমিও চাই নন্দা। দরিদ্র হ'তে আমরা কেউ চাই না। কিন্তু তাই বলে দরিদ্রের রক্ত শুষে দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করে বড়লোক হওয়াটা একটা সামাজিক পাপ।

নন্দিতা ॥ তা যদি বল, এই পাপই জগতের নিয়ম। সব যুগেই দুর্বলকে শাসন ও শোষণ করেছে প্রবল। দেশ যখন থাকে পরাধীন তখনও এই নিয়ম চলে। দেশ স্বাধীন হ'লেও এই নিয়মই থাকে। স্বাধীনতার সনদ, সমাজতন্ত্রবাদের বুলি, সবকিছু মিথ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশে দেশে। আমিও তাই আমার অধিকার ছাড়তে প্রস্তুত নই পার্থ।

পার্থ ॥ কিন্তু তোমার দিদির মত তা নয়। তোমাতে এবং তাঁতে এইখানেই পার্থক্য নন্দরাণী।

নন্দিতা ॥ দিদির কিছু নেই আর আমার এত কিছু আছে। আমি বলবো তাই তার এই হিংসা।

[হঠাৎ বাহিরে জনকোলাহল শোনা গেল। পার্থ ও নন্দিতা উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। বন্দিতা ও ধনঞ্জয়ের প্রবেশ।]

ধনঞ্জয় ॥ [নন্দিতাকে] এই যে মা—তোমার কাছেই এসেছি। বন্দুকটা বের করো মা।

নন্দিতা ॥ সে কি! কি হয়েছে কাকাবাবু ?

ধনঞ্জয় ॥ তুমি মা হুকুম দিয়েছিলে বাইরের কোন লোক আজ যেন এ বাড়িতে

ঢুকতে না পারে। সে বাধা না মেনে সদর দেউড়ী ঠেলে অন্তত খুব কম করে দু'শ লোক ঢুকে পড়েছে বাড়িতে।

নন্দিতা ॥ কি চায় তারা ?

ধনঞ্জয় ॥ সমবায় আন্দোলনের নেতা সত্যশরণবাবুর সঙ্গে তারা এখনই দেখা করবে—এই তাদের দাবী।

নন্দিতা ॥ কিন্তু বাবা মিটিং করবেন তো শুনেছি বিকেলে। গাঁয়ে তো সেই ঢোলই পড়েছে। এখন কি ?

ধনঞ্জয় ॥ ওরা কি করে খবর পেয়েছে আমরা নাকি থানায় খবর দিয়েছি। দারোগাকে ঘুষ দিয়ে শান্তি ভঙ্গের অজুহাতে বিকেলের মিটিং বানচাল করার ব্যবস্থা করেছি। তাই সে মিটিং তারা করতে চায়—এখনই—এখানে।

নন্দিতা ॥ কিন্তু এটা কাছারি বাড়ি নয়। মিটিংএর জায়গা এটা নয়। এটা আমাদের বসতবাড়ি।

ধনঞ্জয় ॥ আর বসতবাড়ি। ওরা শাসাচ্ছে, দেরী হলে ওরা এখানেই ঢুকে পড়বে।

নন্দিতা ॥ ধনঞ্জয় কাকা, আপনি শিগ্‌গীর যান। বাড়ির সদর দরজায় তালা দিন!

পার্থ ॥ না না। ওরা তাতে আরো ক্ষেপে যাবে। দরজা বরং খুলে দিন।

[ধনঞ্জয় ইতস্ততঃ করিয়া নন্দিতার মুখের দিকে তাকাইলেন।]

নন্দিতা ॥ আমার আদেশ, দরজায় তালা দিন।

বন্দিতা ॥ তুই ভুল করছিস নন্দিতা।

নন্দিতা ॥ ভুল করছি কি ঠিক করছি, সেটা আমি বুঝবো।

পার্থ ॥ আমি বুঝছি না, এ বাড়িটা কার!

নন্দিতা ॥ [ধনঞ্জয়কে] আপনি এখনো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন ?

ধনঞ্জয় ॥ [পার্থকে] আমাকে মাফ করবেন ছোটকর্তা। বুড়োকর্তা উইল করে গেছেন, বাড়ি এবং বিষয়ের ষোলো আনা মালিক বৌমা।

[ধনঞ্জয় নন্দিতার আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল।]

বন্দিতা ॥ [নন্দিতাকে] ওদের যদি আসতে না দাও, তবে আমাকে যেতে দাও ওদের কাছে।

নন্দিতা ॥ না। তাও আমি দেব না।

বন্দিতা ॥ কিন্তু বাবাকে তুই কি করে রুখতে পারিস আমি দেখবো।

[বন্দিতা অন্দরে ছুটিয়া গেল। সদর দরজা হইতে ছুটিয়া আসিলেন ধনঞ্জয়।]

ধনঞ্জয় ॥ সদর দরজায় তালা পড়েছে। লোকগুলো যে এতে নিরস্ত্র হবে, তা মনে হচ্ছে না! আত্মরক্ষার জন্যে বন্দুকটা তুমি এখনো বের করলে না মা ?

নন্দিতা ॥ বন্দুক বের করবার সময় এখনো হয়নি কাকাবাবু, কিন্তু যে খাতক-দের আপনি হাত করেছিলেন, তারা কোথায় ? কোথায় তাদের লাঠি ?

[বন্দিতা সহ সত্যশরণের প্রবেশ।]

সত্যশরণ॥ লোকদের জানিয়ে দে নন্দিতা, আমি ওদের সঙ্গে দেখা করতে পারবো না।

বন্দিতা॥ সে কি বাবা ?

সত্যশরণ॥ হ্যাঁ মা। ওদের সঙ্গে আমি দেখা করবো না। যদি দেখাই করি, দেখা হবে বিকেলে—মিটিঙে। পার্থ, তুমি যাও বাবা, আমার এই কথাটা তুমি ওদের জানিয়ে এসো। সেই সঙ্গে এটাও ওদের বুঝিয়ে দিয়ে এসো—এই জোর-জবরদস্তি, সমবায় আন্দোলনের নীতি নয়। জোর-জবরদস্তি চললে মিটিংয়ে যাওয়া দূরের কথা, আমার জীবন নিয়ে হবে টানাটানি। ওদের বলে দাও, মনটা আমার যত সবলই হোক না কেন, হার্টটা আমার দুর্বল—অত্যন্ত দুর্বল।

[পার্থ ও তৎপশ্চাৎ ধনঞ্জয় জনতার উদ্দেশ্যে ছুটিলেন। নন্দিতা পিতাকে ধরিয়া একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিল।]

নন্দিতা॥ তুমি বসো। কফি খেয়েছ বাবা ?

সত্যশরণ॥ খেয়েছি—খেয়েছি মা। তুই আমার কফির নেশাটা ভুলিসনি দেখছি। আর অত খাবার—দেখে মনে হ'ল বাকী জীবনের সব খাওয়াটা তুই আমাকে একদিনে খাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিস।

নন্দিতা॥ খাবার তৈরি করেছে দিদি।

বন্দিতা॥ করেছিলাম তোর জন্যে নন্দিতা। সেই সব খাবার—যা আবদার করে আমার কাছে খেতে চাইতিস। কিন্তু তোকে কাছে বসিয়ে খাওয়াবার সুযোগ আমি পেলাম না। সকাল থেকে শুরু হ'ল এমন গোলমাল !

[পার্থ ও ধনঞ্জয় ফিরিয়া আসিলেন।]

পার্থ॥ জনতা চলে যাচ্ছে বটে কিন্তু বড় দুঃখ করে গেল, আপনি ওদের সঙ্গে একটিবার দেখা করলেন না।

বন্দিতা॥ একটিবার দেখা করলেই বোধ হয় ভাল হ'ত বাবা। বড় আশা করে এসেছিল ওরা। তাছাড়া কলঙ্কও রটতে পারে। এ আশঙ্কা তো এখানকার লোকের আছে যে, ছোট মেয়ে তোমাকে হাত করবে বাবা।

সত্যশরণ॥ বন্দিতা !

বন্দিতা॥ বাবা।

সত্যশরণ॥ একদিন তুই না আমাকে বলেছিলি, দেশের মানুষকে মানুষ করেছ বাবা, কিন্তু নিজের মেয়েকে মানুষ করতে পারনি। সেই কথাটাই আজ আমার বার বার মনে পড়ছে। নন্দিতাকে—নিজের মেয়েকে—যদি আমি সমবায় মন্ত্রে দীক্ষিত করতে না পারি, অপরকে সে মন্ত্রে দীক্ষা দেবার সত্যিকার অধিকার আমার নেই। নন্দিতা, আমার কাছে আয় মা !

নন্দিতা॥ [কাছে আসিয়া] সমবায়ের কথা জন্ম থেকে শুনে আসছি তোমার মুখে—তখন বিশ্বাসও হতো আমার—বোধ হয় এই জন্য—তখন আমরা ছিলাম সাধারণ

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। কিন্তু সত্যি কথা বলবো বাবা, বিয়ের পর আজ যখন ধনদৌলত এসে পড়েছে আমার মুঠোর মধ্যে, এখন আমার কেবলই মনে হয় হিংসা আর ঈর্ষা থেকেই জন্ম নিয়েছে এই সমবায় আন্দোলন। তাই, তুমি যাই বলো না কেন, এ আন্দোলনকে আমি বুঝবো—যথাশক্তি বুঝবো।

[পার্থ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

বন্দিতা॥ পার্থ ঠিকই হাসছে নন্দিতা। এ ধনদৌলত ওর মুঠোতেও ছিল একদিন। আজই না হয় ওর বাবা উইল করে সব সম্পত্তি দিয়েছেন তোমায়।

সত্যশরণ॥ হ্যাঁ, সেটা আমিও শুনেছি। তাতে আমার কাজ হয়ত আরো সহজ হয়েছে মা। পরের ছেলেকে জয় করাই কঠিন, নিজের মেয়েকে জয় করা সহজ। শোন্ মা নন্দিতা—

নন্দিতা॥ আমি তোমার কোনো কথা শুনবো না বাবা। ভুলো না, তুমিও এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ।

সত্যশরণ॥ [হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া] বটে! আমি না হয় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কিন্তু রাজ-ঐশ্বর্যের মালিক ছিলেন এই দেশের যে শ্রেষ্ঠ মনীষী সেই রবীন্দ্রনাথ—তিনি কি বলেছেন শোন্। তোকে শুনতে হবে। তিনি বলেছেন—"আজকালকার দিনে অর্থশক্তি বিশেষ ধনী সম্প্রদায়ের মুঠোর মধ্যে আটকা পড়েছে। তাতে অল্প লোকের প্রতাপ ও অনেক লোকের দুঃখ। অথচ বহু লোকের কর্মশক্তিকে নিজের হাতে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলেই ধনবানের প্রভাব। তার মূলধনের মানেই হচ্ছে, বহু লোকের কর্মশ্রম তা॰ টাকার মধ্যে রূপক মূর্তি নিয়ে আছে। সেই কর্মশ্রমই প্রত্যক্ষভাবে আছে শ্রমিকদের প্রত্যেকের মধ্যে।"

বন্দিতা॥ বাবা, তুমি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছ। তুমি থামো—তুমি থামো।

[উহাতে কর্ণপাত না করিয়া আরো উত্তেজিতভাবে—যেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত এক বিরাট জনতার উদ্দেশ্যে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—]

সত্যশরণ॥ তোমাদের এই বিরাট শক্তি সম্পর্কে যত হবে তোমরা সচেতন, অত্যাচারী মহাজন তত হবে ভীত। কে বলে তোমরা নির্ধন! তোমরা যদি ঠিকমত বলতে পারো যে—"আমরা আমাদের ব্যক্তিগত শক্তিকে এক জায়গায় মেলাব" তাহলে সেই হয়ে গেল মূলধন। এই সামাজিক মূলধন, এই সামাজিক শক্তি সংগ্রহ করতে হলে, তোমাদের ঐক্য চাই, একাত্মবোধ চাই, আর তা যদি আসে কেউ পারবে না তোমাদের শোষণ করে শেষ করতে। তোমাদের উন্নতি কেউ পারবে না রুখতে। লক্ষ্মীর দরজা যাবে খুলে—লক্ষ্মীর সে ভাণ্ডারের অধিকারী শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন হবে না—হবে সমস্ত সমাজ—

বন্দিতা॥ এ কি! বাবা তুমি অমন করছো কেন! পার্থ! এ কি হ'ল!

[সত্যশরণের সর্বশরীর কাঁপিতে কাঁপিতে ভূলুণ্ঠিত হইল। সকলে আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া গেল। পার্থ নাড়ী পরীক্ষা করিল।]

নন্দিতা॥ [সরিয়া আসিয়া] কাকাবাবু, দরজা খুলে দিন—ডাক্তার আনুন।

পার্থ ॥ [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] দরকার নেই। দরকার নেই। তোমাদের হাত থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন।

পঞ্চম দৃশ্য

[অধ্যাপক সত্যশরণ রায়ের বারাসতের পূর্ববর্ণিত বাসভবন। অপরাহ্ণ। গৃহ ভৃত্য জগবন্ধু কক্ষের আসবাবপত্র পরিষ্কারে ব্যস্ত। সদর দরজায় করাঘাত শুনিয়া সে সদর দরজা খুলিয়া দিল। বাহির হইতে প্রবেশ করিল নন্দিতা।]

জগবন্ধু ॥ ছোটদিদি! আপনি!

নন্দিতা ॥ কেন আমার কি এখানে আসতে নেই?

জগবন্ধু ॥ আসেন না কিনা তাই। আর যদিও বা এলেন বাড়িতে এখন কেউ নেই।

নন্দিতা ॥ কেন তোমার বড়দি?

জগবন্ধু ॥ বড়দি তো এখন মিটিং করে বেড়ান এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে। একদিন যদি বাড়ি থাকেন তিনদিন থাকেন বাড়ির বাইরে।

নন্দিতা ॥ হুঁ। আর তোমাদের বাবু?

জগবন্ধু ॥ বাবু! তিনি আবার কে?

নন্দিতা ॥ তোমাদের জামাইবাবু। তিনিও তো তোমাদের বড়দির আঁচল ধরে ঘুরে বেড়ান সঙ্গে সঙ্গে?

জগবন্ধু ॥ হ্যাঁ-তা-না—হ্যাঁ তিনিও যান—লোকে যে ছাড়ে না। একজন হ'ন সভানেত্রী আর একজন হ'ন প্রধান অতিথি! ফুলের মালা দু'জনেই পান।

[নন্দিতা একটি চেয়ারে বসিল।]

নন্দিতা ॥ ফুলের মালা তো বুঝলাম। সংসার চালাচ্ছেন কে?

জগবন্ধু ॥ সে আমার জানবার কথা নয় ছোটদিদি। তবে আমার হাতে টাকাকড়ি আসে বড়দির হাত থেকে। তাঁর হাতে টাকাকড়ি কোত্থেকে আসে সে জানেন মা গঙ্গা।

নন্দিতা ॥ [গৃহসজ্জা দেখিতে দেখিতে] অনেক কিছু পালটে গেছে দেখছি! আজকাল কে কোন ঘরে শোন? বল—সেও জানেন শুধু মা-গঙ্গা! তোমাদের বড়দি কোন ঘরে শুচ্ছেন এখন?

জগবন্ধু ॥ কেন—বড়দি তাঁর নিজের ঘরেই শোন!

নন্দিতা ॥ আর তোমাদের বাবু?

জগবন্ধু ॥ তিনি শোন আপনার খাটে।

নন্দিতা ॥ তার মানে, দিদিরই ঘরে।

জগবন্ধু ॥ [জিভ কাটিয়া] ছিঃ ছিঃ ! আপনি কি বলছেন দিদিমণি ? বুড়ো কর্তার ঘরে গিয়ে দেখুন আপনার খাট চালান হয়েছে সেখানে।

নন্দিতা ॥ হু ! খুব আনন্দেই সব আছ—না ? খুব হাসাহাসি চলে দিনরাত ?

জগবন্ধু ॥ আপনি একটা দিন থেকে দেখুন না ছোটদিদি ! বুড়ো কর্তা চলে যেতে বাড়িটা খাঁ খাঁ করে। সে বাড়ি আর নেই—এ বাড়ি এখন আঁধার। হাত মুখে একটু জল দিন ছোটদিদি। আমি চা করে দিই।

[জগবন্ধু অন্দরে চলিয়া গেল। নন্দিতা উঠিয়া এই কক্ষ সংলগ্ন শয়ন কক্ষের পর্দাগুলি সরাইয়া ঘরগুলি দেখিতেছিল এমন সময় সদর দরজায় করাঘাত শুনিয়া নন্দিতা নিজেই ছুটিয়া গেল সেখানে এবং দরজা খুলিয়া বহিরাগত দুইজন ভদ্রলোককে লইয়া কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। দুইজনের মধ্যে একজন বাঙ্গালী যুবক। আর একজন মধ্যবয়সী পাহাড়ী ভদ্রলোক—নমস্কার বিনিময়ান্তে।]

বাঙালী যুবক ॥ আমি উত্তমগ্রাম সমবায় সমিতির সম্পাদক। আমাদের আঞ্চলিক সমবায় সম্মেলনে সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করবার জন্য আমরা বন্দিতা দেবীকে অনুরোধ করতে এসেছি।

নন্দিতা ॥ আর প্রধান অতিথি ?

বাঙালী যুবক ॥ বন্দিতা দেবী যদি দয়া করে সভানেত্রী হ'তে সম্মত হ'ন, প্রধান অতিথিরূপে আমরা পার্থবাবুকে পাবো এ আশা আমাদের আছে।

নন্দিতা ॥ কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনি এখন তাঁদের কাউকেই পাবেন না। তাঁরা বাড়ি নেই। কোথায় গেছেন বা আছেন, বাড়ির চাকর বলতে পারছে না। আমিও তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বাঙালী যুবক ॥ আপনি ?

নন্দিতা ॥ আমার পরিচয়টা শোনবার মত নয়।

বাঙালী যুবক ॥ বলছেন বটে। কিন্তু আমি বুঝেছি। আপনি আমাদের স্বর্গত অধ্যাপক সত্যশরণ রায়ের ছোট মেয়ে…নন্দিতা দেবী। দেখেই আমি বুঝেছি—নমস্কার। [পাহাড়ী ভদ্রলোকের প্রতি] শুনলেন তো সব। যাবেন কি বসবেন এখন আপনি বুঝুন। [নন্দিতাকে] ইনি এসেছেন হিমালয় পাহাড় থেকে। সত্যশরণ বাবুর বাড়ি খুঁজছিলেন। [পাহাড়ী ভদ্রলোককে] দেখি বারাসতের সমবায় অফিসে গিয়ে যদি ওঁদের কোন খোঁজ পাই।

পাহাড়ী ভদ্রলোক ॥ আপনি দেখুন। আমি এই বাড়িতেই আর একটু বসছি। [নন্দিতাকে] তোমার আপত্তি নেই তো মা ?

নন্দিতা ॥ না-না সে কি। আপনি বসুন।

[নন্দিতা তাঁহার সামনে একটি চেয়ার আগাইয়া দিল। বাঙালী যুবকটি চলিয়া গেল। জগবন্ধু চায়ের ট্রে আনিয়া নন্দিতার সামনে রাখিল।

নন্দিতা ॥ [জগবন্ধুকে] আর একটা পেয়ালা।

[জগবন্ধু অন্দরে চলিয়া গেল এবং ইহাদের কথোপকথনের মধ্যে পেয়ালাটি দিয়া গেল।]

নন্দিতা ।। আপনাকে একটু চা দিই।

[চা ঢালিতে লাগিল।]

পাহাড়ী ভদ্রলোক ।। পাহাড়ী লোক আমি। চা'তে না বলবো না মা। এসে-ছিলাম কলকাতায়। খবরের কাগজে দেখলাম প্রফেসর রায়ের মৃত্যু সংবাদ। তুমি জানো কিনা মা জানি না, প্রফেসর রায়-ই আমাকে মানুষ হবার পথ দেখিয়েছিলেন। আর সেই পথে চলেই আজ গড়ে উঠেছে আমাদের "হিমালয়ান কো-অপারেটিভ ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল হোম" যার নাম আর কাজ ছড়িয়ে পড়েছে দেশ বিদেশে। আমাদের এই উন্নতির সংবাদ তাঁকে চিঠিতে আমি জানাতাম। উত্তরও পেতাম, উপদেশও পেতাম—মাঝে মাঝে। পাহাড়ে সেই যে একবার দেখা হয়েছিল প্রায় আঠারো বছর আগে, তারপর আর দেখা হ'ল না। তবু ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে আমার একবার দেখা করা উচিত। আজ মনে পড়ছে, আঠারো বছর আগে তোমারই জন্যে তাঁর কাছে আমি প্রথম গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, খেলনা বিক্রী করতে। সেই তুমি আজ কত বড়টি হয়েছো মা। আজ আরও মনে পড়ছে তোমার জন্মের কিছুদিন আগে তোমার দিদিমা গিয়েছিলেন মারা। তাঁর শবযাত্রাটা আমি দেখেছিলাম। তোমার দাদামশাই মারা গেলেন, তখনও আমি কলকাতাতেই—তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে যদি একটিবার আসতে পারতাম।

নন্দিতা ।। কিন্তু প্রফেসর রায় আমার দাদামশাই নন—আমার বাবা।

পাহাড়ী ভদ্রলোক ।। তাই কি ? তোমার মা কোথায় মা ?

নন্দিতা ।। আমার মা তো আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছেন! সেই পাহাড়েই।

পাহাড়ী ভদ্রলোক ।। তাই কি ? হয়তো হবে। তবে হয়তো আমারই ভুল।

[চায়ে শেষ চুমুক দিয়া]

আচ্ছা মা—তবে উঠি। তোমাদের পরিবারকে আমি জানিয়ে যাচ্ছি আমার শ্রদ্ধা।

[তাহার শ্রীনিকেতনী ব্যাগ হইতে একটি সুদৃশ্য ধূপদানী বাহির করিয়া উহা নন্দিতার সামনে রাখিয়া—]

আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রেখে যাচ্ছি এই ধূপদানীটি। তোমার দাদামশাই-এর ফটোর সামনে—

নন্দিতা ।। দাদামশাই নয়, বাবা।

পাহাড়ী ভদ্রলোক ।। ও-হ্যাঁ। ধূপ জ্বেলে দিও মা। সেই হবে আমাদের পূজা।

[নন্দিতাকে নমস্কার করিয়া পাহাড়ী ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন।]

নন্দিতা ।। জগবন্ধু !

[জগবন্ধু কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।]

এই ধূপদানীটা বাবার ঘরে বাবার ফটোর সামনে রেখে দাও। ধূপ জ্বেলে দিও সন্ধ্যায়।

জগবন্ধু ॥ [ধূপদানীটি হাতে লইয়া] খুব দামী জিনিষ ! আর কি চমৎকার ! কে দিল দিদি ?

নন্দিতা ॥ পাহাড়ী এক ভদ্রলোক। কিন্তু মাথায় গোল আছে। আমার বাবাকে বলছে আমার দাদামশাই।

[জগবন্ধু ধূপদানীটি যথাস্থানে রাখিবার জন্য যাইবে, এমন সময় বন্দিতার প্রবেশ। জগবন্ধু দাঁড়াইয়া গেল।]

বন্দিতা ॥ [নন্দিতাকে দেখিয়া—বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দে] নন্দা তুই ! কতক্ষণ ?

নন্দিতা ॥ তা' অনেকক্ষণ। উঠবো ভাবছিলাম।

বন্দিতা ॥ না-না সে কি ! [জগবন্ধুকে] নন্দাকে চা দিয়েছ তো জগবন্ধু ? [জগবন্ধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "হ্যাঁ"] নন্দা—তুই যখন এসেছিস, তোকে কিন্তু আজ আর ছাড়ছি না। দু'দিন থাক আমাদের কাছে। জগবন্ধু, ষ্টোভটা জ্বেলে দাও তো। তোমার হাতে ও ধূপদানীটা কোত্থেকে এলো ? নন্দা তুই এনেছিস বুঝি ? বাঃ—চমৎকার তো !

নন্দিতা ॥ আমি আনিনি। দিয়ে গেলেন বাবার এক পাহাড়ী ভক্ত। কিন্তু বাবার মৃত্যু সংবাদে তাঁর মাথাটা কেমন গোলমাল হ'য়ে গেছে। আমি না কি প্রফেসর রায়ের নাতনী !

[শোনা মাত্র বন্দিতার মুখ ছাই-এর মত সাদা হইয়া গেল।]

বন্দিতা ॥ [জগবন্ধুর প্রতি অকারণ ক্রোধে] হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? ষ্টোভটা জ্বালাতে বলিনি ?

[জগবন্ধু তাড়া খাইয়া ছুটিয়া অন্দরে চলিয়া গেল।]

বন্দিতা ॥ পাহাড়ী সেই ভদ্রলোক চলে গেছেন ?

নন্দিতা ॥ হ্যাঁ চলে গেছেন। কত সব পুরানো কথা বলে গেলেন। আমি হ'তেই নাকি বাবার কাছে গিয়েছিলেন আমার জন্য খেলনা বেচতে। সেই থেকে বাবার সঙ্গে আলাপ।

বন্দিতা ॥ হবে। তা তুই ভাল আছিস তো নন্দা ?

নন্দিতা ॥ বাড়িতে আর আমি টিকতে পারছি না দিদি। এমনি যদি হবে তবে আমাকে বিয়ে দিয়েছিলে কেন তোমরা ?

বন্দিতা ॥ সে কি ! তুই এ কথা বলছিস কেন—নন্দা ?

নন্দিতা ॥ বুঝেও তুমি না বোঝার ভাণ কোরো না দিদি। আমার স্বামীকে তুমি কেড়ে নিয়েছ। তুমি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও দিদি। বিষয়-সম্পত্তি হাতের মুঠোয় নিয়ে ভেবেছিলাম স্বামীকেও হাতের মুঠোয় রাখতে পারব আমি। কিন্তু আমি হেরে গেছি—দিদি—আমি হেরে গেছি।

বন্দিতা ॥ ছিঃ ছিঃ—নন্দা। কাঁদছিস কেন ? আমি তোকে একটা কথা বিশ্বাস করতে বলছি—পার্থ তোকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। শুধু একটা ভুল বোঝাবুঝির

ফলে তুই এই দুঃখ পাচ্ছিস। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বলবো, পার্থও কম দুঃখ পাচ্ছে না। সেটা তার চেহারা দেখলেও বুঝবি। মহাজনী পাপটা সে ধ্বংস করতে চায় সমবায়ের মধ্য দিয়ে—বাবা যা চেয়েছিলেন। সেটা যদি তুই মেনে নিস—স্বামীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বামীর সহধর্মিণী যদি হোস তুই—তাতে হয়তো তোর ধন-দৌলতের কিছু কমতি হবে কিন্তু তোর সত্যিকার ধন তুই ফিরে পাবি—ফিরে পাবি সুখ, শান্তি, আর আনন্দ আর সেই সঙ্গে জনগণের আশীর্বাদ।

নন্দিতা ॥ আমি রাজী—আমি রাজী। লড়াই করে আমি হেরে গেছি। আর আমি পারছি না। তুমি বল—মায়ের মত তুমি আমায় ভালবাস। আমায় তুমি বাঁচাও—আমায় তুমি বাঁচাও।

[বন্দিতার বুকে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।]

বন্দিতা ॥ ছিঃ ছিঃ নন্দা—এমন করে কাঁদে না। তুই এমন কাঁদলে আমিও যে ঠিক থাকতে পারিনা নন্দা। আমি বলছি তোর কোন ভাবনা নেই। চল—তুই আমার ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকবি চল। তুই একটু বিশ্রাম কর। পার্থ এলেই আমি তোকে ডাকবো। আজ তুই এসেছিস, আমি নিজে হাতে রাঁধবো। চল—নন্দা চল।

[তাকে সস্নেহে ধরিয়া লইয়া বন্দিতা নিজের শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন। সদর দরজায় করাঘাত শোনা গেল। জগবন্ধু অন্দর হইতে বাজারের থলি লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বন্দিতা তাহার কক্ষ হইতে ত্বরিৎ পদে আসিয়া বাজাবের একটি ফর্দ চটপট লিখিলেন। জগবন্ধু সদর দরজায় করাঘাত শুনিয়া কে আসিল—তাহা দেখিতে গিয়াছিল। সে একটি স্লিপ লইয়া ফিরিয়া আসিল।]

বন্দিতা ॥ এই নাও জগবন্ধু, দশ টাকা দিচ্ছি। আর এই ফর্দ। কতদিন পর আজ নন্দা এসেছে, আজ আমি নিজে রাঁধবো। জিনিসগুলো দেখে শুনে কিনে চটপট নিয়ে এসো। [জগবন্ধুকে টাকা ও ফর্দ দিলেন]

জগবন্ধু ॥ একজন ভদ্রলোক—[নাম লেখা স্লিপটি বন্দিতার হাতে দিল]

বন্দিতা ॥ [নামটি পড়িয়া চমকিয়া উঠিলেন] সে কি!

জগবন্ধু ॥ বাবুকে ডাকবো ?

বন্দিতা ॥ তুমি বাজারে যাও। আমি দেখছি।

[জগবন্ধু বাজারে চলিয়া গেল। বন্দিতা ক্ষণকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ়ার মত চিন্তা করিলেন, পরে ধীর পদক্ষেপে সদর দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন। অপেক্ষমান ভদ্রলোককে ডাকিলেন।]

আসুন।

[ভদ্রলোক ভিতরে আসিলেন। দেখা গেল, ইনি কাশীর রমেশ। চেহারায় বয়সোচিত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মুখে চাপ দাড়ি এবং গোঁফ।]

রমেশ ॥ আমি কাশীর রমেশ। কলকাতায় এসেছিলাম একটা কাজে। কাগজে দেখলাম প্রফেসর রায়ের মৃত্যু সংবাদ, ছবি ও জীবনীও দেখলাম। তোমার সঙ্গে দেখা

করার মুখ নেই আমার। তবু এলাম, কেন এলাম—তার কোনো সদুত্তর দিতে পারবো না আমি। চলে যেতে বললে চলে যাব এখনি। যাব ?

বন্দিতা ॥ [ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া] বসুন।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

রমেশ ॥ জীবনে আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ রয়ে গেল, প্রফেসর রায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারলাম না। নিজেই বুঝতে পারছি এ কথাগুলোও আমার মুখে বেখাপ্পা শোনাচ্ছে।

বন্দিতা ॥ ওসব কথা থাক। বাবা তো চলেই গেছেন, আর এসব কথা কেন!

রমেশ ॥ তিনি চলে গেলেন, তুমি আছ। কিন্তু তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার সাহস আমার নেই।

বন্দিতা ॥ এসব কথা আজ আর না তোলাই ভাল। জীবনে অনেক কিছু ঘটে—যা মনে রাখা উচিত আবার যা ভুলে যাওয়াও উচিত। কাশীর জীবনটা আমি ভুলে যেতেই চাই রমেশবাবু। এ কথার পরেও যদি সে কথা তোলেন তবে বরং আপনি আসুন। নমস্কার।

রমেশ ॥ নির্দেশটা আমি মেনে নিয়েও চলে যাচ্ছি। বারাসতে এসে তোমাদের আর সব খবর পেয়েছি, কিন্তু নিজের খবরটা তোমাকে না জানিয়ে যেতে পারছি না। বিয়ে তুমিও করোনি—আমিও না। আমার জীবনের ওপর দিয়েও অনেক ঝড় ব'য়ে গেছে। আমি এখন কাশীর একজন গরীব স্কুলমাষ্টার। সেই বাড়িতেই দু'খানা ঘর নিয়ে আমি কোনোমতে আছি। সেই চাঁপা গাছটি এখনো আছে—এখনো তাতে ফুল ফোটে। যদি কখনো কাশীতে যাও, যেও আমার বাড়ি—এই নিমন্ত্রণ জানিয়েই আজ আমি উঠছি।

[রমেশ যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল নন্দিতা।]

নন্দিতা ॥ একলা আমার সময় কাটছে না দিদি। বাবার ঘরটা খুলে দাও। ওঘরের বই-টইগুলো একটু দেখি।

বন্দিতা ॥ [আঁচল হইতে চাবির তাড়াটি খুলিয়া নন্দিতার হাতে দিয়া রমেশকে] এক পেয়ালা চা খেয়ে যান।

নন্দিতা ॥ [রমেশের প্রতি] বসুন। আমি চা করে আনছি।

[নন্দিতা অন্দরে চলিয়া গেল।]

রমেশ ॥ ইনি কে ?

[বন্দিতার মুখ পাংশু হইয়া গেল।]

বন্দিতা ॥ চেনা উচিত ছিল। তা' যখন চেনোনি, ও আমার বোন—নন্দিতা।

রমেশ ॥ [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর আমার কোনো

অধিকারই তো নেই আজ। শুনেছি ভাল ঘরে, ভাল বরে বিয়ে হয়েছে তোমার ঐ নন্দিতার।

বন্দিতা ॥ হাসি পাচ্ছে আজ এই ভেবে যে, এর বেশী বলার অধিকার আজ আমারও নেই, কারণ আমি ওর দিদি। হ্যাঁ, ওর কাছে আমার এই পরিচয়!

রমেশ ॥ আমি তোমার জীবনে কত বড় অভিশাপ সেটা আজ যত বুঝছি, আগে এত বুঝিনি।

বন্দিতা ॥ থাক এসব কথা। তুমি বিয়ে করনি কেন রমেশদা?

রমেশ ॥ বিয়ে করবার মত চরিত্র আমার ছিল না বন্দিতা।

[নন্দিতা চায়ের ট্রে লইয়া আসিল এবং ট্রেটি টেবিলে রাখিল।]

রমেশ ॥ [নন্দিতাকে] এরই মধ্যে চা হয়ে গেল মা!

নন্দিতা ॥ চায়ের জল ফুটছিল যে।

বন্দিতা ॥ [নন্দিতাকে] প্রণাম কর এঁকে। কাশীতে বাবার ছাত্র ছিলেন ইনি।

[নন্দিতা রমেশকে প্রণাম করিল।]

রমেশ ॥ থাক, থাক। আমার আশীর্বাদের কোনো দাম আছে কিনা জানিনে, তবু মনে প্রাণে আশীর্বাদ করছি—সুখী হও মা!

নন্দিতা ॥ [চা ঢালিতে ঢালিতে হাসিয়া] সুখী আমি নই। তাই আপনার এই আশীর্বাদের দাম আমার কাছে খুব কম নয়।

[নন্দিতা ইঁহাদের চা দিয়াই যেন পালাইয়া গেল অধ্যাপকের শয়ন কক্ষের সামনে। চাবি দিয়া তালা খুলিয়া, ঘরে গিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।]

রমেশ ॥ অমন ঘর-বর, কিন্তু ও সুখী নয় কেন?

বন্দিতা ॥ শরতের মেঘ।

[বাহির হইতে পার্থের প্রবেশ।]

বন্দিতা ॥ এত দেরি হ'ল কেন পার্থ?

পার্থ ॥ উত্তরগ্রামের সেই সমবায় সম্মেলন। [রমেশের প্রতি] নমস্কার। আপনি?

বন্দিতা ॥ কাশীতে বাবার ছাত্র ছিলেন—রমেশ চৌধুরী। কলকাতায় এসেছিলেন, কাগজে বাবার মৃত্যু সংবাদ দেখে আমাদের খোঁজ-খবর নিতে এসেছেন। [রমেশকে] নন্দিতার বর—পার্থ সরকার।

[বন্দিতার ইঙ্গিতে পার্থ রমেশকে প্রণাম করিল।]

রমেশ ॥ হয়েছে বাবা, হয়েছে। দীর্ঘজীবী হও—সুখী হও—সার্থক হও। আমি আজ উঠছি। কালই চলে যাচ্ছি কাশী। যদি তোমরা কখনো কাশী যাও বাবা, আমার ওখানে উঠলে আমি ধন্য হব। [বন্দিতাকে দেখাইয়া] ইনি জানেন আমার

বাড়ির ঠিকানা—কত বার গেছেন—চাঁপা ফুলের একটা গাছ আছে, তার ফুল ইনি বড় ভালবাসতেন। [বন্দিতাকে] সে গাছটি এখনও আছে বন্দিতা দেবী। আজও তেমনি ফুল ফোটে। কিন্তু ফুল কুড়োবার লোক আজ আর নেই। আচ্ছা আসি—নমস্কার।

[সকলের নমস্কার বিনিময়।]

বন্দিতা ।। কলকাতায় আপনি কোথায় উঠেছেন রমেশবাবু ?

রমেশ ।। আর্য হোটেলে।

[রমেশ চলিয়া গেল।]

পার্থ ।। দেখে আনন্দ হচ্ছে দিদি, আমাদের ঐ সরল সদানন্দ লোকটি কত লোকেরই না প্রিয় ছিলেন !

বন্দিতা ।। হ্যাঁ। যাদের কোনো দিন আর দেখব বলে আশা করিনি, এখন তাদেরও দেখা পাচ্ছি। ভাল কথা, নন্দিতাও আজ এসেছে।

পার্থ ।। নন্দিতা !

বন্দিতা ।। হ্যাঁ, নন্দিতা। বাবার ঘরে বসে পুঁথিপত্র ঘাটছে। আজ এখানে থাকবে। জগবন্ধুকে বাজারে পাঠিয়েছি, আজ নিজে আমি রাঁধবো। কিন্তু তার আগে গোটা দুই কথা বলে যেতে চাই আমি তোমাকে।

পার্থ ।। বলো।

বন্দিতা ।। [পার্থের হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া] নন্দিতাকে তুমি ক্ষমা কর পার্থ। সে আজ অনুতপ্ত। মহাজনী মোহ আজ তার কেটে গেছে। সে তোমার পাশে দাঁড়াতে এসেছে আজ—সহধর্মিণী হতেই এসেছে। তাকে তুমি বুকে টেনে নাও পার্থ।

পার্থ ।। বলো কি দিদি ? আমার কপালে এত সুখ ! কোথায় সে ? [আবেগভরে] নন্দিত—নন্দিতা—

বন্দিতা ।। বাবার ঘরে। আমি চললাম রান্নাঘরে। আজ আশ মিটিয়ে রাঁধবো আমি। [জগবন্ধুর প্রবেশ] এই যে জগবন্ধুও বাজার নিয়ে এসে গেছে।

[জগবন্ধু সহ বন্দিতা অন্দরে চলিয়া গেল। পার্থ সত্যশরণের কক্ষের দরজায় অধীরভাবে করাঘাত করিতে লাগিল।]

পার্থ ।। নন্দিতা—নন্দিতা—দরজা খোল নন্দিতা !

[নন্দিতা দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ গম্ভীর। হাতে একখানি পুরাতন ডায়েরী।]

পার্থ ।। তোমাকে নাকি আজ আমি ফিরে পাচ্ছি নন্দিতা।

নন্দিতা ।। [উদ্বিগ্ন কণ্ঠে] আমি জানি না। কিছু বলতে পারছি না আমি। আমার ভয় হচ্ছে—আমি পাগল হয়ে যাব।

পার্থ ।। সে কি ! এ তুমি কি বলছো নন্দিতা !

[তাহাকে বুকে টানিয়া লইতে গেল।]

নন্দিতা ॥ না না, তুমি সরে যাও।

পার্থ ॥ কেন, কেন নন্দিতা ?

নন্দিতা ॥ হ্যাঁ, আমি অশুচি। আমাকে তুমি ছোঁবে না।

পার্থ ॥ তোমার কি মাথা খারাপ হ'ল নন্দিতা ?

নন্দিতা ॥ বাবার ডায়েরীর এই পাতাটি পড়ে দেখ।

পার্থ ॥ কিন্তু ডায়েরীর ওপর লেখা রয়েছে, 'অত্যন্ত গোপনীয়'।

নন্দিতা ॥ ওটা লেখা ছিল বলেই সীলকরা প্যাকেটটা আমি কেন যেন খুললাম।...আমি কেন খুললাম...আমি কেন পড়লাম !

[রন্ধনরতা বন্দিতা ইহাদের উচ্চস্বরের কথাবার্তা শুনিয়া এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

বন্দিতা ॥ কি হয়েছে ?

নন্দিতা ॥ [পার্থকে] তুমি ও ঘরে গিয়ে পড়। ও'র সঙ্গে আমার কথা আছে।

বন্দিতা ॥ কি পড়বে ? ওটা কি ?

নন্দিতা ॥ বাবার পুরানো ডায়েরী। আমার জন্মের ইতিহাস।

[বন্দিতার হাতে একটি রন্ধনপাত্র ছিল। কথাটা শোনামাত্র হাত হইতে উহা ঝনাৎ করিয়া পড়িয়া গেল।]

নন্দিতা ॥ [পার্থের প্রতি চীৎকার করিয়া] তুমি যাও বলছি—

পার্থ ॥ [নন্দিতাকে] কিন্তু তোমার বাবার ইচ্ছা ছিল না এ ডায়েরী কেউ পড়ে।

[ডায়েরী টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া পার্থ তাহার ঘরে চলিয়া গেল। বন্দিতা আসিয়া ডায়েরীটা খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। বন্দিতা ক্ষণপর ডায়েরীটি বন্ধ করিলেন।]

নন্দিতা ॥ ব্যাপারটা সত্যি ?

বন্দিতা ॥ [প্রশান্তভাবে] সত্যি।

নন্দিতা ॥ অথচ এটা তোমরা গোপন করেছ আমার কাছে !

[কোন উত্তর দিলেন না। মাথা নীচু করিয়া রহিলেন।]

গোপন করেছ আমার স্বামীর কাছে! এর পরিণামটা কি হতে পারে তা ভেবেছ ?

[কি বলিতে গিয়া বলিলেন না।]

অথচ তুমি আমার মা। আজ পাহাড়ী সেই ভদ্রলোকের কাছে এমনি একটা ইঙ্গিত আমি পেয়েছিলাম। তখন মনে হয়েছিল তাঁর মাথা খারাপ! লোকের কাছে আজ আমরা মুখ দেখাব কি করে, আমি ভাবতে পারছি না। আমি যখন হ'লাম আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলনি কেন তুমি ? কেন এই মিথ্যার বোঝা সারা জীবন বইলে তুমি ? এতে কি লাভ হ'ল তোমার—কি লাভ হ'ল আমার ! তোমার মিথ্যার প্রাসাদ চুরমার হয়ে গেল আজ। কি করে আমি মুখ দেখাব পার্থের কাছে ? সে-ই বা কি করে মুখ দেখাবে ঘরে-বাইরে লোকের কাছে ?

বন্দিতা ॥ ভুল—ভুল করেছি আমি। গোটা জীবনটাই ভুল হয়ে গেছে আমার। কি প্রায়শ্চিত্ত করবো তা বুঝছি না আমি।

নন্দিতা ॥ আমি অবাক হচ্ছি ভেবে—এত বড় একটা মিথ্যা তোমার বাবা মেনে নিয়েছিলেন কি করে!

বন্দিতা ॥ তুমি হতেই তিনি অনাথ আশ্রমে রাখতে চেয়েছিলেন তোমাকে। কিন্তু আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না বলে তাঁর পায়ে পড়েছিলাম আমি। কন্যাস্নেহে সেদিন অন্ধ হয়েছিলাম আমরা দুজনেই। তোমাকে আমার বুকে তুলে দিতে রাজি হলেন তিনি—এই সর্তে, মা হয়েও তোমাকে বোন বলে মানুষ করতে হবে আমাকে। তোমাকে বুকে পেতে তাতেই রাজী হলাম আমি।

নন্দিতা ॥ [ভাবাবেগে আকুল হইয়া] মা! আমার মা!

[বন্দিতার বুকে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।]

বন্দিতা ॥ কিন্তু এর শেষ কোথায় আমি জানিনা মা!

নন্দিতা ॥ [বন্দিতার বুক হইতে মুখ তুলিয়া লইয়া] আমাদের চলে যেতে হবে—[একটু সরিয়া আসিয়া] এ সংসার—এ সমাজ থেকে চলে যেতে হবে আমাদের —দূরে—বহু দূরে। পার্থকে এ মুখ আর আমরা দেখাব না মা। চল—এখনই চল —হ্যাঁ, এই এক কাপড়েই চলে যাব আমরা। তুমি যাবেনা মা?

বন্দিতা ॥ তোকে যদি কাছে পাই কিছুই ছাড়তে আমার বাধবে না মা। কিন্তু কোথায় যাবি?

নন্দিতা ॥ জানিনা—যেদিকে দুচোখ যায়, যাব মা।

বন্দিতা ॥ কাশীর রমেশবাবু এসেছিলাম আজ।

নন্দিতা ॥ এই রমেশবাবুই কি সেই রমেশবাবু যার কথা লেখা রয়েছে ঐ ডায়েরীতে?

বন্দিতা ॥ হ্যাঁ মা।

নন্দিতা ॥ আমার বাবা?

বন্দিতা ॥ হ্যাঁ মা। সারাজীবন আমি যেমন করেছি পাপের প্রায়শ্চিত্ত, তিনিও তাই করেছেন। বলে গেছেন আজ তিনি যত নিস্বঃই হন তবু এখনো আছে তার দুখানি ঘর। আর সে ঘরের দুয়ার খোলা আছে আমার জন্য।

নন্দিতা ॥ চল মা—চল—যেখানে হয় চল—এখনই চল—এখানে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

[বন্দিতাকে লইয়া গৃহত্যাগে উদ্যত হইল। পশ্চাৎ হইতে ডাকিল পার্থ।]

পার্থ ॥ দাঁড়াও।

[নন্দিতা ও বন্দিতা ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন।]

পার্থ ॥ [তাহাদের কাছে আসিয়া] তোমরা চলে যাচ্ছ যে!

নন্দিতা ॥ ঐ ডায়েরীটা পড়লেই বুঝবে, কেন আমরা যাচ্ছি।

পার্থ ॥ ডায়েরীর খবরটা তোমার কাছেই নতুন নন্দিতা, আমার কাছে নয়। ঐ ডায়েরী যিনি লিখে গেছে, তিনি নিজ মুখেই আমাকে সব বলে গেছেন। সব জেনে শুনেও যখন তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছি, তখনই তিনি দিয়েছেন আমাদের বিয়ে।

নন্দিতা ॥ পার্থ!

পার্থ ॥ হ্যাঁ নন্দিতা। শিশুকালেই আমি মা হারিয়েছি। মা কি আমি জানতাম না। মা যে কি তা আমি মর্মে মর্মে বুঝতে পারলাম তখন—যখন জানলাম মায়ের আত্মত্যাগের এই চরম কাহিনী। মাকে থাকতে হ'ল সারা জীবন দিদি হয়ে, ভোগ করতে হ'ল সারা জীবন কি অসম্ভব লাঞ্ছনা! আজ আমার এই আনন্দ, যাকে মা বলে ডাকবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠতো, তাকে মা বলেই ডাকতে পারব—প্রণাম করতে পারব আমরা।

[চট করিয়া বন্দিতার পায়ের ধুলো লইয়া।]

লোকে জানুক—দিদি, কিন্তু তুমিই আমাদের মা। কি অপরাধে তোমরা ত্যাগ করছো আমাকে!

বন্দিতা ॥ [নন্দিতার দিকে চাহিয়া] নন্দা!

নন্দিতা ॥ ঘরে চল মা। বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

[আনন্দাশ্রু প্লাবিতা কন্যা মায়ের বুকে পড়িল।]

পার্থ ॥ [তাহাদের দুজনকে বাহু বন্ধনে রাখিয়া] ক্ষিধেটা চটপট মেটাতে হলে চল রান্নাঘরে—সমবায় রন্ধন হোক!

নন্দিতা ॥ লোকটা মানুষ নয় মা, যেন একটা দেবতা।

বন্দিতা ॥ দেবতার মত অমর হও বাবা!

[আনন্দাশ্রু উদ্ভাসিত আননে পার্থকে আশীর্বাদ করিলেন।]

—যবনিকা—

অমৃত অতীত

॥ অমৃত অতীত ॥

কথাসাহিত্যশ্রী পরমস্নেহাস্পদ

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়যুক্তেষু

শুভার্থী

মন্মথ রায়

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

সাম্প্রতিক নবনাট্য আন্দোলনে 'গন্ধর্ব' নামক একটি তরুণ নাট্যসংস্থার অভিনয় এবং প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হই। এই নাট্যসংস্থার নির্দেশক শ্রীমান শ্যামল ঘোষ 'গন্ধর্ব' কর্তৃক অভিনয়ের জন্য আমার কাছে একটি নূতন নাটক দাবী করেন। আমি সানন্দে এজন্যে যে নাটকটি রচনা করি সেই নাটকই এই 'অমৃত অতীত'।

শতবর্ষব্যাপী অরাজকতায় অতিষ্ঠ হইয়া গৌড়বঙ্গের প্রজাপুঞ্জ অষ্টম শতাব্দীতে গোপালদেবকে পরিত্রাতা মনে করিয়া তাঁহাকে গৌড়বঙ্গের রাজা নির্বাচন করে— ঐতিহাসিক এই ভিত্তিতে নাটকটি পরিকল্পিত হইয়াছে। অবশ্য একমাত্র গোপাল দেব ভিন্ন অন্য চরিত্রগুলি আমার কল্পনা প্রসূত। এই নাটক প্রণয়ণ করিতে গিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর গৌড়বঙ্গের সামাজিক এবং রাজনৈতিক বহু তথ্য লাভ করিয়াছি—দীনেশচন্দ্র সেনের বৃহৎ বঙ্গ', রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলার ইতিহাস' এবং নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থ তিনখানি হইতে।

'বহুরূপী' নাট্য প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'বহুরূপী'তে এই নাটকখানি ১৯৫৯ সালের নবম স্যখ্যায় প্রকাশ করিয়া 'বহুরূপী'র কর্তৃপক্ষ আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

নাটকটির নামকরণ করিয়াছেন আমার তরুণ নাট্যকার বন্ধু গিরিশংকর। প্রচ্ছদপটটি অঙ্কন করিয়াছেন বিরাজ সেনগুপ্ত। তাঁহাদিগকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। অলমিতি।

২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬
শ্রীপঞ্চমী ॥ ১৩৬৬

মন্মথ রায়
১/২/৬০

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'অমৃত অতীত' নাটকটি বাংলার সুপরিচিত নাট্যসংস্থা 'গন্ধর্ব' কর্তৃক গত ১৯৬০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী রঙমহল নাট্যমঞ্চে অভিনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয় হয়। অতঃপর বহু নাট্য সংস্থাই নাটকটি সাফল্য ও সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন। কিন্তু নাটকটির দৈর্ঘ্যের স্বল্পতা কোন কোন মহলে ক্ষোভের কারণ হয়। তদনুযায়ী আমি অতিরিক্ত দুইটি দৃশ্য সংযোজন করি। এই পরিবর্ধিত নাটকটি সুখ্যাত নাট্যসংস্থা 'ক্রান্তি শিল্পী সংঘ' গত ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬০) মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করেন। পরিবর্ধিত নাটকটির চাহিদা মিটাইতে দ্বিতীয় সংস্করণে অতিরিক্ত দৃশ্য দুইটি সংযোজিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণে অতিরিক্ত দৃশ্য দুইটি দ্বিতীয় ও চতুর্থ সর্গে বিন্যস্ত হইয়াছে। যাঁহারা অতিরিক্ত এই দৃশ্য দুইটি অভিনয়ে অনিচ্ছুক, তাঁহারা দ্বিতীয় ও চতুর্থ সর্গ বাদ দিলেই 'গন্ধর্ব' প্রযোজিত প্রথম সংস্করণের মূল নাট্যাংশ পাইবেন।

মন্মথ রায়

পটভূমি

"তারানাথের বিবৃতি মতে [চন্দ্রবংশীয়] ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর সমগ্র বাংলা দেশ জুড়িয়া অভূতপূর্ব নৈরাজ্যের সূত্রপাত হয়।...আজ একজন রাজা হইতেছেন, রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব দাবী করিতেছেন, কাল তাঁহার ছিন্নমস্তক ধূলায় লুটাইতেছে।... বাহুবলই একমাত্র বল, সমস্ত দেশময় উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খল শক্তির উন্মত্ততা।... শশাঙ্কের পর হইতেই গৌড়তন্ত্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত।...এই পর্বেই আবার পূর্ব প্রত্যন্ত-দেশে এক নিদারুণ দুর্ভিক্ষের খবরও পাওয়া যাইতেছে।...রাষ্ট্রের এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা খুব ভাল থাকিবার কথা নয়। সামন্তরাই এ যুগের নায়ক, এবং সকলেই স্ব স্ব প্রধান। বৌদ্ধমঠগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং তাহারই ইঁট কাঠ কুড়াইয়া লোকে বাড়ী তৈয়ারী করিতেছে।...মাৎস্যন্যায় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাংলার প্রকৃতিপুঞ্জ যাহাকে রাজা নির্বাচন করিয়াছিল সেই...গোপালদেবের কুলগৌরব কিছু ছিল বলিয়া মনে হয় না, তেমন দাবীও কোথাও করা হয় নাই।"

শ্রীনীহাররঞ্জন রায় কৃত 'বাঙালীর ইতিহাস'

"রাজলক্ষ্মী কাহার ভুজ অবলম্বন করিবেন? রাজকুলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এবার তিনি বিশিষ্ট ও যোগ্য ভুজাশ্রয় করিতে উদ্যত হইলেন। যিনি সর্বাপেক্ষা যোগ্য, প্রজারা তাঁহারই ললাটে রাজচিহ্নলাঞ্ছন লিখিয়া দিল। এই ভাগ্যবান ব্যক্তি গোপাল।...তিনি নিশ্চয় বঙ্গদেশের ঘোর অরাজকতার সময় বহু দস্যু এবং অত্যাচারীর গর্ব খর্ব করিয়াছিলেন, প্রজাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন এবং যেখানে প্রবলের অত্যাচার ও দুর্বলের দলন হইত, সেই স্থানেই অভয় শব্দ উচ্চারণ করিয়া দাঁড়াইতেন।"

দীনেশচন্দ্র সেন কৃত 'বৃহৎ বঙ্গ'

সমীক্ষা

ভারত ইতিহাস ভাস্কর ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের পত্র

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, সমসাময়িক লোকেরা তাহাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।......গ্রন্থকার আলোচ্য নাটকখানিতে 'মাৎস্যন্যায়ের যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যে সে যুগে ঘটে নাই—এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। যে উপন্যাস বা নাটক কোন

সুপরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত—এবং যাহার মধ্যে এমন কোনো কাল্পনিক দৃশ্য নাই যাহা প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী, তাহাই ঐতিহাসিক নাটক বা উপন্যাস বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য। শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়—বাংলার অষ্টম শতাব্দীতে মাৎস্যন্যায়ের প্রতিকারের জন্য প্রজাগণ কর্তৃক গোপালের রাজপদে নির্বাচন—এই ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে ভিত্তি করিয়া 'অমৃত অতীত' নামক যে নাট্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক নাটক বলিয়াই আমি মনে করি।

১৭-১-৬০ **শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার**

'ইতিহাসের মানুষের সঙ্গে আমাদের কালগত যে ব্যবধানই থাকুক না কেন, চিরন্তন মানবিক অনুভূতির দিক দিয়া ইহাদের সঙ্গে আমরা এক অখণ্ড যোগ অনুভব করিয়া থাকি।......অমৃত অতীত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় মানুষের চিরন্তন জীবন সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল দূর করিতে ব্যর্থ হয় নাই; সেইজন্যই আধুনিক যুগে ইহার আবেদন সার্থক হইয়াছে।......তথ্যজ্ঞানের সঙ্গে উচ্চ কল্পনা শক্তির সংমিশ্রণঃ অমৃত অতীত এই গৌরব হইতে বঞ্চিত হয় নাই।......নাটকখানির কাহিনী দৃঢ়সংবদ্ধ ও সংলাপ শক্তিশালী।......কৃতান্তক চরিত্রটি বর্তমান কালের নাট্য সাহিত্যের একটি নূতন পরিচয় দিয়াছে।......মক্ষিরাণী নাট্যকারের কল্পনা-প্রসূত একটি চরিত্র। ইহার একটি জটিল আচরণ নাটকের কাহিনীগত ঔৎসুক্য শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছে।'

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যকৃত 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস'

এই নাটকের চরিত্র

পশু ॥ গোপাল ॥ কৃতান্তক ॥ চৌরোদ্ধরণিক ॥ উদাত্ত ॥ মহামাত্য ॥ শ্রীমান ॥ কুম্ভীরক ॥ শার্দুলক ॥ দুঃশাসন ॥ বজ্রসেন ॥ উদয়ন ॥ কুবেরক ॥ শীলভদ্র ॥ রুদ্রসেন ॥ পুণ্ডরীক ॥ রাজা গোবর্ধন ॥ প্রথম দেহরক্ষী ॥ দ্বিতীয় দেহরক্ষী ॥ মক্ষিরাণী ॥ মল্লিকা ॥

দৃশ্য পীঠ

৭৪০ খৃষ্টাব্দের গৌড়

প্রথম সর্গ, তৃতীয় সর্গ এবং পঞ্চম সর্গঃ জীর্ণ অট্টালিকার গুপ্ত গুহা প্রকোষ্ঠ ॥ দ্বিতীয় সর্গঃ ভাস্কর শ্রীমানের শিল্পকক্ষ ॥ চতুর্থ সর্গঃ জীর্ণ পরিত্যক্ত অট্টালিকার সভাকক্ষ ॥

অমৃত অতীত

প্রথম প্রকাশ ঃ 'বহুরূপী' পত্রিকা
নবম সংখ্যা—১৯৫৯

প্রথম সর্গ

[সাতশত চল্লিশ খৃষ্টাব্দের গৌড় নগরী। একটি জীর্ণ অট্টালিকার মধ্যে একটি গুপ্ত গুহা প্রকোষ্ঠ। এক বৃদ্ধ মূক বলিষ্ঠ ক্রীতদাস, নাম পশু, কক্ষের এলোমেলো আসবাবপত্র সুবিন্যস্ত করিতেছিল। কক্ষে আর কেহ ছিল না। সূর্যাস্ত সমাগত। অদূরবর্তী মন্দিরে সন্ধ্যারতির শংখ ঘন্টাধ্বনি। পশু কক্ষটিকে আলোকিত করিল। বহির্দরজায় ঘন্টাধ্বনি শোনা গেল। পশু ঘন্টাধ্বনিগুলি গুণিতে লাগিল। সপ্তম ধ্বনির সঙ্গে সে বুঝিল ঘরের লোকই কেহ আসিতেছে। আনন্দিত মনে সে কক্ষের দরজাটি খুলিয়া দিতে গেল।

গুহাকক্ষে প্রবেশ করিল গৃহকর্ত্রী মক্ষিরানী। রানীর মতো সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব মক্ষিরানীতে পরিস্ফুট। তাহার পশ্চাতে একটি সুদর্শন যুবক, মলিন বেশ, কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় তাহার ব্যক্তিত্বও সুপ্রকাশ। যুবকটির হস্তে খুব বড় একগুচ্ছ নীলকমল। পশু এই নবাগত যুবকটিকে সন্দেহের চোখে দেখিতে লাগিল। মক্ষিরানী পশুকে ইংগিতে একটু দূরে সরাইয়া দিল।]

রানী ॥ এসো, এসো এখানে এসো, তোমার এই সব ফুলগুলোই আমি নিলাম। কতো দাম দেব বলো।

যুবক ॥ সে কি ? এ তুমি কি বলছো ইন্দিরা ?

রানী ॥ ইন্দিরা ! সে আবার কে ?

যুবক ॥ বাঃ ! রহস্য হচ্ছে ?

রানী ॥ কে এ লোকটা ? মাথা খারাপ নাকি ?

যুবক ॥ সে কি ? তুমি আমায় চিনতে পারছো না ইন্দিরা ?

রানী ॥ কে তুমি ? কেইবা তোমার ইন্দিরা ?

যুবক ॥ [রাগিয়া] রাখো তোমার রসিকতা। তুমি ইন্দিরা নও ? দস্যুরা তোমাকে আমাদের গ্রাম থেকে লুণ্ঠন করে আনেনি ?

রানী ॥ [হাসিয়া] লুণ্ঠন করবে আমাকে ! কেন ?

যুবক ॥ এক অঙ্গে এত রূপ, ঐ রূপই হয়েছিল তোমার কাল।

রানী ॥ বাঃ ! যেন রূপকথা শুনছি। হ্যাঁ, বলো, বলো ! তারপর ?

যুবক ॥ এই অরাজক রাজ্য তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি তোমায়। পাইনি। শেষে

পেলাম রাজধানী গৌড়ে এসে আজ উমা-মহেশ্বরের মন্দিরে, উৎসব প্রাঙ্গণে। চোখা-চোখী হতেই হাতছানিতে তুমি আমায় ডাকলে।

রানী ॥ হ্যাঁ, ডাকলাম! দেখলাম, অতবড় একগুচ্ছ নীলকমল নিয়ে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে উৎসব প্রাঙ্গণে। দেখে মনে হলো গেঁয়ো লোক। ফুল বেচতে এসেছে।

যুবক ॥ [চটিয়া] থামো। গেঁয়ো লোক আমি সত্যি। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো সত্যি তুমি আমার ইন্দিরা—যার সব চেয়ে প্রিয় ফুল ছিলো এই নীলকমল।

রানী ॥ নীলকমল বুঝি এক তোমার ঐ ইন্দিরাই ভালোবাসে? আর কেউ না?

যুবক ॥ তা হয়তো বাসে। কিন্তু তোমার মতো পাগল হয়না কেউ। এই নীলকমল হাতেই তাই এসেছিলাম আজ গৌড়ে। ভেবেছিলাম, এ ফুল যদি দৈবাৎ তোমার চোখে পড়ে, তুমি আমাকে ডাকবে—তুমি আমাকে ডাকবে, আমাকে ডাকতেই হবে তোমাকে।

রানী ॥ হ্যাঁ ডেকেছি।

যুবক ॥ শুধু ডেকেছো? ইসারায় তুমি অনুসরণ করতে বললে না আমাকে?

রানী ॥ বললাম। কিন্তু কেন বললাম তা তো জানো না?

যুবক ॥ প্রকাশ্যে কথা বলার হয়তো বিপদ ছিল। দস্যুদল হয়তো কাছেই ছিল। তাই নীরবেই আমি চলে এসেছি তোমার পিছু পিছু এখানে। এখন তুমি আমায় চিনতে পারছো না ইন্দিরা?

রানী ॥ ও। তোমার নীলকমল ফুল যে মেয়েই ভালোবাসবে—তাকেই তোমার ইন্দিরা হতে হবে, কেমন?

যুবক ॥ তবু ছলনা?

রানী ॥ তুমি কোথায় এসে পড়েছো জানো?

যুবক ॥ কোথায়?

রানী ॥ বাঘের গুহায়।

যুবক ॥ বলো, দস্যুর গুহায়।

রানী ॥ [হাসিয়া] হ্যাঁ।

যুবক ॥ তবে আর আমাকে ছলনা করতে পারবে না তুমি ইন্দিরা। [আবেগে হাত চাপিয়া ধরিয়া] ইন্দিরা, আমি, আমি তোমাকে চাই। উদ্ধার করতে চাই তোমাকে।

[ক্রীতদাস ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো এই দৃশ্যটি দেখিতেছিল, সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়িল যুবকের উপর।]

রানী ॥ [চীৎকার করিয়া] পশু! দাঁড়াও, শোনো। আমার কাছে এসো। এসো— ...

[পশু অগত্যা কাছে আসিল। তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া]

ক্ষিদে পেয়েছে ? লোকটাকে টুকরো টুকরো করে ওর রক্ত খেতে সাধ বুঝি ?

[পশুর চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল]

কিন্তু না, লোকটাকে মারলে ওর কে এক ইন্দিরা আছে সে খুব কাঁদবে। [খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া] ওকে ছেড়ে দাও পশু, ছেড়ে দাও।

[পশু মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল। আদেশসূচক কঠোর স্বরে]

পশু ! [পশু বিদ্রোহীভাব দেখাইল। চীৎকার করিয়া] পশু ! [এইবার পশুব চৈতন্য হইল, রানীব আদেশ সূচক ইঙ্গিতে সে দূরে চলিয়া গেল। যুবককে] তুমি বসো। [যুবক বসিল] তোমার নাম ?

যুবক ॥ [হাসিয়া উঠিল] আমার নাম যে গোপাল, তা তুমি ভালো করেই জানো।

রানী ॥ গোপাল ! গোপাল তোমার নাম ! গরু চরাও। তা এখানে কেন ? এখানে কি চাও ?

গোপাল ॥ আমি কি চাই তা আমার চেয়েও বেশী জানো তুমি। [চীৎকার করিয়া] চাই তোমাকে। রাজ্য ছিল অরাজক। দস্যুরা লুণ্ঠন করে নিয়ে এল তোমাকে। কিন্তু তবু আবার পেয়েছি তোমাকে। আর তা যখন পেয়েছি, এখন চাই রাজ্য থেকে এই অরাজকতা দূর করতে।

রানী ॥ তাই বলো। রাজা হতে চাও। না, তা রাজার মতোই তোমার চেহারা। আর দেখছি সাহসও খুব। [কি]ন্তু বুদ্ধিটা কম। মাথায় একটু গোল থাকাও সম্ভব। হ্যাঁ হ্যাঁ, যে ইন্দিরা নয় তাকে ইন্দিরা বললে বলতেই হবে তুমি পাগল। এখানে বসে থাকো। স্বচক্ষে দেখো আমি কার স্ত্রী। তোমার মতো একটি গ্রাম্য ভূত আমার স্বামী নয়। আমার স্বামী কৃতান্তক। তোমার মতো চোখ ঝলসানো রূপ নেই তার সত্য, কিন্তু যেমন শৌর্য তেমন বুদ্ধি। সমগ্র গৌড় বঙ্গের ত্রাস আমার স্বামী দস্যু কৃতান্তক। রাজা সে নয় কিন্তু রাজার চেয়েও বড়ো।

গোপাল ॥ [ব্যাঙ্গে] ও। ঈশ্বর !

রানী ॥ পরিহাস করছো ? কিন্তু জেনো আজ যিনি রাজ সিংহাসনে বসে আছেন সে সিংহাসন থেকে হেলায় তাঁকে টেনে নামিয়ে সেই সিংহাসনে বসিয়ে দিতে পারেন তোমারই মতো এক মূর্খকে আমার স্বামী। [তিনটি ঘণ্টাধ্বনি হইল] ঐ তিনি এসে গেছেন।

[পশু ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। কৃতান্তকের প্রবেশ। দেখলেই মনে হয় দুর্দান্ত। কৃতান্তক নামটি সার্থক। রানী ছুটিযা আসিয়া নীলকমলগুচ্ছ কৃতান্তকের হাতে দিল।]

কৃতান্তক ॥ একি, নীলকমল ! কতদিন তুমি আমার কাছে চেয়েছো, আমার মনেই থাকে না ছাই। কোথায় পেলে ? [গোপালকে দেখিয়া] লোকটা কে রানী ?

[কৃতান্তক গোপালের চোখে চোখ রাখিয়া ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার কপাল পরীক্ষা করিয়া সেই কপালের ক্ষতচিহ্নে হাত দিয়া]

কৃতান্তক ॥ সেই ক্ষতচিহ্ন ! হুঁ। [নিজের বাহুকে একটি ক্ষত চিহ্নে হাত দিয়া উহা গোপালকে দেখাইয়া] আছে। আমারও সে ক্ষত চিহ্ন আজো মিলিয়ে যায়নি। অবাক করেছিলে তুমি আমাকে সেদিন। কেন যেন মনে মনে তোমাকেই খুঁজেছি এতদিন। আজ তোমাকে আমি পেয়েছি [হঠাৎ তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া] তুমি বীর !

গোপাল ॥ তোমাকে আমি চিনেছি দস্যু। [আবেগপূর্ণ কণ্ঠে] আমাকে শুধু একটি প্রশ্নের উত্তর দাও—ঐ নারী তোমার বিবাহিতা স্ত্রী ?

কৃতান্তক ॥ [উচ্চহাস্যে] এর উত্তর তোমাকে ওই নারীই দিক।

গোপাল ॥ সে বলেছে তুমি তার স্বামী। কিন্তু তার সমর্থন চাই আমি তোমার মুখে।

কৃতান্তক ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—

গোপাল ॥ থামো। একখানি অসি দাও আমাকে। নিজে ধরো আর একখানি।

কৃতান্তক ॥ আবশ্যক নেই। ঐ নারী স্বেচ্ছায় আমার কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেছে। ধর্মসাক্ষী রেখে আমি তাকে পত্নীরূপে বরণ করেছি। দুঃখিত হচ্ছো বীর।

গোপাল ॥ যাক্, উত্তরটা পেলাম। সন্দেহটা গেল ! দুঃখ ? না ! আমি জানি বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। বিদায় ইন্দিরা।

রানী ॥ [ম্লানহাস্যে] এখনো ইন্দিরা !

গোপাল ॥ আর বলবো না। আমার ইন্দিরা মরে গেছে। যমের হাত থেকে আমি তাকে রক্ষা করতে পারিনি। দোষ আমার, তার নয়।

কৃতান্তক ॥ যা হবার তা হয়ে গেছে। আমার ঠাকুরমা বলতেন, যে দুধ পড়ে গেছে তাকে তুলতে যেওনা, তার জন্য কেঁদোনা ! কি ভাই ঠিক কিনা।

গোপাল ॥ না, আর আমার কোন ক্ষোভ নেই, বিদায়।

কৃতান্তক ॥ আরে-আরে সেকি ? এত কষ্ট করে নীলকমল এনেছ ! তা ছাড়া কতকাল পরে দেখা। মক্ষিরানী অতিথি সৎকার ভুলে গেলে নাকি !

গোপাল ॥ দস্যুর আতিথ্য আমি ঘৃণা করি।

কৃতান্তক ॥ বিপদের কথা। হ্যাঁ, তবে তোমাকে অনাহারে থাকতে হবে, এই গৌড়ে। গৌড়ের যে-কোন ভদ্রলোকের বুক চিরে দেখ, দেখবে সেখানে একটি দস্যু কি একটি তস্কর ঘুপটি মেরে বসে আছে।

গোপাল ॥ এ রাজ্য অরাজক সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে এখানকার লোক এখনো এত নীচে নামেনি কৃতান্তক। তার প্রমাণ তুমি নিজে।

কৃতান্তক ॥ সেকি ! আমি !

গোপাল ॥ হ্যাঁ। আমি এখনো অক্ষত দেহে জীবিত রয়েছি তোমার সামনে।

কৃতান্তক ॥ [হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল] সেটা তুমি বড় কুটুম্ব বলে।

বসো ভাই বসো। ভারী ভাল লাগছে তোমাকে আজ। বড় কুটুম্ব, কি যেন তোমার নাম ?

গোপাল ॥ আমি কারো কুটুম্ব নই। আমার নাম গোপাল।

রাণী ॥ দস্যুর আতিথ্য যখন ইনি গ্রহণ করেন না, যেতে দাও ওঁকে।

কৃতান্তক ॥ ও, একে বুঝি বিষ খাইয়ে মারতে চাও না তুমি। অসীম তোমার দয়া রানী।

গোপাল ॥ মানুষকে এত নীচ ভাবতে শিখিনি আমি এখনো।

কৃতান্তক ॥ ও, বটে ? রানীর দেওয়া পানীয় তুমি পান করবে গোপাল ?

গোপাল ॥ অসঙ্কোচে।

[হঠাৎ বহির্দ্বারে ঘন্টাধ্বনি।]

কৃতান্তক ॥ তুমি এখনো শিশু। মানুষ কত নীচে নামতে পারে স্বচক্ষে দেখো—স্বকর্ণে শোন। নিয়ে যাও রানী, গোপালদেবকে নিয়ে যাও। পর্দার অন্তরাল থেকে ওকে শুনতে দাও আজ আমরা কোথায়। সেই সঙ্গে পার তো পান করিয়ে দাও সেই বিখ্যাত গৌড়ীয় সুধা !

[মক্ষিরানী গোপালের হাত ধরিয়া পর্দার অন্তরালে লইয়া গেল। পশ্চাৎ একজন আগন্তুককে লইয়া প্রবেশ করিল।]

কৃতান্তক ॥ আরে আরে, এ কী সৌভাগ্য ! গৌড়রাজ্যের মহামান্য চৌরোদ্ধারণিক স্বয়ং আমার গুহায় শুভপদার্পণ করেছেন। আসুন আসুন, দয়া করে আসন পরিগ্রহ করুন।

চৌরো ॥ বাজে কথা রাখো কৃতান্তক ? এ রাজ্যের চোরেরা ভেবেছে কি ?

কৃতান্তক ॥ সেটা আমার চেয়ে চৌরোদ্ধারণিকেরই জানবার কথা বেশী। কারণ তিনিই তস্করকুলের দণ্ড মুণ্ডের কর্তা।

চৌরো ॥ তস্করকুল আজ একমাস চৌর্যকর্ম বন্ধ রেখেছে।

কৃতান্তক ॥ আপনার আনন্দের কথা। আপনিও তো তাই চান। রাজ্যের চুরি বন্ধ করাই তো আপনার সুমহান দায়িত্ব এবং কার্য।

চৌরো ॥ [হঠাৎ নরম হইয়া] শোনো ভাই কৃতান্তক, এখানে কেউ নেই তো ?

কৃতান্ত ॥ আঃ ! যা বলবার নির্ভয়ে বলো। না।

চৌরো ॥ ভাই, চোরেরা আজ একমাস চুরি করা বন্ধ রেখেছে। আমার চাকরী তো আর থাকে না।

কৃতান্তক ॥ এ কী বলছো হে ? এতে তো রাজার খুসী হওয়ারই কথা তোমার উপর।

চৌরো ॥ আঃ ! তুমি বুঝেও বুঝতে চাইছো না কৃতান্তক। রাজা খুসী কি অখুসী সে কথা আমি ধরছি না। কিন্তু আজ তিনি স্পষ্ট আমায় বললেন, ওহে চৌরোদ্ধারণিক, রাজ্যে চুরিই যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন তোমার চোর দমনের এই পদটি রাখার আর কোন আবশ্যক দেখছি না। ও পদটা আমি তুলে দিয়ে তোমাকে এক নতুন পদে নিয়োগ করতে চাইছি।

কৃতান্তক ॥ বাঃ! বাঃ! তবে পদোন্নতি হচ্ছে নিশ্চয় ?

চৌরো ॥ পদোন্নতি না হাতী। রাজ্যের মেষাধ্যক্ষ মারা গেছে, রাজা আমাকে সেই পদে নিযুক্ত করতে চাইছেন।

কৃতান্তক ॥ তা বেশ তো। রাজসরকারে যে কোনো একটা অধ্যক্ষের পদে থাকলেই ঘি-ভাত তোমার মারছে কে ?

চৌরো ॥ তুমি বুঝেও বুঝছো না কৃতান্তক। কোথায় চৌরোদ্ধারণিক আর কোথায় মেষাধ্যক্ষ! এই শেষ বয়সে মাঠে মাঠে ভেড়া চরাতে হবে নাকি আমাকে ? লোকে বলবে কি ? কিন্তু এও বড় কথা নয় কৃতান্তক। চুরি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কতোবড়ো একটা উপার্জন আমাদের বন্ধ হয়ে গেছে বলো দেখি ?

কৃতান্তক ॥ হ্যাঁ, তা তো বটেই।

চৌরো ॥ আরে ঐ উপার্জনটাই তো ছিলো আমার সত্যিকার আয়। বেতন পেয়েছি বটে কিন্তু সে আর কতো ? গৃহিনীর হাত খরচ ছিল সেটা। আমি জানতে চাই কৃতান্তক, চোরদের এ দুর্মতি কেন হলো ?

কৃতান্তক ॥ তোমাদের উৎকোচ আর পার্বণীর দাবীটা আকাশ ছুঁয়েছিলো। চোরেরা দেখলো এ দাবী মেটাতে গেলে ওদের দুধে হাত পড়ে। ওদের নিশাচরসংঘ—

চৌরো ॥ কি সংঘ ?

কৃতান্তক ॥ নিশাচরসংঘ।

চৌরো ॥ সেটা আবার কি ?

কৃতান্তক ॥ রাজ্যের চোরদের সংগঠন। সংহতির জন্য একটা সংগঠন।

চৌরো ॥ ও। চোরদেরও তবে একটা সংঘ হয়েছে ?

কৃতান্তক ॥ হ্যাঁ, হয়েছে তোমাদেরই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আত্মরক্ষার জন্য। আর তা ছাড়া ওদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যেও এ সংঘ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

চৌরো ॥ বুদ্ধিটা তবে তোমার ?

কৃতান্তক ॥ অস্বীকার করছি না।

চৌরো ॥ কিন্তু এ তোমার কী দুর্বুদ্ধি ? চোর চুরি করবে না ?

কৃতান্তক ॥ না। আর চুরি করবে না। ওদের সংঘের নির্দেশে ওরা ধর্মঘট করেছে।

চৌরো ॥ ধর্মঘট করেছে চোরেরা ? পৃথিবীর ইতিহাসে এ বোধহয় এই প্রথম।

কৃতান্তক ॥ হয়তো তাই।

চৌরো ॥ না না, এ অসহ্য!

কৃতান্তক ॥ তোমাদের অত্যাচারটাও ওদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছিল অসহ্য।

চৌরো ॥ ভাই মারা যাব যে।

কৃতান্তক ॥ আঃ! তা আমি কি করবো ?

চোরো ॥ একটা আপোষ করে দে ভাই।

কৃতান্তক ॥ হ্যাঁ, আপোষমূলক মনোভাব দেখালে অবশ্য নিশাচর সংঘ ধর্মঘটের সিদ্ধান্তটা পুর্নবিবেচনা করে দেখতে পারে।

চোরো ॥ দেখতে পারে না ভাই, দেখতেই হবে।

কৃতান্তক ॥ আপোষের সর্তটা তো আগে ঠিক করা দরকার।

চোরো ॥ নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! সহ-যোগ নীতি বজায় রেখে তুমি আপোষ করে দাও ভাই।

কৃতান্তক ॥ সহ-যোগ নীতি রাখতে হলে তোমাদের দাবী-দাওয়াগুলো কমাও। ওরাও থাক, তোমরাও থাক।

চোরো ॥ বটেই তো, বটেই তো, আমাদের দাবী দাওয়া কি হওয়া উচিত সেটা না হয় তুমিই ঠিক করে দাও। তোমার ওপর আমাদের আস্থা আছে। আমি জানি তুমি বরের ঘরের পিসি আর কনের ঘরের মাসি।

কৃতান্তক ॥ বেশ আমি দেখছি। নিশাচর সংঘের একটা সভা তবে আজই ডাকছি। সিদ্ধান্ত যা হয় তা তোমাকে আমি যথাস্থানে যথাসময়ে জানিয়ে দেবো।

চোরো ॥ দেখো ভাই, ডুবিওনা কিন্তু। বেশ, তবে চলি। কিন্তু কই, তোমার রানীর দেখা পেলাম না তো ?

[তাম্বুলাধারে তাম্বুল এবং আতর লইয়া মক্ষিরানীর প্রবেশ]

কৃতান্তক ॥ মহামান্য চৌর্যোদ্ধারণিক তোমাকে স্মরণ করছিলেন রানী।

রানী ॥ আমার পরম সৌভাগ্য। মার্জনা করবেন, আপনাকে দেখলে আমার ভয় করে।

চোরো ॥ [তাম্বুল এবং আতর গ্রহণ করিয়া] না না, ভয় নেই। বেঁধে নিয়ে যাবো না। মাঝে মাঝে ঘাঁটিগুলোর সব খবর নিতে হয়, তাই এসেছিলাম। তা যা দেখে গেলাম—

রানী ॥ কী দেখলেন ?

চোরো ॥ নরক আজ স্বর্গ। তা নয় কি ! চুরিই বন্ধ !

কৃতান্তক ॥ না না, বরং বলুন স্বর্গ আর নরকে আজ কোন ভেদ নেই, এক হয়ে গেছে সব।

চোরো ॥ যা বলেছ, যা বলেছ—কি বললে ? স্বর্গ আজ নরক ? [হাসিয়া] না হে না, স্বর্গে ধর্ম আছে, ধর্মঘট নেই। ওটা ভেঙে দিয়ো।

[প্রস্থান। গোপাল ছুটিয়া প্রবেশ করিল।]

গোপাল ॥ আশ্চর্য ! এ রাজ্যের এই অবস্থা ! যে রক্ষক সেই ভক্ষক !

কৃতান্তক ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ! এরই নাম মাৎস্যন্যায়।

রানী ॥ কি ন্যায় ?

কৃতান্তক ॥ মাৎস্যন্যায়। হ্যাঁ, গৌড়ের পণ্ডিতরা একে মাৎস্যন্যায়ই বলছেন। মানে, বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে খাচ্ছে। যে রক্ষক সেই ভক্ষক হচ্ছে।

[বাহিরে ঘন্টাধ্বনি শোনা গেল।]

এই দেখ, আবার কে এলো ! [ক্রীতদাসের প্রতি] এই কটা ঘণ্টা পড়লো ? [ক্রীতদাস অঙ্গুলী দিয়া চারিটি দেখাইল]

কৃতান্তক ॥ জননেতা উদাত্ত।

গোপাল ॥ জননেতা উদাত্ত ? সাক্ষাৎ প্রার্থী দস্যুনেতার ?

কৃতান্তক ॥ মাৎস্যন্যায় যুগের নেতারা গভীর জলের মাছ। যবনিকার অন্তরালে সজাগ রাখো কর্ণযুগল। রানী, প্রস্তুত রাখো আমাদের পানাহার। ও, ভালো কথা, তোমার হাত থেকে পানীয় গ্রহণ করেছেন গোপাল ?

রানী ॥ [হাসিয়া] না।

কৃতান্তক ॥ সাহস হচ্ছে না বুঝি ! আচ্ছা, আচ্ছা।

[ইঙ্গিতে গোপালকে লইয়া মক্ষিরানী পর্দার অন্তরালে চলিয়া গেল এবং আর এক ইঙ্গিতে ক্রীতদাস গিয়া একজন মুদ্রাবাহী অনুচর সহ জননেতা উদাত্তকে লইযা কক্ষে প্রবেশ করিল।]

কৃতান্তক ॥ আরে আরে, আজ আমার এ কী সৌভাগ্য ! সর্বজনবন্দিত জননেতা উদাত্তের শুভ পদার্পণ ঘটলো আজ সর্বজনঘৃণিত এই অধমের গুহায় ?

উদাত্ত ॥ আজকাল খুব পণ্ডিত হয়েছিস দেখছি কৃতান্তক। সাধুভাষায় কথা বলছিস ! এ্যাঁ ?

কৃতান্তক ॥ এটা সঙ্গদোষ। তোমার সভাসমিতিগুলোতে আমি উপস্থিত থাকি-তো ॥ তোমাদেরই বক্তৃতা থেকে এ সব শেখা। তা, কি মনে করে ?

উদাত্ত ॥ মাছ খাচ্ছিস ?

কৃতান্তক ॥ মাছ ?

উদাত্ত ॥ হ্যাঁ, মাছ, মৎস্য ? আজকাল খেতে পাচ্ছিস ?

কৃতান্তক ॥ কই আর মাছ ? মাছ তো আজকাল দুষ্প্রাপ্য।

উদাত্ত ॥ কেন দুষ্প্রাপ্য সেটা ভেবে দেখেছিস ?

কৃতান্তক ॥ না। তেমন করে ভেবে দেখিনি। তবে এখন তোমার কথায় মনে হচ্ছে গুরুতর কারণ একটা কিছু খুঁজে পেয়েছো তুমি।

উদাত্ত ॥ হ্যাঁ, পেয়েছি। বড় মাছগুলো ছোট মাছগুলোকে খেয়ে ফেলছে।

কৃতান্তক ॥ তা তো খেয়েই থাকে। এর নামই তো মাৎস্যন্যায়।

উদাত্ত ॥ হ্যাঁ যে ন্যায় আমাদের সমাজেও আজ চলছে—বড়রা ধরে খাচ্ছে ছোটদের

কৃতান্তক ॥ মানে নতুন একটা আন্দোলন শুরু করতে চাইছো ? কি বড় মাছদের বিরুদ্ধে, না বড় মানুষদের বিরুদ্ধে ?

উদাত্ত ॥ আন্দোলনটা হচ্ছে এই ঃ মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। কেন ? বড় মাছ-গুলো ছোট মাছগুলোকে খেয়ে ফেলছে। কাজেই বড় মাছ মারো। বড়লোকদের

পাতে বড় মাছ চাই-ই। বড়লোকেরা তাতে দেবে বাধা। তখন আন্দোলনটা গিয়ে দাঁড়াবে—তবে ঐ বড়লোকদেরই মারো।

কৃতান্তক॥ ওরে বাবা! এ না হলে জননেতা!

উদাত্ত॥ এটা হ'ল রাজনীতি। দূরদৃষ্টি। কাল থেকেই আমাদের এই মৎস্য আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে কৃতান্তক।

কৃতান্তক॥ শুরু হয়ে গেছে?

উদাত্ত॥ হ্যাঁ। শুরু হয়ে গেছে। কালকের এক বিরাট জনসভায় শুরু হয়ে গেছে।

কৃতান্তক॥ তা আমার কাছে এসেছ কেন?

উদাত্ত॥ 'বড় মাছ মারো' এই দাবী নিয়ে আমরা একটা অভিযান করতে চাই রাজপ্রাসাদে।

কৃতান্তক॥ রাজা এ দাবী মানবেন না। তিনি বৌদ্ধ। অহিংসা তাঁর ধর্ম। তিনি মাছ খান না।

উদাত্ত॥ তিনি না খান, কিন্তু আর দশজন খায়। তিনি বৌদ্ধধর্ম আজও আঁকড়ে ধরে বসে আছেন বটে, কিন্তু রাজ্যের বেশীর ভাগ প্রজাই বৌদ্ধধর্মে আর অনুরাগী নয়। তারা আজ মাছ খেতে চায়। স্বচক্ষে দেখছো না কি, বৌদ্ধ মঠ আর বিহার—অনাদরে সব ভেঙে পড়েছে। তার ইঁট পাথর কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে লোকেরা বাড়ি ঘর তৈরী করছে। বৌদ্ধধর্মের সে গৌরব, সে প্রতাপ কি আজ আর দেশে আছে?

কৃতান্তক॥ তার জন্য রাজা দায়ী নন।

উদাত্ত॥ কিন্তু বড় মাছদের প্রশ্রয় দিয়ে রাজা জাতির কাছে কোনো অপরাধ করেননি বলতে চাও তুমি? তাঁর প্রশ্রয় পেয়েই তো বড় মাছগুলো গরীবের খাদ্য ছোট মাছদের খাচ্ছে। কিন্তু কার কাছে আমি এসব কথা বলছি? তুমি নিজেই যে একটি রাঘব বোয়াল। চুনোপুঁটিদের আত্মরক্ষার এই আর্তনাদ তাই তোমার কানে পৌঁছবেনা সে আমি জানি।

কৃতান্তক॥ তাই যদি—তবে আমার কাছে এসেছ কেন?

উদাত্ত॥ আমি এসেছি ব্যবসার ব্যাপারে। আমার আন্দোলনটাকে জোরাল করবার জন্য তোমার কাছে শ'দুই লোক ভাড়া চাই। উপযুক্ত দক্ষিণা নিয়ে যেমন তুমি দাও, দিয়ে থাকো।

কৃতান্তক॥ হ্যাঁ, দিয়ে থাকি। কিন্তু এ আত্মঘাতী আন্দোলনে আমি কোনো লোক দেবো না।

উদাত্ত॥ এই কৃতান্তক, শেষে তুই আমাকে ডোবাবি? দে ভাই দু'শো বাছা বাছা লোক। আমার আন্দোলনের পুরোভাগে থাকবে তারা। ঠিক হয়েছে কিনা —আজ আমাদের এই দাবী নিয়ে রাজপ্রাসাদ অবরোধ করবো আমরা।

কৃতান্তক॥ না, বড় মাছ মারা চলবে না। ওই চুনোপুঁটি আমাদের মুখে রুচবে

না। খাওয়ার সুখতো উঠেই গেছে। যা খাবো তাতে-ই ভেজাল। কই এদিকে তো জননেতা, তোমার দৃষ্টি নেই। তণ্ডুলে ভেজাল, গোধুমে ভেজাল, দুগ্ধ, ঘৃত, এমন কি সুরা, আজকাল তাতেও ভেজাল। আমিষ ছেড়ে নিরামিষ আন্দোলন শুরু কর, যত লোক চাও দিচ্ছি।

উদাত্ত॥ এই তবে তোমার শেষ কথা ?

কৃতান্তক॥ এই আমার শেষ কথা। তোমারই ভালোর জন্য বলছি উদাও। মৎস্য-আন্দোলনে বৌদ্ধরা যোগ দেবে না। কিন্তু ভেজাল-আন্দোলনে বৌদ্ধ অবৌদ্ধ সবাই যোগ দেবে।

উদাত্ত॥ মানে, বড় মাছের পর টাকার কুমীরগুলো আগে মারো, ওই শ্রেণী-সংঘর্ষটা এড়িয়ে যেতে চাইছিস। যা, তবে তাই যা। তবে যুতসই আন্দোলন একটা আমার চাই। নেতৃত্বটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো ? তা বেশ। খাদ্যে ভেজাল আর চলবে না—খাদ্যে যে ভেজাল দেবে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে সে—জনতার এই দাবী নিয়েই আজ আমাদের অভিযান হোক রাজপ্রাসাদে।

কৃতান্তক॥ হ্যাঁ, এ আন্দোলন বেশ ভালো আন্দোলন। কিন্তু কি ভাবছি জানো ?

উদাত্ত॥ কি আবার ভাবছো ?

কৃতান্তক॥ শেষে তোমারই কোন শ্যালক কিম্বা ভাগ্নে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না হয়।

উদাত্ত॥ কি যে বলো, অতো বোকা যদি হয়, তবে তারা আমার শ্যালকও নয় —ভাগ্নেও নয়।

কৃতান্তক॥ বটেই তো। তা বেশ, লোক তুমি পাবে। ফেলো কড়ি মাখো তেল। কতো লোক চাই ?

উদাত্ত॥ দু'শো। একটু শীর্ণকায় হলেই ভালো হয়। দেখে যেন মনে হয় মূর্তিমান অম্বল আর অজীর্ণ। বুঝতেই পারছো, মানে, ভেজালের বিরুদ্ধে অভিযান তো ?

কৃতান্তক॥ [হাসিয়া] খুব বুঝেছি। এ না হলে আর দূরদৃষ্টি ! ঠিক আছে। পাবে দু'শো লোক। সারাপথ ঢেঁকুর তুলতে তুলতে যাবে'খন। তবে ওদের মাথাপিছু এক মুদ্রা এবং আমারও দাক্ষিণা মাথা পিছু আর এক মুদ্রা।

উদাত্ত॥ মোট চারশত মুদ্রা ?

কৃতান্তক॥ হ্যাঁ ; চারশত।

[উদাত্ত চারিটি টাকার থলি বাহির করিয়া কৃতান্তকের সম্মুখে রাখিল।]

উদাত্ত॥ এই চারশত মুদ্রা গুণে নাও।

কৃতান্তক॥ এ কি আজ নতুন যে গুণে নেবো ? পশু ?

[পশু টাকার থলি কক্ষান্তরে লইয়া গেল। কৃতান্তক পুষ্পপাত্র হইতে একটি লোহিত পুষ্পপ্রতীক তুলিয়া লইয়া]

আমার অনুচর আচার্য বলভদ্রের ধর্মমন্দিরে গিয়ে তাঁর হাতে এই প্রতীকচিহ্ন দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জানাবে কবে কোথায় কখন এই দু'শো লোক তোমার চাই। ব্যাস। আর দেখতে হবে না।

উদাত্ত ॥ চলি কৃতান্তক।

কৃতান্তক ॥ ও ভালো কথা, শোনো ভাই, শোনো।

উদাত্ত ॥ কি ?

কৃতান্তক ॥ বড়ো বিপদে পড়েছি।

উদাত্ত ॥ তোমার আবার বিপদ ?

কৃতান্তক ॥ হ্যাঁ, বিপদ। আমার একজন কুটুম্ব, ভারী সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক। গ্রাম থেকে এসেছেন গৌড়ে। কিন্তু আমাকে তো জানেন, তাই জলস্পর্শ করতে চান না আমার এখানে। থাকতে চান এখানে কিছুদিন, কোনো সাধু-সজ্জনের গৃহে আতিথ্য নিয়ে। এমন লোক এখন আমি কোথায় পাই বলো দেখি ?

উদাত্ত ॥ কেন, পাঠিয়ে দিও আমার গৃহে।

কৃতান্তক ॥ ও, তাও তো বটে। তোমার গৃহ তো সাধুসজ্জনেরই আশ্রম। আচ্ছা ভাই, এসো। বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক।

উদাত্ত ॥ [একগাল হাসিয়া] হ্যাঁ, বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক !

[অনুচরসহ প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে গোপালের প্রবেশ এবং তৎপশ্চাতে মক্ষীরানী প্রবেশ করিল।]

গোপাল ॥ আমি চলে যাচ্ছি।

কৃতান্তক ॥ কোথায় ? জননেতা উদাত্তের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতে ?

গোপাল ॥ না না, তার চেয়ে নরক বরং ভালো। কিন্তু এখানেও আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

কৃতান্তক ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ! রানী, প্রথম প্রথম দু' চারদিন তুমিও না আমাকে বলতে, এ সব কী ! এই কি নগর জীবন ! দেখে শুনে চীৎকারও করে উঠেছ কতদিন—আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

রানী ॥ হ্যাঁ, তা বলেছি, কিন্তু এখন এ আমার বেশ লাগে। [গোপালকে] দু'দিন এখানে থাকো, তুমিও মেতে উঠবে।

গোপাল ॥ তা আমি বিশ্বাস করি, আর বিশ্বাস করি বলেই আমি চলে যাব এখান থেকে।

কৃতান্তক ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও। রানী, তোমার দেওয়া পানীয় গ্রহণ করেনি গোপাল ?

রানী ॥ না।

কৃতান্তক ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—

গোপাল ॥ কোথায় পানীয় ? দাও।

কৃতান্তক ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ! গেলে গোপাল, তুমি গেলে।

[সঙ্গে সঙ্গে দু'টি ঘণ্টা পড়িল। ক্রীতদাস ছুটিয়া আসিয়া প্রভুর দিকে তাকাইয়া আদেশের প্রতীক্ষা করিল]

কৃতান্তক ॥ কটা ঘণ্টা পড়লো, দু'টো না তিনটে ?

[ক্রীতদাস অঙ্গুলী দিয়া বুঝাইল দুইটি]

কৃতান্তক ॥ মহামাত্য।

[তাহার ইঙ্গিতে ক্রীতদাস বাহিরে ছুটিল। কৃতান্তকের অপর ইঙ্গিতে রানী এবং গোপাল অন্দরে প্রবিষ্ট হইল। একজন মুদ্রাবাহী রক্ষীসহ মহামাত্যের প্রবেশ]

কৃতান্তক ॥ আরে আরে, এ কী সৌভাগ্য ! স্বয়ং মহামাত্য ! এ যেন ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো। কী সৌভাগ্য ! কী সৌভাগ্য !

মহামাত্য ॥ কাজেই আমার দুর্ভাগ্যটা কত বড় তা সহজেই বুঝতে পারছো কৃতান্তক। এখানে যখন আর কেউ নেই দেখছি তখন এ সাধুভাষাটাষাগুলো এখন থাক। এই কৃতান্তক, আর একবার বাঁচা দেখি আমাকে।

কৃতান্তক ॥ কেন মশাই, আবার কি হ'ল ?

মহামাত্য ॥ আরে ঐ জননেতা, শালা উদাত্ত আবার জ্বালাচ্ছে। শালার শয়তানী এবার চরম। করেছে কি জানিস ?

কৃতান্তক ॥ কি ?

মহামাত্য ॥ একটা "মৎস্য আন্দোলন" শুরু করেছে।

কৃতান্তক ॥ সেটা আবার কি ? মাছ খেতে বলছে, না, খেওনা বলছে ?

মহামাত্য ॥ বলছে—খাও, বড় মাছ খাও।

কৃতান্তক ॥ তা বেশ তো। খাক্ না।

মহামাত্য ॥ আঃ ! তুমি বুঝছো না কৃতান্তক। আজ বলছে বড় মাছ খাও, কাল বলবে বড় লোক, আমাদের খাও, পরশু বলবে রাজাকেই খাও।

কৃতান্তক ॥ বেচারী রাজা ! তাকে সবাই খেতে চায়। ওরাও খেতে চাইছে, আর আপনারা তো তলে তলে একটু একটু করে খেয়েই যাচ্ছেন।

মহামাত্য ॥ খেতে আর পারছি কই। তা যদি পারতাম তবে এই চুনো-পুঁটি-গুলো একদিনেই সাবাড় করতাম আমি।

কৃতান্তক ॥ কিন্তু লোকের তো ধারণা যে এর পরের রাজা আপনি।

মহামাত্য ॥ এ্যাঁ?

কৃতান্তক ॥ হ্যাঁ।

মহামাত্য ॥ ও। না। অতটা সোজা নয়। আরো বারোটি অমাত্য রয়েছে যে। চোখ সবারই ঐ গদির দিকে।

কৃতান্তক ॥ কিনে ফেলুন।

মহামাত্য ॥ কাকে ?

কৃতান্তক ॥ ঐ বারো অমাত্যকে। আরে মশাই, আপনার তো কত সুবিধে। অতবড় মূলধন রয়েছে আপনার ঘরে।

মহামাত্য ॥ মূলধন ? মূলধন আবার কী দেখলে ?

কৃতান্তক ॥ কেন ? আপনার মেয়েটি ! অমন সুদর্শনা আর সুচতুরা কন্যা গৌড়বঙ্গে আজ আর কার আছে ? ও বারজনকেই আলাদা আলাদা ডেকে বলুন··· [হাসিয়া] বুঝলেন তো ?

মহামাত্য ॥ আরে সে বুঝি জানো না ? তোমার ঐ মূলধনেই গোলমাল।

কৃতান্তক ॥ মানে ?

মহামাত্য ॥ বেটির মন পড়েছে এক শিল্পীর ওপর। ঐ সেই ধীমানের বেটা শ্রীমান ? ঐ যে মাথামুণ্ডু কী সব আঁকে। আর সেই ক্ষ্যাপা ছেলেটা—সে জন্যেও যে আজ তোমারি কাছে এসেছি। কথাটা যখন আগেই উঠলো, আগেই বলছি। ছোকরাটাকে সাবাড় করে দাও তো কৃতান্তক।

[হঠাৎ যবনিকার অন্তরাল হইতে কি একটা পড়িয়া যাওয়ার শব্দ হইল। ইহাতে মহামাত্য চমকিয়া উঠিল]

মহামাত্য ॥ ও কী !

কৃতান্তক ॥ আর বলবেন না মহামাত্য, বেড়ালের উৎপাতে মারা গেলাম।

মহামাত্য ॥ সাবাড় করো, সাবাড় করো। [চুপিচুপি] আর ঐ সঙ্গে আমার ঘরের বেড়ালটাকেও।

কৃতান্তক ॥ এ আর বেশী কথা কি বলছেন মশাই ? তবে এ সব কাজে আগে যে দক্ষিণা দিতেন তা আর চলবে না।

মহামাত্য ॥ আগে তো একশো মুদ্রা নিতে হে।

কৃতান্তক ॥ এখন হয়েছে দু'শো।

মহামাত্য ॥ তাই হবে, তাই হবে। অত সব সুপাত্র থাকতে বলি মেয়েটাকে তো আর জলে ফেলে দিতে পারিনা হে। আমি রাজী।

[দুইটি মুদ্রার থলি কৃতান্তকের সম্মুখে রাখিল। কৃতান্তক ইংগিত করিতেই পশু থলি লইয়া গেল]

কৃতান্তক ॥ বেশ। [শ্বেত পুষ্পপ্রতীক দিয়া] এই নিন। দিয়ে দেবেন আচার্যদেবকে।

মহামাত্য ॥ আরে জানি, জানি। তোমার ফুলটি যখন হাতে পেয়েছি কাজটিও আমার হয়ে গেছে। এখন আসল দায় থেকে উদ্ধার করো দেখি ভাই কৃতান্তক। ঐ আমিষ আন্দোলনটা নিরামিষ করে ছেড়ে দাও দেখি। শ'তিনেক লোক দাও।

কৃতান্তক ॥ এরা কি করবে ? নিরামিষ খাবে ?

মহামাত্য ॥ পরিহাস রাখো কৃতান্তক। মৎস্য আন্দোলনকারীদের সঙ্গে এরা বেমালুম মিশে যাবে। ওদের সুরে সুর মিলিয়ে ভীষণ চ্যাঁচাবে। রাজপ্রাসাদের কাছে জনতার এই মিছিল যেই আসবে আমাদের সান্ত্রীরা দেবে বাধা।

কৃতান্তক ॥ ও বাবা ! বাধা মানেই তো প্রহার। আমার লোকেরা এ আহারের জন্য প্রস্তুত নয় মহামাত্য। না, মাথা পিছু তিন মুদ্রাতেও না।

মহামাত্য ॥ নাঃ, কৃতান্তক—তুই আমাকে হাসালি। আরে, ভাড়াটে লোক কখনো মার খায়, না মারে ?

কৃতান্তক ॥ রাজার সান্ত্রীরা এদের ছেড়ে কথা কইবে ? মারবে না ?

মহামাত্য ॥ আঃ! মারবে বৈকি, মেরে সাবাড় করবে। কিন্তু মারতে পারে কখন ? জনতা যদি অহিংস থাকে তবে তো আর তাদের মারা চলে না। মানে, শোভা পায় না। কাজেই এই ভাড়াটে লোক দিয়ে কিছু লোষ্ট্র আর প্রস্তর নিক্ষেপ করাতে হবে আমাদের সান্ত্রীদের ওপর। ব্যস—তারপরই তো বুঝতে পারছো—

কৃতান্তক ॥ সে বুঝেছি। লাঠি চলবে।

মহামাত্য ॥ লাঠি মানে, মৃদু লাঠি। তবে তাতেই—

কৃতান্তক ॥ কিন্তু তার আগেই মশাই আমার লোক কিন্তু ভাগবে।

মহামাত্য ॥ বটেই তো।

কৃতান্তক ॥ দক্ষিণা কিন্তু মাথাপিছু তিন মুদ্রা আর আমারও মাথাপিছু তিন মুদ্রা।

মহামাত্য ॥ তাহলে হ'ল গিয়ে মোট আঠারো শো। দক্ষিণাটা এবার একটু বেশী হ'ল হে। তা বিপদ হলে, শাস্ত্রে বলে, অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। পাবে ভাই তাই পাবে।

[মহামাত্য পুনরায় টাকার থলি কৃতান্তকের সম্মুখে রাখিল এবং পশু প্রভুর ইঙ্গিতে তাহা লইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল]

কৃতান্তক ॥ ও আপনি জেনে রাখুন যে আমিষ আন্দোলনটা এরই মধ্যে নিরামিষ হয়ে গেছে। বেশ তাহলে নিন—[একটি কৃষ্ণ পুষ্পপ্রতীক দিয়া] বাকীটা আপনার জানাই আছে।

মহামাত্য ॥ হ্যাঁ, তা আছে বৈকি। চলি। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা। জনতার চেঁচামেচিতে বাধ্য হয়ে একটা নতুন অনুশাসন আমাদের ঘোষণা করতে হচ্ছে।

কৃতান্তক ॥ কি ?

মহামাত্য ॥ [একটি কাগজ বাহির করিয়া পাঠ] "আমাদের মহামান্য রাজা গভীর পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছেন যে, রাজ্যে দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব শোচনীয়রূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ইহার দমন কল্পে রাজশক্তি বদ্ধপরিকর হইয়াছে। দুর্নীতি অপরাধের শাস্তি এক্ষণে শুধু কারাদণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকিবে না, এজন্য চরম অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।"

কৃতান্তক ॥ না না এ আর কি হ'ল ? এতে লোক নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। বরং বলুন, দুর্নীতির অপরাধে এক্ষণে শুধু কারাদণ্ড নয়, অর্থদণ্ডও নয়, নিকটতম চৌমাথায়, প্রকাশ্যে, চরমতম শূলদণ্ড দেওয়া হইবে। এরকম একটা ঘোষণায় জনসাধারণ খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

মহামাত্য ॥ বুঝলাম।

কৃতান্তক ॥ কি ?

মহামাত্য ॥ জনসাধারণ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে পারলেই তোমাদের কাজটা বেশ একটু সহজ হয়। ধরেছি কিনা ?

কৃতান্তক ॥ তা আর ধরবেন না ? এ না হলে মহামাত্য !

মহামাত্য ॥ বেশ তাই হবে। চরমতম শাস্তির ব্যবস্থাই হবে। এবার তবে চলি। এ বিপদটা কেটে গেলেই আবার কিন্তু আসবো আমি।

কৃতান্তক ॥ কেন, আবার কি ?

মহামাত্য ॥ [চুপি চুপি] নতুন একটা চকমকি কথায় কথায় আমার হাতে তুলে দিয়েছ হে, আলোটা জ্বলছে—গদিতে উঠবার পথটাও দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু পাথেয়টা এখনো জোগাড় নেই।

কৃতান্তক ॥ সে ভাববেন না, পাথেয় আপনার ঘরেই রয়েছে।

মহামাত্য ॥ [চমকিয়া] আমার ঐ মল্লিকার কথা বলছো ? দেখা যাক— সাদা ফুলটার কাজ আগে দেখা যাক। শ্রীমান হতশ্রী হবেন তবে তো ? আচ্ছা চলি।

[অনুচর সহ প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে পর্দার অন্তরাল হইতে ছুটিয়া আসিল গোপাল এবং মক্ষিরানী]

গোপাল ॥ আমিও চলি। এটা পাপপুরী, এটা নরক !

কৃতান্তক ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ! কোথায় যাবে ?

গোপাল ॥ বাইরে।

কৃতান্তক ॥ বাইরে ? হাঃ হাঃ হাঃ ! সেখানেও এই নরক।

গোপাল ॥ মানুষই এই নরক সৃষ্টি করেছে। মানুষই ধ্বংস করবে এই নরক।

কৃতান্তক ॥ সে মানুষ কি তুমি ?

গোপাল ॥ জানি না। তবে সে মানুষ হতে আমি চেষ্টা করবো। [প্রস্থানোদ্যত]

রানী ॥ শোনো।

কৃতান্তক ॥ আঃ! কেন ওকে ডাকছো। ও যদি অমানুষ হয়, তোমারই এখানে ফিরে আসবে। আর যদি মানুষ হয় তবে এখানেই আসতে হবে ওকে সবার আগে—ধ্বংস করতে আমাকে, না পারলে ধ্বংস হতে নিজে।

গোপাল ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ।

[তিনবার "হ্যাঁ" বলিতে বলিতে চলিয়া গেল]

রানী ॥ [আর্তনাদ করিয়া উঠিল] আঃ—

কৃতান্তক ॥ বুঝলাম, তুমি এখনও ওকে ভালোবাসো রানী। তাই তোমার এই আর্তনাদ !

রানী ॥ আমি তোমাদের কাউকে হারাতে পারবো না।

কৃতান্তক ॥ তবে আমিও বলি—তোমাকেও আমি হারাতে পারবো না। দস্যুতা করতে গিয়ে এ জীবনে কত সুন্দরী নারীই তো লুণ্ঠন করেছি, কিন্তু ভালোবাসতে

পেরেছি শুধু এক তোমাকে। আর কতখানি ভালোবেসে ফেলেছি তা বুঝতে পারছি আজ সর্বপ্রথম, যখন এলো ঐ গোপাল, আর নতুন করে দোলা দিলো তোমার মনে। আজ আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভয় ঐ গোপাল। তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে এক শুধু ওই গোপাল।

রানী ॥ না—না—ওগো না—

কৃতান্তক ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার দেহটাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না, কিন্তু ছিনিয়ে নিতে পারে তোমার মন।

রানী ॥ ও তোমার মতো দস্যু নয়।

কৃতান্তক ॥ না, তা নয়। কিন্তু ভয় হয়—যদি দস্যু হয়, গোপাল যদি আমার মতো দস্যু হয়।

রানী ॥ না না, ও দস্যু হবে না। ও সে লোক নয়।

কৃতান্তক ॥ সেই যা ভরসা। ও সেই লোক যে মানুষের নীচতা দেখে শিউরে ওঠে। মানুষ যে কত নীচে নামতে পারে, আজ ওকে আমি ইচ্ছে করে তা দেখিয়ে দিয়েছি। কেন জানো?

রানী ॥ কেন?

কৃতান্তক ॥ ওর দুর্জয় শক্তি এখন থেকে নিয়োজিত হবে মানুষের নীচতা আর রাজ্যের অরাজকতা দমনে। ও ভুলে যাবে তোমাকে।

রানী ॥ ও ভুলে গেছে, ভুলে গেছে…

কৃতান্তক ॥ হাঃ হাঃ হাঃ…

[রানীকে বুকে নিল]

দ্বিতীয় সর্গ

[গৌড় নগরীর উপকণ্ঠে ভাস্কর শ্রীমানের শিল্প-কক্ষ। রাত্রি। উজ্জ্বল দীপালোকে কক্ষটি আলোকিত। শ্রীমান সদ্য সমাপ্ত প্রস্তর-নির্মিত ক্ষুদ্র মূর্তি নিরীক্ষণ করিতেছে। মাঝে মাঝে উহার সংস্কার সাধন করিতেছে।

দ্বারে করাঘাত শুনিয়া শ্রীমান দ্বার উন্মোচন করিল। এবং দ্বারে গোপালদেবকে দেখিতে পাইল।]

শ্রীমান ॥ তুমি—আপনি কে?

গোপাল ॥ আমি এক গ্রাম্য লোক।

শ্রীমান ॥ তা এখানে এত রাতে?

গোপাল ॥ বিশেষ প্রয়োজন আছে।

শ্রীমান ॥ কি প্রয়োজন?

গোপাল ॥ আপনিই তো শিল্পী শ্রীমান?

শ্রীমান ॥ হ্যাঁ।

গোপাল ॥ আপনার সঙ্গে আমার কিছু গোপনীয় কথা-বার্তা আছে।

শ্রীমান ॥ কিন্তু তার সময় কি এই ?

গোপাল ॥ আমার ধারণা নিশীথই গোপন কথা-বার্তার শ্রেষ্ঠ সময়।

শ্রীমান ॥ অপরিচিতের সঙ্গে বোধহয় তা নয় !

গোপাল ॥ আমি আপনার অপরিচিত, আপনি আমার অপরিচিত নন।

শ্রীমান ॥ কথাটা হেঁয়ালীর মত শোনালো। আচ্ছা আপনি ভেতরে আসুন।

গোপাল ॥ হ্যাঁ, ভেতরে যাওয়াই আমার খুব দরকার।

[গোপাল কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল]

গোপাল ॥ দরজাটা বন্ধ করুন।

[শ্রীমান বিরক্ত হইয়া গোপালের দিকে তাকাইল। দরজা বন্ধ করিতে গেল। গোপাল ইতিমধ্যে সদ্য-সমাপ্ত মূর্তিটি দেখিতে লাগিল। শ্রীমান গোপালের কাছে দরজা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিল]

গোপাল ॥ মল্লিকা দেবী !

[শ্রীমান গোপালের হাত হইতে মূর্তিটি কাড়িয়া লইল এবং যথাস্থানে রাখিয়া বিরক্ত কণ্ঠে কহিল]

শ্রীমান ॥ বলুন কি আপনার গোপনীয় কথা !

[উভয়ে মুখোমুখি বসিল]

গোপাল ॥ তোমার জীবন বিপন্ন।

শ্রীমান ॥ মানে ?

গোপাল ॥ আজ রাতে তোমাকে গুপ্ত হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়েছে।

শ্রীমান ॥ কিন্তু তোমার হাতে তো কোন অস্ত্র দেখছি না।

গোপাল ॥ তুমি কি ভেবেছ, তোমাকে হত্যা করতে এসেছি আমি ? আমি তোমাকে রক্ষা করতে এসেছি।

শ্রীমান ॥ কি তুমি আবোল-তাবোল বকছ ? ওঠো বেরিয়ে যাও। আমার সময়ের দাম আছে।

গোপাল ॥ কিন্তু তোমার জীবনের দাম তার চেয়েও বেশী। শেষে দেখছি, ঐ মল্লিকাই তোমার কাল হল।

শ্রীমান ॥ কে তুমি ! কি তোমার নাম ? এ কথা তুমি কেন বলছ ?

গোপাল ॥ আমি তোমার বন্ধু—আপাতত এই পরিচয়ই থাক। তোমার এবং মল্লিকার গুপ্ত-প্রেম মল্লিকার পিতার অনভিপ্রেত।

শ্রীমান ॥ হুঁ। তুমি বুঝি মল্লিকার অন্য কোনও গুপ্ত প্রণয়ী ?

গোপাল ॥ মল্লিকাদেবীকে আমি দেখিইনি। তবে এখন দেখলে তাকে চিনতে পারব। কারণ মূর্তিটি আমি দেখেছি। তা প্রেমে পড়বার মত রূপই বটে। আর গুণও শুনেছি অসাধারণ।

শ্রীমান ॥ তোমার এই প্রলাপ শুনতে আমি আর প্রস্তুত নই। ওঠো। বেরিয়ে যাও।

গোপাল ॥ আমার মনে হচ্ছে আমাদের দুজনেরই বেরিয়ে যাওয়া উচিত এখান থেকে, এখনই।

শ্রীমান ॥ তুমি বেরিয়ে যাবে কি না বল ?

গোপাল ॥ তুমি সংগে এলে যাব। না এলে যাব না। কারণ আমি জেনেছি শিল্পসৃষ্টির কাজ তুমি নির্জনেই করতে ভালবাস। আর তাই লোকজন তোমার এখানে বিশেষ কিছু নেই।

শ্রীমান ॥ কখনও মনে হচ্ছে তুমি উন্মাদ, কখনও মনে হচ্ছে তুমি অসাধারণ। আবার এও মনে হচ্ছে, আমি কি স্বপ্ন দেখছি ? নইলে এ কি করে সম্ভব হয়, পুরুষোত্তমের যে মূর্তি আমি কল্পনায় গড়েছি তার সঙ্গে তোমার অসম্ভব সাদৃশ্য। হ্যাঁ এই দেখ।

[গোপালকে টানিয়া লইয়া গেল একটি মূর্তির সামনে]

শ্রীমান ॥ দেখছ ?

গোপাল ॥ দেখলাম। কিন্তু এত এক যোদ্ধার মূর্তি।

শ্রীমান ॥ হ্যাঁ, এই মূর্তি আমাদের যুব-শক্তির প্রতীক। বীর্যবান পেশী, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ। ধনুর্বাণই একমাত্র অলঙ্কার। ঠিক যেমনটি তুমি। মনে হচ্ছে তোমারই প্রতীক্ষা করছিল আমার এই শিল্পী-মন। কে তুমি, কোথা থেকে এলে, কেনই বা এলে ?

গোপাল ॥ পরিচয় পাবে পরে। আগে তোমার জীবনরক্ষা করতে দাও আমাকে। ঐ একটা শকট এসে দাঁড়াবার শব্দ হল না ?

[ধনুক ও তীরপূর্ণ তূণীর লইয়া গোপাল খুব তৎপর হইয়া এদিক-ওদিক চাহিল ও উপরে যাইবার একটা পথ পাইয়া দ্রুত সেই দিকে চলিয়া গেল]

শ্রীমান ॥ এই শোন ! শোন !!

[দরজায় দ্রুত করাঘাত হইল। শ্রীমান একটু ইতস্তত করিয়া দরজা খুলিয়া দিল। মল্লিকা প্রবেশ করিল]

শ্রীমান ॥ মল্লিকা তুমি !

মল্লিকা ॥ তোমার জীবন বিপন্ন। তোমাকে এই সংবাদ দিতে আমি পালিয়ে এসেছি।

শ্রীমান ॥ তুমি কি বলছ মল্লিকা ? আমি কি আজ স্বপ্ন দেখছি !

মল্লিকা ॥ আমি শকট নিয়ে এসেছি। চলে এস শকটে। বিলম্ব হলে তোমার প্রাণ রক্ষা সম্ভব হবে না শ্রীমান।

[মল্লিকা শ্রীমানের হাত ধরিয়া টানিতে লাগল]

মল্লিকা ॥ তুমি এস, তুমি এস।

[ঊর্ধ্ব সোপানে গোপালের আবির্ভাব]

গোপাল ॥ মল্লিকাদেবীর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য শ্রীমান।

মল্লিকা ॥ কে ও ?

শ্রীমান ॥ চিনি না আমি ওকে। কিন্তু এই সাবধান আমাকে ঐ লোকটিও করেছে।

গোপাল ॥ হ্যাঁ করেছি। কারণ আমি ষড়যন্ত্রটা জানি।

মল্লিকা ॥ আপনি কে ?

গোপাল ॥ আপাততঃ এই পরিচয়ই থাক—আমি তোমাদের বন্ধু। এখান থেকে এখনই তোমরা ঐ শকট নিয়ে চলে যাও। যে কোনও বিপদই আসুক না কেন, তোমাদের দেহরক্ষী আমি। গবাক্ষ থেকে আমি আততায়ীর গতিবিধি লক্ষ্য করছি। আর বিলম্ব নয়। তোমরা প্রস্তুত হও।

[গোপাল উর্ধ্বতর সোপানে অদৃশ্য হইল]

শ্রীমান ॥ কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আমাকে হত্যা করতে আসছে কে ?

মল্লিকা ॥ আমার পিতার আদেশে আমারই সহোদর ভ্রাতা বজ্রসেন। সঙ্গে তার দুর্ধর্ষ অনুচর।

শ্রীমান ॥ তোমার পিতার আদেশে ? কেন মল্লিকা ?

মল্লিকা ॥ কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমাকে ভালবাস। অপরাধ এই।

শ্রীমান ॥ শুধু এই অপরাধে ? এ রাজ্য কি আজ এত অরাজক ?

[গোপাল ছুটিয়া নীচে নামিয়া আসিল]

গোপাল ॥ ওপর থেকে দেখলাম, মশাল হাতে একদল লোক এদিকে আসছে।

মল্লিকা ॥ আমি জানি, আমি জানি, আজ গভীর রাত্রে এই নির্জন পল্লীতে অগ্নিদাহে তোমার জীবন নাশের ষড়যন্ত্র হয়েছে শ্রীমান।

গোপাল ॥ এখনও হয়তো সময় আছে, ঐ শকটে তোমরা পালাতে পারবে। হ্যাঁ, এই তীর-ধনুকে বেশ খানিকটা সময় আমি ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারব।

মল্লিকা ॥ না, না; ওরা যখন এসে গেছে, পালাবার আর সময় নেই। গৃহের চারিদিকে ওরা জ্বালবে আগুন। দাবানলের মত সেই আগুন এখনই ছড়িয়ে পড়বে গৃহের এখানে, ওখানে, সেখানে। পালাবার আর সময় নেই পথও নেই।

গোপাল ॥ কিন্তু মল্লিকাদেবী, আপনার ভ্রাতা কি জানেন, আপনি এখানে ?

মল্লিকা ॥ না, তা হয়তো জানে না। ষড়যন্ত্রের কথা কানে আসতেই আমি পালিয়ে এসেছি এখানে।

গোপাল ॥ বেশ, আমি শেষ চেষ্টা দেখছি।

[গোপাল ছাতে উঠিয়া গেল]

মল্লিকা ॥ মশালের আলো, এই দেখ ঘরেও এল।

শ্রীমান ॥ কিন্তু তাতে কি আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। জীবনের এই শেষ মুহূর্তে মনে হচ্ছে, কি আশ্চর্য ভাবেই না উদ্ভাসিত হল তোমার আমার প্রেম।

মল্লিকা ॥ সমস্ত দুঃখের মধ্যে শুধু একটি আনন্দ, মৃত্যু আমাদের পৃথক করতে পারলো না—পারলো না।

[মল্লিকা শ্রীমানের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। শ্রীমান তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল। মশালের আলো তীব্রতর হইল। ঊর্ধ্ব হইতে গোপালের তীব্র-তীক্ষ্ণ এক ঘোষণা শোনা গেল।]

গোপালের কণ্ঠ ॥ এ গৃহে লুক্কায়িত রয়েছে মন্ত্রীকন্যা মল্লিকা। অগ্নিতে তাঁরও হবে মৃত্যু। সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

[গোপালের ঘোষণা শোনা গেল। তারপর ক্ষণিক স্তব্ধতা। উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে তিনজন দুর্ধর্ষ লোক উন্মুক্ত অসি হস্তে কক্ষে লাফাইয়া পড়িল। এবং একজন তড়িৎ-গতিতে দরজার কাছে গিয়া দরজা খুলিল। কক্ষে প্রবেশ করিল বজ্রসেন। সেই মুহূর্তে ঊর্ধ্বতম সোপানে তীর-ধনুকধারী গোপালেরও আবির্ভাব হইল। গোপাল সেখান হইতে ইহাদের অলক্ষে সব কিছু নিরীক্ষণ করিতে লাগিল]

বজ্রসেন ॥ মল্লিকা, তুমি এখানে! তোমার শকট দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। আমার কাছে এস ভগিনী!

মল্লিকা ॥ না।

বজ্রসেন ॥ পিতা তোমার এই অপরাধ যাতে ক্ষমা করেন তার ব্যবস্থা করব আমি। তুমি চলে এস আমার কাছে।

মল্লিকা ॥ না।

বজ্রসেন ॥ তুমি আমার আদরের ভগ্নী। এক রাজপুরুষের সঙ্গে হবে তোমার বিবাহ। দীনহীন এই শিল্পীটাকে তুমি ছেড়ে এস। বংশের অমর্যাদা তুমি করো না মল্লিকা। কি দুঃসাহস ঐ লোকটার! আমার সামনে তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে!

মল্লিকা ॥ এ অধিকার আমিই দিয়েছি ওকে।

বজ্রসেন ॥ অনধিকার। শোন মল্লিকা, আমি আর বিলম্ব করতে পারছি না। অধীর আগ্রহে পিতৃদেব অপেক্ষা করছেন এই ধৃষ্ট যুবকের মৃত্যুসংবাদের জন্যে। তুমি যদি সরে না আস, বলপ্রয়োগে তোমাকে করতে হবে বিচ্ছিন্ন।

মল্লিকা ॥ আমার হাতে রয়েছে বিষের এই অঙ্গুরীয়ক। বলপ্রয়োগের পূর্বেই আমার মৃতদেহ এখানে পড়বে লুটিয়ে।

বজ্রসেন ॥ বটে! কুলের এতবড় কলঙ্ক তুমি। হোক তোমার মৃত্যু। এখন মনে হচ্ছে আমার বংশ-মর্যাদা রাখতে তোমার মৃত্যুই শ্রেয়। [অনুচরদের প্রতি] এই মুহূর্তেই বধ করো, দুজনকেই—এক সঙ্গে।

[আদেশ দিয়া বজ্রসেন মুখ ফিরাইয়া রহিল। অনুচরগণ অবিচলিত রহিল]

বজ্রনেস ॥ এ্যাঁ? এ্যাঁকি? [সপদ-দাপে] আদেশ পালন কর শার্দুলক। বধ কর।

শার্দুলক ॥ আমাদের প্রতি এ আদেশ ছিল না। কি বল কুম্ভীরক?

কুম্ভীরক ॥ পুড়িয়ে মারবার আদেশ ছিল একজনকে—ঐ লোকটাকে। তাই না কি দুঃশাসন ?

দুঃশাসন ॥ হ্যাঁ একজনকে পুড়িয়ে মারবার জন্যেই আমরা টাকা খেয়েছি।

বজ্রসেন ॥ বটে ? বেশ, তবে ঐ লোকটাকে পুড়িয়ে মার। জ্বাল আগুন।

শার্দুলক ॥ কিন্তু একজন তো দেখছি না। দেখছি দুজন। একসঙ্গে।

বজ্রসেন ॥ বিচ্ছিন্ন কর ওদের। তোমাদের শিকারকে সরিয়ে নিয়ে মশালের আগুনে পুড়িয়ে মার লোকটাকে।

কুম্ভীরক ॥ "বিচ্ছিন্ন কর !"—এ সব আদেশ আমাদের ওপরে নেই।

বজ্রসেন ॥ বিচ্ছিন্ন আমিই করছি ! তাতে যদি ঐ পাপিষ্ঠা বিষ খায়, খাক্।

গোপাল ॥ [উপর হইতে তীর সন্ধান করিয়া] এক পা এগিয়েছ কি তুমি গেছ।

[তৎক্ষণাৎ সকলে উপরের দিকে তাকাইয়া গোপালের রুদ্রমূর্তি দেখিল]

বজ্রসেন ॥ বুঝলাম। পিতার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য আর একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে এখানে। হ্যাঁ, আজ হেরেই গেলাম আমি। ভগিনি, যাই। বেঁচে গেলে …আমি কিন্তু খুশীই হলাম।

গোপাল ॥ হাঃ ! হাঃ !! হাঃ !!!

বজ্রসেন ॥ [গোপালকে] ওহে লোকটা, তুমি শুনে রাখো, আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু জেনে রেখো তোমার এই হাসিই শেষ হাসি নয়। সর্বশেষে যে হাসে তার হাসিই হাসি।

[তড়িৎপদে বজ্রসেন কক্ষ পরিত্যাগ করিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া উঠিল দুর্ধর্ষ অনুচরত্রয়। গোপাল সোপানপথে ত তর করিয়া নীচে নামিয়া আসিল]

গোপাল ॥ [অনুচরত্রয়কে] শার্দুলক ! কুম্ভীরক ! দুঃশাসন ! তোমরা এত মহৎ, এত উদার !

শার্দুলক ॥ [হাসিয়া] ঐ ভুলটি করবেন না মশাই।

কুম্ভীরক ॥ পেটের দায়ে আর আমরা মানুষ নই। আমরা অমানুষ।

দুঃশাসন ॥ কিন্তু, একদিন যে আমরা মানুষ ছিলাম, সেটা মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়—যেমন পড়ল আজ। এই হয়েছে বিপদ।

মল্লিকা ॥ তোমরা দেবতা ! তোমরা দেবতা !!

শার্দুলক ॥ হাঃ ! হাঃ !! হাঃ !!! ভুল, ভুল—আমরা দস্যু। পেটের দায়ে আজ আমরা দস্যু।

কুম্ভীরক ॥ দেবতা ছিল একটা লোক। কৃতান্তক। কিন্তু পেটের দায়ে তাকেও একদিন হতে হয়েছিল দস্যু। সেই থেকে ক্রমে ক্রমে আজ সে দস্যুরাজ।

দুঃশাসন ॥ গৌড়ে এখন তারই রাজত্ব চলছে। অবশ্য সকলের অগোচরে, গোপনে।

গোপাল ॥ আমি জানি—আমি জানি—

শার্দুলক ॥ কি জান ? কতটুকু জান ? দীন-দুঃখীর সে যে কত বড় বন্ধু—সে কি জান তুমি ?

কুম্ভীরক ॥ প্রবলের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করতে, দুঃখী-দরিদ্রের ভাত-কাপড় জোটাতে সে আজ হয়েছে ডাকাত। আর তাই তার পতাকাতলে জুটে আমরাও হয়েছি ডাকাত। জান তোমরা ?

দুঃশাসন ॥ নইলে আমরাও ছা-পোষা গৃহস্থ ছিলাম একদিন। কিন্তু কি করব ? এই অরাজক রাজ্যে সংসার চলে না। ভাল কাজ করতে গেলে টাকা জোটে না ; আর টাকা পেতে গেলে ভাল কাজ করা চলে না।

কুম্ভীরক ॥ তাই ধীরে ধীরে আমরাও অমানুষ হয়ে যাচ্ছি।

গোপাল ॥ আবার তোমরা মানুষ হবে। রাজ্যের জন-সাধারণের এই যে আজ অধঃপতন, এটা সাময়িক। মানুষ যে আজ অ-সামাজিক ব্যাধিতে ভুগছে—এটা যাবে—এটা যাবে। সব চেয়ে বড় সত্য নিহিত রয়েছে মানুষের রক্তে, সে সত্য মনুষ্যত্ব। মানুষের মহত্ব। সে সত্য আমার চোখের সামনে তুলে ধরেছ তোমরা—এখানে, এখনই, আজ। আমি স্পষ্ট দেখছি দারুণ অন্ধকারের মধ্যেও আজ জ্বলে উঠেছে তোমাদের মশাল—গণ-চেতনার জ্বলন্ত মশাল।

শ্রীমান ॥ কে তুমি—এখনও আমরা জানি না। কিন্তু তবু মনুষ্যত্বের অভি-যানের নেতৃত্ব তুমি নাও, তুমি নাও বন্ধু।

মল্লিকা ॥ এই অমানুষের দেশে প্রতিষ্ঠা কর মানুষের রাজত্ব।

শার্দুলক ॥ হ্যাঁ, আমাদের আবার তোমরা মানুষের মত বাঁচতে দাও।

কুম্ভীরক ॥ দলে টেনে নাও আমাদের দলপতিকেও। অমানুষের সাজে রয়েছে মানুষের রাজা—আমাদের কৃতান্তক।

দুঃশাসন ॥ নিভতে দেব না আমরা এ মশাল। শুরু হোক আবার মানুষের জয়যাত্রা।

গোপাল ॥ সেজন্য চাই গণঅভ্যুত্থান। সেজন্য চাই বিপ্লবের আগুন। জাতির আবর্জনা—সমাজের জঞ্জাল পুড়িয়ে দিয়ে এই বিপ্লবের মধ্যে জন্ম নেবে নতুন যুগের নতুন মানুষ। জেনো ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

তৃতীয় সর্গ

[প্রথম সর্গোক্ত দৃশ্য। সূর্যোদয়। ক্রীতদাস কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটি বাতায়ন খুলিয়া দিল। সূর্যালোক দেখা গেল, শয্যায় নিদ্রিতা মক্ষিরানী। বৃদ্ধ ক্রীতদাস স্নেহের দৃষ্টিতে তাহাকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিল। তৎপর শয্যাপ্রান্তে ভূতলে বসিয়া শয্যাটিতেই হাত বুলাইতে লাগিল, যেন সে মক্ষিরানীকে ছোট শিশুর মত ঘুম পাড়াইতেছে। ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। ক্রীতদাস এবং পরে মক্ষিরানী চমকিয়া উঠিল। ক্রীতদাস বহির্দরজায় ছুটিয়া গেল। মক্ষিরানী তাহার শিথিল বসনভূষণ সুবিন্যস্ত করিতে লাগিল। কক্ষে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল গোপাল। তৎপশ্চাতে ক্রীতদাস। মক্ষিরানী ও গোপালের কথোপকথনকালে ক্রীতদাস গৃহকার্যে রত রহিল]

রানী ॥ তুমি ?

গোপাল ॥ হ্যাঁ, আমি। কাল সারারাত নির্জন নদীতীরে অন্ধকারে তারা-ভরা আকাশের তলে বসে কত কি যে ভাবছিলাম। হঠাৎ একটা কথা আমার মনে হ'ল আর সেই জন্যেই আমি এলাম। আমি কৃতান্তকের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার কিছু বলবার আছে। কোথায় সে ?

রানী ॥ রাত্রে তার ঘরে থাকবার কথা নয়।

গোপাল ॥ কেন ?

রানী ॥ তুমি এখনো শিশু। দস্যু তস্করের আর এক নাম নিশাচর, এও জানো না তুমি ?

গোপাল ॥ কিন্তু এখন তো নিশা নয়। প্রভাত। ঐ গবাক্ষ পথে সূর্যের মুখ দেখা যাচ্ছেনা কি ?

রানী ॥ অপেক্ষা কর, তার মুখও এখনি দেখতে পাবে। কিন্তু আমাদের মুখ আব দেখবে না বলেই না তুমি চলে গিয়েছিলে ?

গোপাল ॥ হ্যাঁ গিয়েছিলাম।

রানী ॥ তবে আবার ফিরে এলে যে ? এই বাঘের গুহায় ? কি সাহসে এলে ? ও, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কি না, তাই জান না যে রাজা তোমার মাথার দাম ঘোষণা করেছেন পঞ্চসহস্র স্বর্ণমুদ্রা। পথে ঘাটে যেখানে সেখানে গরম গরম সব কথা বলার ফল।

গোপাল ॥ তাই নাকি ? কেউ কেউ বলছিল বটে। কিন্তু তোমার মুখেও যখন শুনছি, বিশ্বাস করছি। যাক আজ তবে তোমার কাছে আমার একটা দাম আছে। ধরিয়ে দিয়ে নেবে নাকি টাকাটা !

রানী ॥ ও, নীতিপাঠকের মুখে শোনা সেই গল্পটা বুঝি তুমি ভুলে গেছ গোপাল ?

গোপাল ॥ কোন্ গল্পটা ?

রানী ॥ সেই যে এক বুড়ি—একটা রাজহাঁস কিনে এনে অবাক হয়ে দেখে, হাঁসটা দুটো করে সেনার ডিম দেয় রোজ !

গোপাল ॥ বটে !

রানী ॥ হ্যাঁ। সোনার ডিম বিক্রী করে বুড়ীর অবস্থা গেল ফিরে, বুড়ীর ছেলে-দের তখন লোভ গেল বেড়ে। তারা ভাবল—রোজ দুটো সোনার ডিম, এটা বড় কম।

গোপাল ॥ [হাসিয়া] লোভে পড়ে ছেলেরা বুঝি হাঁসটাকে মেরে ফেলে, পেট চিরে বের করে নিলে শ'খানেক সোনার ডিম !

রানী ॥ না গো। পেট চিরে তারা দেখে, রয়েছে মাত্র দুটি ডিম, মাঝখান থেকে মূলধন রাজহাঁসটাই গেল মরে। তুমি যে আমার সেই রাজহাঁস গোপাল ! ধরিয়ে দিয়ে কাঙাল হতে পারছি না আমি, বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই ত মুঠো মুঠো

সোনা পাব যতদিন বাঁচি ; কাজেই আমার হাতের প্রভাত-পানীয়টুকু পান করে তুমি পালিয়ে যাও গোপাল।

গোপাল ॥ একটা প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্য আমি অধীর হয়ে এখানে ছুটে এসেছি। কৃতান্তক যখন নেই প্রশ্নটা তোমাকেই করছি।

[ইতিমধ্যে ক্রীতদাস দুইটি পাত্রে কিছু ফল, দুগ্ধ ও মধু রাখিল।]

রানী ॥ প্রশ্নটা আমি শুনতে পারি, কিন্তু প্রভাতী-পানীয়ের জন্য পিপাসার্ত আমি।

গোপাল ॥ আমিও। কাল থেকে আমি অভুক্ত।

রানী ॥ কিন্তু এখানকার আতিথ্য—

গোপাল ॥ ভেবে দেখলাম এইটাই গৌড়ে একমাত্র ধর্মশালা।

রানী ॥ তাই নাকি! তবে এসো, বসা যাক্।

[উভয়ে আহারের জন্য বসিল]

গোপাল ॥ এইবার আমার প্রশ্নটা—

রানী ॥ প্রশ্নটা এখনও আমি শুনিনি।

গোপাল ॥ আমি যদি কৃতান্তকের কাছে আজকের রাতটির জন্যে ভাড়া চাই তার সমস্ত অনুচর, পাবো ?

রানী ॥ এ্যাঁ!

গোপাল ॥ হ্যাঁ। আমি দেখেছি সে কোনো প্রার্থীকেই নিরাশ করে না।

রানী ॥ তুমি গোটা রাজ্যটাই লুণ্ঠন করতে চাও নাকি ?

গোপাল ॥ লুণ্ঠনের শেষ করতে চাই। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাই রাজ্যে।

রানী ॥ অবাক করলে তুমি আমাকে। কৃতান্তকের লোক দিয়ে কৃতান্তককেই শেষ করতে চাও তুমি ?

গোপাল ॥ হ্যাঁ।

রানী ॥ তুমি উন্মাদ। কি করে তুমি আশা কর যে কৃতান্তক এতে রাজী হবে ?

গোপাল ॥ না না, এ আমার দুরাশা নয়। তাকে দেখা অবধি আর একটি দস্যুর কথা আমার কেবল মনে হয়েছে। তার নাম ছিল রত্নাকর।

রানী ॥ রত্নাকর! সে আবার কে ? ও, নীতিপাঠকের মুখে শোনা রামায়ণের সেই গল্প ?

গোপাল ॥ হ্যাঁ, হাজার হাজার বছর আগের কথা। পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম হয়ে দস্যু হ'ল সে। নির্মম, নিষ্ঠুর দস্যু। বনপথযাত্রী ব্রহ্মা আর নারদ একদিন হ'ল তার শিকার।

রানী ॥ মনে পড়ছে। তাঁরা বললেন—রত্নাকর, কার জন্য তুমি এই পাপ করছো ?

গোপাল ॥ তোমারই মত তারও ছিল এক স্ত্রী, তাছাড়া ছিল পিতা-মাতা। রত্নাকর বলেছিল, আমার যত পাপ এদেরই ভরণ-পোষণের জন্য।

রানী ॥ ব্রহ্মা আর নারদ বলেছিলেন—তারা কিন্তু তোমার এ পাপের ভাগ নেবে না রত্নাকর।

গোপাল ॥ সংশয় জাগল রত্নাকরের মনে। ব্রহ্মা আর নারদকে গাছে বেধে রেখে ছুটল গৃহে। পিতা-মাতাকে গিয়ে সব বলল। জিজ্ঞাসা করল, আমার এ পাপের ভাগ নেবে কি তোমরা ?

রানী ॥ তাঁরা হেসে বললেন, তা কেন ? আমরা বৃদ্ধ। আমাদের ভরণ-পোষণ তোমার কর্তব্য। কিন্তু তাই বলে তোমার পাপের ভাগ কেন নেব আমরা ?

গোপাল ॥ শেষে গেল স্ত্রীর কাছে।

রানী ॥ [হাসিয়া] স্ত্রীও বলল—না না, তোমার পাপের ভাগ আমি নেব না।

গোপাল ॥ কেউ তার পাপের ভাগ নিল না দেখে রত্নাকরের হ'ল চৈতন্য। ব্রহ্মা আর নারদের দয়ায় অবশেষে পেলো মুক্তিমন্ত্র, রাম নাম। উদ্ধার হ'ল দস্যু। রত্নাকর হ'ল বাল্মীকি। তারপর, হাজার হাজার বছর কেটে গেছে। কিন্তু আজও রয়ে গেছে সেই জিজ্ঞাসা ! দস্যু রত্নাকরের পাপের ভাগ কি নেবে তার স্ত্রী ?

রানী ॥ [আর্তনাদ করিয়া উঠিল] আঃ !

গোপাল ॥ আর্তনাদ করবার কথা তোমার নয় ইন্দিরা, আমার। আমি ভেবে পাইনা, আমি ভেবে পাইনা কি করে তুমি এ জীবন সহ্য করছ, সহ্য করছ—নীরবে, সানন্দে।

রানী ॥ [অসহ্য যন্ত্রণায়] তুমি জানোনা, তুমি জানোনা—সারারাত আমি ঘুমতে পারিনা।

গোপাল ॥ কেন তুমি এখানে থাকলে ? কেন তুমি এখান থেকে পালালে না ?

রানী ॥ তুমি জানো না, তুমি জানো না, ও যে আমাকে কত ভালোবাসে, তুমি জানো না।

গোপাল ॥ তাতেই আশায় ভরে উঠছে আমার মন। কৃতান্তক দস্যু বটে, কিন্তু মানুষও।

রানী ॥ এ্যাঁ ?

গোপাল ॥ হ্যাঁ, তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ তুমি নিজে। মনুষ্যত্ব তার ভিতর না থাকলে তুমি বাঁচতে না, করতে আত্মহত্যা।

রানী ॥ যাক সে কথা। তুমি কিন্তু কিছুই খাচ্ছ না।

গোপাল ॥ [খাইতে খাইতে] একটি রাত্রির জন্যে তার সব অনুচর আমার হাতে তুলে দিতে রাজী হবে নাকি সে ?

রানী ॥ বলে দেখতে পার। . অনেকদিন পর সে হয়তো প্রাণখোলা হাসি হাসবে। ভাল কথা, তার দক্ষিণা ? খুব কম করে লক্ষ মুদ্রা। দিতে পারবে তুমি তাকে ?

গোপাল ॥ দক্ষিণা আমি তাকে দিয়েছি।

রানী ॥ মানে ?

গোপাল ॥ দিই নি ? [আবেগপূর্ণ কণ্ঠে] সে দক্ষিণা—তুমি ?

রানী ॥ [অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিল] কাপুরুষ ! নিজে আমাকে রক্ষা করতে পারোনি, এখন করছ ব্যঙ্গ ?

গোপাল ॥ সত্য কথা, অতি সত্য কথা। দস্যুর হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারিনি আমি। হ্যাঁ, আমি হেরে গেছি। কিন্তু তুমিও কি হেরে গেছ ইন্দিরা ? যে ক্ষমতা তোমার আজ আছে, সে ক্ষমতা কি এ অরাজকতা দমনে কোন কাজে লাগবে না ? দস্যুতার পূজাই কি তুমি করে যাবে সারাজীবন ?

রানী ॥ তুমি থামো। কী চাও তুমি আজ আমার কাছে ?

গোপাল ॥ কি চাই তা যদি এখনো তুমি বুঝে না থাকো ইন্দিরা—

রানী ॥ আমি ইন্দিরা নই, আমি ইন্দিরা নই, কে তোমার ইন্দিরা আমি জানি না।

গোপাল ॥ ও ! ফিরিয়ে দাও আমার নীলকমল।

রানী ॥ [সজল চোখে হাসি ফুটিয়া উঠিল] শুকিয়ে গেছে তোমার নীলকমল।

গোপাল ॥ ফিরিয়ে দাও, সেই শুকনো ফুলই আমাকে ফিরিয়ে দাও তুমি।

রানী ॥ বেশ দিচ্ছি। সেই শুক্‌নো ফুলই আমি তোমায় দিচ্ছি। তোমার ক্ষতিপূরণ করছি, ক্ষতিপূরণ করছি।

[কৃতান্তকের পুষ্পপাত্র হইতে বহুবর্ণের একগুচ্ছ পুষ্প প্রতীক আনিয়া রানী গোপালের হাতে দিল।]

রানী ॥ নাও। পূরণ হোক তোমার ক্ষতি, পূর্ণ হোক তোমার মনস্কামনা।

গোপাল ॥ [আশ্চর্য হইয়া] এ কী ?

রানী ॥ যাও, নিয়ে যাও। অর্ঘ দাও আচার্য দেবের ধর্ম মন্দিরে। কৃতান্তকের সমস্ত শক্তি আজ এসে দাঁড়াবে তোমার পতাকাতলে। অরাজকতা দূর করে, রাজা হও তুমি।

গোপাল ॥ রাজা হবে কৃতান্তক। রাজমুকুট তার মাথায় যে মুহূর্তে তুলে দেব, সেই মুহূর্তে হবে তার নব জন্ম। সে আমাদের রত্নাকর, সে আমাদের রত্নাকর। কিন্তু এ পুষ্পপাত্র আমি নিয়ে যাবনা ইন্দিরা। রেখে যাব তোমারই কাছে। আমার দেওয়া যা কিছু চিরদিন তুমি রাখতে তোমার বুকে। আজ যে পরম ধন আমি পেলাম, এও তুমি লুকিয়ে রাখ আমার হয়ে তোমারই কাছে।

[গোপাল কর্তৃক পুষ্পচয় মক্ষিরানীকে প্রত্যর্পণ]

রানী ॥ কিন্তু এতে তোমার কি লাভ গোপাল ?

গোপাল ॥ জনসাধারণের সমর্থনেই আমাদের বিপ্লব। এ বিপ্লবে কৃতান্তকের এই বিপুল শক্তি আমাদের পক্ষে যদি নিজ থেকে আসে ভাল, কিন্তু যাতে বিপক্ষে না যেতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হল এতে। তাই হলো না কি ইন্দিরা ?

রানী ॥ তুমি চতুর। এত চাতুরী শিখলে কোথায় ?

গোপাল ॥ তোমাকে হারিয়ে।

[গোপালের প্রস্থান]

চতুর্থ সর্গ

[গৌড় রাজধানী হইতে দূরে গ্রামাঞ্চলে একটি পুরাতন জীর্ণ পবিত্যক্ত অট্টালিকার সভাকক্ষ। কক্ষটির চতুর্দিকে বৌদ্ধ-স্থাপত্যের নিদর্শন। রাত্রি। কক্ষটির তিন দেওয়াল সংলগ্ন বসিবার বেদী। এই কক্ষ হইতে পার্শ্ববর্তী কক্ষ সমূহে যাতায়াতের দরজাও রহিয়াছে। এবং বাহিরে যাতায়াতের পথও আছে।

শ্রীমান এক কোণে একটি মাটির মূর্তি নির্মাণে ব্যস্ত। মল্লিকা অন্দর হইতে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।]

মল্লিকা ॥ দেখ শ্রীমান, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার একটা প্রধান সর্তই ছিল যে, রাতের বেলা তোমার শিল্প-টিল্প চলবে না। ছিল কি না ?

শ্রীমান ॥ [শিল্প-কর্ম হইতে চোখ না ফিরাইয়া] ছিল।

মল্লিকা ॥ তা যদি ছিল, তবে তুমি সে সর্ত মানছ না। তবে কি বুঝব, এই ভাঙা বাড়িতে তোমার সঙ্গে আমার যে সেদিন বিয়ে হল সে বিয়েটাও ভেঙে গেছে ?

শ্রীমান ॥ [মল্লিকার মুখের দিকে তাকাইয়া] ও তাই তো ! বেশ রাত হয়ে গেছে দেখছি। রাগ করো না মল্লিকা, আমার খেয়াল ছিল না। মূর্তিটা শেষ করতে পারলাম না। সামান্য একটু বাকি রয়ে গেল। থাক্ কাল সকালে শেষ করব। কি মূর্তি বলত ?

মল্লিকা ॥ [মূর্তিটা হাতে লইয়া] ওরে বাবা, এ যে দেখছি একটা রাক্ষসী ! কি যে সব উদ্ভট কল্পনা তোমার !

শ্রীমান ॥ কল্পনাটা আমার নয়। তন্ত্রের। দশমহাবিদ্যার এক মহাদেবী—নাম ছিন্নমস্তা।

মল্লিকা ॥ ছিন্নমস্তা !

শ্রীমান ॥ হ্যাঁ ছিন্নমস্তা।

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধ বিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা
এতদশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

মল্লিকা ॥ সেই ছিন্নমস্তা তুমি গড়ছ ? নিজের মুণ্ডু নিজে কেটে ফেলে উল্লাস করছে ! এই মূর্তি তুমি গড়ছ ? এই উৎকট সখ কেন ?

শ্রীমান ॥ তোমাকে দেখে। রাজ্যের সেনাপতির সঙ্গে যার বিয়ে হবার ঠিক

ছিল সে কিনা বিয়ে করল দরিদ্র এক ক্ষ্যাপা শিল্পীকে। হাসিমুখে বরণ করল দুঃখ, দৈন্য, প্রতিপদে মৃত্যুর আশংকা। ছিন্নমস্তা নয় তো কি ?

মল্লিকা ॥ না, না, অমন রাক্ষসী আমি নই। তুমি অমন করে আমাকে মেরো না। না না এ মূর্তি তুমি শেষ করতে পারবে না। শেষ করতে আমি দেব না।

[মল্লিকা শ্রীমানের হাত হইতে মূর্তিটি কাড়িয়া লইতে গেল]

শ্রীমান ॥ না না, ছাড় ছাড় ! ভেঙে যাবে যে—

মল্লিকা ॥ না, আমি ওকে ভাঙবই।

[বাহির হইতে গোপালের প্রবেশ]

গোপাল ॥ এ কি ! ব্যাপার কি ?

[লজ্জা পাইয়া মল্লিকা মূর্তিটি ছাড়িয়া দিয়া গোপালের কাছে গেল]

মল্লিকা ॥ [হাসিয়া] কিছু না দাদা, কিছু না।

শ্রীমান ॥ এই একটু—যাকে বলে দাম্পত্য-কলহ। বিয়ে করনি—কাজেই এটা তুমি বুঝবে না।

গোপাল ॥ কেন বুঝব না। শাস্ত্রেই তো রয়েছে—বহু আড়ম্বরের পর লঘু ক্রিয়া হলে সেটা হয় অজাযুদ্ধ, নয় ঋষি শ্রাদ্ধ, নতুবা দাম্পত্য কলহ। কিন্তু শ্রীমান আমি ভাবছি, আড়ম্বর তো আমরাও খুব করেছি, ক্রিয়াটা এখন লঘু না হয়ে দাঁড়ায়।

শ্রীমান ॥ শ্লোকটাতে গণঅভ্যুত্থানের কথা যখন উল্লেখ নেই তখন আর লঘু ক্রিয়ার আশংকা কেন ? আগামীকাল রাজধানী অভিযানের আয়োজন তো সম্পূর্ণ। বিঘ্নের আশংকা দেখে এলে নাকি ?

গোপাল ॥ না না, আশায় আমার মনপ্রাণ ভরপুর। মল্লিকা, আমি পিপাসার্ত।

মল্লিকা ॥ পানীয় দিচ্ছি। সেই সংগে খাদ্যও কিছু ?

গোপাল ॥ না না, খাব সবার সঙ্গে আজ। তোমাদের বিয়ের ভোজ একা খাব না—খাব সব একসঙ্গে। মণ্ডলের কাছে শুনে এলাম ভোজ্যদ্রব্যে তোমাদের ভাণ্ডার সে ভরে দিয়ে গেছে। আয়োজন তার সম্পূর্ণ।

[মল্লিকা পানীয় আনিতে চলিয়া গেল]

শ্রীমান ॥ আয়োজন তো তোমার। মণ্ডল শুধু আজ্ঞাবহ। নিজেদের জীবনই যখন বিপন্ন, তখন আমাদের বিয়ের ভোজের এই উৎসবটা কেন যে তুমি করছ আমি বুঝলাম না দাদা।

গোপাল ॥ জীবন বিপন্ন বলেই তো উৎসবটা আজ করছি। যদি আর না বাঁচি শ্রীমান।

[মল্লিকা পানীয় লইয়া আসিল এবং গোপালকে পানপাত্রটি দিল। গোপাল পান করিয়া মল্লিকাকে ফিরাইয়া দিল]

গোপাল ॥ তোমাদের বিয়ের ভোজে আমি নিমন্ত্রণ করেছি বিপ্লবের মহা-নায়কদের। এই ভাঙা ঘরেই তাদের আপ্যায়ন করব আমরা। না না লজ্জার কিছু

নেই। সব আমাদের নিজের লোক। নীচে আমরা সব বসবো আর বেদীর ওপর দেওয়া হবে ভোজ্যপাত্র।

শ্রীমান ॥ তুমি করেছ কি দাদা! এত লোককে নিমন্ত্রণ করেছ?

গোপাল ॥ যা করার করেছি। এখন কেবল ভয় বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া না হয়।

শ্রীমান ॥ কেন দাদা?

গোপাল ॥ মণ্ডল, শুধু মণ্ডল কেন, আরও বেশ কয়েকজন, আমাদের এক নায়ককে বিশ্বাস করতে চাইছে না; সন্দেহ করছে।

শ্রীমান ॥ কাকে, উদাত্তকে?

গোপাল ॥ না, না, যতক্ষণ না আমি নিজে প্রমাণ পাব, আমি কারও কোনও কথায় অবিশ্বাস করব না কোনও বন্ধুকে। মল্লিকা, তোমার এ সজ্জা তো উৎসবের সজ্জা নয় ভগ্নী। জানি, রাতারাতি পালিয়ে এসেছ আমাদের সঙ্গে এই দূর অঞ্চলে, কিন্তু ধনীজনের পরিত্যক্ত এই অট্টালিকাটি যত জীর্ণই হোক, এর উদ্যানে পুষ্পের সমারোহ তো এখনও রয়েছে ভগ্নী। যাও মল্লিকা—আজ হয়তো আমাদের জীবনের শেষ আনন্দের শেষ রাত্রি।

মল্লিকা ॥ কিন্তু এ কথা বললে আমি যাব না দাদা।

শ্রীমান ॥ মল্লিকা ঠিক বলেছে। যদি বল আজ রাত থেকে শুরু হল আমাদের নতুন জীবনের জয়যাত্রা, তবেই এই উৎসব। আর তা যদি না হয়, একে বলব আমার আর মল্লিকার শ্রাদ্ধ।

গোপাল ॥ [হাসিয়া] নতুন জীবনের জয়যাত্রা! হ্যাঁ, যদি সবাই আমাদের সঙ্কল্প কায়মনবাক্যে প্রতিপালন করে তবেই নতুন জীবনের জয়যাত্রা আজ। মল্লিকা, উৎসবের সাজে সেজে এস ভগ্নী। আমার অতিথিদের শুভাগমন আসন্ন।

[মল্লিকার প্রস্থান]

শ্রীমান ॥ ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনছি।

গোপাল ॥ নিমন্ত্রিতেরা বোধ হয় আসছেন।

[সামন্ত প্রতিনিধির প্রবেশ]

সামন্ত ॥ মহানায়ক—

[শ্রীমানকে দেখিয়া থামিয়া গেল]

গোপাল ॥ যা বলবার আছে তুমি বল উদয়ন। ইনিই আমার পরম বন্ধু—শিল্পীশ্রেষ্ঠ শ্রীমান।

উদয়ন ॥ দুঃসংবাদ মহানায়ক।

গোপাল ॥ দুঃসংবাদ?

উদয়ন ॥ হ্যাঁ মহানায়ক।

গোপাল ॥ বিশ্বাসঘাতকতা?

উদয়ন ॥ তুমি তবে শুনেছ গোপালদেব?

গোপাল ॥ না, না আমি শুনিনি। কিছু শুনিনি আমি। তুমি বল।

উদয়ন ॥ রাজার লোক খবর পেয়ে গেছে আগামীকাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর প্রতি পথে শুরু হবে গণবিপ্লবের অভিযান।

গোপাল ॥ এত লোকের সমাবেশ, এত বড় অভিযান—একটি রাত্রির মাত্র ব্যবধান—এ সংবাদ সম্পূর্ণ গোপন রাখা সম্ভব নয় উদয়ন। এতে আমি এখনও চরম বিপদ দেখছি না।

উদয়ন ॥ কিন্তু রাজার লোক এ সংবাদ পাওয়া মাত্র রাজসৈন্য নিয়ে আজ সন্ধ্যা থেকে আক্রমণ করেছে বিপ্লবের গুপ্ত নায়কদের প্রতিটি গুপ্ত ঘাঁটি।

গোপাল ॥ এ্যা ?

উদয়ন ॥ হ্যাঁ। আমি সংবাদ পেয়েই তোমাকে এ সংবাদ দিতে অশ্বারোহণে ছুটে চলে এসেছি।

[পুনরায় ঘোড়ার শব্দ পাওয়া গেল]

গোপাল ॥ এখন বুঝতে পারছি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কেউ।

উদয়ন ॥ আমি তখনই তোমাকে বলেছিলাম, জননেতা ঐ উদাত্তকে বিশ্বাস করো না, বিশ্বাস করো না গোপাল।

গোপাল ॥ আমি তো তাকে বিশ্বাস করতে চাইনি উদয়ন। কারণ তাকে আমি জানতাম, তাকে আমি জানতাম। কিন্তু সামন্তদের বিশ্বাসভাজন না হলেও অগণিত প্রজার বিশ্বাসভাজন ছিল সে। উদাত্ত পরিচালিত ঐ বৃহৎ প্রজাগোষ্ঠীকে আমি দূরে সরিয়ে রাখা সমীচিন মনে করিনি।

উদয়ন ॥ এখন তার ফল ভোগ কর মহানায়ক।

গোপাল ॥ উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এই মহা অভিযানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কোনও নায়ককেই অবিশ্বাস করা আমার কর্তব্য হবে না উদয়ন।

[বণিক প্রতিনিধি ও প্রজাপ্রতিনিধিদ্বয় ছুটিয়া আসিল। দুজনেই অল্পবিস্তর আহত]

বণিক ॥ সর্বনাশ মহানায়ক।

গোপাল ॥ বল, কি সর্বনাশ!

প্রজা ॥ আমাদের এই রক্তাক্ত আহত দেহ দেখেও কি তা বুঝতে পারছ না গোপাল দেব ?

গোপাল ॥ রাজসৈন্য বিপ্লবনায়কদের গুপ্তঘাঁটি আক্রমণ করেছে। তারপর আর কি সংবাদ বণিকপ্রতিনিধি কুবেরক ?

কুবেরক ॥ শুধু আক্রমণই করেনি, অতর্কিতে আক্রমণ করে অগ্নিদাহে ভস্মীভূত করেছে বহু ঘাঁটি।

প্রজা ॥ শুধু তাই নয়, বর্শা বিদ্ধ করে হত্যা করেছে বহু পল্লীনায়ককে। শুধু নায়ক কেন, নায়ক সন্দেহে নির্বিচারে নির্যাতন করেছে অগণিত জনসাধারণকে।

শ্রীমান ॥ অত্যাচার যত প্রবল হবে বিদ্রোহও হবে তত প্রবল।

গোপাল ॥ তুমি মিথ্যা বলনি শ্রীমান। যাক্ তবু ভাগ্য ভাল, রক্ষা পেয়েছে

অন্ততঃ কিছু অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ত বন্ধু। প্রজাপ্রতিনিধি শীলভদ্র! তোমার আঘাত কি গুরুতর?

শীলভদ্র ॥ রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়েছে মহানায়ক।

গোপাল ॥ জননেতা উদাত্ত, সে কোথায়?

শীলভদ্র ॥ আজ সারাদিন আমরা তাকে দেখিনি। আত্মগোপনের অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার।

উদয়ন ॥ এই দুর্দৈবের মূলে রয়েছে তারই বিশ্বাসঘাতকতা।

গোপাল ॥ [অন্য দুই প্রতিনিধিকে] তোমরা বিশ্বাস কর এ কথা?

শীলভদ্র ॥ বহুলোকের সে সন্দেহভাজন।

কুবেরক ॥ আস্থাভাজনও ছিল বহু লোকের।

গোপাল ॥ তা ছাড়া শপথ করে এই মহাসঙ্কল্প গ্রহণ করেছিল সে আমাদের সংগে। উপযুক্ত প্রমাণ ভিন্ন কোনও বন্ধুকে শত্রু মনে করার অধিকার নেই আমাদের। কিন্তু এখন আমাদের কর্তব্য কি বন্ধুগণ?

উদয়ন ॥ বিপ্লবের মহানায়কের জীবন রক্ষাই এখন আমাদের প্রথম কর্তব্য।

কুবেরক ॥ আমাদের এই মূল ঘাঁটির সন্ধানও হয়তো পেয়েছে রাজসৈন্য।

শীলভদ্র ॥ জীবন তুচ্ছ করে তাই আমরা ছুটে এসেছি তোমার কাছে। অন্য কোনও নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করতে তোমাকে।

শ্রীমান ॥ তাই সংগত। মহানায়কের জীবনরক্ষা হলে বিপ্লবেরও জীবনরক্ষা হবে।

[উদাত্তের প্রবেশ]

উদাত্ত ॥ গোপাল!

সকলে ॥ [সবিস্ময়ে] উদাত্ত!

উদাত্ত ॥ সব শুনেছো গোপাল?

গোপাল ॥ শুনেছি। সৌভাগ্য তুমি রক্ষা পেয়েছ উদাত্ত।

উদাত্ত ॥ কি অদ্ভুতভাবে যে আমার জীবন রক্ষা হয়েছে—সে এক কাহিনী। আমারই এক সহকর্মী, দেখতে অনেকটা আমারই মত; আমারই গাত্রাবরণ, আমারই শিরস্ত্রাণ আমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে নিজের গায়ে চাপিয়ে, আমারই সাদা ঘোড়ায় চড়ে ছুটে গেল—যেখানে চলছে গোলমাল। তাকে আমি মনে করে জনতা করলো আমারই জয়ধ্বনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কান খাড়া হল রাজসৈন্যের। বিপদটা তার বোঝ!

উদয়ন ॥ বুঝেছি। তাকে বিপদে ঠেলে দিয়ে তুমি এখানে এলে নিরাপদে।

উদাত্ত ॥ এলাম কি সাধে? এরই মধ্যে খবর পেলাম স্বয়ং রাজ-সেনাপতি অনুসন্ধান করছে বিপ্লবের মহানায়ক—তোমাকে গোপাল। তুমি এখনই এ স্থান পরিত্যাগ কর মহানায়ক।

গোপাল ॥ আর তোমরা?

উদাত্ত ॥ আমরা তোমার অনুচর। শপথ নিয়েছি তোমাকেই অনুসরণ করবো আমরা। এই মাৎস্যন্যায়কে একদিন না একদিন আমরাই করব ধ্বংস। বড় মাছ ছোট মাছকে এমনি করে গিলে খাবে—জাতীয় জীবনে এটা দুঃসহ। আমি চেয়েছিলাম মৎস্য-আন্দোলন। তুমি চাইলে গণঅভ্যুত্থান। দেখলাম—সেটা আরও ব্যাপক, আরও বিরাট। আনন্দে আমি তাই তোমার পতাকাতলে এসে দাঁড়িয়েছি। এখন এস, আমরা আত্মরক্ষা করে শেষ রক্ষা করি।

গোপাল ॥ আত্মরক্ষা ! আত্মরক্ষা !! আত্মরক্ষাই কি তাহলে সকলের অভিপ্রায় এখন ?

[অন্য সকলে নীরব রহিল]

গোপাল ॥ বেশ তাই হোক্। শ্রীমান আমরা প্রস্তুত। আহার্য দাও—পানীয় দাও আমাদের। তোমার আর মল্লিকার শুভ-বিবাহের উৎসবই হোক আমাদের জীবনের শেষ উৎসব।

[শ্রীমান অন্দরে চলিয়া গেল]

উদাত্ত ॥ তা মন্দ নয়। সারা দিনের এই উত্তেজনা-অন্তে আমরা বড়ই ক্ষুধার্ত। না না আমি কখনও সত্য গোপন করিনা।

গোপাল ॥ জন-নেতা উদাত্তের সঙ্গে আমিও একমত। সত্য গোপন করা কাপুরুষের কাজ।

উদয়ন ॥ আর বিশ্বাসঘাতকতা ?

উদাত্ত ॥ পাপ। এই একটি পাপই আমি স্বীকার করি।

কুবেরক ॥ স্বীকার করাই উচিত।

উদাত্ত ॥ কি স্বীকার করা ?

শীলভদ্র ॥ বিশ্বাসঘাতকতা।

উদাত্ত ॥ কে স্বীকার করছে ?

উদয়ন ॥ তুমি।

উদাত্ত ॥ হ্যাঁ, তা স্বীকার করছি—বিশ্বাসঘাতকতা চরম পাপ। এবং এখন আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য, কে সেই বিশ্বাসঘাতক—তাকে খুঁজে বের করা—যার পাপে আমাদের অভিযান অঙ্কুরেই হ'ল বিনষ্ট।

[ইতিমধ্যে শ্রীমান ও মল্লিকা আহার্য-দ্রব্য লইয়া প্রবেশ করিল এবং ভোজ্য-পাত্রগুলি বেদীর উপর সাজাইতে লাগিল। শ্রীমান আসনগুলি পাতিয়া দিল]

গোপাল ॥ আহার্য উপস্থিত। দুঃখ এই, আরাম করে আহার করার সময় নেই।

উদাত্ত ॥ সৈনিক-জীবনের এইটাই হল বিশেষত্ব।

উদয়ন ॥ এ অভিজ্ঞতা তোমার হ'ল কবে থেকে ? যুদ্ধ কোনও কালে করেছিলে নাকি উদাত্ত ?

উদাত্ত ॥ এ অরাজক-রাজ্যে বেঁচে থাকাটাই তো একটা যুদ্ধ।

গোপাল ॥ বাঃ—বেশ বলেছ তো উদাত্ত।

উদাত্ত ॥ বলব না ? ঐ—ওঁরা হলেন গিয়ে সামন্ত। এনারা হলেন গিয়ে বণিক। আজ না হয় সব সিং ভেঙে বাছুরের দলে এসে ভিড়েছেন, কিন্তু এতকাল কি লড়াই না করতে হয়েছে ওদের খপ্পর থেকে আত্মরক্ষা করতে আমাদের। তোমরা—সৈন্যরা যুদ্ধ কর একদিন, আর আমাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে অহরহ।

কুবেরক ॥ বটেই তো! বটেই তো!! তবে কিনা, জন-নেতা উদাত্ত যুদ্ধ করেছেন যত, সন্ধি করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী।

উদাত্ত ॥ যুদ্ধের কতটুকু জান হে! শুধু আক্রমণটাই যুদ্ধ নয়। শুধু আত্মরক্ষাই যুদ্ধ নয়। পশ্চাদপসরণও যুদ্ধ। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে সন্ধি করাও যুদ্ধ। এমন কি, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করাও যুদ্ধ।

উদয়ন ॥ নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ—সেটা আবার কি ?

উদাত্ত ॥ জানোনা তো। জেনে রাখ—জেনে রাখ। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা হচ্ছে কি না, যাকে বলে, পোড়ামাটি নীতি। শুধু পালাব না, পালাবার সময় নিজের গরুবাছুর মেরে পালাব। ঘরের মজুত ফসল পুড়িয়ে দিয়ে যাব—শত্রু এসে শুধু কাঁচ-কলা খাবে।

শীলভদ্র ॥ কিন্তু আর দেরী করলে আমাদেরই কাঁচ-কলা খেতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের শিয়রে শমন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সকলে ॥ বটেই তো! বটেই তো!!

গোপাল ॥ [শ্রীমানকে] তোমরা দুজনে পরিবেশন করে উঠতে পারছ না দেখছি। আমি তোমাদের সাহায্য করছি। সুরা পরিবেশন করছি আমি।

উদাত্ত ॥ সুরার অভাবটাই বেশী অনুভব করছিলাম। মহানায়ক জয়তু!

গোপাল ॥ ভেবো না উদাত্ত, মন্ত্রীকন্যা মল্লিকার বিবাহে সমারোহ হল না বটে কিন্তু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখিনি আমি। যথারীতি গৌড়ীয় এবং মাধ্বীর মিশ্রণে কি উৎকৃষ্ট সুরা তৈরী করেছি—দেখবে এখন। [তথাকরণ]

উদাত্ত ॥ সে তো আমি সেদিন বলেছি। সাধারণ এক শিল্পীর সঙ্গে বিবাহ হল বটে মল্লিকাদেবীর, কিন্তু রাজভগ্নী বলে গণ্য হবার সম্ভাবনাও তো রয়ে গেল তাঁর। সেনাপতি-পত্নী হওয়ার দুর্ভাগ্যের চেয়ে এ সৌভাগ্যটা অনেক বড়।

উদয়ন ॥ সেনাপতি-পত্নী হওয়াটা বুঝি খুব দুর্ভাগ্য ?

উদাত্ত ॥ নয় ? তলোয়ারের সঙ্গে ঘর করা!—বল্লমের সঙ্গে ওঠা-বসা!—ওরে বাপ!!

কুবেরক ॥ উদাত্ত, তুমি এতও জান ?

শীলভদ্র ॥ শুধু জান না কার বিশ্বাসঘাতকতায় আজ আমাদের এ সর্বনাশ হল।

উদাত্ত ॥ জানি, জানি। তাও জানি। তবে শত্রুবৃদ্ধির ভয়ে সেটা এখন বলব না। যাকে যখন বলা দরকার, যথাসময়েই বলব। দাও গোপাল গলাটা শুকিয়ে গেছে।

[গোপালের হাত হইতে মদ্য-পাত্র লইল। ইতিমধ্যে অন্য সকলে মদ্য-পানরত]

গোপাল ॥ এখন বলছি বিশ্বাসঘাতক কে—আমি জেনেছি।

অনেকেই ॥ কে ?

গোপাল ॥ [সকলে মদ্যপান করিতেছে দেখিয়া লইয়া, নিজে এক ঢোক সুরা পান করিয়া] হ্যাঁ, আমি জানি। এখানে আমাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক কে, আমি জানি। তার সুরায় আমি বিষ মিশিয়ে দিয়েছি।

[শোনামাত্রই সকলেই চমকিত হইল। উদাত্ত তৎক্ষণাৎ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া থু-থু করিয়া মুখের সুরা ফেলিয়া দিল]

উদাত্ত ॥ তাই তো ভাবছিলাম, সুরাটা এত তিক্ত কেন। তুমি আমাকে বিষ দিয়েছ গোপাল—এ ভয়টা আমার ছিল। থু—থু—

গোপাল ॥ বিষটা তো পাত্রে নয়—মনে। এই দেখ।

[গোপাল উদাত্তের মদ্য-পাত্রটি লইয়া এক চুমুক পান করিল]

উদয়ন ॥ [উদাত্তকে] বিশ্বাসঘাতক !

[প্রতিনিধি-ত্রয় ছুটিয়া গিয়া উদাত্তের গলা চাপিয়া ধরিল। হঠাৎ বাহিরে সৈন্যদের পদধ্বনি শোনা গেল। সেই সঙ্গে সামরিক বাদ্য। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কতিপয় সৈনিক উদ্যত বর্শা হস্তে সভাকক্ষে প্রবেশ করিল এবং সভাকক্ষের সমস্ত দ্বার এবং গবাক্ষের সামনে পাহারায় রহিল।

উদাত্তের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে সঙ্গীদের কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেল। শ্রীমান মল্লিকার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার পাশে দাঁড়াইল গোপাল। প্রতিনিধিত্রয় ইহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইল]

গোপাল ॥ [উদাত্তকে] অমানুষের সাজে এক মানুষকে দেখেছিলাম। তার নাম কৃতান্তক। আর আজ মানুষের সাজে অমানুষকে দেখলাম—তার নাম উদাত্ত।

[একজন দেহরক্ষী সহ রুদ্রসেনের প্রবেশ।

১ম দেহরক্ষী ॥ গৌড়-সৈন্যাধ্যক্ষ শত্রুমর্দন রুদ্রসেন।

[অন্যান্য রক্ষীগণ তাহাকে অভিবাদন করিল। একজন দেহরক্ষীসহ পুণ্ডরীক প্রবেশ করিল]

২য় দেহরক্ষী ॥ অরাতিদমন প্রবলপ্রতাপ মহামহিম গৌড়-সেনাপতি নরশার্দুল পুণ্ডরীক।

[রাজকর্মচারীগণ অভিবাদন করিল। পুণ্ডরীক কক্ষের চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন—উদাত্তকে দেখিয়া একটু মৃদু হাসিলেন। মল্লিকাকে লুব্ধদৃষ্টিতে ক্ষণকাল দেখিলেন]

পুণ্ডরীক ॥ এই সেই মেয়েটা না ? কতবার দেখেছি। যতবার দেখি, ততবারই নতুন মনে হয়। [উদাত্তকে] কাকে যেন বিয়ে করেছে ?

উদাত্ত ॥ [শ্রীমানকে দেখাইয়া] ঐ লোকটাকে।

পুণ্ডরীক ॥ একটা তালপাতার সেপাই দেখছি ! কি দেখে যে কে কখন মজে —বলা যায় না। আমি একবার একটা চাঁড়াল-ছুঁড়ি দেখে এমন মজে গেলাম যে, তখন মনে হয়েছিল যে সেনাপতি না হয়ে চণ্ডাল হলাম না কেন ! গোপালটা কে ?

উদাত্ত ॥ [গোপালকে দেখাইয়া] ঐ যে, ঐ লোকটা।

পুণ্ডরীক ॥ তা গরু চরাবার মত চেহারাই বটে! আর এরা বুঝি সব ওর রাখাল! কি হে রাখালের পাল, তোমরা নাকি সব কাল থেকে কি করবে ঠিক করেছিলে? কি যেন সেই গাল-ভরা কথাটা! মনে রাখতে পারিনা ছাই।

উদাত্ত ॥ গণঅভ্যুত্থান।

পুণ্ডরীক ॥ না না—ও আমার মুখে আসবে না। [উদাত্তকে] ওহে কথাটার যখন দরকার হবে তুমিই বলে দেবে। কি যেন কথাটা?

উদাত্ত ॥ গণঅভ্যুত্থান।

পুণ্ডরীক ॥ না না, কানে কটাস্‌-কটাস্‌ করে লাগছে। এখন থেকে বরং বলবে দুম-দাম। [উদাত্তকে] কাল সকাল থেকে এরা সব কি শুরু করতে চেয়েছিল?

উদাত্ত ॥ দুম-দাম

পুণ্ডরীক ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ দুম-দাম। [গোপালকে] কিহে, সেই দুম-দামের ধূম-ধাম চলছিল বুঝি এখানে? বাঃ এ তো বেশ, কেউ কথা বলে না! ওহে রুদ্রসেন এদের নিয়ে এখন কি করি বলত? পালের গোদা যখন ধরা পড়েছে, তখন তো আর ভাববার কিছু নেই তোমার। চাবুক মারবে, না গলা কাটবে—সে সব ভেবে আমার সময়টা আর নষ্ট করো না। এদের নিয়ে যাও বাইরে। আজ রাতটা ঐ গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখ।

[রক্ষীরা আদেশ পালন করিতে ছুটিল]

না-না ও মেয়েটাকে না। ওটা এখানে আমার কাছে থাকবে।

রুদ্রসেন ॥ আপনি কি আজ এখানেই থাকবেন প্রভু?

পুণ্ডরীক ॥ তুমি কেমন বেরসিক হে? এত রাতে আবার যাব কোথায়?

রুদ্রসেন ॥ আমরা?

পুণ্ডরীক ॥ বাইরের ঘরগুলো পড়ে আছে কেন?

রুদ্রসেন ॥ ও। কিন্তু মেয়েটি?

পুণ্ডরীক ॥ না, তোমার মগজে মুগুর না মারলে বুদ্ধি-শুদ্ধি তোমার খুলবে না রুদ্রসেন। আরে, এ মেয়েটার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া ঠিক ছিল।

উদাত্ত ॥ আমি জানি বাগদানও হয়ে গি॰ ছিল।

পুণ্ডরীক ॥ তবে আর কি, বাকি যেটুকু আছে—সেটুকু হবে আজ।

রুদ্রসেন ॥ প্রভু একটা কথা নিবেদন করবার আছে।

পুণ্ডরীক ॥ আমার সময়ের দাম আছে। চট্‌পট্‌ সারো।

রুদ্রসেন ॥ মনে রাখবেন প্রভু এখানে এখনো বুদ্ধ দেবের মূর্তি রয়েছে।

পুণ্ডরীক ॥ সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। ভেঙে পড়েছে।

রুদ্রসেন ॥ ভেঙে পড়ুক, তবু এর পবিত্রতা আছে।

পুণ্ডরীক ॥ তুমি বৌদ্ধ নাকি?

বুদ্ধসেন ॥ না প্রভু। কিন্তু পবিত্রতার মর্যাদা সব ধর্মেই সমান।

পুণ্ডরীক ॥ তুমি আর কিছুক্ষণ আমার কাছে থাকলে, আমার মেজাজ বিগড়ে যাবে। কি যে করে বসব, জানিনা। এখান থেকে নিয়ে যাও এদের। এখনই।

[আদেশ প্রতিপালিত হইতেছিল]

গোপাল ॥ মল্লিকা, তুমি এখানে থাকতে সাহস পাচ্ছ ?

মল্লিকা ॥ পাচ্ছি।

পুণ্ডরীক ॥ হাঃ! হাঃ !! হাঃ !!!

গোপাল ॥ আমি জানি, তোমার সাহসটা কোথায় এবং কেন। বিদায় ভগ্নী। এস শ্রীমান। এস বন্ধুগণ।

উদয়ন ॥ কিন্তু—

গোপাল ॥ এস তোমরা চলে এস। মল্লিকাকে তোমরা জাননা। জানি আমি। জানে শ্রীমান। ও যদি নিজে ধরা না দেয়, পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই যে ওকে ধরে।

উদাত্ত ॥ প্রভু আমাকেও যে নিয়ে যাচ্ছে—

পুণ্ডরীক ॥ না, না ওকে বাঁধবে না। জেনো ও লোকটা আমার বন্ধু।

[রক্ষীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া ইহারা চলিয়া গেল। রহিল শুধু পুণ্ডরীক, দুই দেহরক্ষী ও মল্লিকা]

পুণ্ডরীক ॥ তোমার এত শক্তি ! ওঃ হাতের ঐ আংটিটা। বিষের আংটি ?

মল্লিকা ॥ হ্যাঁ।

পুণ্ডরীক ॥ তবে দেখছি ও লোকটা মিথ্যে বলে যায়নি। আমি ধরতে গেলেই—

মল্লিকা ॥ হ্যাঁ, আমি বিষ খেতে পারি।

পুণ্ডরীক ॥ খুব চালাক মেয়ে তুমি মল্লিকা। এমনই মেয়ে আমি ভালবাসি। খুব সহজ-সরল একটা প্রশ্ন করছি তোমাকে—

মল্লিকা ॥ করুন।

পুণ্ডরীক ॥ আমি কি তোমাকে পেতে পারি না মল্লিকা—এই একটা রাতের জন্যে—এখানে—আজ ?

মল্লিকা ॥ পারেন।

পুণ্ডরীক ॥ কি সর্তে ?

মল্লিকা ॥ আমার স্বামীকে আর আমার ঐ ভাই চারটিকে মুক্তি দিতে হবে। যেই তারা ঘোড়ায় চড়ে নিরাপদে দূরে চলে যাবে আমার চোখের আড়ালে তখন আর লজ্জা থাকবে না আমার। তখন আমি আপনার।

পুণ্ডরীক ॥ সত্য ? সত্য বলছ মল্লিকা ?

মল্লিকা ॥ সত্য বলছি সেনাপতি। আমার লজ্জাটা দূর করুন আপনি।

[পুণ্ডরীক একজন দেহরক্ষীকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া জনান্তিকে তাহাকে কি বলিলেন]

পুণ্ডরীক ॥ শুনলে ? বুঝলে ?

১ম দেহরক্ষী ॥ হ্যাঁ প্রভু।

পুণ্ডরীক ॥ যাও।

[প্রথম দেহরক্ষী চলিয়া গেল]

পুণ্ডরীক ॥ সেই আদেশই দিলাম মল্লিকা। মল্লিকা, এখানে তোমার শয়নকক্ষ কোথায় ?

মল্লিকা ॥ ওধারে—

পুণ্ডরীক ॥ কিসের ওপর শোও এখানে ? সবই তো দেখছি পাষাণ।

মল্লিকা ॥ কিন্তু ঘাসের অভাব নেই সেনাপতি। ঘাস দিয়ে তৈরী খুব নরম বিছানা আছে আমার।

পুণ্ডরীক ॥ কোথায় ?

মল্লিকা ॥ কেন আমার শয়নকক্ষে।

পুণ্ডরীক ॥ বাঃ—সে তো বেশ। শুয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে কতটা নরম—আর কতটা আরাম। মল্লিকা, ঐ ঘোড়া ছুটছে—শব্দ শুনছো ? এস এস, এই গবাক্ষে এসে দেখ—তোমার পাঁচটি বন্ধু মুক্তি পেয়ে কেমন অনন্দে ছুটে যাচ্ছে দেখছ !

মল্লিকা ॥ দেখলাম।

পুণ্ডরীক ॥ তুমি খুশী হয়েছ ?

মল্লিকা ॥ হয়েছি।

পুণ্ডরীক ॥ আমিও খুশী হলাম—। খুব—খুব—

[প্রথম দেহরক্ষী মদ্যাধার সহ ফিরিয়া আসিয়া সেটি বেদীর উপর রাখিল। পুণ্ডরীক সেখানে গিয়া বসিল]

পুণ্ডরীক ॥ [২য় দেহরক্ষীকে] ওদিকে গিয়ে দেখ, কোনও একটা ঘরে ঘাসের একটা বিছানা আছে। নিয়ে আয়।

মল্লিকা ॥ সব ঘরেই ঘসের বিছানা—

পুণ্ডরীক ॥ না না, আমি চাই তোমার বিছানাটা। তুমি গিয়ে ওকে দেখিয়ে দাও। আমি আমার গলাটা ভিজিয়ে নিই।

[মল্লিকা অন্দরের দিকে গেল। পশ্চাতে গেল ২য় দেহরক্ষী]

পুণ্ডরীক ॥ [১ম দেহরক্ষীকে] বন্দী পাঁচটা গাছেই বাঁধা আছে তো ?

১ম দেহরক্ষী ॥ হ্যাঁ প্রভু। যেমন বলেছিলেন—ঠিক তাই—ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেছে আমাদেরই পাঁচ সৈনিক।

পুণ্ডরীক ॥ ঠিক আছে।

[ইতিমধ্যে ২য় দেহরক্ষী একটি গুটানো ঘাসের বিছানা আনিয়া ফেলিল]

পুণ্ডরীক ॥ বিছানাটা পেতে দে এখানে।

[দেহরক্ষীর তথাকরণ]

দুটো বালিশই আছে দেখছি। [হঠাৎ] মেয়েটা কোথায়? তাকে কোথায় রেখে এলি?

২য় দেহরক্ষী ॥ সাজছে—

পুণ্ডরীক ॥ ফুলটুল পরছে বুঝি।

২য় দেহরক্ষী ॥ হ্যাঁ প্রভু। আর মুখে কি রং মাখছে—রঙের সব পাত্র দেখলাম সাজান রয়েছে ওখানে।

পুণ্ডরীক ॥ ও, হ্যাঁ। ওর স্বামীটা একটা পটুয়া। তা বেশ—তা বেশ। ভাল করে সেজে আসুক—

[পুণ্ডরীক মদ্যপান করিতে লাগিলেন। অপরূপ সাজে সজ্জিতা মল্লিকা কম্পিত চরণে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল]

২য় দেহরক্ষী ॥ তিনি এসে গেছেন প্রভু।

পুণ্ডরীক ॥ [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] ইনি যখন এসে গেছেন তোদের তবে যেতে হচ্ছে। যা—তোরা যা।

[দেহরক্ষীদ্বয় চলিয়া যাইতেছিল]

কিন্তু শোন্, দুয়ারেই দাঁড়িয়ে থাকিস। পাহারা দিস। কেউ যেন আর এখানে না আসে।

মল্লিকা ॥ [জড়িত কণ্ঠে] আমি এসেছি—

পুণ্ডরীক ॥ [দুই হাত প্রসারিত করিয়া] এস মল্লিকা। এস।

[মল্লিকা টলিতে টলিতে পুণ্ডরীকের দিকে অগ্রসর হইল। এবং হঠাৎ পুণ্ডরীকের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল]

পুণ্ডরীক ॥ কি আশ্চর্য সুন্দর তুমি।

[মল্লিকার ওষ্ঠে দৃঢ়-চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল]

আঃ—কিন্তু—কিন্তু—তোমার ঠোঁট দুটি এত কটু কেন? একি!

মল্লিকা ॥ হ্যাঁ। এ আমার বিষের ঠোঁট।

পুণ্ডরীক ॥ বিষ? হ্যাঁ বিষই তো! এ তুই কি করলি রাক্ষসী? হ্যাঁ তাই তো—বিষের জ্বালা আমার সকল দেহে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

মল্লিকা ॥ আমারও! আমরাও!

[উভয়েরই চরম বিষযন্ত্রনা]

পুণ্ডরীক ॥ [প্রাণপণ চীৎকার] কে কোথায় আছ? শীগ্‌গীর এস। আমাকে বিষ দিয়েছে। আমাকে মেরে ফেল্‌ল—

[পুণ্ডরীক ও মল্লিকা উভয়েই ভূপতিত হইয়াছে। দেহরক্ষীদ্বয় ছুটিয়া আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল]

রক্ষীদ্বয় ॥ কে কোথায় আছ শীঘ্র এস। সেনাপতি মারা যাচ্ছে। সেনাপতি মারা যাচ্ছে !

পুণ্ডরীক ॥ নিজে মরলি, আমাকে মারলি ! রাক্ষসী, তোর মনে এই ছিল !

মল্লিকা ॥ হ্যাঁ, এই ছিল—এই ছিল।

[দেহরক্ষীদ্বয়সহ ছুটিয়া আসিল রুদ্রসেন। এবং তৎপশ্চাতে গোপাল, শ্রীমান এবং প্রতিনিধিত্রয়। ইহারা আসিয়া উভয়কেই মৃত দেখিল]

শ্রীমান ॥ আমি জানতাম—আমি জানতাম, ও আমার সেই ছিন্নমস্তা।

রুদ্রসেন ॥ ঐ পাপিষ্ঠের আজ এভাবে মৃত্যু না হলে আমার হাতেই হত ওর মৃত্যু। গোপালদেব ! এই অমানুষদের রাজ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা আমিও করছি। আমার সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে যোগ দিলাম তোমারই পতাকা তলে। এইবার নিশ্চিন্ত মনে আয়োজন কর জন-জাগরণের—গণ অভ্যুত্থানের।

শ্রীমান ॥ ছিন্নমস্তা ! ছিন্নমস্তা !! আমার মূর্তিগড়া আজ শেষ হল।

পঞ্চম সর্গ

প্রথম সর্গোক্ত দৃশ্য

[দেখা গেল, তখন গভীর রজনী। প্রদীপ জ্বলিতেছে। শয্যাতে নিদ্রিত কৃতান্তক। বাতায়নে মক্ষিরাণী : উন্মনা। হঠাৎ বাহিরে ঘন্টাধ্বনি। কৃতান্তক জাগিল এবং মক্ষিরাণী চমকিত হইল। নিদ্রোত্থিত ক্রীতদাস পাশের কক্ষ হইতে ছুটিয়া আসিল।]

কৃতান্তক ॥ কি বিপদ, এতো রাতে আবার কে ? বোধ হচ্ছে কোন জরুরী ব্যাপার।

[আদেশ অপেক্ষারত ক্রীতদাসকে দরজা খুলিতে ইঙ্গিত। ক্রীতদাস ছুটিয়া বাহিরে গেল। কৃতান্তক এবং রাণী আগন্তুকের অপেক্ষায় রহিল। কক্ষে প্রবেশ করিল চৌরোদ্ধরণিক। তাহার দুই হাতে দুইটি পুষ্প স্তবক]

কৃতান্তক ॥ আরে আরে, একী সৌভাগ্য। কিন্তু এতো রাতে ?

রানী ॥ কি সুন্দর ফুলের তোড়া। ব্যাপার কী ?

[ভক্তিবিনত ভাবে ফুলের তোড়া দুইটি দুইজনের পায়ের কাছে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গপ্রণাম করিয়া উঠিল।]

কৃতান্তক ॥ আরে আরে, এ কী ?

রানী ॥ ব্যাপার কি ?

চৌরো ॥ অধীনকে মনে রাখবেন প্রভু।

কৃতান্তক ॥ ও। [মক্ষিরানীকে] বুঝছো না ? চোরেরা ধর্মঘট তুলে নিয়েছে। তস্কররা কাজে নেমেই অর্ঘ দিয়েছে চৌরোদ্ধরণিককে। আপোষ করে দিয়েছিলাম আমি, খুসী হয়ে তাই উনি আমাদের জন্যে এনেছেন এই উপঢৌকন।

রানী ॥ এতো রাতে!

কৃতান্তক ॥ এদের সব কারবার রাতারাতিই হয়।

চৌরো ॥ অধীনকে আর ছলনা করবেন না প্রভু। দয়া করে ঐ শ্রীরাজ পাদপদ্মে অধীনকে একটু স্থান দেবেন। কুসুমেও তো কীট থাকে। আমি আপনাদের সেই দাসানুদাস, কীটানুকীট।

কৃতান্তক ॥ আরে ব্যাপার কি?

রানী ॥ বুঝছো না? গৌড়ী ও মাধ্বী সুরার একত্র সমাবেশ।

কৃতান্তক ॥ [চৌরোদ্ধারণিককে] কী?

চৌরো ॥ না, একেবারেই না। আগে যদিও বা হয়তো এ সাহস হতো, আজ এই রাজমন্দিরে অতবড় দুঃসাহস—[মক্ষিরানীকে] আপনি অবিচার করছেন মা আমার ওপর। [কৃতান্তককে] আমাকে দয়া কর বাবা।

[পুনরায় ঘণ্টাধ্বনি]

কৃতান্তক ॥ আবার কে?

চৌরো ॥ আসবে, আসবে, অনেকেই আসবে। কিন্তু মা, কিন্তু বাবা, এটা মনে রেখো আমি এসেছি সবার আগে।

[আদেশ অপেক্ষারত ক্রীতদাস কৃতান্তকের ইঙ্গিতে বাহিরে ছুটিয়া গিয়াছিল। এবার তাহার সহিত আসিয়া দাঁড়াইলেন মহামাত্য]

কৃতান্তক ॥ আরে আরে, একি সৌভাগ্য! মহামাত্য!

[মহামত্য আসিয়া হস্তস্থিত একটি মণিমাণিক্যের পেটিকা উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল কৃতান্তক এবং মক্ষিরাণীর পদতলে]

মহামাত্য ॥ মহারাজ! মহারানী! দাসানুদাসের অভিনন্দন আর আনুগত্য কায়মনোবাক্যে সমর্পণ করছি যুগল চরণে।

কৃতান্তক ॥ রানী! আমরা কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি?

রানী ॥ কী জানি।

মহামাত্য ॥ প্রভু, দাসানুদাসের সঙ্গে ছলনা শোভা পায় না প্রভু।

চৌরো ॥ ইনি দাসানুদাস, আমি কীটানুকীট। ছলনা কোরো না প্রভু।

কৃতান্তক ॥ [গম্ভীরভাবে] এ সব ভণ্ডামী আর কিন্তু আমার সহ্য হচ্ছে না। মধ্যরাত্রে আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত করে তোমাদের এই নির্লজ্জ উন্মত্ততা আর সহ্য করব না আমি। এই অসময়ে তোমাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি উলঙ্গ ভাষায় আমাকে খুলে বলো এই মুহূর্তে। নইলে আমি—

মহামাত্য ॥ গৌড়নগরে রাতারাতি এক গণ-অভ্যুত্থান স্বচক্ষে দেখে এলাম।

চৌরো ॥ প্রথমে দেখেছি আমি। সে গণ-অভ্যুত্থান পরিচালনা করছে তোমারই যত অনুচর।

মহামাত্য ॥ দেখে এতো আনন্দ হ'ল যে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম

না। সমস্ত গৌড় এই গভীর নিশীথেই জেগে উঠেছে। তোমার অনুচরদের অনুসরণ করে জনতার জয়যাত্রা হয়েছে শুরু।

চৌরো ॥ রাজপ্রাসাদ অভিমুখে তাদের অভিযান লক্ষ্য করে মনে হ'ল, এতকা— পর গৌড়বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে আমাদের স্বপ্নের সেই রাজ্য।

মহামাত্য ॥ এ দেশে উপযুক্ত রাজার অভাব ছিল বলেই রাম, শ্যাম, যদু, মধু, সবাই রাজা হতে চেয়েছে। চেয়েছিলাম, হ্যাঁ, আমিও চেয়েছিলাম। কিন্তু শেষে তুমিই রাজা হলে কৃতান্তক, এ সৌভাগ্যে অধীর হয়ে ছুটে এলাম তোমার সকাশে— তোমার পতাকা বহন করে তোমারই পাশে দাঁড়াতে।

কৃতান্তক ॥ দাঁড়াও॥ মনে রেখো এটা বাঘের গুহা। মনে রেখো সুপ্ত ব্যাঘ্রকে জাগিয়ে তুলেছ তোমরা। যদি এতটুকু অসত্যভাষণ কেউ করো নিস্তার নেই তোমাদের। এইবার ধীর মস্তিষ্কে আমার কথার উত্তর দাও। বলছো, গণঅভ্যুত্থান হয়েছে।

[মহামাত্য এবং চৌরোদ্ধরণিক ভীতভাবে উত্তর দিতে লাগিল]

মহামাত্য ॥ হ্যাঁ।

কৃতান্তক ॥ কোথায় ?

চৌরো ॥ গৌড় নগরে।

কৃতান্তক ॥ কখন ?

মহামাত্য ॥ আজই রাত্রে।

কৃতান্তক ॥ তার নায়ক কে ?

চৌরো ॥ তোমারই সব অনুচর।

কৃতান্তক ॥ নাম বলো।

চৌরো ॥ শার্দূলক।

মহামাত্য ॥ কুম্ভীরক।

চৌরো ॥ দুঃশাসন।

কৃতান্তক ॥ হুঁ। দেখছি সবাই। তাদের উদ্দেশ্য ?

মহামাত্য ॥ [বিনীতভাবে] উদ্দেশ্য কি তোমার অজ্ঞাতপ্রভু ?

কৃতান্তক ॥ [দৃঢ় কণ্ঠে] আমার জ্ঞাত কি অজ্ঞাত সে কথা থাক। উদ্দেশ্যটা তোমরা জ্ঞাত কিনা ?

মহামাত্য ॥ এ অভ্যুত্থানের নায়ক যখন তোমারই সব অনুচর, উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট।

চৌরো ॥ পরম কারুণিক ঈশ্বরের ইচ্ছায় রাজা হবেন কৃতান্তক।

মহামাত্য ॥ আমাদের এতকালের স্বপ্ন হবে সার্থক।

কৃতান্তক ॥ হুম্। রাজপ্রাসাদ তারা অবরোধ করতে গেছে ?

চৌরো ॥ হ্যাঁ।

মহামাত্য ॥ আমি তা স্বচক্ষে দেখি এসেছি।

চৌরো ॥ আমি দেখেছি সবার আগে। কর্তব্যানুরোধে নৈশ ভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলাম আমি।

কৃতান্তক ॥ আমার অনুচর সে আর কত! তোমরা বলছ, জনতাও যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে ?

মহামাত্য ॥ হ্যাঁ প্রভু।

চৌরো ॥ দস্তুর মত গণ-অভ্যুত্থান।

কৃতান্তক ॥ তাদের উদ্দেশ্য ?

চৌরো ॥ অনুচরের উদ্দেশ্য কখনো প্রভুর স্বার্থ-বিরোধী হয় কি প্রভু ?

কৃতান্তক ॥ [এতক্ষণ পরে সহজভাবে] ও, তবে আমি গৌড়ের রাজা হচ্ছি ?

মহামাত্য ॥ আর তার জয়ধ্বনির প্রথম গৌরব আমাদেরই হোক প্রভু। জয়—জয়—

চৌরো ॥ মহারাজ কৃতান্তকের জয়।

কৃতান্তক ॥ [মক্ষিরানীর দিকে তাকাইয়া] তুমি কি বলো রানী ?

মহামাত্য ॥ উনি আবার কি বলবেন ? যা বলবার আমরাই বলছি। জয়—জয়—

চৌরো ॥ মহারানী মক্ষিরানীর জয়।

কৃতান্তক ॥ মহারানী খুসী হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না। তা যদি হতেন তবে এতক্ষণ কয়েকপাত্র সুধা বিতরণ করতেন না কি উনি ?

রানী [হাসিয়া] আমি আসছি।

[কক্ষান্তরে প্রস্থান]

কৃতান্তক ॥ যাক্ তাহলে রাজা হ'ল রানী হ'ল—

মহামাত্য ॥ দাসানুদাস মহামাত্যও রয়েছেন।

চৌরো ॥ কীটানুকীট চৌরোদ্ধরণিকও উপস্থিত।

কৃতান্তক ॥ বাঃ! ষোলকলা তবে পূর্ণ।

মহামাত্য ॥ এবার যা হবে সে একেবারে রামরাজ্য।

কৃতান্তক ॥ কিন্তু রাম কি চুরি ডাকাতি করতেন ?

চৌরো ॥ নিজের হাতে চুরি ডাকাতি করতেন বলে রামায়ণে অবশ্য উল্লেখ নেই

মহামাত্য ॥ থাকবে না, থাকবে না। রাজ-রাজড়ার অনেক ব্যাপারই ইতিহাস চেপে যায়।

চৌরো ॥ কিন্তু নিজহাতে চুরি না করলেও হনুমানকে দিয়ে রাবণের মৃত্যুবাণ চুরি করিয়েছিলেন।

কৃতান্তক ॥ এ্যাঁ তাইতো ?

চৌরো ॥ তা নয়তো কি ? রাবণ চুরি করেছিলেন সীতা, আর রাম চুরি করলেন রাবণের মৃত্যুবাণ। মোট কথা যে যত বড় রাজা, সে তত বড় চোর।

কৃতান্তক ॥ এটা তো বেশ বলেছ হে।

চোরো ॥ আজ্ঞে চৌর্যবৃত্তি সম্পর্কে বিরাট গবেষণা না থাকলে চৌরোদ্ধরণিক পদে আপনি আমাকে কেন রাখবেন প্রভু ?

মহামাত্য ॥ রাজ্যশাসন করতে গেলে গবেষণা চাই-ই চাই। এ সব রাজাদের সে বালাই ছিলনা বলেই এরা একের পর এক আসছেন আর যাচ্ছেন। এই যে রাজা গোবর্ধন, যার জীবন-সূর্য আজ অস্ত যেতে বসেছে—

চোরো ॥ বসেছ কি ? গেছে বলুন মহামাত্য—

মহমাত্য ॥ এই রাজা গোবর্ধনকে কতবার কতভাবে বলেছি—মহারাজ, রাজ্যশাসন ছেলেখেলা নয়। একটা নীতি নির্ধারণ করুন। মন্ত্রীর মন্ত্রণা শুনুন। কিন্তু শুনছে কে ?

কৃতান্তক ॥ [হাসিয়া] না না আমি শুনবো

(একটি পাত্রাধারে কয়েকপাত্র সুধা লইয়া মক্ষিবাণীর প্রবেশ ও বিতরণ)

কৃতান্তক ॥ [সুধা পান করিতে করিতে] শোন রানী—কি নীতিতে আমার রাজ্যশাসন হবে শোন—

(সকলেই "জয়স্তু" বলিয়া পানপাত্রে চুমুক দিলেন]

কৃতান্তক ॥ হ্যাঁ, তারপর মহামাত্য কি নীতিতে আপনি রাজ্য শাসন করতে বলেন ?

মহামাত্য ॥ সনাতন নীতি। যে নীতি পৃথিবীর ইতিহাসে সব দেশে, সব কালে প্রতিপালিত হয়েছে।

কৃতান্তক ॥ কিন্তু সে নীতিটি কি ?

মহামাত্য ॥ মাৎস্যন্যায়। নদীতে বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে খায়। বিধির বিধান সুস্পষ্ট।

চোরো ॥ শুধু নদী কেন ? অরণ্যে যাও সেখানেও সেই নীতি। সিংহ খাচ্ছে বাঘকে, বাঘ খাচ্ছে মেষকে, মেষ খাচ্ছে ঘাসকে, ঘাস খাচ্ছে ইয়েকে—

কৃতান্তক ॥ কিন্তু এ নতুন কি হ'ল ? এই নীতিই তো এখানে চলছিল।

মহামাত্য ॥ ঠিক চলছিল না।

চোরো ॥ অচল হয়ে গিয়েছিল।

মহামাত্য ॥ খানিকটা মাৎস্যন্যায় আর খানিকটা অ-মাৎস্যন্যায়। এ চলে না।

চোরো ॥ হ্যাঁ মহামাত্য, যেমন তেল-জলে মিশ খায় না।

রানী ॥ আলো-আঁধার যেমন এক সঙ্গে থাকে না। যেখানে আলো সেখানে আলোই। যেটা অন্ধকার সেখানে আলো এলে আর অন্ধকার থাকে না।

কৃতান্তক ॥ চমৎকার ! চমৎকার ! কিন্তু এই নীতিটি জোর গলায় প্রচার করা চলে কি ? ছোট মাছগুলো ছোট পশুগুলো বড্ডো বেশী চেঁচাবে না কি ?

রানী ॥ হ্যাঁ। ওদের সংখ্যাটাই অনেক—অনেক বেশী।

মহামাত্য ॥ মহারানীর কী চিত্তচমৎকারিণী অথচ ক্ষুরধার বুদ্ধি। নমস্কার মহারানী।

(নমস্কার]

চৌরো ॥ একবার ? শতবার।

(ঘন ঘন নমস্কার)

মহামাত্য ॥ মুখে বলা হবে না মাৎস্যন্যায়। ওটা থাকবে মনে।

কৃতান্তক ॥ কিন্তু মুখেও তো একটা কিছু বলতে হবে।

মহামাত্য ॥ অবশ্যই মনীষীরাই বলে গেছেন—

কৃতান্তক ॥ কী ?

মহামাত্য ॥ মধুটা বড় তীব্র ছিল। গুছিয়ে বলতে পারবো কিনা জানিনা।

চৌরো ॥ আমি বলছি। আমরা বলবো, একটা হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান ?

মহামাত্য ॥ বটেই তো বটেই তো। ঈশ্বর মানো ? দশবল ঈশ্বর ? বল না হে—

চৌরো ॥ হ্যাঁ, তা যদি তোমরা মানো, তবে তিনি পাঁচটা আঙুল সমান করলেন না কেন ? পারেন নি বলা তো চলবে না। করেন নি।

মহামাত্য ॥ তা হলেই ঈশ্বর বলছেন, বড় থাকবে বড়—

চৌরো ॥ আর ছোট থাকবে ছোট।

কৃতান্তক ॥ হ্যাঁ, থাকবে। কিন্তু তাই বলে ছোটকে ধরে খাবে বড়, ঈশ্বর এ কথাটা কোথায় বলেছেন ?

মহামাত্য ॥ সর্বত্র বলেছেন, প্রতিমুহূর্তে বলছেন। দুনিয়ায় যে যা খাচ্ছে তাকিয়ে দেখুন—সখ করে কেউ কারো মুখে যাচ্ছে না। যে খাচ্ছে সে জোর করে খাচ্ছে। হয় গায়ের জোরে, নয় টাকার জোরে।

রানী ॥ হ্যাঁ, প্রবল দুর্বলকে খাচ্ছে। আমার কি ভয় হয় জানেন ? যে ভাবে এই খাওয়া-খায়ি চলছে পৃথিবীতে দুর্বল আর থাকবে না।

(কক্ষান্তরে প্রস্থান)

মহামাত্য ॥ [উন্মত্ত উল্লাসে] আবার, আবার নমস্কার করি ওই চিত্তচমৎকারিনী ক্ষুরধার বুদ্ধিকে।

চৌরো ॥ একবার ? শতবার।

[ঘন ঘন নমস্কার]

মহামাত্য ॥ মহারানী বলেছেন, পৃথিবীতে দুর্বল আর থাকবে না। সেই পৃথিবীই আমরা চাই।

চৌরো ॥ তা নয় তো কি। শাস্ত্রেই বলেছে বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা। প্রবলের সেবা যদি করো, থাকো। না করো, মরো।

মহামাত্য ॥ শুধু এই নীতি অনুসরণ করে মানুষ উঠবে তার উন্নতির চরম শিখরে। এই নীতি অনুসরণ করেই গৌড়বঙ্গ সমস্ত ভারতকে করবে পদানত। জয় করবে সসাগরা পৃথিবী।

কৃতান্তক ॥ চমৎকার! চমৎকার! বিশেষ করে ঐ কথাটা—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

চৌরো ॥ ওটা আমি বলেছি প্রভু। এই গোবর্ধন রাজাকেও বলেছিলাম। বলেছিলাম—মহারাজ, আমার শ্যালক চোরা-কারবার করে দশজন বোকাকে ঠকিয়ে খাচ্ছে। খাওয়াই উচিত। কেউ বোকা হয়ে থাকা এটা তো আর কাম্য নয়। ঠকে শিখুক, ঠেকে শিখুক। এতে কিছু অন্যায় হয়নি মহারাজ, এতে পরিণামে জাতির সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির সতর্কতাশক্তির উন্নতিই হবে। কাজেই আপনি চটছেন কেন মহারাজ?

মহামাত্য ॥ বটেই তো। আমার ভাগ্নে গোপনে মদের চোরাই-কারবার করে। এতে কতটা উদ্ভাবনী শক্তির দরকার বুঝুন। প্রভু আপনার তস্কর বিভাগের একজন সুচতুর সদস্যও সে। পাকে চক্রে একবার ধরা পড়াতে রাজা এমন একটা প্রতিভাকে শূল দণ্ড দেন আর কি।

কৃতান্তক ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমিই রাজাকে অনুরোধ করে তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম। তা এ সবই তবে মানব জাতির উচ্চতম উৎকর্ষের সোপান স্বরূপ, কি বলো?

মহামাত্য ॥ এই তো মহারাজ বুঝেছেন।

চৌরো ॥ রাজকার্য্যের চাপে এই নীতিটা মহারাজ না ভোলেন এই প্রার্থনা।

(বাহিরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ক্রীতদাস ছুটিয়া আসিল এবং প্রভুর অনুমতি লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল)

মহামাত্য ॥ লোকের কাণ্ডজ্ঞানের এত অভাব।

চৌরো ॥ তা নয়তো কি! এই অসময়ে—

(জননেতা উদাত্তের প্রবেশ)

কৃতান্তক ॥ আরে আরে, এ কী সৌভাগ্য! জননেতা উদাত্ত!

উদাত্ত ॥ [মহামাত্য ও চৌরদ্ধরণিককে দেখিয়া] তোমরা এখানে?

মহামাত্য ॥ মন্ত্রীসভার গোপন অধিবেশন চলছে।

চৌরো ॥ এখানে বিরোধী দল-নায়কের উপস্থিতিটাই আশ্চর্য!

উদাত্ত ॥ বুঝেছি, কালনেমির লঙ্কা ভাগ হচ্ছে। তা করো বাবা, যত খুশী করো। শুধু কৃতান্তক, তোমার কাছে [হঠাৎ কেমন অভিভূত হইয়া] আমাকে রক্ষা করো কৃতান্তক।

কৃতান্তক ॥ সে কি?

চৌরো ॥ আরে হ'ল কি?

উদাত্ত ॥ দেখলাম তোমার অনুচররা রাজপ্রাসাদ অক্রমণ করতে যাচ্ছে। মনে মনে লাফিয়ে উঠলাম—উঠবনা! সারাজীবন এই তো চেয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ভিড়লাম তোমার অনুচরদের দলে। পরম বিক্রমে রাজপ্রাসাদ করলাম অবরোধ জনতার জয় যখন আসন্ন ঠিক সেই মুহূর্তে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিলে রাজা। প্রাসাদ চূড়া থেকে অবিশ্রান্তভাবে বর্ষিত হতে থাকলো অভিযাত্রী জনতার মধ্যে মুষ্ঠি মুষ্ঠি মুদ্রা আর রত্নমাণিক্য!

মহামাত্য ॥ এঁ্যা ?

উদাত্ত ॥ দুঃখ এই, ক্ষোভ এই, আকস্মিক মুদ্রা বৃষ্টিতে অভিযাত্রীদল ভুললো তাদের উদ্দেশ্য, ভুললো তাদের লক্ষ্য। এই অপ্রত্যাশিত মুদ্রালুণ্ঠনে যেই তারা হ'ল মত্ত, রাজপ্রাসাদ থেকে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের ওপর অশ্বারোহী রাজ-সৈন্যদল।

চৌরো ॥ এঁ্যা

উদাত্ত ॥ হঁ্যা।

কৃতান্তক ॥ জনতা তবে ছত্রভঙ্গ ?

উদাত্ত ॥ বলাই বাহুল্য। শুধু কি তাই? নিহত জনতার রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাজপথ। আহত জনতার আর্তনাদে ছেয়ে গেছে আকাশ বাতাস।

কৃতান্তক ॥ তুমি কিন্তু ঠিকই রক্ষা পেয়েছ জননেতা উদাত্ত।

উদাত্ত ॥ রক্ষা পেয়েছি কি? বোধ হয় পাইনি। আমাকেও অনুসরণ করেছে একদল রাজসৈন্য। তোমার এই গুপ্ত গুহায় আশ্রয় পেলে তবে যদি রক্ষা পাই!

মহামাত্য ॥ আর রক্ষা! দেখছি কারোই রক্ষা নেই, কারণ—

চৌরো ॥ তুমি এখানে এসেছ তারা তা দেখেছে। আর তার মানে আমাদের সবারই—হয়ে গেল।

মহামাত্য ॥ না—না। সবার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক! আমরা জানি যে এ বিদ্রোহের মূলে কৃতান্তক! তাই তুমি আর আমি—

চৌরো ॥ হঁ্যা হঁ্যা, তাই তুমি আর আমি তদন্তে এসেছি।

মহামাত্য ॥ তা নয়তো কি ?

উদাত্ত ॥ কিন্তু এ কথা বলে রক্ষা পাবে ভেবো না।

মহামাত্য ॥ এঁ্যা ?

উদাত্ত ॥ হঁ্যা। বিদ্রোহের সময় রাজার পাশে না থেকে রাজশত্রুর গুহায় অবস্থান—

চৌরো ॥ এঁ্যা।

উদাত্ত ॥ হঁ্যা। বিদ্রোহের সময় রাজার পাশে না থেকে রাজশত্রুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকার নামও বিদ্রোহ। ওসব যুক্তি অচল। তার চেয়ে বরং এই কৃতান্তকেরই স্মরণ নাও লোকটা তবু যা হোক রুখে দাঁড়াবে আমাদের রক্ষা করতে।

মহামাত্য ॥ স্মরণ নিতে হয় নাও তুমি। কৃতান্তক যেমন চিরকাল আমাদের বন্ধু বা শত্রু ছিল তেমনই থাকবে। আমরা বরং—

চৌরো ॥ ব্যাপারটা কতদূর গড়াল দেখে আসি।

কৃতান্তক ॥ [চটিয়া] হ্যাঁ, তাই যাও। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকলে ব্যাপারটা আরো অনেকদূর গড়াবে।

(চৌবোদ্ধরণিক ও মহামাত্যেব প্রস্থান। যাইবার সময় তাহারা অলঙ্কার পেটিকা এবং ফুলের তোড়াও লইয়া গেল)

উদাত্ত ॥ তোমার এই বন্ধুদের চিনলে কৃতান্তক ?

কৃতান্তক ॥ ওদের আমি চিরদিনই চিনি। কিন্তু তোমাকে যেন ঠিক চিনতে পারছি না আমি এখনো। যখন আমার নিজের জীবনই বিপন্ন তখন তুমি কেন নিজের জীবন বিপন্ন করে এসেছ আমার কাছে ?

উদাত্ত ॥ শোন-শোন—

কৃতান্তক ॥ না, দাঁড়াও। গৌড়বঙ্গের জননেতা তো নিজেকে কখনো বিপন্ন করে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি যে তোমাকে জানি। আর জানি বলেই বুঝতে পারছি, আমি বিপন্ন নই। আর বিপন্ন নই বলেই তুমি এসেছো আমার কাছে। এ কথা মিথ্যা ?

উদাত্ত ॥ মোটেই না। তোমার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে সত্য কৃতান্তক। তোমার জয় অবধারিত।

কৃতান্তক ॥ মুদ্রাবৃষ্টিতে জনতার ছত্রভঙ্গ—এ কাহিনী তবে তোমারই রচনা ?

উদাত্ত ॥ আমারই রচনা। যে উদ্দেশ্যে রচনা তা সম্পূর্ণ সার্থক। তোমার প্রকৃত বন্ধু কে তা বোধকরি তুমি এখন বুঝতে পেরেছো।

কৃতান্তক ॥ না, এখনো বুঝতে পেরোছ বলে মনে হচ্ছে না। কে যে বন্ধু আর কে যে শত্রু মানুষ শেষ নিঃশ্বাসেও জানতে পারে কিনা সন্দেহ।

উদাত্ত ॥ সেকি ? তুমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছো না কৃতান্তক ?

কৃতান্তক ॥ বিশ্বাস করাটা একটু কঠিন নয় কি ? প্রথমতঃ আমি তোমাকে জানি, দ্বিতীয়তঃ আমি ভেবে পাচ্ছি না জনস্বার্থের উদগাতা উদাত্ত কোন্ স্বার্থে আমার কাছে এসে দাঁড়ায়—যখন সে জানে যে লুণ্ঠনই আমার ব্যবসা !

উদাত্ত ॥ [চারিদিকে তাকাইয়া লইয়া] হ্যাঁ, তুমি লুণ্ঠন আমি অলুণ্ঠন। আমরা দু'জনেই থাকবো, পাশাপাশি থাকবো। রাজনীতির ভাষায় যাকে বলে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি।

কৃতান্তক ॥ এ্যাঁ ?

উদাত্ত ॥ হ্যাঁ। এমন কি, শ্রীবুদ্ধের পঞ্চশীল নীতি অনুযায়ী আমাদের মধ্যে আজ এই ঐতিহাসিক রাত্রিতে স্বাক্ষরিত হতে পারে একটি পবিত্র চুক্তি।

কৃতান্তক ॥ ও।

উদাত্ত ॥ হ্যাঁ।

কৃতান্তক ॥ কিন্তু আমি এখনো তো রাজা হইনি উদাত্ত !

উদাত্ত ॥ হওয়ার আর মুহূর্ত বিলম্ব নেই। আমি দেখছি।

(ব্যস্তভাবে প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে গবাক্ষপথে দীনহীন বেশ পরিহিত একটি লোক কক্ষমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কৃতান্তক চমকিয়া উঠিল। ক্রীতদাস রুখিয়া দাঁড়াইল)

লোকটি ॥ বাঁচাও ! আমাকে বাঁচাও !

(কৃতান্তকের ইংগিতে ক্রীতদাস সরিয়া দাঁড়াইল। লোকটি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া করজোড়ে কৃতান্তকের সম্মুখে আসিল)

কৃতান্তক ॥ কে তুমি ?

লোকটি ॥ আমি গোবর্ধন।

কৃতান্তক ॥ গোবর্ধন !

লোকটি ॥ না না গিরি গোবর্ধন নয়। রাজা গোবর্ধন।

কৃতান্তক ॥ এ্যাঁ ? [তাহাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া] তাই তো তোমার—আপনার আজ এ কি দশা মহারাজ ? আপনার রাজবেশ কোথায় ?

রাজা ॥ তোমার সৈন্যসামন্ত রাজপ্রাসাদ অবরোধ করতেই আমি ভাবলাম, যঃ পলায়তি, স জীবতি। রাজবেশ থাকলে ধরা পড়বো, তাই সেটা প্রাসাদেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, ভৃত্যের বেশে চলে এলাম তোমারই কাছে। শুধু এই আশায় যে তোমার সঙ্গে আমার লেনদেনের ব্যবসা বহুদিনের। একবার গিয়ে পড়লে, ফেলতে পারবে না বাবা। কি বাবা। প্রাণটা বাঁচবে তো ?

কৃতান্তক ॥ কিন্তু মহারাজ, আপনার সৈন্যসামান্ত ছিল। তারা কেউ রক্ষা করতে আপনাকে এগিয়ে গেলো না ? যুদ্ধ হল না ?

রাজা ॥ আর যুদ্ধ ! কে যুদ্ধ করবে ? এ রাজ্যে আজ একটি প্রাণীও সন্তুষ্ট নয়। যাদের কিছু নেই তারা তো নয়ই—যাদের আছে তাদের আরো কেন বেশী নেই, তাই তারাও অসন্তুষ্ট। প্রজারা অসন্তুষ্ট, সামন্তরা অসন্তুষ্ট। আজ সবার পেটেই সমান ক্ষুধা। কেউ সুখী নয় বাবা, কেউ সুখী নয়। সবাই কেবল খাই-খাই।

কৃতান্তক ॥ তা আপনি তো বেশ কয়েক বছর শাসন করলেন মহারাজ। আপনি এ অবস্থার একটা প্রতিকার করলেন না ?

রাজা ॥ কী প্রতিকার করবো বাবা ? দেখলাম ঠগ্ বাছতে গাঁ উজাড়। মুখে সবারই বড় বড় বুলি বুঝলে বাবা। কিন্তু তলে তলে সবাই খাচ্ছে। যে যাকে পাচ্ছে খাচ্ছে। শেষে আমাকেই খেতে শুরু করলো।

কৃতান্তক ॥ [হাসিয়া] সে কি ! আপনাকে খেলো ?

রাজা ॥ হ্যাঁ বাবা, আমাকে খেলো। সেটা টের পেলাম কবে জানো ? যেদিন আমার সাংঘাতিক অসুখ হল। উদরাময়।

কৃতান্তক ॥ উদরাময় ?

রাজা ॥ হ্যাঁ বাবা, উদরাময়! রাজবৈদ্য এসে বললো, আপনি কি খেয়েছেন আমি দেখতে চাই। পরীক্ষা করে দেখেন, আটাতে ভেজাল, ঘিয়ে ভেজাল, এমন কি দুধ, তাতেও জল। রাজবৈদ্য হেসে ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন। সারলো না বাবা, সে ওষুধেও সারলো না, কারণ দেখা গেল সে ওষুধে ভেজাল।

কৃতান্তক ॥ আহা হা, ব্যারাম তবে সারলো না?

রাজা ॥ সারলো। তবে কোন ওষুধ না খেয়ে সারলো। কিন্তু এবার যে ওরা আমায় সারবে। এবার আমায় কে সারাবে বাবা?

কৃতান্তক ॥ আপনি ভাববেন না মহারাজ। আপনাকে মেরে জগতের কারো কোন উপকার হবে না। দেখতে পাচ্ছি আপনি ভীষণ ক্লান্ত, অবসন্ন।

রাজা ॥ কত রাত ঘুমহীন। তোমার এখানে আজ একটু ঘুমতে পারি বাবা?

কৃতান্তক ॥ নিশ্চয়, আসুন আমার সঙ্গে।

রাজা ॥ [যাইতে গিয়া থামিল] দেখো বাবা, ঘুমটা যেন আবার ভাঙে।

কৃতান্তক ॥ [উচ্চাহাস্য করিয়া] না না আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আসুন।

[রাজাকে লইয়া কৃতান্তক কক্ষান্তরে গেল। মক্ষিরানী অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ইহা দেখিল। সে চারিদিকে সন্তর্পণে তাকাইয়া গবাক্ষে গিয়া দাঁড়াইল এবং বাহিরের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া রহিল, উৎকর্ণ হইয়া কোন ধ্বনি শোনা যায় কিনা শুনতে চেষ্টা করিল। রাজাকে কক্ষান্তরে রাখিয়া কৃতান্তকের প্রবেশ। সে মক্ষিরানীকে ঐ ভাবে দেখিবে আশা করে নাই।]

কৃতান্তক ॥ এই যে তোমাকেই চাইছিলাম রানী। এরা সব বলছে আমি রাজা হচ্ছি। তুমি তো কিছুই বলছো না রানী?

রানী ॥ আমার কাছে সেটা নতুন কিছু নয় কৃতান্তক। আমার রাজা হয়েই রয়েছ তুমি।

কৃতান্তক ॥ তোমার রাজা আমি—সে তো আজ অনেকদিন। কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারছি না, দেশের লোক হঠাৎ ক্ষেপে গেছে কেন তাদের রাজা করতে আমাকে? আমি তো দেশের রাজা হতে কোনো দিনই চাই নি। রাজার পর রাজা তৈরী করে গেছি আমি। আজ মনে হচ্ছে তুমি একদিন আমায় বলেছিলে, নিজেই হও না কেন রাজা। কি উত্তর দিয়েছিলাম আমি তোমায় রানী?

রানী ॥ বলেছিলে, রাজা হলে গোটা রাজ্যটাই হবে আমার। লুণ্ঠন করবো কাকে?

কৃতান্তক ॥ তাই আমি রাজা তৈরী করে গেছি কিন্তু নিজে কখনো রাজা হতে চাইনি। এবারও রাজা হতে চেয়েছিল অনেকে—চেয়েছিল ওই মহামাত্য, চেয়েছিল আরও দ্বাদশ অমাত্য, চেয়েছিল ওই জননেতা উদাত্ত। আর কে চেয়েছিল, আর কে চেয়েছিল রানী?

রানী ॥ আর কে?

কৃতান্তক ॥ এই দ্যাখো, তুমি ভুলে গেছো। কেন সেই গ্রাম্য যুবক ? সহায়হীন সম্পদহীন সেই গ্রাম্য যুবক, মাৎস্যন্যায় থেকে দেশকে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর সেই গ্রাম্য যুবক—আরে সেই যে—

[কপালের একটি কাল্পনিক ক্ষত এবং বাহুতে একটি সত্য ক্ষতচিহ্ন কৃতান্তক রানীকে দেখাইলেন)

রানী ॥ [অস্ফুট আর্তনাদে] গোপাল ?

কৃতান্তক ॥ এই দ্যাখো, নামটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তোমার মনে আছে।

"কিশোরকালের প্রেমের স্মৃতি লুপ্ত হয়েও লুপ্ত নয়,
জেগে ওঠে যখন তখন হিয়ার মাঝে সুপ্ত রয়।"

আমি বুঝতে পারছি না রানী—এই অপ্রত্যাশিত গণঅভ্যুত্থানের নায়ক কি সেই গোপাল ? যদি তাই হয়, তবে—তবে—

রানী ॥ তবে ?

কৃতান্তক ॥ তবে আমার শক্তির সঙ্কেত, আমার সেই পুষ্পপাত্র এ গুহা থেকে হয়েছে অন্তর্হিত।

(রানী চমকিয়া উঠিল)

চমকালে যে রানী ?

রানী ॥ তোমার শক্তির প্রতীক সেই পুষ্পপাত্র আমার কাছেই আছে। সে নেবে না। সে নিজে রাজা হচ্ছে না। রাজা করতে আসছে তোমাকে।

কৃতান্তক ॥ এ কথা বলতে তোমার এতটুকু দ্বিধা হচ্ছে না রানী—শুধু এই জন্য যে, তুমি নিশ্চিত জান রাজা হতে স্বীকৃত হব না আমি কখনো। পুষ্প প্রতীক কেন তোমার কাছে সে আমিও বুঝেছি রানী।

রানী ॥ কি আবার বুঝেছ!

কৃতান্তক ॥ [হাসিয়া] কী জানি। হয়তো আমারই বোঝবার ভুল।

কৃতান্তক ॥ তার পদধ্বনি তুমি চেন রানী ?

রানী ॥ তুমিও চেনো দেখছি!

কৃতান্তক ॥ তুমি চেনো বলেই আমি চিনি।

[তিনজন সঙ্গী সহ গোপালের প্রবেশ। এক হাতে রাজমুকুট, অন্য হাতে রক্তাক্ত তরবারী। সঙ্গে কোষবদ্ধ আরো একটি অসি]

কৃতান্তক ॥ তুমি ?

[সকৌতুকে গোপালের কপালের এবং নিজের বাহুর ক্ষতচিহ্ন দু'টি ইংগিতে দেখাইয়া]

দুইটি ক্ষতচিহ্নই কি যথেষ্ট নয় গোপাল ?

গোপাল ॥ না। আমি এসেছি, তোমাকে ধ্বংস করতে।

রানী ॥ [আতঙ্কিত কণ্ঠে] গোপাল! গোপাল!

গোপাল ॥ এক হাতে আমার রাজমুকুট, আর এক হাতে উন্মুক্ত অসি। কী বেছে নেবে নাও দস্যু!

কৃতান্তক ॥ যদি বলি ঐ রাজমুকুট ?

গোপাল ॥ সার্থক হবে আমার সাধনা। তোমার হবে নবজন্ম। এ যুগের রত্নাকর হবে তুমি।

কৃতান্তক ॥ রানী, তোমার কি ইচ্ছা রানী ?

রানী ॥ আমাকে যদি আজও তুমি না বুঝে থাকো, নতুন কোনো কথা বলেই তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না কৃতান্তক।

গোপাল ॥ কী নেবে নাও দস্যু। রাজমুকুট অথবা অসি।

কৃতান্তক ॥ যদি আমি অসিই নি ?

গোপাল ॥ তাই নাও। হোক, হোক তবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ !

[একটি অসি কৃতান্তকের দিকে নিক্ষেপ করিয়া দুইজনে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মক্ষিরানী আর্তনাদ করিয়া উঠিল]

রানী ॥ না না—

কৃতান্তক ॥ এ আর্তনাদ স্বাভাবিক। কারণ দু'জনের মধ্যে একজনের মৃত্যু অবধারিত। এ নারী জানে না সে কে। আচ্ছা গোপাল, বলতে পারো, কে মরলে রানী বেশী কাঁদবে ?

গোপাল ॥ সেটা জানা নেই। আজ তারই পরীক্ষা হোক দস্যু।

[আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল]

রানী ॥ [কাঁদিতে কাঁদিতে] না—না—না...

কৃতান্তক ॥ আচ্ছা আ৮২া। রাখো তোমার কান্না। [গোপালকে] ওঁরা কারা ? কে ওঁরা ?

গোপাল ॥ গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধি ও'রা। সামন্তদের প্রতিনিধি ইনি, বণিকদের প্রতিনিধি ইনি, আর প্রজা প্রতিনিধি ইনি।

সামন্ত ॥ আজ প্রায় একশ' বছর গৌড়বঙ্গে চলেছে নৈরাজ্য। নিজেরা মারা-মারি করে সামন্ত আমরা ক্লান্ত, অবসন্ন।

বনিক ॥ শতবর্ষব্যাপী মাৎস্যন্যায়ের ফলে গৌড়বঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য অচল। দেশ হতে সুবর্ণমুদ্রা অন্তর্হিত, ধনসম্পদ হারিয়ে বণিক আমরা, আজ লক্ষ্মীহীন

প্রজা ॥ আমি সাধারণ প্রজাপুঞ্জের প্রতিনিধি।

কৃতান্তক ॥ কিন্তু আমরা জানতাম প্রজাপ্রতিনিধি জননেতা উদাত্ত।

প্রজা ॥ হ্যাঁ, নেতাগিরিই তার ব্যবসা। আর অরাজক রাজ্যেই এ ব্যবসা জমে ভালো। ভণ্ড শাসক আর ভণ্ড নেতার দৌরাত্ম্যে শস্যশ্যামলা গৌড়বঙ্গে আজ দুর্ভিক্ষ। যারা আমাদের রক্ষক, তারাই আজ ভক্ষক। আজ আমরা—

প্রতিনিধিত্রয় ॥ হ্যাঁ, আজ আমরা পরিত্রাতা চাই।

কৃতান্তক ॥ কিন্তু কে সে পরিত্রাতা ?

গোপাল ॥ আমি এদের বলেছি, আমাদের সেই পরিত্রাতা হবে তুমি।

কৃতান্তক ॥ [উচ্চহাস্যে] পরিত্রাতা আমি ? এই দস্যু ? যার প্রতি বিন্দু রক্ততে রয়েছে লুণ্ঠনের নেশা। না-না-না রাজা হলে আমি লুণ্ঠন করবো কার সম্পদ ?
গোপাল ॥ তাই তো তোমাকে করতে চাই আমরা রাজা। লুণ্ঠনের হোক চির অবসান।

কৃতান্তক ॥ সে হবে আমার মৃত্যু। রাজা হোক আজ নির্বাচিত। নির্যাতিত নিপীড়িত জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত। এই গুহাতে এই মুহূর্তে সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত নিপীড়িত কে ?—ঐ নারী। যে তার প্রণয়ীর বক্ষ থেকে হয়েছিল লুণ্ঠিতা, হয়েছিল ধর্ষিতা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ নারী। আজ আমি একটি সর্তে স্বীকৃত গোপাল। ঐ রাজমুকুট যার মাথায় তুলে দেবে এই নারী, সেই হবে রাজা। সামান্য এইটুকু পরিশ্রমে যদি স্বীকৃত না হয় সে, তবে হোক দ্বন্দ্বযুদ্ধ ! স্বীকৃত তুমি গোপাল ?

গোপাল ॥ আমি স্বীকৃত।

কৃতান্তক ॥ আপনারা ?

প্রতিনিধিত্রয় ॥ আমরাও।

কৃতান্তক ॥ রানী !—

[মুক্তিরানী ক্ষণকাল অশ্রুসিক্ত চোখ বুজিয়া কি ভাবিল। তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া রাজমুকুট লইযা তাহা গোপালের মাথায় পরাইয়া দিয়া কৃতান্তকেব বুকে ঝাঁপাইযা পড়িল]

প্রতিনিধিত্রয় ॥ পরম সৌগত গরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ গোপাল-দেব জয়তু।

[তিনবাব এই জয়ধ্বনির মধ্যে মূক ক্রীতদাস কৃতান্তকের সম্মুখে আসিয়া সানুনয়ে কি যেন প্রার্থনা করিতে লাগিল]

কৃতান্তক ॥ দস্যু রাজা হলে দস্যুতাই করত। গৌড়বঙ্গ আজ বেঁচে গেল। আমার এই মূক ক্রীতদাস সেও আজ মুখর হতে চাইছে। কথা বললেই লোকটা হাউহাউ করে কাঁদে। তাই আমার আদেশে মূক হয়ে আছে ও এতদিন। আজ এই আনন্দের দিনে বলো, বলো তুমি কি বলতে চাও ?

ক্রীতদাস ॥ [করজোড়ে প্রাণপণ প্রয়াসে] আমার ঘর ছিল, ঘরণী ছিল, সোনার চাঁদ ছেলেমেয়ে ছিল, কিন্তু ক্ষিধেতে শিশুদের চোখ গেল গর্তে বসে। পেট পিঠ গেল এক হয়ে। তাদের মা ভিক্ষে করে একমুঠো চাল পেল। একমুঠো চাল পেয়ে দেবতার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো—একমুঠো চাল যেন একশ' দিন চলে। আমি আর দেখতে পারলাম না। পালিয়ে এলাম। সেই থেকে মুখে আর আমার কথা সরে না। আজ, আমাদের তুমি ভুলোনা রাজা, ভুলোনা—

কৃতান্তক ॥ ভুলোনা, ভুলোনা, আমাদের কথাও ভুলোনা রাজা। সাধারণ মানুষের দুঃখদৈন্য নিয়ে রাষ্ট্র এতটুকু মাথা ঘামায়নি এতদিন। জনসাধারণকে শোষণ আর শাসন করে চলেছে এতকাল রাজশক্তির বিপুল বিলাসরথচক্র। এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সৎ জীবনযাপন করলে অন্নবস্ত্র জোটে না দেখেই আমরা হয়েছি অসৎ, আমরা হয়েছি তস্কর, আমরা হয়েছি দস্যু। অন্নবস্ত্রের দুঃখ ঘুচিয়ে দাও, দেখবে দস্যুর হয়েছে ধ্বংস, তস্করের হয়েছে মৃত্যু। কিন্তু তা যদি না পার, জানবে আমাদের মৃত্যু নেই—রাজা, আমাদের মৃত্যু নেই।

[কৃতান্তক অসিখানি গোপালের পদতলে রাখিল। আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল কৃতান্তকের শেষ কয়টি কথা]

॥ যবনিকা ॥

লালন ফকির

॥ উৎসর্গ ॥

ভাষা ও সাহিত্যাচার্য

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিশ্ববরেণ্যেষু—

প্রীতিধন্য

মন্মথ রায়

ভূমিকা

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"—চণ্ডীদাসের এই মর্মবাণী লালন ফকিরের জীবনে এবং সাধনায় মূর্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য, সমগ্র পৃথিবী জুড়েই আজ মানবাত্মার এই মর্মবাণী।

এই মর্মবাণীকেই আমি রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছি লালন ফকিরের জীবন অবলম্বনে রচিত এই নাটকটিতে। লালনের সঠিক জীবনেতিহাস এখনও অলিখিত। অনেক কিংবদন্তীতে গড়ে উঠেছে লালনের জীবন-কাহিনী। আমার এই নাট্যকাহিনী কিছুটা ইতিহাস, কিছুটা কিংবদন্তী। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে নদীতে নিক্ষিপ্ত হবার পর লালনের স্মৃতিলোপের কাহিনীটি আমার কল্পিত। কোন কোন চরিত্রের নামকরণে এবং কোন কোন ঘটনার বিন্যাসেও আমি কল্পনার আশ্রয় নিয়েছি। অবশ্য লালনের সত্যিকারের ইতিহাস পেলে, এটা আমি করতাম না।

লালনের জীবন নিয়ে আমি দুটি নাটক লিখেছি। প্রথমটির নাম—'লালনামৃত', দ্বিতীয়টির নাম—'লালন ফকির।' চরিত্র ও ঘটনা দুটি নাটকে প্রায় এক, তফাৎ শুধু এই যে, 'লালন ফকির' নাটকটির বহুলাংশ কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক ভাষায় গ্রথিত এবং কিছুটা সংক্ষিপ্ত।

'রূপকার'-এর প্রযোজনায় 'লালন ফকির' নাটকটি ৩রা জুন ১৯৬০ তারিখে কলামন্দির মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়।

শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র, শ্রীমতী গীতা দত্ত ও শ্রীমান সবিতাব্রত দত্তের সম্মিলিত প্রতিভা এবং অন্যান্য কুশীলবদের সাফল্য নাটকটিকে অসাধারণ জনপ্রিয়তায় অভিষিক্ত করেছে। আমি তাঁদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

এই নাটকটি প্রকাশের ব্যাপারে আমি যাঁদের কাছে অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি, তাঁরা হলেন, স্নেহাস্পদ শ্রীমাধব ঘোষাল, কল্যাণীয় শ্রীমান নির্মলচন্দ্র শীল এবং আমার পরম প্রিয় শ্রীমান আশুতোষ দে। তাঁদের আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মন্মথ রায়

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

এই নাটকটি কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত হওয়ায় অন্যান্য অঞ্চলে কিছুটা দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে, এই অভিযোগ এসেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নিবেদন—এই নাটকের প্রযোজক ইচ্ছা করলে কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক ভাষাকে বদলে বাংলার চলতি ভাষায় রূপান্তরিত করে নিতে পারেন। কিন্তু এই অনুরোধও রইলো তাতে যেন মূল বক্তব্যের কোনও বিকৃতি না হয়। আঞ্চলিক ভাষা থেকে চলতি ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদই কাম্য।

মন্মথ রায়

লালন ফকির

।। প্রথম দৃশ্য ।।

[নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমায় ভাড়ারা গ্রামে লালন করের গৃহ-প্রাঙ্গণ। অন্দরে শাঁখ, ঘন্টা, কাঁসর বাজছে—একটা পুজোর পরিবেশ। দু-একজন গ্রামবাসী ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আসছে, যাচ্ছে। প্রচণ্ড জোরে কাঁসর, ঘন্টা বাজছে। ভেতর থেকে ইশারা ক'রে ডাকতে ডাকতে লালনের প্রবেশ, পিছনে চুপি চুপি কিশোরী স্ত্রী তুলসীর প্রবেশ]

লালন ॥ [চেঁচিয়ে] বলি শোন—বাড়ির গোপালের ঐ পুজোর বাদ্যে আপাততঃ আমরা হলাম দুজনেই বাড়ির রাখাল ঐ রহিম।

তুলসী ॥ কি বুলতিছো চেঁচায়ে বলো।

লালন ॥ তাইতো বলছি আমরা দুজনেই হইয়া পড়ছি আমাগো বাড়ির সেই বদ্ধকালা রহিম, চেঁচায়ে না বললি শুনতেই পাবন নানে। ওই তো রহিম গোয়ালে গরু তুলতে যাচ্ছে—ওরে রহিম একবার ভোলাই আর শীতলকে—

[রহিম ছিল একেই কালা, তার ওপর পুজোর বাদ্যির এই গোলমালে দেখা গেল রহিম কিছু শুনতে পেল না, গরু বাঁধবার দড়ি নিয়ে চলে গেল।]

ভোলাই আর শীতলকে—কাকে বুলছি—কে শুইনছে!

তুলসী ॥ তুমি একবার যাও না গো।

লালন ॥ কি বুলতিছো গো?

তুলসী ॥ এতো চেঁচাচ্ছ ক্যান? কেউ শুনতে পাবি যে।

লালন ॥ আরে শুনতি পাচ্ছে না বলেই তো চেঁচাচ্ছি।

তুলসী ॥ কাঁসর ঘন্টা যে থ্যামে গেল।

লালন ॥ ও থামেসে—তাই তো—বাঁচা গেল।

তুলসী ॥ শোন, এই বেলা চট করে তুমি ভোলাই আর শীতল ঠাকুরপোদের কাছে ঘুরি আইস, একটু হাতে পায়ে ধরো না। তা হলে রাজী হবেন নে আমাগো পুরী নিয়ে যাতি, পুইজো শেষ হবার আগেই ঘুইরা আস না কেন?

লালন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ সে যেমন কইরে পারি আমি রাজী করাবোনে, তোমাকে ছেড়ে আমি একলা কখনো যাতি পারি, তাও কিনা পুরীতে, জগন্নাথের রথ দেখতি?

তুলসী ।। হয়েচ্ গো হয়েচ্। কেডা আবার আইসে পড়বে—তাড়াতাড়ি যাও—

লালন ।। হ্যাঁগো ওই রহিমের মত চোখে দেখপো না কানে শুনপো না, থুড়ি ওতো খালি কানে শোনো না—তাহলি ওই তিন বাঁদরের মত—

তুলসী ।। ও মাগো নিজেকে নিজে বাঁদর কয় [বলেই জিব কাটল] ছিঃ ছিঃ তুমি কিছু মনে কইরে না গো লক্ষ্মীটি।

লালন ।। তা হলি আমি তোমার লক্ষ্মী বাঁদর।

তুলসী ।। দেরী হয়ে যাবেন যে—

[লালন বাইরে চলে গেল। তুলসী গেল অন্দরে। ভেতর থেকে এসে দাঁড়ালেন লালনের বিধবা মাতা পদ্মাবতী ও পুরোহিত রাধামাধব।]

রাধা ।। পুরীধামে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা দেখা—এ তো আর সবার ভাগ্যি হয় না। লালন যাতি যাচ্ছে এ তো ভাল কতা।

পদ্মা ।। পায়ে হাঁটি যাবি—সে নাকি অনেক দিনের পত। আমার তো সবেধন নীলমণি ঐ এক লালন, বলতিছি আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো, তা বুলে কিনা সঙ্গী-সাথীরা মিয়ে ছাওয়াল সঙ্গে নিয়ে যাতি রাজী হচ্ছে না। আমি কান্নাকাটি করায় সঙ্গীদের কাছে আবার গেছে।

[তুলসীর প্রবেশ]

রাধা ।। তা বেশ তো ছাওয়ালকে তীরথ যাত্রায় বাধা দিয়ো না পদ্মাবতী। এ তো পুণ্ণির কাজ—পুণ্যাত্মা না হলি কি ঠাকুর দর্শন দেন! এই ভাড়ারা গ্রাম থেকে বহুকাল পুরীতে তীরথ করতি কেউ যায়নি, ওরা যাচ্ছে এ খুব আনন্দের কতা। আমার নামাবলীডা সিড়ে গেসে। ফিরবার সময় লালন যেন আমার জন্যি একডা নামাবলী কিইনা আনে।

[পদ্মাবতী ও তুলসী রাধামাধবকে প্রণাম করে]

রাধা ।। রাধামাধব মঙ্গল করুন।

[প্রস্থান]

পদ্মা ।। না ওক্ আমি একলা সাইড়ে দেবেন নানে।

তুলসী ।। একলাটি তো যাচ্ছেন না মা!

পদ্মা ।। একলা সাড়া আবার কী? ভোলাই আর শীতলা সঙ্গে যাবি বলেছে—কিন্তু তারাও ছাওয়াল পাওয়াল।

তুলসী ।। ওমা ছাওয়াল পাওয়াল আবার কথথেন? ওরাও তো এক একটা সোমত্ত জোয়ান।

পদ্মা ।। তুমি কি বুলতি চাও বলো তো। আমি সঙ্গে না গেলি—ও যার সঙ্গে যাক, একলাই যাচ্ছে ধইরে নেব।

তুলসী ॥ তা ঠিক বুলেছেন মা, আমরা সঙ্গে না গেলে মনে হবে আপনার ছাওয়াল একলাই যাচ্ছে। তা হলি আমি সব চট্ কইরে গোছায় নিই মা ?

পদ্মা ॥ হ্যাঁ তাই নেও মা।

[চীৎকার করতে করতে লালনের প্রবেশ]

লালন ॥ মা মা জয় জগন্নাথ, আজই আমরা রওনা হচ্ছি মা। পথে ঠাকুরমশাই কইলেন—'যাও বাবা যাও—আমার জন্যি একটা নামাবলী আইনো।'

পদ্মা ॥ তাই নাকি ? তুলসী, গোছগাছ কইরা নাও মা।

লালন ॥ হ্যাঁ মা—হ্যাঁ তবে কেউ মিয়ে ছাওয়াল সঙ্গে নিতি রাজি হচ্ছে না, কাজেই তোমাগো আর যাওয়া হচ্ছে না, তা হলি আমাকে আনতি হবে ঠাকুরমশায়ের জন্যি একটা নয় দুইটো নামাবলী, ও পাড়ার কোবরেজমশায়ের জন্যি সাগরের ফেনা—এ পাড়ার পদীপিসির জন্যি কাঠের মালা, মার জন্যি জলজ্যান্ত জগন্নাথের পট, আর তুলসীর জন্যি চন্দন কাঠের চিরুণী, কেমন এই তো ? তা হলে আমার পোঁটলাটা বেঁধে দাও—দুডো ধুতি, দুডো ফতুয়া, মাথায় লাগাবার এক শিশি ত্যাল—আর যেন তুমি কি বুলতিছিলে—হ্যাঁ কাপড় কাচা সাবান। বুঝলে মা তোমার বৌমা বলে ময়লা কাপড়ে ঠাকুরের দরশন করতি নেই।

তুলসী ॥ কিন্তু সে কাপড় কেসে দেবেন নে কিডা মা ? আপনার ছাওয়াল নিজির হাতে কোনদিন কাপড় কেসেচে ?

পদ্মা ॥ বলতো মা! তাই তো আমি বুলছি যে আমি সঙ্গে যাই, কাপড় কাসতি পারব, দু-বেলা দুডো রাঁধতি পারবো।

তুলসী ॥ না না আপনি কেন করতি যাবেন মা ? আমি সঙ্গে থাকতি ?

পদ্মা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভালো।

লালন ॥ না না এ সবই আমি ভোলাই আর শীতলকে খুব ভালো করি বুঝায়ে দিসি। কিছ্যুৎ রাজী হচ্ছে না ওরা। এমন কথাও বুলেছি যে এই মা আর বৌ সঙ্গে না গেলি সারাপথ কেবল এদের কথাই মনে হবেন নে। জগন্নাথ দেখতি গিয়ে দেখবোনে কোন জগন্নাথ টগন্নাথ আর নেই—সামনে দাঁড়িয়ে আছে এই ঘরের দুডি লোক! হ্যাইয়ে গেল!

[পদ্মাবতী ও তুলসীর মুখে হাসি ফুটিল]

পদ্মা ॥ তা কি বুললো ওরা ?

লালন ॥ বললো তবেতো ভালই হলো, পুরীতে গিয়ে আর দরকার কি, বাড়িতি বসেই দেখ। [পদ্মাবতী ও তুলসী হাসিয়া উঠিল] না না হাসির কথা নয়, আমার পুঁটুলিটা গুসোয় দাও, ওরা এলো বলে।

পদ্মা ॥ আরে দুপুরে খায়ি যাবা তো ?

লালন ॥ না মা ভোলায়ের পিসি আমাগো তিনজোনেকেই পেট পুরে খাইয়ে

দেসে, বলে কি না জগন্নাথ দেখতি যাচ্ছি আমাগো খাওয়ালেও নাকি পুন্নি, কই তুমি গেলেই না ? যাও যাও আর সময় নেই।

[তুলসী চলে গেল]

পদ্মা ॥ বাবা লালন একা তোকে আমি ছেড়ে দিতি পারবো নারে।

লালন ॥ মা তুমি গেলি এ ঘর সংসার দেখপি কেডা ? তোমার ঐ পোলাপান বৌমাকেই বা দেখপি কেডা ?

পদ্মা ॥ তবে বাছা তুই তুলসীকে সঙ্গে নিয়ে যা।

লালন ॥ তা তুমি যখন বুলছো তো ওক গিয়ে বলো। রহিমডা কনথে গেল ?

পদ্মা ॥ তাক আবার কী দরকার ? সে গরুক জাব দিচ্ছে।

লালন ॥ ঐ দেখ আমি চইলে যাচ্ছি, আর আমার চেয়ে ওর কাছে আমার গরুডাই বড়ো হলো। এমন রাখাল আমি জন্মেও দেখিনি। [চীৎকার করিয়া] রহিম রহিম—

পদ্মা ॥ বুললাম তো রহিম গরুক জাব দিচ্ছে। আমি বৌমাকে চট করে তৈরি হোতি বুলছি।

লালন ॥ মা রাগ কয়েরলে মা ? অতদূর অচেনা অজানা পথ, তার উপর তোমার বয়েস হয়েসে, শরীরও সব সময় ভাল থাকে না—তাই না তোমাকে নিয়ে যাতি সাহস হচ্ছে না। নইলে ফি বছর বছর নবদ্বীপ তীর্থ করতে তোমাকে নিয়ে যাই না ? তোমাকে আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি মা, এবার নবদ্বীপ তোমাক দুবার নিয়ে যাবোনে, একবার দোলে, একবার রাসে, নাও হয়লো তো ? আঃ মার মুখে আর হাসি ধরে না ! নাও এইবার যাও তোমার বৌমাকে শিগগীর তৈয়ের হতি বলোগা। [পদ্মাবতীর অন্দরে প্রস্থান] রহিম ! রহিম ! আঃ কানে খাটো লোক নিই ঘর করা—এ যে কি ঝকমারী বাবা ! তবে ভাগ্যি রাখাল ঘরের বৌ নয়। তবেই হইসিল আর কি।

[ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে রহিমের প্রবেশ।]

রহিম ॥ হলো কি ? ষাঁড়ের মত চেঁচায়ে আমাকে ডাকছো ক্যান কর্তা।

লালন ॥ হতভাগা তুই যে কালা, কোন কথাডা শুনিস ? চেঁচাবো না তো কি ? শোন আমি এখনি রওনা হচ্ছি পুরী।

রহিম ॥ কি বুললে ? শুঁড়ি ? তা শুঁড়ির দোকানে কি করতি যাচ্ছো ?

লালন ॥ শুঁড়ি নয়রে হতভাগা পুরী। পুরী। মা থাকপি। রেখেয়ে যাচ্ছি তোর ভরসাতে, দিন রাত বাড়ি থাকপিকোন।

রহিম ॥ বরষাৎ বাড়ি থাকপো না তো কন যাবো ? ছাতি নেই তো। আমার জন্য একটা ছাতি আইনো।

লালন ॥ .তোমার জন্য একটা হাতি আনপো।

রহিম ॥ আচ্ছা।

[রহিমের প্রস্থান, তুলসীর প্রবেশ]

তুলসী ॥ সে কি, মা বুল্লেন যে আমি নাকি তোমার সঙ্গে যাবো ?

লালন ॥ [গান]

কুলের বৌ হয়ে মন আর
কত দিন থাকপি ঘরে
ঘোমটা খুলে চলনারে যাই
সাধ বাজারে।

তুলসী ॥ না না শোন যদি নিতিই হয় মাকই সঙ্গে নাও। ওঁর বড় সাধ ছাওয়াল ওঁক তীরথ করাবি। বয়স হয়েছে, আজ আছেন কাল নাই, ওর সাধডাই তুমি পুইন্নো করো।

লালন ॥ আমারও তো একটা সাধ থাকতি পারে।

তুলসী ॥ তবে দু'জনাকেই সঙ্গে নিয়ে চলো।

লালন ॥ তা হয় না তুলসী। সঙ্গীরা কেউ রাজী হচ্ছে না।

[রহিমের প্রবেশ]

তুলসী ॥ বেশ তো তুমিই এসো—আমরা দু'জনাই বাড়ী থাকছি, তোমার চোখ দিয়েই জগন্নাথ দেখা হবিনি আমাদের। দেহ দুডো এখানে পড়ে থাকছে, আমাদের মন তো থাকছে তোমাকে ঘিরে।

লালন ॥ [রহিমকে দেখিয়া] এই যে হাঁ করে সব শুনতিছি।

তুলসী ॥ [হাসিয়া] কিছুই শুনতিছে না, শুধু হ্যাঁই করে আছে।

লালন ॥ কিন্তু ওর ভরসাই তো তোমাক রেখে যাচ্ছি।

তুলসী ॥ কিছু ভুল কোরছো না। এত ভালবাসে আমাদের, দরকার হলি প্রাণ দিতি পারে।

লালন ॥ কিরে রহিম, তোর বৌঠান কি বুলতিছে বল তো ?

রহিম ॥ গানের কথা বুলতিছ এডা আমি শুনিস। তা গান কোথায় হবি ?

লালন ॥ নাও প্রাণ হয়ে গেল গান। কি কানরে বাবা ! যা না কাজে যা।

রহিম ॥ নামাজে যাবো। যাবো যাবো গরুক্ জাব দিয়েই যাব। [প্রস্থান]

লালন ॥ রাতে ওক তোমাগো বারান্দায় শুতি দিয়ো।

তুলসী ॥ খেপেছো ? মা ওর ছায়া মাড়ান না আর ও শুবি বারান্দায় !

লালন ॥ না এ ঠিক নয়, এ অন্যায়।

তুলসী ॥ যাক ও সব কথা এখন থাক।

লালন ॥ না না থাকবে কেন ? কই পুরীধামে জগন্নাথদেবের মন্দিরে তো এসব নেই। তাই না কাশী বৃন্দাবনে না গিয়ে সব তীরথ ছেড়ে জগন্নাথ যাচ্ছি।

(গান)

একবার জগন্নাথ দেখরে যেয়ে
জাতি কেমন রাখো বাঁচিয়ে
চণ্ডাল আনিলে অন্ন
বামনে তাই খায় চেয়ে,

[নেপথ্য হইতে পদ্মাবতীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

পদ্মা ॥ বৌমা, বৌমা একবার শুনত।

তুলসী ॥ মা ডাকছেন, যা তাড়াহুড়ো, তা বুলছিলাম যে তোমার জন্যি এক-জোড়া কটকি চটি জুতা কিনে আইনো—আমার বড় সাধ হয় তুমি পরো, আর শোন তোমার বোঁচকাৎ কিছু তুলসীর পাতাও দিচ্ছি ঠাণ্ডা লাগলিই তোমার সর্দি হয়। তুলসীর পাতার রস খালি পর তোমার সেটা যাবে।

(গান)

লালন ॥ জাত না গেলে পাই না হরি
কি ছার জেতের গৌরব করি
ছুঁসনে বলিয়ে
আমি জাত হাতে পায়লে
পুড়াতাম আগুন দিয়ে।

তুলসী ॥ চুপ চুপ ও গানটা আর মাকে শুনিয়ো না। মা ক্ষেপে যাবেন।

[পদ্মাবতীর প্রবেশ]

পদ্মা ॥ কি সব অনাসিসটির কথা। বৌমা, তোমার তুলসীর মালাডা সঙ্গে নিতি ভুইলো না যেন। ওটাকে জগন্নাথের পায়ে ছুঁইয়ে আইনো।

লালন ॥ ও যাতিই চাচ্ছে না মা। তোমাকে যাতি বুলছে আমার সঙ্গে।

পদ্মা ॥ [তুলসীকে সস্নেহে বুকে টেনে] তুমি যে এ কথা বুলছো মা, এতেই আমার যাওয়া হয়ে গেছে। গেলি দু'জনাই যাতাম। তোমাকে একা ফেইলে রেখে আমি কখনো যাতি পারি মা!

লালন ॥ কিন্তু তাও একদিন যাতি হবি মা, যেদিন স্বর্গে যাবা সেদিন। ওর কথাও মনে থাকপি না আমার কথাও না, ড্যাং ড্যাং করে একাই চলে যাবা।

পদ্মা ॥ ঐ একবারই যাবানে বাপ! ঐ একবারই যাবানে। এখন তোদের রাইখে যাতি পারি। কিছু লাড়ু আর খোয়া তোয়ের করে রাখচি চট করে অ্যাইসে কিছু খেয়ে যা আর সঙ্গেও নিয়ে যা, আর তুলসী এস থাকপি মানে।

[অন্দরে প্রস্থান, তুলসী গলা হইতে মালাটি খুলিল]

তুলসী ॥ না না মা বুলে গেলেন যে—

লালন ॥ ও তা বেশ তো দাও [তুলসী মালাটি লালনের গলায় পরিয়ে দিল, লালন খুলে তুলসীর গলায় দিতে গেল] এইবার—

তুলসী ॥ এ কি!

লালন ॥ এই নিয়ম। সেই বিয়ের রাতটা মনে নেই ?

(গান)

ও সে প্রেম করা কি গো কথারি কথা,
প্রেমে মজে হরির হলো গলায় কেতা,
একদিন রাধা মান করিয়ে
ছিলেন ধনি শ্যাম তেজিয়ে
মানের দায়ে শ্যাম যোগী হয়ে
প্রেম যোগী হয়ে, মুড়ালে মাথা ॥

[বাইরে ভোলাই এবং শীতলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কই রে লালন, আর দেরী করতিছিস কেন ?]

তুলসী ॥ এই রে, ওরা আইসে পড়সে, পাঁচ গণ্ডা টাকা নিয়ে যাবি বলে বালিশের তলায় রাখিসি, যাই চট করে ওডা নিয়ে আসি।

[তুলসীর প্রস্থান। খোয়া ও নাড়ুর রেকাবি হাতে পদ্মার প্রবেশ]

পদ্মা ॥ এই-ই যা—ওরা অ্যাইসে পড়ল যে !

[বাইরে থেকে ভোলাই ও শীতল এসে দাঁড়াল]

ভোলাই ॥ এই যে মাসি পেননাম হই, আশীর্বাদ কইরো মনোবানছা যেন পুন্ন হয়।

শীতল ॥ জগন্নাথ যেন দর্শন পাই।

পদ্মা ॥ ঐ পারথনাই করগো বাবা। ভোলাই শীতল আমার শিবরাত্রির স্যলতা সবেধন নীলমনি লালন তোমাগো হাতে দিয়া দিচ্ছি, তোমরা ওক দেখো।

ভোলাই ॥ নিশ্চই নিশ্চই আমরা তা হলি বাইরে অপেক্ষা করি, লালন ভাই তুমি চট্ করে অ্যাইসোতো।

[ভোলাই ও শীতলের প্রস্থান]

পদ্মা ॥ তোর মনোবাঞ্ছা পুন্ন হোক লালন, জগন্নাথকে স্মরণ কইরে যাত্রা করো। যাত্রাকালে আমি আমার ঠাকুরের বেদিৎ তোর মঙ্গল পেরথনা করতে যাচ্ছি। নির্ভয়ে যাত্রা করিস। [লালন পদ্মাবতীকে প্রণাম করিল, পদ্মাবতী শিরশ্চুম্বন করিয়া প্রস্থান করিলেন]

লালন ॥ একটা মাস মা, মাত্তর একটা মাস দেখতি দেখতি চইলে যাব।

[বাইরে ভোলাই ও শীতল—'কৈ হে লালন বড্ড দেরী হচ্ছে।' ছুটে তুলসীর প্রবেশ, হাতে তুলসীর মালা ও বোঁচকা।]

লালন ॥ তুলসী এইবার চলি। [তুলসী লালনের গলায় মালা পরাইয়া দিল ও বোঁচকাটি হাতে তুলে দিল]

লালন ॥ তুলসী ! তুলসী ! তুলসী ! আমার বোঁচকায় তুলসীর পাতা—গলায় তুলসীর মালা—সর্বাঙ্গে আমার তুলসী ! চলি—

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রসুলপুর গ্রামের গঙ্গার তীরবর্তী একটি পথ। গান গাইতে গাইতে দরবেশ সিরাজ সাঁই ফকিরের প্রবেশ]

সিরাজ ॥ [গান]

এলাহি আলামিন আল্লা
বাদশা আলম পানা তুমি।
ডুবায়ে ভাসাইতে পারো
ভাসায়ে কেনার দেও কারো
যা করে, সে ইহাও তোমারো—
তাইতে তোমায় ডাকি আমি ॥
নহু নামে এক নবীরে
ভাসালে বিষম পাথরে
আবার তারে মেহের করে
আপনি লাগালে কিনারে,
জাহের আছে ত্রিসংসারে
আমায় দয়া কর স্বামী ॥

[নিকটস্থ চটির মালিক নিবারণ সাহার ব্যস্তভাবে প্রবেশ]

নিবারণ ॥ সাঁইবাবা! সাঁইবাবা! এই যে সিরাজ বাবা, বড় বিপদে ঘোর বিপদে পড়েছি আমি। দোয়া কর যাতে বাঁচি।

সিরাজ ॥ কি হয়েস রে নিবারণ? তোর হাসি-খুশি মুখখানা এমন কালো হ্যয়েছ কেন রে?

নিবারণ ॥ সর্বনাশ হয়েছে সিরাজ সাঁইবাবা, কি যে হবি, কি যে করপো কিছুই বুঝঝি না।

সিরাজ ॥ রথের আগে তোর এই ছোটো চটিটা যাত্রীর ভীড়ে ভরে যায়। যাত্রীরা তোকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করে, তোর বিপদ কেন হবি নিবারণ?

নিবারণ ॥ এবার আর তা হবি না যে বাবা। এবার আমার শুরুতেই শেষ।

সিরাজ ॥ কেন রে কি হয়েসে? চল তোর চটিতে গিয়ে বসে শুনপো।

নিবারণ ॥ আর চটি, চটির ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছি সাঁইবাবা। হায় হায় মায়ের এমন দয়াই হয়েসে চটিটা আমার উঠে গেল।

সিরাজ ॥ মায়ের দয়া? বসন্ত? তা দয়াটা কার উপর হয়োলো রে নিবারণ?

নিবারণ ॥ সে কি আর শুনপার সুযোগ পালাম। কাল সাঁঝের বেলা সুয্যি-ঠাকুর কেবল পাটে বসেছে এমন সময় দুডো লোক একটা লোককে ধরাধরি করে

নিয়ে আইলো আমার চটিতে। লোকটা জ্বরে বেহুঁশ। তাড়াতাড়ি একটা ঘর খুইলে দেলাম। আলো দেলাম, জল দেলাম, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দেলাম। একটু নাড়ি দেখতেও তো জানি, তাই নাড়ি দেখতি গেলাম—তা সঙ্গের লোক দুটো হাঁ হাঁ করে চেঁচিয়ে উঠে বুললো—ছুঁয়োনা—ছুঁয়োনা—ভীষণ মায়ের দয়া হয়েছে তা, মায়ের এত দয়া, এত বেশী দয়া, এত ভীষণ দয়া আর কখনো দেখিনি। দেহটা ফুলে ঢাক হয়েসে। বুঝলাম এখান থাকলি আর রক্ষা নাই। মাগ ছেলেমেয়েকে ঐ রাতেই পাঁশের গাঁয়ে শ্বশুর বাড়িৎ চালান করে আজ ভোরে চটিৎ ফিরে যা দেখ-লাম তাৎ আমার চোখ ছানাবড়া।

সিরাজ॥ কি দেখলি ?

নিবারণ॥ দ্যাখলাম ঘরে কেউ নাই।

সিরাজ॥ তবে তোর আর বিপদডা কি নিবারণ ? বিপদবারণই ওদের সরা দেসেন।

নিবারণ॥ সরা দেসেন কি ? ঘরে বোঁচকা-বুঁচকি কিছু পইড়ে আছে যে। [হাত দেখিয়ে] দেখতো গোঁসাই, আমার এই হাতে এই লাল দাগ গুলোন কি ? মায়ের দয়া নয় তো ?

সিরাজ॥ আরে না না, ওতো মশার কামড়।

নিবারণ॥ কি জান সাঁইজি ! কাল রাত থেকে কেবলই মনে হচ্ছে, মা বুঝি আমাকেও দয়া করতে আসছেন। যাই ঘরটা ছড়া দিয়ে মুছে ধুপ ধুনো দি, আর মা শীতলার একটা পুইজোর ব্যবস্থা করি। কি বলো সাঁইজি ?

সিরাজ॥ ত যা করতে হয় কর। যাই মুরশিদের বাড়ি গিয়ে বসি।

[ভীত সন্ত্রস্ত ভোলাই ও শীতলের প্রবেশ]

নিবারণ॥ এই এই এই যে এরা। এরাই আন্‌সিলো সেই মায়ের দয়াক। [ভোলাই শীতলকে] কোথায় রেখে আইলে তাকে ? হয়ে গেছে নাকি ? কিগো বাবুরা, কথা বুলতিছো না কেন ? এত ভোরে গঙ্গা নেয়ে এ্যালে, ব্যাপারডা কি ? তার মানে বুঝলে সাঁইজি, হয়য়া গেছে। গঙ্গার তীরে পুইড়া শেষ কাজ সেরে আইলো।

ভোলাই॥ না না পুড়োই নি, আমরা পুড়োই নি।

শীতল॥ শেষ রাতে কিছুটা জ্ঞান হয়েছিলো কিন্তু সে কি যন্ত্রণা। চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না।

ভোলাই॥ কেবলই বলতি লাগল জ্বলে-পুড়ে আমার দেহ খাক হয়য়া যাচ্ছে। আমাক গঙ্গায় ডুবো রাখো। আমার মনের আগুন দেহের আগুন শীতল কর।

সিরাজ॥ দেহের আগুন মনের আগুন শীতল কর। ওরে, এ যে সাধকের কথা। তোমরা তাকে পুড়োয় এলে ?

ভোলাই ॥ পুড়োই নি বাবা।

শীতল ॥ কিছুটা জ্ঞান তখনো ছিল, জ্যান্ত মানুষকে কেউ পুড়োয় নাকি ? যখন বোঝলাম বাঁচার আর কোন আশাই নাই তখন—

ভোলাই ॥ তার দেহের নীচের দিকটা গঙ্গা জলে ডুবো দেলাম। মাথাটা বাঁধা ঘাটের শানে লাইগা চোট খাইল—তাতেই জ্ঞানটা গেল।

সিরাজ ॥ আ-হা-হা মাথায় চোট খাইল—তাতেই জ্ঞানটা গেল !

শীতল ॥ অন্তর্জলী কইরে রাখলাম তাক। আর তাতেই শান্তি হইল।

ভোলাই ॥ গঙ্গার উপর ছিল ওর বড় বেশী টান সেই গঙ্গায় শেষে প্যায়লো।

সিরাজ ॥ এ যেন গঙ্গাই টাইনা নিল। হ্যাঁ—হ্যাঁ—সাধক, সাধক নইলে আমার এই চরণদাস চলতি চলতি এখানে আইসা থেমে যায় !

নিবারণ ॥ তা তোমরা চইলে আইলে কেন ?

ভোলাই ॥ বাঁচবো এ আশা এতটুক্ থাকলি আমরা থাকি যাতাম। কোন আশা নেই, কোন আশা নেই। সোনার অঙ্গ পচে গয়লে খসে পড়সে।

শীতল ॥ কি লাইগা থাকপো ! কার লাইগা থাকপো। সে কি আর আছে।

সিরাজ ॥ তবে তো যাতিই হয়। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

[নিবারণের সঙ্গে গমনোদ্যত]

ভোলাই ॥ না না তোমরা যাতি পারবে না নে, ক্যান যাবা ? কি দেখতি যাবা ? মাথায় চোট লাগছে ! আমরা তাক মায়রে ফেলেছি।

নিবারণ ॥ জ্যান্ত লোককে এরা গঙ্গায় ভাসা দিছে। এরা খুনী। দাঁড়াও তো সাঁইজি এদের কাছে। আমি যাই, চৌকিদারকে ডাকি আনি।

সিরাজ ॥ [এগিয়ে] আরে শোন্, শোন্, মাথা গরম কইসিনা—তারচেয়ে জিজ্ঞাসা কর—অসুস্থ লোকডার নাম কি, ক আইলো ক্যনথেন। এরাই বা কে ? পরিচয়টা কি ? ও চৌকিদারে কাজ নাই। তাৎ অনেক ঝন্‌ঝাট—চল, চল ওসব না করি আসো ঐ রোগীর কাছে—

[ভোলাই ও শীতলের পলায়ন]

নিবারণ ॥ [হঠাৎ এদিক চেয়ে] আরে এরা যে আবার পলায়া গেল ! এরা নিশ্চয় খুনী—এদের চৌকিদারের হাতে—

[নিবারণকে বাধা দিলেন সিরাজ সাঁই]

সিরাজ ॥ আগে তাড়াতাড়ি লোকডার কাছে যাওয়া দরকার, নাকি, চৌকিদারের কাছে যাওয়া দরকার ! নিবারণ তুই চেরটা কাল—

নিবারণ ॥ আরে ছাড় ছাড় লাগে যে—ছাড় ছাড়—আঃ, কি তোমার গায়ের জোর—চল চল গঙ্গার তীরেই চল। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[মুরশিদ জোলার বাড়ি। মুরশিদ ও তার স্ত্রী ফতেমা গৃহকর্মেরত]

ফতেমা ॥ এই যে শুনতিছ, নিবারণের বাড়ি চটিৎ গিয়ে একবার জেইনে এসো দিকি—সাঁইবাবা আইচেন কি না। মানিকের চোখের ব্যাদনা আর শেলেষ্যাডা খুব ব্যাইরে গেছে।

মুরশিদ ॥ এতো ব্যস্ত হলি কি চলে? কি অবস্থায় সাঁইবাবা গঙ্গার ঘাট থেন তুলি আনি দিছিল—সেটা ভাবি দেক। বাঁচায়ে যে তুলতি পেরেছো এইডে তোমার ভাগ্যি জেনো—

ফতেমা ॥ তা বটে। সে দিনের কতা মনে পড়লি গা আমার সিউরে ওঠে, একটা জোয়ান ছাওয়াল, সারা অঙ্গ মায়ের দোয়ায় পচে গেছে—কি বিভ্রাট—হাতই দেওয়া যায় না, ভাগ্যে মতি সেই দিনই এসে পড়েছিল।

মুরশিদ ॥ সেডাও খোদার দোয়া—নইলে একলা কি তুমি সামলাতি পারতে। কিন্তু ফতেমা বানভাসি মানুষটা নিজের কতা কিছুই মনে আনতি পারতেছে না। ও কার ছাওয়াল, কি নাম ওর, গেরামের নাম কি? বাড়িৎ ওর কেডা কেডা আছে, কথথেন আইছে—এতদিন গেল আমরা কিছুই জানতি পারলাম না। এডা আমার মনকে সর্বদাই পীড়া দেয়।

ফতেমা ॥ আর পীড়া দিয়া কাজ নাই, তুমি যাও তো দেখ সাঁইজি আইলো কিনা, অষুদের ব্যবস্থা করতি হবে তো।

মুরসিদ ॥ কিন্তু ফতেমা, কার কইলজার ধন আমরা চুরি করি ভোগ করতিছি!

ফতেমা ॥ চুরি করি কও কি? খোদার দোয়ায় অরে আমি পাইছি, খবরদার তুমি আবার ওসব কতা সাঁইজিরে বুলতি বসনা—খালি ব্যাদানার কতাডা বুলো।

মুরশিদ ॥ ঠিক আছে, তাই বুলব কিন্তু সাঁইজির কি কিছু বুঝতে বাকী থ্যাক? যাই।

[ঘর থেকে লালন এসে দাঁড়ায়]

ফতেমা ॥ একি বাপজান তুমি? বোসো।

লালন ॥ না ধরতি হবে না, আজ আমি বল পাচ্ছি। কাসিডা থাকি থাকি যখন আসে তখন সামলাতে পারি না। মতিবিবি বুলতিছিলো আসল বসন্ত হলি লোক নাকি বাঁচে না।

ফতেমা ॥ কে বলে বাঁচে না মানিক, এই তো তুমি সাইরে উঠসো।

লালন ॥ হ্যাঁ সেরে উঠেছি তোমারই জন্যে মা, তুমি রাত-দিন আমার কাছে পইড়ে থ্যাকে কি সেবাটাই না করছ,—কিন্তু এত করেও তুমি আমার বাঁ চোখটা রাখতি পারলে না মা। ডান চোখ ঢাকলি এই চোখটাৎ আমি কিসসু দেখি না।

ফতেমা ॥ দুঃখ কোরোনা মানিক, খোদার দোয়াই প্রাণটা যে বাঁচিসে এই ঢের। বাবা তুমি সাত-রাজার ধন—এক মানিক, তোমাকে পেয়ে আমি আর কিসসু চাই না।

লালন ॥ কোথায় যেন আমাকে পেলে ?

ফতেমা ॥ তোমার কিছু মনে থাকে না, কতবার বুলিছি তো বাবা, আমাদের গঙ্গার ঘাটেৎ—

লালন ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—

ফতেমা ॥ ছাওয়াল-পাওয়াল তো আমার নেই; খোদা তাই বুঝি তোমাকে পাঠায়ে দেলেন।

লালন ॥ কোনথ্যেন-কে আমি গঙ্গায় ভ্যয়সে আলাম—এত চেষ্টা কোরছি কিছুৎই মনে কোরতে পারতিছি না, আমি ভ্যেবেই পাই না আমি কে, আমি কেডা ?

ফতেমা ॥ যার বুকের ধনই হও না কেন আমি তোমাকে বাঁচাসি, তুমি আমার, তুমি আমার মানিক। এমন দিন হয়তো আসতি পারে, যেদিন তোমার সব মনে পড়বি, সেদিন কি তুই আমার বুক খালি করে আমাকে ছেড়ে চলে যাবিনি মানিক ?

লালন ॥ সে কি মা, শী বুলছো তুমি ? তোমাকে আমি ভুলতে পারি ? তুমিই বুললে না খোদা আমায় পাঠায়ে দেছে !

ফতেমা ॥ আমি যাই, মতিক দিয়ে তোর দুধটা পাইঠা দিচ্ছি, তারপর আবার হেঁসেলে ঢুকুতে হবি। তোমার বাপজান বুলেছে আজ নাকি সে শহরে যাবি তোমার সঁদিকাশির অষুদ আনতি, আর আমাদের তাঁতের শাড়ির সওদা আনতি।

লালন ॥ মা সাইরে উঠলি আমিও যাবেক বাবজানের সাথে সওদা আনতি। জান মা, ঐ তাঁতের সুতো যাওয়া-আসা দেখতি আমার ভারী ভালো লাগে। লাল, নীল, সবুজ। মা, খালি ইচ্ছা করে বাপজানের সঙ্গে আমুও বইসে পড়ি।

ফতেমা ॥ বেশ তো বসতি তো হবিই, ছাওয়াল তার বাপজানকে সাহায্য করপিনা !

লালন ॥ তাঁতের কাপড় বুনতি শিখলি একটা শাড়ি বুনবোনে তোমার জন্যি, একটা লুঙ্গী বাপজানের জন্যি—আর একটা শাড়ি বুনব তোমার বোনঝি মতির জন্যি—ও আমাকে গান শেখাচ্ছে কিনা। আচ্ছা মা, মতির আর কেউ নাই ?

ফতেমা ॥ কে আর থাকপি বাপ, আমরাই তো ওর বিয়ে দিসি, তার দু-তিন মাস যাতি না যাতি বেওয়া হয়ে গেল।

লালন ॥ বেওয়া কি মা ?

ফতেমা ॥ ওর খসম্—

লালন ॥ খসম্ কি মা ?

ফতেমা ॥ ওর স্বামী রে স্বামী—ওর স্বামী ওক বিয়ে করার পরই কলেরায় মারা যায়।

লালন ॥ ও বিধবা ! আচ্ছা ! মা ওর তো আবার বিয়ে হতি পারে—

ফতেমা ॥ হ্যাঁ বাবা আমাদের সমাজে বেওয়া আবার নিকে করতি পারে। সেঁওড়ের মহাজন মহম্মদ শা ওক নিকে করবার জন্যি পাগল।

লালন ॥ মহম্মদ শা ?

ফতেমা ॥ হ্যাঁরে খুব ধনী, বেশ ভাল অবস্থা। দাসী, বাঁদী, চাকর অনেক লোকজন খাটে। আমরা বুলেছিলাম—ও কিছুতেই রাজী নয়। এমনি ভাত-কাপড়ের দুঃখ নেই ওর—খসম্ কিছু জোতজমা রাইখ্যা গেছে, কিন্তু একা তো, তাই মন খারাপ হলি চলি আসে আমার কাছে, এত দুঃখু, তবু হাসিটুক্ মুখে য্যান লেগেই আছে।

[মতিবিবি ঘর হইতে বাহিরে আসিল]

মতি ॥ এই যে লাগান হচ্ছি আমার নামে—

ফতেমা ॥ লাগাবো কোন দুঃখে, মায়ে ব্যাটায় একটু সুখ দুঃখুর কথা হচ্ছিল।

মতি ॥ দুঃখু আবার কন গো খালা ! তুমি তো এখন বেগম বইনে গেছোগো।

ফতেমা ॥ ও মা তোর মাথা খারাপ হলো নাকি রে ?

মতি ॥ মাথা খারাপ তোমার—তা না হলি কনকার কে এক গংগার ঘাটে কুড়োয় পাওয়া ছাওয়াল সে হল সাত রাজার ধন এক মানিক, আর আমি—আমি হলাম সামান্য মতি—তাও ঝুটো—

লালন ॥ দেখছো মা দেখছো, খালি হিংসে—তুমি যে আমাকে এত ভালো-বাসো ওর কিছুৎই সহ্য হচ্ছে না।

মতি ॥ হচ্ছে নাই তো—হচ্ছে নাই তো, কনকার কে উইড়ে এ্যাইসে জুড়ে বসেসে আমার ভাগীদার হতে চান—না না ওসব চলবিনানে বলে দিচ্ছি—ওঠ ওঠ, অ্যাঁ, আবার কোল ঘেঁসে বসা হয়েছে—ছোট ছাওয়ালের মত !

ফতেমা ॥ ওরে হয়েসে রে হয়েসে—তা তোর হাতে ওডা কি ? দুধ তো। ঝগড়া না কোরে ওটা ওক খেতে দে।

মতি ॥ ওমা ! খালা তুমি কড়াই-এ ডাল বসাইয়া ছেলেকে আদর করতেছো—ডাল যে ধইরে গেল।

ফতেমা ॥ আমি যাচ্ছি। দেখিস তো মতি, সব দুধডাই যেন খায়।

[ফতেমা ঘরের ভেতর গেল]

মতি ॥ খাবে না মানে ? কারে ঘাড়েৎ কটা মাথা আছে যে খাবেন না।

আর তা ছাড়া দুধ না খালি সাঁইবাবার গান যা একটু শুনোই তা ওই পয্যন্তই। নাও খেয়ে উদ্ধার করো।

লালন ॥ না, গান না শোনালে খাব নানে।

মতি ॥ ও বাবা আবার গোঁসা!

লালন ॥ রাগ হবি না! গান শোনাবে না—আর খালি কথায় কথায় বলবি কুড়ো পাওয়া ছাওয়াল!

মতি ॥ তা যা সত্যি তা বুলবো নে? আমাকে যে সকলে বলে বেওয়া, আমি কি তাতে রাগ করি? কি চুপ করে গেলে যে—জবাব দাও।

লালন ॥ আচ্ছা তুমি আবার বিয়ে কর না কেন?

মতি ॥ তুমি আমাক বলবার কে হে? তুমি লোকডা কেডা?

লালন ॥ তা বটে, আমি ভেইবে পাই না আমি কে? আমি কোথাথ্যেন্ এলাম—

মতি ॥ গঙ্গার ঘাটথ্যেন গো।

লালন ॥ কতায় কতায় বল ক্যান গঙ্গার ঘাট থ্যান? ক্যান আমার কি হয়েসিল?

মতি ॥ সে তো অনেক কিছু। তোমার বসন্ত হয়েসিল—সাঁইবাবা তোমাক প্রথম দেখেসিল, তোমার সঙ্গে দুডো লোক ছিল—তারা তোমাক অদ্ধেক শরীর গঙ্গার পাণিৎ ডুবয়ে দিয়েছিল, ঐ কি য্যান কয় অন্তর্জলি করে রাখসিল। নামাতে গিয়ে বাঁধন ঘাটে তোমার মাথা ছেঁচে গিয়েছিল। সে দিনের কথা মনি হলি—তোমার মনে পড়তিছিনে কিছু? আমার গেরামের কথা কয়েছিলাম মনে আছে? কও দিকি আমার গেরামের কি নাম—

লালন ॥ কি য্যান একটা গাছের না ম…ও শ্যাওড়া গাছ—শ্যাওড়া।

মতি ॥ শ্যাওড়া না। শ্যাওড়া গাছে তো পেত্নি থাকে—আমার গেরামের নাম শেঁউড়ে। সেখানে ঈদের সময় খুব বড় মেলা হয়, সেখানে তুমি বলিছিলে যাবে। মনে আছে তোমার? নাও দুধটা ঠাণ্ডা হয়ে যাতিছে, খায়ে নাও। ওমা, রঙ্গ দেখে আর বাঁচিনে! নাও, ধর, হাতে করে ধর।

লালন ॥ উঁহু! হাত ওডা ধরতি চাইছে না!

মতি ॥ বটে, এত সাধ তো বিয়ে করলি পার। খালাক বুলি?

লালন ॥ তুমুও তো করলি পার।

মতি ॥ কাক গো? গংগার ঘাটে—কুড়ো পাওয়া ফুটো পাত্তরেক নাকি?

লালন ॥ না গো, সোনার ঘড়াক, সে সোনা হীরে জহরৎ দিয়ে তোমাক—মুড়ো রাখপি।

মতি ॥ ও মা! এদিক শুনি কিছু জানে না—কিছু বোঝে না—এদিক দেখি খবর ঠিক রাখে! তা এত খবর কার ঠাঁই পেলে গো? আমাক এত ভাল করার সে লোকডা কেডা গো।

লালন ॥ কেন, মহম্মদ শাহ্।

মতি ॥ কেডা বুললো, কেডা বুললো—নিশ্চয়ই খালা, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।

লালন ॥ না না কথায় কথায় বুলতিছিলো মহাজন নাকি তোমার জন্যি পাগল।

মতি ॥ নিজে তো পাগল স্যইজে বসে আছ, আমাকেও কি পাগল করতি চাও? তুমি জান, ওর তিন তিনটে বিবি? নাও, অনেক হ্যয়েছে। আমার ভাল করি কাজ নাই। নাও দুধডা খ্যাই ফেলাও—একটুকুও রাখলি পরে চলবি না নে, চোঁ চোঁ করি খাতি হবে।

লালন ॥ চোঁ চোঁ করি?

মতি ॥ হ্যাঁ, চোঁ চোঁ করি।

[লালন এক চুমুকে দুধটা খেল]

লালন ॥ শব্দডা হ্যয়েছিলো!

মতি ॥ হ্যাঁ হ্যয়েছিলো, না হলি রক্ষি ছিলো? এক্ষুণি আর এক বাটি খাতি হতো, দুধ খাতি হোলি ওই চোঁ চোঁ বাদ্যিটা চাই, গান গাতি হলি যেমন এক বাদ্যি—

লালন ॥ তা হলি একতারাটাক একবার আন না।

মতি ॥ আনতিছি। তার আগে এই আরশীতে তোমার মুখখান একবার দেখ তো—আচ্ছা থাকি থাকি গলায় হাত দাও ক্যান বল তো? কি খোঁজ?

লালন ॥ কি জানি? গলাডা আমার যেন কেমন খালি খালি লাগে। কি যেন গলাৎ আমার ছিল।—কি ছিল বলতো?

মতি ॥ ওমা আমি কয়া দেব! আমি তো তোমাক শুধুচ্ছি, কী? তাবিজ?

লালন ॥ তাবিজ? না ঠিক তাবিজ নয়—কি যেন?—কি যেন,—

মতি ॥ থাক মনে যখন করতি পারছ না—তখন থাক—আর ভাবি কাজ নাই, দেখতো মানিক মুখের দাগগুলো কমে যাচ্ছে না?

লালন ॥ তাই তো—

মতি ॥ কমবিনে! রোজ ডাবের পানি দিয়ে মুখখান ঘষি কি সাধে?

লালন ॥ আমার মুখের বসন্তের এ সব দাগ গুলান তুমি তুলে দেবে?

মতি ॥ সে আমি ভেইবে দেখপোনে।

লালন ॥ কেন, ভেইবে দেখপা কেন?

মতি ॥ সব দাগ তুলি দিলি পর—সুন্দর মুখখান আরও সুন্দর হবিনি—তো দেমাকে তখন আমাদের দিকি চাইবেই না নে।

লালন ॥ ক্যান?

মতি ॥ এই তো তোমাগো স্বভাব।

লালন ॥ তা হলি গানটা ধর।

মতি ॥ আগে দেখি যেটুকু শেখালাম সেটুকু মনে আছে কিনা।

[মতির সহযোগিতায় লালন গায়]

[গান]

কথা কয় রে দেখা দেয় না—
নড়ে-চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনম ভোর মেলে না ॥
খুঁজি তারে আসমান জমি
আমারে চিনিনে আমি
এতো বিষম ভোলে ভ্রমি
আমি কোন্ জন সে কোন্ জনা ॥
রাখ রহিম বলছে যে জন
সে জনা কি বায়ু হুতাশন
শুধালে তার অন্বেষণ
সূর্য দেখে কেউ বলে না।

[লালন গাইতে থাকে—সেই সুর ধরে সিরাজ সাঁইবাবার গাইতে গাইতে প্রবেশ—সঙ্গে মুরশিদ। মতি আড়াল হয়। গান শুনে ফতেমা আসে।]

সিরাজ ॥ আমার হাতের কাছে হয় না খবর
কি দেখতে চাও দিল্লী শহর
সিরাজ সাঁই কয় মানুষ রে তোর
সদায় মনের দ্দম যায় না ॥

তা আমার বেটীর গলা পালাম, সে পালালো কোওয়ানে। এই যে ফতেমা, মতি গেল কোওয়ানে ?

ফতেমা ॥ ওরে ও মতি, সাঁইবাবাক বসতি একটা জায়গা দে—[মতির তথাকরণ)।

সিরাজ ॥ ছাত্তর তো খাসা তেয়ৈরি হয়েছে গো। ম্যাস্টারীতো ভালই হচ্ছে।

মতি ॥ আমি আবার মাস্টারী কি করব সাঁইবাবা, আপনার গান তো না গায়ে পারা যায় না। আপনার গান কখনও রসুই ঘরে, কখনও তাঁত ঘরে গুনগুন করে গাই, তাই হয়ত শুনি থাকপেন। দেখা দেখি নিজেই গান শুরু করেছেন। আমার কি মনে হয় জান সাঁইবাবা, ছোটকাল থেকেই ওর গান করা অভ্যাস ছিল।

ফতেমা ॥ মতি—[মতিকে থামতে ইঙ্গিত]

সিরাজ ॥ এতি দেখি একেবারে একলব্য। তা মতিক গুরু দক্ষিণা কি দেবে বাবা মানিক ? সে তো দিয়েছিলো বুড়ো আঙ্গুল, তুমি কি তাই দেবে ?

লালন ॥ আমি একটা তাঁতের শাড়ি বুনি দেব।

মতি ॥ ওমা আমি আবার গুরু কি ? গুরু তো আপনি, আপনারই গান।

সিরাজ ॥ তা বটে। তা শিকলো কেডা—সে তো তুমি।

মতি ॥ তা গান তো আপনার।

সিরাজ ॥ তা বাবা কটা গান শেখা হলো ? এ গানটা শিকচো ! এ গানটা শিকচো ! আচ্ছা তুমি যখন খুব ছোট তখন থেকেই তো গান কর।

ফতেমা ॥ মতি ওর শরীরডা আজ ভাল নয়। বাবা, ও সব কথা আজ থাক না।

সিরাজ ॥ তুই থাম তো ফতেমা। আচ্ছা, তোর মনের কথা তো আমি বুঝি —ওর মনের কথাডা একটু বুঝতে দে, আচ্ছা মাঠে গরু চরায় যে রাখাল তার বাঁশি শুনিছো? [লালন মাথা নাড়ায়] কেমন লাগে ? ভালো…ঢাকের বাদ্যি শুনিছো, কেমন লাগে—কোথায় শুনিছো, মহরমে—পূজা বাড়িৎ [লালন মাথা নাড়ে] কি পূজা ? দুর্গা পূজা, কোথায় ? [লালনের মাথা নাড়া, ভাবটা মনে নেই] পালা গান শুনিছো—কীর্তন এডা শুনিছ—জয় গৌরাঙ্গ শুনিছো ?

লালল ॥ হ্যাঁ—

সিরাজ ॥ কোথায় শুনিছো বাবা মানিক, মনে করতি পারতিছো না—নবদ্বীপের নাম শুনিছ ?

লালন ॥ হ্যাঁ—

সিরাজ ॥ গিয়েছিলে কখনও ? [লালন মাথা নাড়ে] একা গিয়েছিলে না সঙ্গে কেউ ছিলো, মনে করতি পারতিছো না ! সেখানে কবে গিয়েছিলে, সঙ্গে কে কে ছিলো ?

লালন ॥ আমি কিছুই মনে করতে পারতিছি না, কিন্তু থাকি থাকি যেন অন্ধকারের মধ্যে ঝাপসা আলো দেখি—মনে হয় যেন সেই ভোর বেলা খোল করতাল বাজে—কানের কাছে যেন শুনতি পাই সেই গান। কিন্তু কোথায় শুনিছি, কে শুনায়েছে—নবদ্বীপে আমি গেলাম কবে? কে ছিল সাথে—

সিরাজ ॥ নবদ্বীপে এ গান তুমি নিশ্চয় শুনিছো।

লালন ॥ এ গান আমার জানা, দেখেন এই তো গাইছি—জয়-গৌরাঙ্গ কিন্তু ঐ গান কোথায়—

সিরাজ ॥ তার আগে কোথাও শুন নাই ? সেই শেষবারে গঙ্গার ঘাটে যাবার আগে শোন নাই ? কোথায় ছিলে তখন ? নিশ্চয় বাড়িৎ শুয়ে থাকতি থাকতি শুনিছো। কোন বাড়িৎ ? সেথায় কে কে আছে ?

লালন ॥ আমি কিছুৎই মনে করতে পারতিছি না, মনে করতে পারতিছি না সাঁইজী, কে আমি ?

সিরাজ ॥ খুঁজি তো—চিনি নে আমি। ওরে আমারে চিনিনে আমি, আমি বলে দেব তুই কে ?

লালন ॥ হ্যাঁ আপুনি নিশ্চয় জানেন। বলুন আমি কে ? আমার পরিচয় কি ?

সিরাজ ॥ তুই মনুষ।

লালন ॥ মানুষ—কোন জাতির আমি ? হিন্দু না মোচলমান ? না তো কি ?

সিরাজ ।। জাত তো মানুষের সিরস্‌টি বাবা। তুমি খোদাতালার সিরস্‌টি মানুষ, তুই মানুষের বাচ্চা মানুষ।

লালন ।। কিন্তু আমি যে আগের কথা কিছুই মনে করতি পারতিছি না, সব সময় একডা যেন কালো পরদা। সে পরদা কিছুৎ আমি সরাৎ পারতিছি না, সে পরদা আমার সরা……সরা দেন।

ফতেমা ।। মতি, তুই মানিকরে সকাল বেলাৎ অষুধডা খাওয়ায়েছিলি ?

মতি ।। ওমা, তুলসী পাতার রসডা খাওয়াতি একেবারে ভুলে গেছি।

লালন ।। কি বুললে ?

মতি ।। তুলসী পাতার রস। [লালন মতির হাত চেপে ধরল]

লালন ।। কি পাতার রস ?

মতি ।। ছাড়…তুলসী—

লালন ।। কি বুললে—?

মতি ।। বুলতিছি তো তুলসী, তুলসী, তুলসী।

লালন ।। তুলসী ! একি চোখের সামনি থেকেন কালো পর্দাডা সইরে যাচ্ছে যে ! আমার যে সব মনে পড়ে যাচ্ছে ! পুরীৎ রথে জগন্নাথ দর্শনে যাচ্ছিলাম— হ্যাঁ-হ্যাঁ সঙ্গে ছিল ভোলাই আর শীতল। পথে বসন্ত হল। আমার বাড়ী ভাঁড়ারা গ্রামে, সেখানে আমার মা, আমার তুলসী—আমার নাম লালন কর, লালন কর, লালন কর—

[অন্ধকার। আবার আলো ফুটে উঠল। অন্ধকারের সময় আজান। আজানের পর লালনের প্রবেশ]

লালন ।। বাপজান ! বাপজান ! মতি ! মতি ! বাপজান ! বাপজান ! মতি ! মতি ! মতি, তুমি এখানে —

[মতি এসে দাঁড়িয়েছে]

মতি ।। কেন ? সবতো গুছো দিছি আমি।

লালন ।। বারে, তোমাক বলে যাতি হবেন নে ?

মতি ।। যাক নিশ্চিন্ত হলাম, পাগলামিটা তোমার একেবারে সেরে গেছে মানিক —যাবার সময় যে বলি যাতি হয় সেটাও মনে করতে পারছো।

লালন ।। ঠাট্টা করিতিছ !

মতি ।। না। খালা খুলুক বুলিছো ?

লালন ।। না। বাপজানকে কোথাও দেখতি পালাম না, আর মা'ক বুলতি গেলাম, কোন কথা না বুলে ঘাটে চইলে গেল।

মতি ।। খালাক তো জানি, পাছে কান্নাকাটি কইরে ফেলান তাই বোধ হয় আড়াল চলে গেছেন। এ বেলাডা থাইকে যাও না মানিক—

লালন ।। না, আমার আর এক মুহূর্ত ত থ্যাকইবার সময় নাই। ওদিক আমার মা, তুলসী—

মতি ॥ ও তাই তো, তোমার মা, তোমার তুলসী! এখান তো সব পাতান, তাই তো।

লালন ॥ মতি, অমন বাঁকা করি কথা বুলসো কেন?

মতি ॥ গোস্তাকি মাফ কর মানিক। কপালডা বাঁকা কি না, তাই নিজের অজান্তে কথাও কেমন বাঁকা হয়ে বাইরা আসে, মাফ কর।

লালন ॥ মতি, তোমার ঋণ আমি জীবনে ভুলতি পারব না নে।

মতি ॥ থাক মানিক, ও সব কেতাবী কতা যারা পর তারা অমন বানা বানা বলে কিন্তু—

লালন ॥ আমি তোমাগো আপনার লোক; কি রকমডা করি বুললে তুমি বিশ্বাস করপা বল। মতি আমাক কতা যোগাচ্ছে না—একটা কতা বলি—আমাক ভুল বুঝ না যেন—আমি যাই।

মতি ॥ এইটাক ধর—না, না, লুঙ্গি না, সেই যে তোমার জন্যি যে গামছাডা বুইনে ছিলাম, সেইডা। গামছা হিন্দু মচলমানে সবাই ব্যাভার করে—ওৎ দোষ নাই—বরং যাবার সময় গঙ্গায় ধুই নিই যাও—

লালন ॥ মতি!

মতি ॥ এই দেখ, আবার বেঁকা কতা বুলতেছি, সত্যি মানিক, এ কতা আমি বুলতে চাই না আজ—না আর না। তোমার দেরী হ্যয়্যা যাচ্ছে।

লালন ॥ হ্যাঁ আমি যাই।

মতি ॥ হ্যাঁ যাও। ভুল হ্যয়ছে মানিক। যাও বুলতি নেই—তাই বুলতিছি এ্যাইসো, কেমন?

চতুর্থ দৃশ্য

[ভাড়ারা গ্রাম। লালনের বহির্বাটীর প্রাঙ্গণ। বেলা সকাল দশটা। পল্লীর কিছু লোক একটি ব্যঙ্গ গীত গাহিতে আসিল এবং কিছুক্ষণ গাহিয়া চলিয়া গেল]

গান

তোমরা শুনেছো কি ভাই মরা মানুষ বেঁচে ওঠার ঘটনা
লালন বেঁচে ওঠে ভূত হয়ে আজ, করছে যা তা রটনা,
কত বুজরুকি জানে, ব্যাটা ভণ্ড হনুমান
আল্লা বোল, রাম রহিম আর, জপে হরির নাম,
হিন্দু পাড়ায় মোচলমান ভূত, ভাল কথা নয়।
ধম্ম-কম্ম জাতের বড়াই, সবই হবে লয়—ও ভাই ॥

ভূত ছাড়াতে চল সবাই, দেরী যে আর কোর না,
লাঠির পেটার চোটে ব্যাটা, কেঁদে যে কূল পাবে না,
ভূতের মুখে রাম নাম আজ, বার না করে ছাড়বো না।

[সঙ্গীত রচয়িতা—ডাঃ অবনীকুমার সিংহ মহাশয়ের সৌজন্যে।]

[অন্দর থেকে পুরোহিত রাধামাধব ও সমাজপতি ভৈরব ভট্টাচার্য এবং তাদের পশ্চাতে লালনের মাতা পদ্মাবতী এসে দাঁড়ালেন। বাতায়ন পথে তুলসীও ইহাদের কথাবার্তা শুনছে]

ভৈরব ॥ দেইখ্‌লে—দেইখ্‌লে তো, ব্যাপারডা কতদূর গড়ায়াছে। তোমার কান্নাকাটিৎ আমি ছিলাম, এখন ওদের চোখ এড়া পালাৎ পারলিই রক্ষে।

রাধামাধব ॥ রাধামাধব! রাধামাধব! বুইঝলে ভৈরব ভটচায, লালনের সাথে আমাদের যে দেখা হইল না তা একপ্রকার ভালই হইল।

ভৈরব ॥ তা যা বুলেছো, ছায়া মাড়ালি চান করতি হতো।

রাধামাধব ॥ তুমি আছ কোয়ানে ভটচায, ম্লেচ্ছের বাড়ী, এতেই তো চান করতি হবেন নে। কিন্তু আর কতক্ষণ অপেক্ষা করপো। লালন তো এখনো আইলো না। গানের দল সইরে গেছে, চলো যাই—এ ফাঁকে, আমরা কাইটে পড়ি।

ভৈরব ॥ আর ফিরবে কিনা তাই বা কে জানে! গেরামের লোক এরই মদ্যি. এ কেচ্ছাডা নিয়ে যা গান বাধাছে, এ কেচ্ছার গানই ওক এ গেরামথেন তাড়াপি।

পদ্মাবতী ॥ না না—আপনারা আর একটু অপেক্ষা করেন। ভোলাই আর শীতল ফিরে রটাছিল তারা ওর মুখে আগুন দেছে, গঙ্গায় চিতা ভাসা দেছে। আমার কাছে সেই কতা শুনে লালন ছুটে চলি গেল ওই ভোলাই আর শীতলেরে ধরতি। সে জলস্পর্শ পর্যন্ত করেনি।

ভৈরব ॥ তবে দেখ গিয়ে—একটা খুনোখুনি বেধে গেইছে হয়তো। না হে রাধামাধব, ব্যাপারডা-একেবারেই সুবিধের বুঝছি না, চল চল।

পদ্মাবতী ॥ দাঁড়ান, আপনাদের পায়ে পড়তিছি—একটু দাঁড়ান, বলেন তো এই বিপদে আমি কি করপো?

রাধামাধব ॥ সে আর কয়বার বলপো পদ্মাবতী? শ্রাদ্ধাদি কাজ যখন হইয়া গেছে—তোমার ছাওয়ালকে এখন প্রেত বলি মানতি হবি, তোমার বধূমাতাকও বিধবা হয়েই থাকৃতি হবি।

পদ্মাবতী ॥ লালন জলজ্যান্ত ফেরৎ আইসলো, তবু আপনাদের এই বিধান?

ভৈরব ॥ বিচার করতি হবি কিডা ফেরৎ আইল। আচ্ছা ধরলাম, প্রায়শ্চিত্ত করি তুমি না হয় তার প্রেতত্বডা ঘুচলে কিন্তু তার ম্লেচ্ছত্বডা—তার কি করবা? মোছলমান গৃহে এতদিন অন্নগ্রহণ কইরে—

রাধামাধব ॥ শুধু অন্নগ্রহণ কি বুলতিছ হে? গো-মাংসও কি বাদ গেইছে নাকি? রাধামাধব, রাধামাধব!

পদ্মাবতী ।। আপনাদের বুললাম তো, ওর কোন স্মৃতিশক্তিই তখন ছিলো না।

ভৈরব ।। সে বুলালি শুনতেছি কেডা ?

রাধামাধব ।। অবিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য—

পদ্মাবতী ।। অবিশ্বাস্য অন্যের কাছে হতি পারে, আমার কাছে নয়। লালন কোনদিন মিথ্যা বুলেনাই। শোনেন—আপুনি এ গেরামের পুরোহিত, আর আপুনি সমাজপতি, সমাজের ভয়ে মিথ্যাই যদি সে বুলতো তবে এই মোছলমান ঘরের বসবাসের কতা সে অনায়াসে চাইপা যাতি পারতো, কিন্তু সে তো তা করেনাই, অকপটে সে সব কতাই আমাকে বুলেছে।

ভৈরব ।। রাখো রাখো সত্য কখনও গোপন থাকে না। আজ হয়তো চাপতি পাইরতো কিন্তু দুদিন বাদে বার হইতই, যাক তুমরা এখন ভেইবে দেখ কি করবা।

রাধামাধব ।। ভাবাভাবির আর কি আছে। শাস্ত্রের বিধান তিন দিন গোবর ভক্ষণ কইরে সুবর্ণ ধেনু দান করতি হবি। তবে না হবি তার প্রায়শ্চিত্তির। ঐ প্রায়শ্চিত্তির করি জাতে উঠপি, আর গাঁয়ের সব লোকেরে একডা ভোজও দিতি হবি।

ভৈরব ।। হ্যাঁ তবেই সমাজে লালন ঠাঁই পাবেন নে।

পদ্মাবতী ।। সুবর্ণ ধেনু ! গাঁয়ের সবলোকেরে ভোজ খাওয়ান—কিন্তু এ খরচ কি আমার মত গরীবের পক্ষে সম্ভব !

রাধামাধাব ।। রাধামাধব, যেমন পাপ তেমনি তার প্রায়শ্চিত্তির। যদি এই বিধানে সম্মত হও খপর দিয়ো। আমরা আবার আসপো।

ভৈরব ।। সম্মত না হলি তোমার ধোপা নাপিত আমাক বন্ধ করতিই হবি, সাজে এক ঘরে হ্যয়ে থাকতি হবি। সেও যে কতদিন পারবা জানিনে কারণ হিন্দু-পল্লীতে একডা মেলেচ্ছ পরিবার—এ চলতি পারে না—এ অচল।

রাধামাধব ।। রাধামাধব, হ্যাঁ শেষ কথাডিই বলা হইলো। চলো হে ভৈরব নদীৎ ডুব দিয়ি ঘরে ফেরা যাক। রাধামাধব ! রাধামাধব ! [পদ্মাবতী প্রণাম করতে যায় এবং তুলসী এসে দাঁড়ায়] না না আর পায়ের ধুলো নয়। কিন্তু একি—

[তুলসীর দিকে ভৈরবের দৃষ্টি আকর্ষণ]

ভৈরব ।। একি ! বিধবার হাতে শাঁখা কপালে সিঁন্দুর, এসব কি ?

রাধামাধব ।। এ সব হচ্ছে কি পদ্মাবতী, এ সব কী অনাচার? শাঁখা ভেইঙ্গে ফেল, সিঁন্দুর মুছে ফেইল, শ্রাদ্ধ কুশপুত্তলিকা এসব হ্যয়ে যাবার পর এ পাপ তো চলবি না নে, নরকের ভয় একটু রেখ, জানো এখনো চন্দ্র সূর্যি উঠতিছে।

ভৈরব ।। সঙ ! সব সঙ সাজা হয়েছে। জাত ধর্ম আর থাইকলনা, দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি ! এসব দেখাও পাপ, আসো।

পদ্মাবতী ।। ছাওয়ালডা জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছে তবু কি না—

তুলসী ।। আপনিই বুলেছিলেন মা তাই আমি—

পদ্মাবতী ॥ বুলেছিলাম—আমিই বুলেছিলাম—মন চাচ্ছিলো তাই বুলেছিলাম কিন্তু তাতে যখন পাপই হচ্ছে, নরক বাস হবি বুলতেছে কি আর বুলবো আমি! তুমি যা ভাল বুঝ কর মা।

তুলসী ॥ [আর্তনাদে] মা! [ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছিল]

পদ্মাবতী ॥ [তুলসীকে ধরিয়া মূঢ়ের মত তাকাইয়া থাকে] আমার মাথার ঠিক নাই। কি বুলছি আমি জানি না, তুমি যা ভাল বোঝ কর, ছাওয়াল তো নয় শত্তুর—শত্তুর।

[লালনের প্রবেশ]

লালন ॥ মা!

পদ্মাবতী ॥ বৌমা আজ কি কপাল আমাক। আমি হিন্দু, ছাওয়াল আমার মোচলমান, তুমি হিন্দু, স্বামী তোমার মোচলমান।

লালন ॥ সত্য বুলেই দেখছি আমি মানুষডা হারায়ে গেছি।

পদ্মাবতী ॥ না না তোক কী আমরা হারাতে পারি লালন? ঘর বাড়ী বেচে আমি প্রায়শ্চিত্তির করপো, তুই যে আমার ছাওয়াল রে।

[ভোলাই ও শীতলের প্রবেশ, পশ্চাতে রহিম]

শীতল ॥ না, পেরাশ্চিত্তির আমাক টাকাতিই হবি।

ভোলাই ॥ আইজ আর তোমাক কাছে না বলি পারছি না। বসন্তে বাঁচার আশা নাই দেখে ছোঁয়াছের ভয়েই আমরা ওক গঙ্গার ঘাটে অন্তর্জলী কইরে প্রাণ ভয়ে পালায় আসিছিলাম। পাপ যদি কিছু হ্যয়ে থাকে সে পাপ আমরাও, লালন মারা গেছে এই মিথ্যাডা রটনা করছিলাম আমরাই, পাপ আমাদের, পেরাশ্চিত্তির আমরাই করপো।

লালন ॥ ভাই ভোলাই ভাই শীতল, চোখের সামনে যদি মরতাম আমাক না পুড়োয়ে তোরা পালাত পারতিস না, তাতে অনেক কিছু আমার অজানা থাকত, আমি মিথ্যা বুলি নাই, চুরি করি নাই, খুন করি নাই, তবু আমি অপরাধী। সমাজের বিচারে আমি জাতিচ্যুত, আমি আমার মার পা ছুঁতি পারবো না নে, আমি আমার বোর সাথি ঘর করতি পারবোনা নে। আমি তো আমাক ধম্ম ছাড়ি নাই, অন্য ধম্ম গ্রহণও করি নাই—তা হলি আমাকই বা কি অপরাধ? আমাক মা বৌ এরই বা কি অপরাধ?

ভৈরব ॥ পেরাশ্চিত্তির করলি তো সব মিটি যায়।

লালন ॥ কেন আমি পেরাশ্চিত্তির করপো? আমি কোন অন্যায় করিনাই। ওপরে যিনি আছেন তিনিই জানেন কি অবস্থায় তোরা আমাক ফেলি আসিছিলি, তাত তোমাক অজানা নয়, সেই অবস্থায় আমাক যদি মোছলমান মৃত্যুর মুখ থেকি ফেরৎ আইনে—তা হলি সেডা তাদের অন্যায় হয়লো না। বাঁচাডাই আমাক অন্যায় হয়ল, তার জন্যি ঘর-বাড়ী বেচে সর্বসান্ত হ্যয়ে মা বউক পথের ভিকিরী করি দিতি হপি? এই বিধান? বা বারে চমৎকার! মা, তুলসী…

তুলসী ॥ মা, ওক ছেইড়ে তুমি থাকতি পারবা ? তুমি সংগে থাক না মা।

পদ্মাবতী ॥ কাক সংগে যাবো ? ভিটের নারায়ণকে ফেইলে ঐ মেলেচ্ছর সঙ্গে গেলি ঠাকুরের কোপে আর ওর বাপ পিতামহের অভিশাপে ওরই অকল্যাণ হবি মা।

তুলসী ॥ তবে ওক সঙ্গে আমাক যাতি দাও মা।

পদ্মাবতী ॥ জাত ধম্ম খোয়ায় শ্বশুর কুল ছাড়ি যদি যাতি চাও যাও, আমি বাধা দেব না।

তুলসী ॥ আমি কি করপো ?

লালন ॥ আমি কি করপো ? বুলতি পার, তোমরা বুলতি পার ? আমাক কাছে কী বড় ? জাত ধম্ম না মানুষ ? ও বুঝেছি। ঠিক আছে—[মাকে প্রণাম করতে গিয়ে থেমে যায়]

রহিম ॥ দাদাবাবু, তুমি কি সত্যিই চলে যাবেন নে আমাদের ছাড়ি ?

লালন ॥ ওরে রহিম—আমার কি পরিচয় বুলতে পারিস্ ? আমি কে ? [ছুটে বেরিয়ে গেল।]

তুলসী ॥ মা ও যে চলি গেলা—মা ! মা ! [ক্রন্দনে ভেঙে পড়ল]

পঞ্চম দৃশ্য

[মুরশিদের গৃহ। ফতেমা ও মতি গৃহকর্মে নিযুক্তা, এমন সময় ডাকহরকরা ভুবনের প্রবেশ।]

ফতেমা ॥ কদিন পর তুমি এয়লে, এদিক দিয়ে যাতি মাঝে মাঝে এয়সো। ও মতি, যানা ভুবনকে কিছু গুড়-মুড়ি এনে দে না।

ভুবন ॥ তুমি কবে এলে ?

মতি ॥ তা মাস দুই হয়ে গেল [(মতি ভিতরে চলে গেল)

ফতেমা ॥ আচ্ছা বাবা, আমাদের কোন চিঠি আসে না বাপ ? আইলেই বা পইড়া দিবে কেড্যা ? ঘরে বাইরে তো আমরা সমান মুক্কু।

ভুবন ॥ যদি আসে পাইড়ে দেব আমি, লিখিও দেব আমি, আর সেই জন্যিই তো মুরশিদ চাচা আমাকে পোস্টকার্ড নিয়ে আসতি কয়াছে।

ফতেমা ॥ তাই বুঝি! সে আবার কাক চিঠি লিখপো গো।

ভুবন ॥ কি যেন বুলেছিল, মুনে করতে পারছি না। সেদিন হাটে একডা পইসা দিয়ে বুইলো একডা পোস্টকার্ড আনি দিয়েতো ভুবন। তা কই মুরশিদ চাচা কন গেল গো ?

ফতেমা ॥ কি জানি কনে গেছে, মাথাডাই ওর যেন কি হয়য়া গেছে। তবে ওই লালনকেই চিঠি লিখতি মন করছে।

ভুবন ॥ এই দেখ ! ঠিক ঐ নামডাই চাচা আমাক বুলছিল। বুলছিল, চিঠি দিলি পর পাবিনি ? তা আমি বুললাম, বিনা টিকিট লেখ না কেন—তাও পাবি।

এতেমা ॥ তবে বাবা লেখতো আমার হইয়ে, দুছত্তর লিখি দাও লালনকে।

ভুবন ॥ সে আর এমন কী কতা। এই দেখ, এই যে পেন্সিল এ্য কালী লাগে না, কি সুবুধে বল দেখি। সঙ্গে রাখি কত লোককে চিঠি লিখে দিচ্ছি। ইংরাজের এমন সব কল। (লিখিবার জন্য প্রস্তুত) বল, কি লিখতি হবি, বল ?

ফতেমা ॥ বাবা মানিক আমার—তুমি ভাল আছ তো ? আর কি আমাক কাছে আইসবানা।

ভুবন ॥ শুদ্ধভাবে লিখতি হবি—আসিবে না, 'স' না 'শ' ও তুমি তো (লিখিয়া) হুঁ তারপর ?

ফতেমা ॥ আর আমাক কিছুই লিকবার নাই। লিকিইবা কী হপি ? সে কি আর আসপি !

ভুবন ॥ তা হলি ইতি করি ? তোমার নাম লিয়খে দি ফতেমা।

[মুড়িগুড়সহ মতির পুনঃ প্রবেশ]

মতি ॥ ভুবন দাদা, চিঠি কি আমু লিখতি পারি ?

ভুবন ॥ কেন পারবা না, কোম্পানীর ডাকঘর তবে আছে ক্যান। এই দেখ এত মুড়ি গুড় আইনেছো, এই তো ও বাড়ীৎ খায়া আলাম, তা দাও আনিছো যখন আমার গামছাটাৎ বাঁইধে দাও। দিনটা তো কাটে পথে পথে, দুইপুরের ভাবনাটা কাইটোল'। (মতি মুড়ি বেঁধে দেয়) তা তুমি আবার কাক চিঠি লিখপা গো।

মতি ॥ ক্যান আমাদের ঐ শত্তুরি—

ভুবন ॥ শত্তুর ! সে আবার কেডা ?

মতি ॥ ঐ যে গো লালন। পারবা না নে ?

ভুবন ॥ ক্যান পারবা না ? এখনো অনেক জায়গা আছে। কিন্তু তাক তুমি শত্তুর বলতিছ ক্যান গো ?

মতি ॥ তা লয়তো কি ! লেমকহারাম ! লেমকহারাম ! হুট কইরে এ্যায়লো হুট করি পালায় গেল। এত সেবা যতন কোথায় রইল ? না, কিছু লিকতি হবি না।

ভুবন ॥ এই দেক, সবে উডপেন্‌সিলডা ধরিচি আর তুমি বলতিছ লিকতি হবি না, আমার চুখা পেনপিল ভোঁতা হোয়নি গো।

মতি ॥ (হাসিয়া) আচ্ছা নেক—বেশী কতা নয়, শুধু একডি কতা লিকি দাও—তোমার মতিক মনে আছে কি ?

ভুবন ॥ তারপরই ইতি ?

মতি ॥ এডা তুমি আগেও বুললে, এডার মানে কি ?

ভুবন ॥ ইতি মানে এই,শেষ হয়লো।

মতি ॥ শেষ হয়েলা না তো কি ? সবই তো শেষ হয়লো।

ভুবন ॥ এবার তবে লিখি তোমাক মতিবিবি।

মতি ॥ তোমাক ক্যান গো ? ও আমাক কিডা যে আমি ওর তোমাক হব। শুধু নেক মতিবিবি।

[মুরশিদের প্রবেশ]

মুরশিদ ॥ এই যে ভুবন আইসে গেছ।

ভুবন ॥ হ্যাঁ তুমি যে একডা পয়সা দিয়েছ তাই দিয়ে একটা পোস্টকার্ড নিয়ে আইসি। চাচীর চিঠি লেখা হয়য়ে গেছে আর তা ছাড়া—(মতির দিকে তাকাইল)

মতি ॥ আমি কিছু লিকি নি গো, আমাক নামে কি সব লিকে দিচ্ছে।

মুরশিদ ॥ বেশ তো, বেশ তো, চটপট আমাক হয়েও নিকে দাও ভুবন।

ভুবন ॥ ইংরেজের কি বল দেখতোছা, একডা পোস্টকার্ডে তিন তিনজন চিঠি নিখলো—বাবা মানিক আমাক ভাল আছ তো ? আর কি আমাক কাছে আসিপে না ? ইতি ফতেমা। তোমার মতিক মনে আছে কি ? ইতি মতিবিবি। এবার তুমি কি লেখপা বল চাচা ?

মুরশিদ ॥ কি আর নিখপো ? নেক বাবা মানিক কেন বা এমন কইরে আসিলে কেন বা অমন কইরে চলি গেলে ? ইদিক আসিলে আবার আসপা।

ভুবন ॥ ইতি ?

মুরশিদ ॥ হ্যাঁ, আর কি।

ভুবন ॥ তোমাক মুরশিদ মিঞা ?

মুরশিদ ॥ হ্যাঁ তা ছাড়া আর কি ? বাপজান বলে ডাকাইতো, তা সে থাক।

ভুবন ॥ এবার ঠিকানাডা তাড়াতাড়ি বলো। আমারও বেলা হ্যয়ে যাচ্ছে।

মূরশিক ॥ নেক লালন কর, গ্রাম বুলোছিলো, ভাঁড়ারা, জেলা নদীয়া।

ভুবন ॥ (ঠিকানাটা পড়ে শুনায়) ঠিক হয়েস তো ?

মুরশিদ ॥ তাই তো বুলোছিলো, চিঠিডা তুমি ডাকৎ ফেলি দিয়ো।

তুবন ॥ সে তো দেবুই। আর জবাব এ্যালেও আমিই নিয়ে আসপানে। (মতির দিকে চাহিয়া) সেদিন চাই নারকেল মুড়ি। আজ তাহলে চলি, অনেক চিঠি বিলি করতি হবেনে।

[প্রস্থান]

মুরশিদ ॥ হ্যাঁরে মতি, তুইও নাকি বুইলোছিস ছেইড়ে চইলে যাবি ?

মতি ॥ অনেক আগেই তো যাবার কতা ছিল। মাঝখানে তোমাক সেই সাত রাজার ধন এক মানিক আইসতেই তো সব গোলমাল হ্যয়ে গেল। থাকলি আমাক জোত জমি, ঘরবাড়ী সব দেখবে কিডা, বলো।

মুরশিদ ॥ তা বটে, তা বটে ; যা চলে যা। বানের পানি তো আসে আবার নায়রে যায়, ধরি রাখতি পারে কিডা। সাঁইবাবা আলি বলিস তাঁত ঘরে আছি।

[প্রস্থান]

[সিরাজ ও ফতেমার প্রবেশ]

সিরাজ ॥ ক্যান আবার চিঠি লেখা লেখি। নিজের সাদ্যি নিষ্ঠা থাকলি ঘরের উঠোনেৎ বসেই রাজধানীর খবর পাওয়া যায় গো। ওরে মতি তোর গানডা মনে আছে? 'কেন কাছের মানুষ ডাকছো জোর করে' ঐ গানটাই সাত্যি। মুরশিদ কই?

মতি ॥ তাঁত ঘরে।

ফতেমা ॥ আপনার আলখেল্লাডা তৈয়ার করেছে, আনবো বাবা, দ্যাখপেন অখুনি।

সিরাজ ॥ বুঝলি এই হাঁকু পাকু করি কাড়া-কাড়ি করি কিছু কাড়তি গেলি ঐ কাড়াই সার হয়। তাতে কিছু লাভ হয় নারে। কাছের মানুষ অনুভবে বুঝতি হয়। জোর করি ডাকাডাকি, চিঠি লেখালেখি কেন? এই কাঙালপনা কেন?

[গান গাইতে গাইতে লালনের প্রবেশ]

লালন ॥ কেন কাছের মানুষ ডাকছো জোর করে
আছিস তুই যেখানে, সেও সেখান
খুঁজে বেড়াও কারে ॥
বিজলী চটকের ন্যায়
থেকে ঝলক দেয় রঙমহল ঘরে।
অহর্নিশি পাশাপাশি থেকে দিশে হয় মোরে।

[মতি এসে লালনের হাঁটু ধরে লালনের কাছে কাঁদছে। এসে দাঁড়ায় সিরাজ, মুরসিদ, ফতেমা। সকলের চোখে জল। সিরাজ হাসতে হাসতে গৈরিক বসনটা লালনের গলায় পরিয়ে দেয়।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[নবদ্বীপ রাসের মেলার একাংশ। কীর্তনের আসরে ভোলাই ও শীতলসহ পদ্মাবতী ও তুলসী এসে বসল।]

কীর্তনীয়া ॥—

গান

কি ভাব নিমাই তোর অন্তরে,
মা বলিয়ে চক্ষের দেখা
তাতে কি তোর ধর্ম যায় রে ॥
কল্পতরু হওরে যদি
তবু মা-বাপ গুরুনিধি
এ গুরু ছাড়িতে বিধি
কে তোকে দিয়েছে হাঁ রে ॥

আগে যদি জানলে ইহা
তবে কেন কল্পি বেহা
এখন সে বিষ্ণু-প্রিয়া
কেমনে রাখিব ঘরে ॥
নদীয়ার ভাবের কথা
অবোধ আমরা কি জানি তা
হা-হুতাশে শচিমাতা
বাল নিমাই দেখা দেরে ॥

[সিরাজ, লালন, মতি ও ফতেমার প্রবেশ ।]

কীর্তনীয়া ॥ এই যে সাঁইজি! গৌর কৃপায় এ বছরও দেখাটি হ'ল! জয় গৌরাঙ্গ, জয় গৌরাঙ্গ, জয় গৌরাঙ্গ, ! সঙ্গে এবার নূতন দল দেখছি।

সিরাজ ॥ জয় গৌরাঙ্গ! জয় গৌরাঙ্গ! এবার নূতন গান শোনবেন আমাগো, এই নুতন বাউল লালন ফকির। বইস মা ফতেমা। তোমার লালন আজ ধন্য, গৌরাঙ্গের পায়ের ধূলো এ মাটিৎ মিশি আছে—এখানে রাম রহিম একাকার হয়া গেছে! গাও লালন, তোমর সঙ্গিনীকে নিয়ে গান গেয়ে এ মাটিৎ সালাম কর।

লালন ॥—

গান

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালল বলে, জাতির কি রূপ দেখলাম না এই নজরে ॥
কেউ মালা কেউ তসবীর গলে
তাইতরে জাত ভিন্ন বলে
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কারে ॥
ছুন্নৎ দিলি হয় মুছলমান
নারীর তবে কি হয় বিধান
বামন চিনি পৈতেৎ প্রমাণ
বামনী চিনি কি প্রকারে ॥
জগৎ বেড়ে জাতির কথা
লোকে গল্প করে যথা তথা
লালন বলে জাতির ফাৎনা
ডুবিয়েছি সাধ বাজারে ॥

[লালন, ভোলাই ও শীতলকে দেখিল। তুলসীও পদ্মাবতীর দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু তাহাদের ভাবলেশহীন মূর্তি দেখিয়া থামিয়া গেল এবং আর্তস্বরে গান ধরিল]

গান

লালন ॥—

আর আমারে মারিস নে মা
বলি তোর চরণ ধরে ননী চুরি আর করবো না ॥
ননীর জন্যে আজ আমারে
মারলি গো মা বেঁধে ধরে
দয়া নেই মা তোর অন্তরে
অল্পেতে মন গেল জানা ॥
ছেড়ে দে মা হাতের বন্ধন
যাই আমার যে দিকে যায় মন,
পরের মাকে ডাকবো এখন,
তোমার গৃহে আর থাকবো না ॥

[গান গাহিতে গাহিতে লালন বাহির হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সিরাজ, ফতেমা ও মতি গেল। শ্রোতারা সবাই অনুসরণ করিল, রইল শুধু তুলসী।]

তুলসী ॥ আমার কেউ নাই, আমার কিছু নাই—এ তুমি কী করলা, কতদিন আমি ভেবে ভেবে বাঁচিছি, তুমি যেখানেই আছ আমি সাথে সাথেই আছি। কিন্তু আজ আমি কি দেখলাম? ইঃ আমার গলাৎ তুলসী, বোচকাৎ তুলসী. আমার সর্বাঙ্গে তুলসী—তোমাকে ছাড়ি কি আমি যাতি পারি! এ হবি না—কিছুৎই হতি দিব না, কিন্তু আমি কি করপো? আমি কি করপো? একদিন না তুমি এই মেলাৎ শাখা পরায়ে দিছিলে, এই নাও এই নাও—(শাঁখা ভেঙ্গে ফেলে) সব শ্যেষ হয়্যায়া গেল—

[সব যেন অন্ধকার হয়ে গেল। যখন আলো ফুটল, তখন দেখ গেল—একটি গ্রাম্য জটলা বসেছে।]

রাধামাধব ॥ শুনিছ ভটচায রাস মেলার বেত্তান্ত!

ভৈরব ॥ ছ্যা ছ্যা ছ্যা, সব শুনি আমার মাথাও রক্ত চড়ি গেল। তারপর শুনিছ গানের কেচ্ছা-ডা?

রাধামাধব ॥ হয় হয়—আরে এই তো পরশুদিন গঙ্গাৎ ডুব দিসি। উঠে সবে ইষ্টদেবকে স্মরণ কত্তি যাচ্ছি, কানে এলো একডা কন্দ কাটা ভূতির মত আওয়াজ; দেখি আমাদের ডাকহরকরা ভুবন। আর সে কি কতার ছিরি—না মাতা না আছে মুণ্ডু।

ভৈরব ॥ আমিও শুনাছি এই গানের জালাৎ বাইরি তো তিষ্ঠতি পারতিছি না। আর ঘরেও তাই, আমার ছোট বৌ সে তো আমার কত্তা-বাত্তা শোনে না। ঐ যে তোমরা কি বল, 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' তা বয়স তো অল্প—একডু চপল-মতি।

রাধামাধব ॥ বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা।

ভৈরব ॥ হয় হয় ঐ তরুণী ভার্যা। তা তরুণী তো এখনও হয়ি উঠে নাই।

রাধামাধব ॥ বেশ তো ডাগর ডোগর। তা বয়স কত হইল ?

ভৈরব ॥ এই তের পেরোয় চোদ্দতে পা দেছে। তা ছোট বৌউ গেছিল মেলাৎ—গানের আসরে বসতি পারে নাই, আমার নিষেধ, কেন না ঐ নবদ্বীপি তো সব একাকার, সে দেখে কি মেলাৎ বুসি গান শুনতিছে, ঐ পদ্মাবতী আর তুলসী—তারপর হঠাৎ দেখে কি একডা দাড়িয়ালা লোক একডা একতারা নে, সঙ্গে একজন মিয়ে ছাওয়াল, পাশে বুসে দুজন মুছলমান—গানের কতা শুনিই বুঝিছে যে আরে এতো লালন। তারপর সে কী ক্লেচ্ছা, কান্নাকাটিৎ ছুটোছুটিতে একাকার। ছোট বৌউ বাড়িৎ আসি আমার সাঙ্গি কি ঝগড়া, বলে ক্যান কি দোষ করিছে ওরা, ক্যান ছাওয়াল নিয়ি ঘর করতি পারবি না সে, তা আমি বুললাম পেরাচিত্তির করিলেই সব চুকি যেত।

রাধামাধব ॥ এখনো তো করতি পারে, তার খরচাডা একটু বাড়বো, কারণ পাপটা তো বায়ড়া গেছে কিনা।

ভৈরব ॥ আরে না, লালন ঐ রাস্তা দিয়িই হাঁটবি নানে। ইতি মধ্যি সব চেলা চামুণ্ডা হতি নাগিছে। এক চেলা ওই ভুবন, ওডা একটা চেহারা যেন খরাকি কাটির মাথায় একধা আলুর দম বসালি যা হয়। তা কি গরম! কতায় কতায় বুলবে আমি হলাম রাণীর চাকর, বিলিতিক রাণীক ইংরাজের চাকর। আমার ভয় কিডা। বাড়ি বাড়ি চিঠি বিলি করতি যাব আর ওই সব অনাসিষ্টির গান শোনান হবি বাড়ীর মিয়ে ছাওয়ালেক।

রাধামাধব ॥ কি আর বলবো, সেদিন আমার মেজ নাতিডা আমার পৈত্যে ধরি টানছি আর গাইছে—বামুন চিনি পৈত্যে প্রমাণ/বামনী চিনি কৈ প্রকারে? বোঝ-বোঝ কি অবস্থাডা।

[ভুবনের প্রবেশ]

ভৈরব ॥ অয় অয়—বলতি না বলতি দেখ, এ্যায় এ্যায় ভুবন।

ভুবন ॥ কেডা, আরে এসে দেখি যুগল ভটাচায্যি! পেন্নাম হই।

রাধামাধব ও ভৈরব ॥ থাক থাক হয়েছে, অনেক হয়েছে।

ভুবন ॥ চটছেন ক্যান? চিঠি বিলির কোন গোলমাল হয়েছে নাকি?

রাধামাধব ॥ হয়েছে সেটা চিঠির নয় মাথার—তোমার—

ভুবন ॥ সে তো অনেক কাল। তা নইলে পতে পতে ঘুরে বেড়াই। তা আপনাগো দুজনেক্ একসঙ্গে দেখলি বড় আনন্দ হয়। য্যান রাণীর ছাপ মারা পোস্টোকাট। ঐ চিঠি নিকতি গেলে শুধু ছাপতে চলপিনানে, আবার শুধু পোস্টো-কাটেও না, দুডো একসাথে হওয়া চাই। ঐ রাণীর ছবি আর পোস্টোকাট। তাই বুঝি গেরামের কেচ্ছা সংগ্রহ করতি দুজনাৎ একসাথে চড়ি বেড়ান।

ভৈরব ॥ ঠাট্টা হচ্ছে ? আমু হেলায় গেরামের মাতা। দেখ ভটচায্য, একবার মিলায়ে নাও,, একটু আগে বললাম।

ভুবন ॥ আমাক কার সাথে মিলাবেন! কোথায় হাতী আর কোতায় চামচিকী।

রাধামাধব ॥ ঘোর কলি বুঝলেন। নইলি একডা ডাকহরকরা ব্যাটার এত সাহস—তোমার মুকির উপর কতা বুলে, তোমার ভিটেৎ ঘুঘু চরবে।

ভুবন ॥ তা চরতিছে বৈকি ?

রাধামাধব ॥ এ্যাঁ—

ভুবন ॥ হ্যাঁ। এই দেখেন না ক্যান, আমু যখন যেখান দিয়ে যাই সেডাই তো আমার ভিটে। এই যে আমু এখন এখান দিয়ি যাতিছি আর এই আর এই আপনারা দুজন এখানে চরি বেড়াচ্ছেন—

রাধামাধব ॥ কি এত বড় কথা, আমরা হলুম ঘুঘু ?

ভুবন ॥ ছি ছি ঘুঘু তো আমু। তবে আপনারা দুজনে হলেন গিয়ে বাস্তু ঘুঘু—লোকের ভিটেৎ চরি বেড়ান। আমু তো বুনো ঘুঘু। ঐ রাস্তাঘাট বনে জংগলে ঘুরে বেড়ানই আমার কাজ। যাই—চলি—আমি অজ্ঞান মুরুক্ষু মানুষ, আর বেশি জ্ঞান পাইলে আতেই না জ্ঞান লোপ পায়। আবার সদরে পৌঁছতি হবি ঠিক সময় মত।

[প্রস্থান]

ভৈরব ॥ আচ্ছা দেখা যাবে তোমাক কি করা হয়।

[মহম্মদ সা এবং খোদাবক্সের প্রবেশ]

মহম্মদ ॥ খোদাবকস্, এ লোকডা কি না— ?

খোদা ॥ জী এতো ডাকহরকরা ভুবন।

ভৈরব ॥ আরে এ যে আমাদের মহাজন সাহেব, ও মহাজন সাহেব।

মহম্মদ ॥ আদাব।

ভৈরব ॥ ভাল আছেন তো ?

খোদা ॥ মাথাডা গরম।

মহম্মদ ॥ চুপ কর শালো।

খোদা ॥ আস্তে আস্তে, চটপেন না, গামছাডা তো দেখি শুকোয় গেছে, পুষ্করীনি থেনে ভিজায়ে আনি।

মহম্মদ ॥ হয়ছে—অনেক হয়ছে, তাড়াতাড়ি চল, কুষ্ঠিয়া কোটে যাতি হবি। হোকিমের সাথে দেখা করতি হবে।

রাধামাধব ॥ হোকিম কি আপনাকে তলব দেছেন না কি! মামলাডা কি—

মহম্মদ ॥ আরে যাবো জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে আর হোকিমের কাছ থ্যান দাওয়াই আনাপা।

ভৈরব ॥ ক্যান অসুখডা কি ?

খোদা ॥ ঐ যে বুললাম দেমাক খারাপ।

মহম্মদ ॥ চুপ কর শালো, দেমাক খারাপ তোর বাপের হোক। আর দেমাক ভাল থাকি কি করে—যা সব দেখতিছি আর শুনতাছি, তাত দেমাক খারাপ হইবার কথা।

রাধামাধব ॥ ক্যান দেখলেনডা কি ?

ভৈরব ॥ শুনলেনডা কি ?

মহম্মদ ॥ ঐ যে শুনলেন না ঐ ডাকহরকরার গান !

রাধামাধব ॥ ছিঃ ছিঃ, যা কাণ্ড-কারখানা করতিছে ঐ লালন—ধর্ম রসাতলে যাবি।

মহম্মদ ॥ আর ঐ সিরাজ সাঁই, ঐ ব্যাটা ফকির এর মূলে, হিন্দু মোচলমান সব এক জায়গায় বসি, কি সব কতা। এর একডা বিহিত আপনাক করেন পণ্ডিতমশাই।

ভৈরব ॥ না না, এভাবে চলতি দেওয়া যায় না ভটচায্যি, এর একডা বিহিত হওয়া চাই।

মহম্মদ ॥ হ্যাঁ এর একডা বিহিত করতি হবি। তুই হিন্দু, তুই কি করি নিকে করিস একডা মোচলমান মিয়ে ছাওয়ালেক।

খোদা ॥ হুজুর দেরী হয়ে যাচ্ছে যে—

মহম্মদ ॥ ঠিক আছে। আসছে মাসের গোড়ার দিকি আবার কোটে আসতি হবি তখন একবার মোলাকাৎ করপেন, একডা কিছু করতিই হবি, আদাব।

সপ্তম দৃশ্য

[গোরাই নদীর তীরে সেউড়িয়ায় লালন ফকিরের আশ্রম প্রাঙ্গন, সময় রাত, একটা লণ্ঠন ঝুলছে। ভুবন একা বসে গান গাইছে। মতি এসে দাঁড়াল।]

ভুবন ॥ ভজ মুরশিদের কছম এই বেলা...

মতি ॥ ও ভুবন দাদা ! ও ভুবন দাদা—

ভুবন ॥ এ্যাঁ—

মতি ॥ কতক্ষণ এয়েছো ?

ভুবন ॥ তা বেশ কিছুক্ষণ হয়য়েছে—তোরে এত ডাকাডাকি কইলাম, কনে গেছিলে ?

মতি ॥ ঘাটে। তা কতা বুলতি বুলতি একটু দেরী হয়য়ে গেল, অ কেউ এ্যায়েছিল নাকি ?

ভুবন ॥ না, কিডা আসপি ? ওঃ আর সকলে, তারা এই এ্যাম্নলো বলে।

মতি ॥ না না তারা নয়—কেউ খাবার নিয়ি দিতে এ্যায়ছিলো ?

ভুবন ॥ না, কিডা খাবার নিয়ে আইসপে ?

মতি ॥ একজন ঐ ফকিরির জন্যি মাঝে মাঝে রান্না করি নিয়ি আসে। তা এখনও আইলো না, তাই ভাবতিছি, ঘাটে দেরী হয়া গেল, ফিরি যায় নাই তো ?

ভুবন ॥ আরে না না। আমি তো কখন থিকি বসি আছি, কেউ আলি কতা না বুলি তাক ছাড়তাম।

মতি ॥ কি জানি কি হইল, এত দেরী তো করে না—

[অন্দরে প্রস্থান]

[ভুবন গাইতে লাগল। ক্রমে ক্রমে গরিবুল্যা, সৈজুদ্দিন, মুরশিদ, সনাতন ও কামালুদ্দিন এসে গানে যোগ দিল]

গান

ভজ খুরশিদের গানে এই বেলা,

ওগো যার পেয়ালা হৃদ-কমলে হবে উজ্জ্বল।

নবীজীর সন্ধানেতে

পেয়ালা চারি মতে

দিব থাইকতি

ওরে আমার মনভোলা।

[রহিমের দ্রুত প্রবেশ]

রহিম ॥ ওগো শুনতিছ, এই মাত্র হাটে শুনে আলাম মহম্মদ শার লোকেরা জোলাদের খেপাচ্ছে—বুলছে আমাদের আশ্রম জ্বালায়ে দিবি।

সকলে ॥ এ্যাঁ—

গরিবুল্যা ॥ আরে তুই তো কানেই শুনিস না—তুই শুনলি কি করে ?

সৈজুদ্দিন ॥ দেখলে তো—বুলেছিলাম কিনা—ঐ রকম একডা কাণ্ড হচ্ছে।

গরিবুল্যা ॥ দূর, ও হয়ত কান শুনতি ধান শুনছে।

রহিম ॥ না গো, এ গান শুনা নয়—রীতিমত জোর করি কানে ধইরে শুনোয়েছে সব কতা ! বুলে আগুন লাগা দি'প—

সকলে ॥ এ্যাঁ।

ভুবন ॥ এ তো অহেতুক অত্যাচার—

সকলে ॥ তা নয় তো কি ?

কামাল ॥ সিরাজ সাঁই ফকিরের সময় থাকতি এই ছেঁউড়িয়া গেরামের জোলারা বাউল ফকিরেদের মান্যিমাননা করে।

গরিবুল্যা ॥ তখন কিন্তু এসব অত্যাচার ছিল না মুরশিদ মিঞা।

ভুবন ॥ তা ত ছিল না, একডা সত্যি কথা বুলি—চিঠি বিলি করা তো কাজ আমাক, গতায়তো সব্বত্তর, কে কি বুলতিছে আর ভাবতিছে আমাক চায়া তো বেশী

কেউ জানে না—কি বল চাচা ?! আসল কতা, লালন শুধু মতিকে নিকে কইরেছে বুলেই মহম্মদ শার যত জ্বলুনী-পুড়োনী, বল ঠিক কিনা ?

কামাল ॥ হ্যাঁ তা ঠিক।

ভুবন ॥ তকন থিকেই না ও কত ফিন্দি-ফিকির করতিছে।

মুরশিদ ॥ এর মদ্দি আরও একডা কথা আছে। একডা লোক এ্যায়লো, মাইজি এন্তেকালের সময় তাকেই নিজের খিলকে-ঝোলার অধিকারী কইরে দিল আর এতো এতো লোক আসতিছে, এত ভক্তি-ছেদ্দা করতিছে—শিষ্য হতিছে—এতেও তো হিংসে হয় গো।

কামাল ॥ হ্যাঁ, ঐ মহাজনের এত টাকা থাকিও কিছু হয়লো না—

সনাতন ॥ এ্যায়, ঐ মহাজনকে লোক ভয় পায় বটে, ভক্তিছেদ্দা তো আর করে না।

সৈজুদ্দীন ॥ হয়—তাই তো ওই ধম্ম গেল ধম্ম গেল এই ধূয়ো তুলি লালনকে গাঁ ছাড়া করতি চায়—বুলে কি জান ?

ভুবন ॥ কি বুলে ?

সৈজুদ্দীন ॥ বলে সিরাজ সাঁই ছ্যেলেন মুচলমান ফকির আর লালন ব্যাটা হিন্দু ফকির, ওর শরীরি কাফেরের রক্ত।

মুরশিদ ॥ কার শরীরি কার রক্ত সেডা তো দেকপার নয়, দেখতি হবি কার কি মত, কার কি পত।

সমাতন ॥ এ্যাঁ।

মুরশিদ ॥ আমাগো অনেকের পূর্বপুরুষ এককালে হিন্দু ছিল। তাৎ কি হয়েছে ? লালন বোলে জাত বিচার ছাইড়ে দাও, আমরা সবাই হলাম মানুষ।

সনাতন ॥ হ্যাঁ সেইডাই তো কতা, কিন্তু ঐ মহাজন সে যে অমানুষ।

গরিবুল্লা ॥ কিছুই শুনতি চায় না, কিছুই বুঝতি চায় না। তার গোঁ লালনকে গাঁ ছাড়া করো,—না করলি পর এ গাঁ জ্বালাইয়া পুড়ায় দেবা।

মুরশিদ ॥ এতই সহজ ? গাঁ পুড়োই দিপি ? আমরা এত লোক···

ভুবন ॥ না চাচা তুমি জান না, ওর হাতে শ' দুই লাঠিয়াল আছে।

কামাল ॥ এ্যা লাঠিয়াল ? লাঠিয়াল আমাদেরও দু-চারজন আছে।

সৈজুদ্দীন ॥ তা যদি বল আমরা সবাই লাঠিয়াল।

[লালনের প্রবেশ]

লালন ॥ লাঠিয়াল নয়গো, লাঠিয়াল নয়—বল আমরা সবাই মানুষ।

মুরশিদ ॥ না লালন, সবাই মানুষ লয়, যেমন ঐ মহম্মদ শা।

লালন ॥ মহম্মদ শাও মানুষ, কুয়াশায় ঢাইকে রয়েছে কিনা তাই নিজক দেখতি পাচ্ছে না।

মুরশিদ ॥ গোড়া মুচলমান বুলে।

সৈজুদ্দীন ॥ হ্যাঁ গোড়া মুচলমানরা মানুষ তো নিরচয়, জানোয়ার হয়ে তো আর জন্মাইনি—মানুষ হয়াই জন্মেছি। কিন্তু সে মানুষের একডা জাত থাকপি তো!

লালন ॥—

[কথকতার সুরে]

তাই তো বাঁধিছি, আদিকালে আদমগণ
নানান জায়গায় করতো ভ্রমণ
ভিন্ন আচার ভিন্ন বিচার, তাই তো সিরিষ্টি হয়।
জানতো না কেউ কারো খবর।
ছিল না এমন কলি [illegible]
এক এক দেশে ক্রমে শেষে
গোত্র সৃষ্টি হয়।
আরবি ভাষায় বলে আল্লা
ফারসিতে হয় খোদাতালা
গড বলেছে—যিশুর চ্যালা
ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভাবে।
আগমে নিগমে তাই কয়
গুরুরূপে দীন দয়া হয়
অসময়ে সখা তার হয়
সত্য [illegible]র যে তায় ভজিবে।

[গান] ভক্তের দ্বারা বাঁধা আছেন সাঁই
হিদু কি মুসলমান জাতের বিচার নাই।
শুদ্ধ-ভক্তি মাতোয়ালা
ভক্ত-ফকির জাতে জোলা
ধরেছে সে ব্রজের কালা
সর্বস্বধন তাই।
এক চাঁদে হয় জগ[illegible] আলো
এক বীজে সব জন্ম হলো
লালন বলে মিছে কলহ
ভবে শুনতে পাই।

গরিবুল্যা ॥ ঠিক ঠিক! আর আমাক কোন সন্দেহ নাই সাঁইজি।

সৈজুদ্দীন ॥ মহম্মদ শা যাই বলুক বুলতি দাও। আর আমরা শুনতিছিনে—ভয়ও পাচ্ছি নে।

লালন ॥ ভয় প্যাবি ক্যান? সাঁইজি বুলতেন—আমরা হলাম মানুষের বাচ্চা! আমি একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আমি কেডা, বুলেছিলেন তুই তো মানুষের

সৃষ্টি, তুই খোদাতালার সৃষ্টি মানুষ, মানুষের বাচ্চা মানুষ। আমি বুললাম, আমার ধম্ম—তা বুললেন, ধম্ম মনুষ্যত্ব। তাই তো বলি, ভয় পাবি কেন? মানুষের বাচ্চা কি কখনো ভয় পায়? অন্যায় কি অত্যেচার করপিও না সইপিও না। শোননি হজরৎ মহম্মদের কতা? কেরেশদের অত্যেচারে তিনি তো মাতা খাড়া কইরে লড়াই করেছেন। শুনিছিতো শ্রীচৈতন্যের কতা—কাজী কত অত্যেচারই না করছিল তার উপর; কিছু কি করতি পারলা? কি শিক্ষাই না তাক দিয়েছিল ঐ মাটির মানুষ।

গরিবুল্যা ॥ আমরাও লইড়বো।

সৈজুদ্দীন ॥ হ্যাঁ আমরাও লইড়বো।

লালন ॥ হ্যাঁ তবে এডা হিন্দু মোচলমানের লড়াই নয়গো, এ লড়াইডা হবি অমানুষের সাতো মানুষের লড়াই, মনুষ্যত্বের লড়াই। দেশতো একডা। কি বল দিকি? বলতে পারলে না তো? পৃথিবী গো পৃথিবী। জাত মাত্র একডা। মানুষ। অজাত যদি কিছু কেউ থাকে সে হোল যাক কয় ঐ অমানুষ। জন্তু জানোয়ার। রাত কত হয়ল—অনেক হয়ল তো।

মুরশিদ ॥ রাত হয়েছে, আমরা একন চলি। মতিক বুলো কাল আবার আসপো।

[ওরা চলে গেল। মতি এল।]

মতি ॥ এই যা আবার এখানে বসলে ক্যান? খাবার সময় পেরো গেছে! সাধন ভজনে বৈসবে কখন?

লালন ॥ সে জানেন সাধনসঙ্গিনী, এখন দেকছি সাধনে বেশ টান হয়েছে। ছাওয়াল-পাওয়াল নাই, বইলে আর দুঃখ নাই, বইলে আর দুঃখ নাই, কি বলগো?

মতি ॥ যাও কি যে বল, দুঃকু হয়েছে বুলেছি নাকি কোনদিন?

লালন ॥ মুখে বলনি কিন্তু মনডাতো দ্যাখতাম। কিন্তু ঐ যে বলি, চিনি হওয়া ভাল না চিনি খাওয়া ভাল? পুরুষ প্রকৃতির মিলনের মধ্যি দিয়ে অধরাক ধরতি হয়—ভাটিৎ নয়গো উজানে।

মতি ॥ কিন্তু তবু তো ধরতি পারিনে, দেকতি পাইনে।

লালন ॥ ঠিক বৈলেছ—এত কাছে তবু এত দূরে।

গান

আমি একদিনও না দেখলাম তারে
আমার বাড়ীর কাছে আরশী নগর
(ও) এক পড়শী বসত করে।
আমি একদিনও না দেখলাম তারে।
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে।

আমি বাঞ্ছা করি দেখব তারি
আমি কেমনে সে গাঁয়ে যাইরে।
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
আমার যত যাতনা যেত দূরে।
আবার, সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁকরে ॥

মতি ॥ লক্ষ যোজন ফাঁকরে! যেমন তুমি আর আমি। (মতি হাসিয়া ওঠে, লালন গম্ভীর) নাও এখন ওঠো, দেখতি দেখতি রাত বাইড়ে যাচ্ছে, কাল খুব ভোরে উঠতে হবে না। শিষ্য হোতি আসবে যে একদল মোমিন।

লালন ॥ ভাবছি গুরুগিরিৎ ইস্তফা দেব।

মতি ॥ ইস্তফা দেব, সে কি গো?

লালন ॥ দীক্ষা আর আমি দেব না। ভাববে দ্যাখলাম, দীক্ষা দিতি আমাক অধিকার নাই।

মতি ॥ অবাক করলে তুমি। হাজার হাজার শিষ্য! আজ বুলতিছ এই কতা!

লালন ॥ আমাক জন্ম দিয়েছেন যে মা আর আমাক তুলসী, এরা আজও জাতের বিচারে আমাক পর কৈরে রাখিছে। মতি, নিজের লোকের কাছেই যখন হায়রে গেলাম, পরের গুরু হওয়া আর আমাক সাজে না গো।

মতি ॥ কি যে হয়েছে তোমাক আমু বুঝিনে। সে দেখা যাবে, এখন ওঠো তো, ঘরে যাবে চলো।

লালন ॥ আজ সারাডা রাত আমি বসে থাকপো এই আশমানের তলায়। পৃথিবীর সত্যিকারের রূপ আজ আমি আবার দেকপো।

মতি। ফকির তুমিই তো গাও—

না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেন আশমানে
চাঁদ রয়েছে চাঁদে ঘেরা ঘরের ঈশান কোণে
খুঁজিলে আপন ঘরখানা পাইবে সকল ঠিকানা ॥

তবে?……চল চল ঘরে চল। ঘরে চল—এখানে হিম পড়ছে।

লালন ॥ না না, আমি বসে থাকপো এখানে এই বাইরে। তুমি গিয়ে খেয়ে নাও না। আমি যাব না।

মতি ॥ ওমা সেকি কতা, তোমাক না নিয়ে আমি যাব না। একলা তোমাক এখানে রাইখে যাতি পারবো না আমি। না জানি কি অঘটন ঘটপো।

লালন ॥ কি অঘটন ঘটপো তাই না হয় দেখপো। হু, আমাক তুমি সরভাজা খাওয়াবা বুলেছিলে—নিয়ে এসো এখানে। এমনি সব চাঁদনি রাতে আমার বাড়ির দাওয়ায় বৈসে—কই সরভাজা নিয়ে এ্যাইসো।

মতি ॥ সরভাজা আজ হৈইনি ফকির।

লালন ॥ তৈয়ের করতি পারোনি ?

মতি ॥ তৈরী করতি আমি জানি না।

লালন ॥ কিন্তু সেদিন তো দিয়েছিলে।

মতি ॥ সেদিন আমি তৈয়ের করিনি।

লালন ॥ তা হলে কে করেছিল ?

মতি ॥ যে তৈরী ক'রে আনে সে আসেনি।

লালন ॥ তৈয়ের করে আনে সে কে ?

মতি ॥ সে এক হিন্দু ঘরের রাঁধুনী। সে বুলে, ফকিরেরি খাওয়ালি পুন্যি হয়।

লালন ॥ আশ্চর্য ! আমাক মনের মত খাবার সে কেমন করে তৈয়ের করে !

মতি ॥ তোমাক যা ভাল লাগে সে সব খাবার তো আমি তৈয়ারী করতি শিকিনি। তুমি তোমাক বাড়ির গল্প করতা সে গল্প তো আমি তাক করি, তাই সে আনি দেয়। আজ আমি একডা নতুন রেধেছি তুমি ভিতরে এসো।

লালন ॥ না ! [হাত ছাড়িয়ে নেয়। মতি অবাক হয়]

মতি ॥ মনডা তোমাক আমাৎ নাই ফকির। তুমি না কও, আমি তোমাক সাধন-সঙ্গিনী, ভাবি অধরাকে ধরতি পারি না কেন ? কি কইরে ধরপো ? ভাবের ঘরে তোমাক এত লুকোচুরি ফকির ? এই মন যদি আমাৎ না থাকে তো কি পাব ঐ মন ? আমারে তুমি ছলনা করতিছ ফকির। আমি কি বুঝিনে সব সময় তুমি কি ভাব ? যখন পথ চল, চারিদিকে তুমি খোঁজ ? চোখ থাকে আমাক দিকে আর মন পৈড়ে থাকে কোনখানে ? এ সাধনা তোমাক কোন সাধনা ?

লালন ॥ সাধনা ঠিকই আছে, তুমি ভুল করতিছ।

মতি ॥ বেশ ভুলই যদি হয় তাহলে ক্যান যাচ্ছ না তুমি ঘরে আমার সঙ্গে ? এস বুলতিছি, এস। তুমি আমারে ঠকায়েছ।

লালন ॥ মন আমাক তুই কল্লি একি ইতরপনা ;
দুগ্ধেতে যেমন রে মন তোর মিললো চোনা !

হ্যাঁ আমি তোরে ঠকায়েছি।

মতি ॥ [হঠাৎ হাসিয়া] স্বীকার কৈরেলে তো। ফকির—ফকির, এই জন্যিই —এই জন্যিই আমি তোমাক এত ভালবাসি। সত্যি বুলেছিলে বলেই সমাজ তোমাকে তাড়ায় দিয়েছে। মা, বৌ তোমারে ছেড়ে গেছে, কারো তোমরা কেউ নও, কিন্তু দুঃখ পাচ্ছ তোমরা সবাই। তুমি ফকির, তুমি ভালবাসিছ মানুষকে, কিন্তু আমি সামান্য মেয়েমানুষ, আমার সাধন ভজন সবই তো তুমি—আমি ভালবাসিছি তোমাক, মানুষের কষ্ট তুমি দেখতি পার না। আমি কিন্তু আমাক সব কিছু তোমারে দিতে আসিছিলাম, কিন্তু তুমি কিছুই নিলে না।

লালন ॥ চল মতি চল, ঘরে চল।

[তুলসীর প্রবেশ]

তুলসী ॥ বুইন, বুইন এমন দেরী হয়া গেল। বুইন, বুইন—

লালন ॥ একি চেহারা তোমাক ? [তুলসীকে ধরিতে যায়]

তুলসী ॥ চেহারা, বাঁচি আছি এই যথেষ্ট—

লালন ॥ কিন্তু এখানে !

তুলসী ॥ কনে যাব বুলতে পার ? আমাক যাওয়ার জাগা তুমি রেখে এসছিলে কোন ? থাকার মধ্যি এক মা ছিলেন তাও—শত্রুতা করি সঙ্গে সঙ্গে চলি গেল।

লালন ॥ হ্যাঁ। মা চলি যাবার পর তোমারে আমি কত খুঁজেছিলাম—কোথাও পায়লাম না—

তুলসী ॥ পাবা কোনথেন—পাবা কোনথেন ? একলা বাড়ি থাকি। ভাবছিলাম ভিটেৎ পড়ি মরব, কিন্তু চারিদিকে ফিসফাস। এ এক কতা কয় ও এক কতা কয়, শ্যাষে পালায়ে বাঁচলাম।

লালন ॥ কিন্তু এখানে ?

তুলসী ॥ হ্যাঁ ও পাড়ায় রাঁধুনীর কাজ নিয়েছি। বুঝলা, রাঁধুনীর কাজ। একডা কথার জবাব দিতি পার, কেন আমারে ছাড়ি চলি আয়লে—

লালন ॥ সেদিন আমি কি করতি পারতাম ?

তুলসী ॥ পারতে, অনেক কিছু পারতে। তুমি আমাক জোর করি নিয়ে আসতি পারতে। তুমি তাদের বাধা দিতি পারতে—বাধা দিতে গিয়ে যদি তুমি মৈরে যেতে তাও তোমাক জয় জয়কার হৈতো। তা না কৈরে তুমি পালা এসে ফকিরের ভেক নিলে। এখন তো দিখি তোমাক হাজার হাজার শিষ্য। সবাইকে বুইলে বেড়াচ্ছ মানুষ হও, মানুষ হও,। আমি তো তোমাক কাছে মনুষ নই। আমি তো কেউ নই কিচ্ছু নই—[ভেঙে পড়ে।]

লালন ॥ তুলসী—মতি—তুলসী সব শেষ।

মতি ॥ তুলসী বহিন, বহিন। ধর না, ঘরে নিয়ে চল।

অষ্টম দৃশ্য

[লালনের আশ্রম, সময় রাত্রি শেষ। লালন একা বসে একতারা বাজাচ্ছে।]

গান

এলাহি আলামিন আল্লা বাদশা
আলামপানা তুমি
ডুবায়ে ভাসাইতে পার
ভাসায়ে কিনার দাও কারো,
যা করো সে ইহাও তোমারো
তাই তো তোমায় ডাকি আমি।

[মতির প্রবেশ]

নুহু নামে এক নবীরে
ভাসালে বিষম পাথারে
আবার তারে মেহের করে
আপনি লাগালে কিনারে
জাহের আছে ত্রিসংসারে
আমায় দয়া কর স্বামী।

মতি॥ আইজ কতদিন পর তুমি ফিইরা আয়লে, তুলসীর শ্যাষ কাজ করে তুমি চইলে গেলে। তুমি তো চইলে গেলে, কিন্তু এদিকে চতুর্দিকে কি লেগেছে জান? আগে তবু জানা ছিল মহম্মদ শা এখন আবার শুনি তোমাক গেরামের রাধামাধব আর ভৈরব ভটচাজ তাক সাথে যোগ দিয়েছে। আমাক কতা শুনতিছ?

লালন॥ বল না।

মতি॥ কত কতাই তো বুলি—কোন কতাই তো শুন না। কিন্তু একডা কতা তোমাক শুনতিই হপি। তুলসী বইন—আবার সেই মুক ফিরায়ে ভাবতি লাগলা তো! কিন্তু আজ শুনতিই হপি। আজ দশ দিন তুলসী চইলে গেছে, আমাক বুক ফাটি গেলেও আমি মুক ফুটি বলতি পারি নাই। যখন সে এই আঙ্গিনায় পড়ি যায়—তখনই তুমি বুঝেছিলে যে আমি তাক চিনি, কিন্তু এই কতাডা তুমি আমাক সারা রাইতের মদ্দি একবারও জিজ্ঞেস কর নাই। তাই আমাক মনে হয়েছিল যে তুমি আমাক অপরাধী কইরে ছিলে। সে আমারে দিব্যি করায়েছিল যদি তোমাক তার কতা কিছু বুলি তো তার মরা মুক দেখপো—আমি তোমাক কোনদিন বুলি নাই তবু ক্যান তাক সেই মরা মুখ দেখলাম? সে বাঁচি থাকতে ক্যান বুললাম না। যতদিন সে বাঁচি ছিল ততদিন নিজের কাছে অপরাধী হয়ে ছিলাম। সে চলি গেল, আজ তোমাক কাছে অপরাধী হলাম—আমি কি করপো বুলতি পার? আজ সাঁইবাবা বাঁচি থাকলি—কি ভাবতিছ, আমার কতা শুনতিছ?

লালন॥ চইলা গেল—পালায় গেল!

গান

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতি পারলে মনবেড়ী দিতাম তার পায়,
মন তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তৈরী কাঁচা বাঁশে
কোন দিন খাঁচা পড়বে খসে।
লালন কয় খাঁচা খুলে
সে পাখী কোনখানে পালায়।

নবম দৃশ্য

[সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে নির্জন পথে রাধামাধব, ভৈরব, মহম্মদ শা, খোদাবক্স আলোচনা করছে।]

রাধামাধব ॥ রাধামাধব ! রাধামাধব ! বৌটা মৈরে গেল, আর ও গায়ে বেড়াচ্ছে গান।

ভৈরব ॥ ওর মাথাডাই খারাপ হয়য়া গেছে। মায়ের অভিশাপ লাগছে যে, বুঝলে ভট্‌চায। ব্যাটা ছিল হিন্দু, হল মুচলমান, তা এমন তো কতই হয়েছে—কতই হয়। কিন্তু তার জন্যি অসহায় বুড়ি-মা, যুবতী-বৌ ঘরে একা ফেলে রাখই চৌলি আসতি হবি ? বৌডা বেঘোরে প্রাণ হারালো। বুড়ি মাডা বোষ্টবী হয়ে গেরামের শম্ভু বাবাজীর পদসেবা করতি করতি পরপারে চলে গেল। এডা কী ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মহাজন সাহেব ?

মহম্মদ ॥ তোবা তোবা ! না হেঁদু না মুচলমান। বেজাত বেহুদা, বেৎমিজ।

খোদা ॥ আস্তে আস্তে, চটপেন না। [মুনিবকে হাওয়া করে।]

রাধামাধব ॥ সেদিন দেখছি মাথায় ভিজা গামছা, আজো দেখছি ভিজা গামছা ! ব্যাপারডা কি ? আর আপনার সেই পায়ের ইয়েটা—

ভৈরব ॥ আপনি সেই যে হেকিমি ওষুধডা খাচ্ছিলেন, কিছু ফল হয় নাই ? আর সেই মাথা গরম রোগ এখনও সারে নাই ? কুষ্ঠিয়া কোর্টে যখন দেখা তখন তো বুলেছিলেন হেকিমি ওষুধ খাচ্ছেন।

মহম্মদ ॥ হেকিমি ওযুধ ! ছ্যা, হ্যা, তারক নাম ওষুধ না কি ? মৈনে হয় কতকগুলি গোবর খাচ্ছি।

খোদা ॥ আস্তে আস্তে, চটপেন না। [মুনিবকে হাওয়া করে।]

ভৈরব ॥ মতির মালা কবচ কইরা গলায় পড়ছেন, কি সব ব্যারাম আরাম ? [শয়তানি দৃষ্টিতে শয়তানি ইঙ্গিত করিল।]

মহম্মদ ॥ এ কতা শুইনে আর তো চুপ করি বসি থাকা যায় না—

রাধামাধব ॥ তাত বটেই। আপনি এ অঞ্চলের মাতব্বর, একডা বিহিত তো আপনাকই করতি হয়—

ভৈরব ॥ চলুন না—আজই।

রাধামাধব ॥ একসাথে নয়, আলাদা আলাদা। আজ না—কাল।

ভৈরব ॥ তা হলি মহাজন সাহেব তৈয়ার হন—কাল সন্ধ্যেৎ আপনার কুঠিৎ আবার দেখা হবি—কাল রাতেই কাম ফতে। মতির মালার কবচ গলায় ঝুললি সব ব্যারাম আরাম।

মহম্মদ ॥ হয়। ঐ কতা। সেলাম।

দশম দৃশ্য

[লালন ফকিরের আশ্রম, সময় সন্ধ্যা, মাথায় গামছা মহম্মদ শা ও খোদাবক্সের প্রবেশ অপর প্রান্ত হইতে রহিমের প্রবেশ।]

রহিম ॥ ফকির সাহেব তো ঘরে নাই।

মহম্মদ ॥ সে কি হে? ব্যাপারডা কি! এখনো আসেনি ঘরে? তা মতি বিবি আছে তো? তাক ডাকো। বল মহম্মদ শা এ্যায়ছে।

[রহিমের প্রস্থান]

মহম্মদ ॥ খোদাবক্স তুই বাইরে যা, দরকার হলি ডাকব।

[খোদাবক্সের প্রস্থান। মতির প্রবেশ]

মতি ॥ সেলাম আলেকুম মহাজন সাহেব! বাব্বা! গরীবির বাড়িৎ হাতির পা!

মহম্মদ ॥ খুবই রসিক দেখছি, এ্যাঁ একেবারে রসবতী—

মতি ॥ আপনি আমাক স্নেহ করেন তাই আমাক সত্যি কতাডাকে রসিকতা বলছেন। তা আপনার পায়ের ফোলাডা কেমন আছে?

মহম্মদ ॥ আমাক পায়ের ফোলা? ক্যান আমাক পা ফুলতি যাবি ক্যান?

মতি ॥ তা বটেই তো! ক্যানই বা ফুলতি যাবি। হাতির পা-ডাই যে অমনি। তা—কি মৈনে করে আয়েছেন?

মহম্মদ ॥ যদি বলি তোমাক মনে কৈরে?

মতি ॥ এইবার আপনি রসিকতা শুরু কইরলেন। কিন্তু ওডা কি আপনাক সইবে?

মহম্মদ ॥ ওঃ, তা হলি সোজা কৈইরেই জিজ্ঞাসা করি। বলি কাজডা কি ভাল করিছ?

মতি ॥ কোন কাজডা?

মহম্মদ ॥ এ আমার বেগম না হৈয়ে ফকিরের বাঁদি হওয়া?

মতি ॥ নসীব মহাজন সাহেব, নসীব।

মহম্মদ ॥ নসীব যদি হয় তা সেডা পালটাৎ কতক্ষণ?

মতি ॥ আল্লার কি খেয়াল দেখেন, আপনার বাঁদি না কইরে আমাক ফকিরের বেগম বানাই দিল।

মহম্মদ ॥ ফকিরের বেগম, তা ভাল। বেগমই বটে, ভাঙা কুঁড়ে, কাঁচের চুড়ি, আর দেহে তো দেখছি এই মোটা কাপড়—তা বেগমকে মানায়েছে ভাল। তা বাদশাক দেখছিনে?

মতি ।। তা বাদশাক তো এখন সময় না মহাজন। কোন আরজি থাকলি বেগমকে বৈলে যাও—বেগম সময় মত বাদশার কাছে পেশ করপে।

মহম্মদ ।। ওঃ খুব যে বড় বড় কতা ? আরজি ! তোমাগো এই অনাচার সহ্য করপো না নে।

মতি ।। কিসে অনাচার হল ?

মহম্মদ ।। যে লোকডা কি না মানুষ না, তাক—

মতি ।। তা ঠিক, ও মানুষ না—

মহম্মদ ।। ফেরেস্তা ?

মতি ।। তা আপনাগো যদি মানুষ বলতি হয়, তা হলি ওক আর কি বলি বল।

মহম্মদ ।। আদিখ্যেতা ! শোন মতি, তোমাগো এই অনাচার সহ্য করপো না, তোমাগো কোন ধর্ম নাই। ঐ লোকটাক হিন্দুরা সমাজ থ্যেন বার করে দেছে। ও বিধিমত মুচলমানও হয়নি। আর বাউল ধর্ম বলি যেডা প্রচার করতি চাইছে, সেডা ওর একডা ভাঁওতা। যার ধর্ম নাই, সে আবার মানুষ কি ? আর তার সাথি যে মিয়েমানুষ বাস করে তাক লোক কি কয় মতি বিবি ?

মতি ।। আইন মত এডা আমার বাড়ীৎ, তুমি বের হয়ে যাও মহম্মদ শা—তুমি তিলেক আমার এখানে থাকলি আমার বাড়ীডা দোজক হয়ে যাবি। আমার বাড়ীৎ তোমার মত মুচলমান আর ভৈরবের মত হিন্দুর ঠাঁই নাই। মানুষ বনি যদি আসতি পার তবেই আইসো—এখন বেরো যাও। এখনি—

মহম্মদ ।। যাচ্ছি, কিন্তু বুলে গেলাম নষ্ট লোকগো ঠাঁই নাই এ গেরামে। কি কৈরে কি করতি হয় সে আমি জানি, তোমার ঐ বেগমগিরি যা পার আজই কৈরে নাও।

[নেপথ্যে লালনের গান]

লালন ।। কাশী কি মক্কায় যাবিরে মন চল না।
দোটানাতে ঘুরলে পড়ে
সন্ধ্যেবেলায় উপায় নাই।

মহম্মদ ।। মক্কায় যাওয়াচ্ছি তোমায়।

[মহম্মদের প্রস্থান। লালনের প্রবেশ।]

মতি ।। [একতারা কেড়ে নিয়ে] তুমি কি ?

লালন ।। এক্কেবারে রণচণ্ডী ! ব্যাপারডা কি ?

মতি ।। মহম্মদশাক চৈলে যাতি দেখলে না ?

লালন ।। দেখলাম—আর দেখলাম কিঞ্চিৎ গোঁসাও হয়েছেন, আমার দিকি তাকালেন না !

মতি ॥ কি বৈলে গেল জান ?

লালন ॥ ভাল কতা যে বুলে যায়নি সে তোমাক দেখেই বুঝতি পারতিছি। কিন্তু—

মতি ॥ দেখ, তোমার ঐ দেব্‌তা-দেব্‌তা ভাবডা একটু কম কর ত। তোমার বাড়ীৎ দাঁড়ায়া তোমাক বুল্লো অমানুষ, আমাক বুল্লো যা-তা। তুমি সহ্য করতি পার কিন্তু আমি পারি না। আজ বুঝেছি ও তোমাক কিছু একডা শত্রুতা করবেই। আমাক সুখের ঘরে আগুন জ্বালাবে।

লালন ॥ তা ত করবেই, এতগুলো লোক যদি আমাক কতা শুইনা নিজেগো মানুষ বলে ভাবতি, শেষে আর ওর মুখের উপর দু একডা জবাব-টবাব দেয়, তা হলি ওর রাগ হবি, এ ত নেশ্চয়। এতে এত বেসামাল হলি কি চলে ?

মতি ॥ ওঃ! ওর রাগ হওয়াডা যদি নেশ্চয় হয় তা হলি আমার রানী হওয়াডা অন্যায় হৈল কোন যুক্তিৎ ফকির ? এক এক জনের বেলায় তোমাক কি এক এক যুক্তি ?

লালন ॥ তাইতরে, তুই হলি আমাক বৌ, আর ওডা, ওডার মধ্যি ভগবান পশু-শক্তি দেছেন বেশী করে। তুই যদি ওরই মত রাগে অন্ধ হস, তা হলি তোৎ আর ওৎ তফাৎ থাকে কি ?

মতি ॥ তোমার ওসব কতা আমি বুঝি না। আমি লালন ফকির না। আমি মতিবিবি, পৈড়ে পৈড়ে মার খাতি আমি শিখিনি। ও যদি আমাগো কোন ক্ষতি করে আম্মু ছারপো নানে। তাৎ তুমি আমাক রাখ বা না রাখ।

[কেঁদে দ্রুত যেতে গিয়ে আগুন দেখে থমকায়। ছুটে আসে ভুবন]

ভুবন ॥ ফকির, ফকির সর্বনাশ হয়েসে—আমাক বাড়ীৎ আগুন নাগি গেছে। এক কাপড় সম্বল করি বৌ বেটির হাত ধরি আমি পলায়ে এসেছি। কী আগুনরে —আমার গাই—গরুক নিয়ি আসতি পারলাম না। আমার বাড়ীৎ গেল, আমার গরু গেল।

লালন ॥ চল চল দেখি—[বলেই ছুটে চলে যাচ্ছিল ভুবনের সঙ্গে। এমন সময় রহিম ছুটে এসে চীৎকার করে।]

রহিম ॥ আম্মাজান, রসুই ঘরে আগুন লাগদিছে। শীগগীর আইস !

[রহিম ও ভুবন ভেতরে যায়]

মতি ॥ কি বলেছিলাম, কি বলেছিলাম তোমাক ?

লালন ॥ মতি, তুই ঢুকিস না আগুনের মদ্দি।

[মতি একটা রামদা নিয়ে এসে আবার ঢুকতে যায়, কিন্তু পারে না।]

লালন ॥ [হাতটা ধরে] মতি যাইও না, আগুনির ভিতর কি আছে ? কী হবি ছার জিনিসে ?

মতি ॥ দেইখলে, দেইখলে তুমি, ওরে আমি মহাজনেরে খুন করপো। না হলি ওর ঘরে আগুন জ্বালায়া দিমু।

লালন ॥ পারপি, পারপি তুই? পারপিনে।

মতি ॥ পারপ, আর আমি কিছুৎই ভয় করিনে—

লালন ॥ বেশ, তা হলি আমারে খুন কর—করি দেখা? কাড কাড, না হয় আমাক হাতটাই কাড।

মতি ॥ ওরা যে সব শ্যাষ করি দিল।

লালন ॥ [মতিকে] চল……ওরে চল—

[মতি বেহুঁসের মত তাকিয়ে থাকে]

লালন ॥ ওরে ফাকিরির হাত যখন ধরেছিলি তখন থিকিই তো জানতিস যে আকাশ আমাগো ছাত, পথই আমাগো ঘর—

মতি ॥ কিন্তু কনে?

[মতি কেঁদে ফেলে। লালন তার হাত ধরে গান গেয়ে চলতে শুরু করে।]

লালন ॥ (গান)

আমি আছি কনে, যাব কনে কার সনে
মনের মনে ঠিকানা হল না এতদিনে,
আমার বাড়ী আমার ঘর
বলা কেবল ঝকমারী সার।
পলকে হবে সংহার কোনদিনে,
কি করিলি অনলেতে সব পোড়ালি
বেরথাই চেষ্টা করেও তবু মনুষ্যত্ব পুড়লোনে।
যত দিন বেঁচে রব
সার কথাটা ইহাই কব
মানুষ হল সেরা রতন
ইট বৈ চিনিনে॥

[ঘরে আগুন জ্বলছে। কিন্তু মন প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে। উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে মানুষ দুটি শরণ লাভ করে।]

॥ যবনিকা ॥

॥ সংযোজন ॥

বাঙলার সাধারণ মঞ্চ ও আমি

মন্মথ রায়

মেয়েটা হঠাৎ এমন ক্ষেপে গেল যে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমাকে তরোয়াল দিয়ে আঘাত করতে লাগল।

কিন্তু কথা তা ছিল না। কথা হয়েছিল, আমাকে দেখেই মেয়েটা, আমাকে আক্রমণ করবে বটে, কিন্তু কিছুটা যুদ্ধের পরই ও হেরে যাবে, পড়ে যাবে, মরে যাবে। সেসব না করে মেয়েটাই আমাকে মেরে-ধরে, সত্যি সত্যি ক্ষতবিক্ষত করে তরোয়াল হাতে ছুটে পালিয়ে গেল।

ঘটনাটা সত্যি, কিন্তু লড়াইটা এত সত্যি হওয়ার কথা ছিল না। কথা ছিল আমাকে দেখেই মেয়েটা বাঁশের তরোয়াল হাতে ছুটে এসে বলবে—'তবে রে পাপিষ্ঠ আকবর তুই আমাদের দেশে এসেছিস, আজ তোকে আমি কেটে ফেলবো।' আমি আকবর তাতে বলবো—'তবে রে পাপিষ্ঠা দুর্গাবতী, আজ তোকে আমি বধ না করে যাচ্ছি না।' খুব লড়াই হবে, তবে সেটা, হবে খেলার লড়াই। কথাই ছিল, কোন আঘাত গায়ে যেন কারও না লাগে। চারিদিকে ঘুরেফিরে দুজনেই খুব তরোয়াল চালাবো এবং শেষ পর্যন্ত ঐ রানী দুর্গাবতীই আকবরের পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে। এবং যতক্ষণ লড়াই চলবে পাড়ার ছেলেগুলো কেউ মুখে আর কেউ টিন পিটিয়ে যুদ্ধের বাদ্য বাজিয়ে যাবে। হায়, সে সব তো কিছু হলই না, উপরন্তু দুর্গাবতীর বাঁশের তরোয়ালের খোঁচায় আকবর-আমার গা কেটে গেল কয়েক জায়গায়। এবং যার জন্য বাড়িতে মায়ের হাতে আর এক চোট মার খেতে হল, আকবররূপী শিশু মন্মথ রায়-আমাকে—পঁয়ষট্টি বৎসর আগে আমাদের বালুরঘাট মহকুমা শহরের বাসভবনে। কিছুদিন আগেই বাড়ির পাশে কালীমন্দির প্রাঙ্গণে মথুর সাহার যাত্রাদল 'পদ্মিনী' পালা অভিনয় করে গেছেন। পাড়ার ছেলে-মেয়ে আমরা রাত জেগে বসে সেই পালা দেখছি, আলাউদ্দিন খিলজি রাজপুতনার পদ্মিনীকে ধরে আনতে গেলে যে প্রচণ্ড তরোয়াল-যুদ্ধ হয়েছিল তা আমরা দেখেছি, সেই যুদ্ধে প্রাণমন পাগল-করা যে বাদ্য বেজেছিল তা আমরা শুনেছি। যাত্রার দল পালাগান গেয়ে চলে গেলেও, যে উন্মাদনা আমাদের মনে রেখে গিয়েছিল তারই ফলে বাঁশের তরোয়াল তৈরী করে কোমরে বেঁধে রেখেছি আমরা বহুদিন—সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে দেখা হলেই সেই তরোয়াল কোমর থেকে একটানে খুলে নিয়ে পরস্পরের প্রতি প্রথম সংলাপই ছিল—তবে রে পাপিষ্ঠ, আয়! এবং এতেও তৃপ্ত

না হয়ে দুপাতার একটা নাটকই লিখে ফেললাম আমি। যার নাম দেওয়া হল 'রানী দুর্গাবতী'। যার যুদ্ধেই শুরু এবং অনেক আস্ফালন, অনেক পতন, অনেক উত্থানের পর যুদ্ধেই শেষ। হ্যাঁ, পঁয়ষট্টি বৎসর আগে লেখা 'রানী দুর্গাবতী'ই আমার প্রথম নাটক।

আমার শৈশব, বাল্য, কৈশোর এবং প্রথম যৌবন অতিবাহিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট নামক ছোট শহরে। আমাদের আদি নিবাস ছিল মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল শহরের তিন মাইল উত্তরে 'গালা' গ্রামে। ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে 'গালা' ছেড়ে আমার পিতা-পিতামহ যখন আমাকে নিয়ে চিরতরে বালুরঘাটে চলে আসেন, তখন আমার বয়স বছর ছয়েক। কিন্তু ঐ বয়সেই থিয়েটারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে গেছে। হ্যাঁ ঐ 'গালা'তেই।

'গালাতে' আমাদের পুরোহিত বংশের শ্রীযুক্ত সুরেন ঠাকুর কলকাতার শ্যামাদাস কবিরাজের ছাত্র ছিলেন। ছুটিতে গালাতে এসে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় করার জন্য মেতে উঠলেন। আমার কাকা ছিলেন তাঁর প্রাণের বন্ধু। ঠিক হল, অভিনয় রাত্রে আমাকে শিশু ধ্রুব সাজানো হবে। প্রায় সত্তর বছর আগে 'গালা'র মত একটা ক্ষুদ্র গ্রামে বাঁশ আর তক্তা দিয়ে মঞ্চ বেঁধে থিয়েটার হতে যাচ্ছে, না যাত্রা নয়, একটা সম্পূর্ণ নতুন জিনিস—'থিয়েটার'। এতে গোটা অঞ্চলে লোক মেতে উঠলো। যেদিন থিয়েটার হবে সেদিন আমার ঠাকুর্মা বরদাসুন্দরী আমাকে কোলে নিয়ে বেঁকে বসলেন, আমাকে ধ্রুব সাজানো চলবে না। কে যেন তাঁকে বলেছে, ঐ থিয়েটারে ধ্রুব মানে যাকে বলি দেওয়া হবে। পিতা দেবেন্দ্রগতি এবং পিতামহ গুরুগতি পিতামহীকে বোঝালেন, না না এটা হতেই পারে না। কিন্তু তাতেও পিতামহী বরদাসুন্দরী আমাকে কোল থেকে নামালেন না। নামালেন তখন যখন পিতৃব্য বীরেন্দ্রগতি মায়ের পা ছুঁয়ে শপথ করে বললেন, 'এরকম একটা কাণ্ড হতে পারে না এবং হবে না। এটা থিয়েটার, এতে সত্যি করে কেউ কাউকে মারে না, সবটাই লোক-দেখানো হৈ-হৈ রৈ-রৈ 'খেলা মাত্র।' মঞ্চে ধ্রুববেশে সেই আমার প্রথম অবতরণ। কিন্তু অবতরণের পূর্বেই ঘুমিয়ে পড়ায় সেটা আমার জীবনে একটি কাহিনী হয়েই রয়েছে।

বালুরঘাট হাইস্কুলে আমি যখন ক্লাশ এইট কি নাইন এ পড়ি তখন আমাদের হেডমাষ্টার পণ্ডিত শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ মহাশয় স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন উপলক্ষে ছাত্রদের দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয়ে আমাকে অমল-এর ভূমিকায় নামান। ঐ ভূমিকা তৈরী করার কালে আমি যেন সত্যি সত্যি 'অমল' হয়ে গিয়েছিলাম। কেবলই মনে হত, সেই রাজা কবে আসবেন যাঁর চিঠিও এসে গেল! মা সরোজিনী দেবীকে জিজ্ঞাসা করে শেষে জেনে নিয়েছিলাম, সে রাজা নাকি ঈশ্বর। অমলের সেই বয়সেই রাজার ডাক এসেছিল। কিন্তু আজ এই চুয়াত্তর বৎসর বয়সেও আমার রাজার ডাক কেন আসছে না তাই ভাবি

সে যাক, ঐ অমল-এর ভূমিকায় আমার বেশ নাম হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছিল, ঐ নাটকের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম আমি জেনে নিতে পেরেছিলাম যে, এই জীবনই শেষ নয়—আর একটা জগৎ আছে—সেখানে জীবন-দেবতা রাজা বসে আছেন, তাঁর দিকেই এগিয়ে চলেছি, আর দূরত্বও ক্রমে ক্রমে দূর হচ্ছে।

বাল্যকালেই থিয়েটারের ঝোঁকটা এসে গেল। বালুরঘাটে তদানীন্তন যুবক এবং মধ্যবয়সীদের মধ্যে থিয়েটার প্রীতিটা জোরালো হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন দক্ষ অভিনেতা আশুতোষ ঘোষ, চিন্তাহরণ মুখার্জি, ক্ল্যারিওনেট-বাদক মতিলাল মুখার্জি এবং সংগঠকরূপে একজন কন্ট্রাকটর শশাঙ্কশেখর রায়। অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন উকিল রাধাচরণ ভট্টাচার্য, মোক্তার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিলের মুহুরি সুরেন্দ্রনাথ সেন। পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন ওখানকার শ্রেষ্ঠ উকিল নলিনীকান্ত অধিকারী, আমার পিতা দেবেন্দ্রগতি রায় এবং অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যাদের নাম আজ আর আমার মনে পড়ছে না। বালুরঘাটে একটা স্থায়ী নাট্যশালা গড়ে তোলবার জন্য এঁরা সবাই উঠে পড়ে লাগলেন। সরকারী হাস-পাতালের উত্তর দিকে একখণ্ড জমি এর জন্য সংগৃহীত হল। খুব কাছেই ছিল একটা ইঁটখোলা। সেখান থেকে ইঁট বয়ে এনে তা থিয়েটারের জমিতে ফেলার কাজে আমরা পাড়ার ছেলের দল মেতে উঠলাম! এবং আজ আমার এই বয়সেও পরম গর্ব যে, ওখানে পরে যে স্থায়ী নাট্যশালাটি গড়ে উঠলো তার ভিত-এ আমার বয়ে আনা ইঁট আর তার মেহনৎ আছে। এবং এটাও আমার পরম আনন্দ যে জনসাধারণের সম্পত্তি ঐ স্থায়ী নাট্যশালাটি, প্রথমে 'এডওয়ার্ড' মেমোরিয়াল ক্লাব', এবং দেশ স্বাধীন হবার পর 'নাট্যমন্দির' নামে আজও সগৌরবে বর্তমান। একসময় আমার বাবা এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন বলে মনে পড়ছে, যদিও তিনি অভিনেতা ছিলেন না।

আমার পরবর্তী জীবনে আমিও এর সম্পাদক ছিলাম বেশ কিছুদিন। নাটকে নাচগানের জন্য এবং ছোট-খাটো স্ত্রী ভূমিকা করার জন্য পল্লী-অঞ্চলের নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘর থেকে সামান্য কিছু হাত-খরচ বা বেতন দিয়ে কার্যক্ষম কিছু ছেলে-ছোকরা সংগ্রহ করা হত। তাদের কারও কারও খাওয়া-পরার ভারও নিতেন থিয়েটারের উদ্যোগী পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে কেউ কেউ। আমাদের বাড়িতেও এমনি একটি ছেলে ছিল বেশ কিছুদিন।

ঐ বয়সেই থিয়েটারের সব নাটক লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে শুরু করেছিলাম। পড়েছিলাম গিরিশ গ্রন্থাবলীর নাটকগুলি, রাজকৃষ্ণ রায়-এর নাটকগুলি, অমৃতলাল বোস-এর নাটকগুলি এবং হরিপদ চট্টোপাধ্যায়-এর যাত্রাপালাগুলি। এটা সম্ভব হয়েছিল আমার মা-এর জন্য। তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখতেন, যার একমাত্র পাঠক ছিলেন আমার বাবা। এবং শাড়ী গয়নার আব্দার না করে বাবাকে দিয়ে কেনাতেন চলতি নাটক-নভেল-এর বই—অবসরকালে পড়বার জন্য। বাবার

আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁরও ছিল প্রবল সাহিত্যানুরাগ। কিন্তু বাবা-মা দুজনেই হঠাৎ ক্ষান্ত হয়ে গেলেন সেইদিন যেদিন দেখা গেল, স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় আমি প্রথম স্থান অধিকার করলেও প্রত্যেক বিষয়ে আমি হয়েছি দ্বিতীয়। লুকিয়ে লুকিয়ে নাটক-নভেল পড়াই এর একমাত্র কারণ—যেই সেটা তাঁরা বুঝলেন, নাটক-নভেল মা-র বাক্সবন্দী হয়ে গেল। ১৯১৭ খৃঃ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সকলের আশা ছিল স্কলারশিপ পাব, কিন্তু পেলাম না। পেল আমার এক প্রিয় বন্ধু প্রফুল্ল কুমার দে, যে এতদিন সব পরীক্ষায় দ্বিতীয় হত। বাবা বললেন, এ যে হবে আমি জানতাম। পড়ার বই না পড়ে থিয়েটারের বই পড়লে এমনি যবনিকাই পড়বে।

রাজশাহী কলেজে আই-এ পড়ার সময় কলেজে-র নাট্যাভিনয়ে সুদক্ষ ছাত্র অভিনেতা অন্তিম বোস-এর পরিচালনায় গিরিশ ঘোষ-এর 'পাণ্ডব গৌরব' নাটকে দণ্ডিরাজ-এর ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসা পেলাম এবং নাটক-এর দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলাম। সাহাসটা বেড়ে গেল। কলেজ-এর ছুটিতে বালুরঘাটে ভ্যাকেশন ক্লাব স্থাপন করে পর পর বছর দুই প্রফুল্ল নিয়োগী, দ্বিজেন চক্রবর্তী, নরেন অধিকারী, রামকালী সান্যাল, অনিলশঙ্কর চৌধুরী, জিতেন চৌধুরী তারকেশ্বর গুহ প্রভৃতি বন্ধুদের সহযোগিতায় অতুলানন্দ রায়-এর 'পাণিপথ' এবং ডি এল রায়-এর 'নূরজাহান' প্রভৃতি নাটকও ই-এস-ডি ক্লাব মঞ্চে অভিনয় করে আমরা নামও পেলাম —হাতও পাকালাম।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, শুধু যে হাতই পাকালাম তা নয় নাটক-লেখার সলতে পাকানো সেই থেকেই যেন শুরু হল। ইতিমধ্যে রাজশাহী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই-এ পাশ করে কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে বি-এ ক্লাশে যখন ভর্তি হয়েছি, তখন আমি নাট্যকারও হয়ে গেছি। বক্তিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়ের ঐতিহাসিক কাহিনীকে ভিত্তি করে 'বঙ্গেমুসলমান' লেখা শুরু করেছি। যতদূর মনে হচ্ছে, লিখে ফেলেছি। এবং ভক্ত-কবিদের জীবনী নিয়ে, আর একটি পঞ্চমাঙ্ক নাটক লেখা শুরু করেছি। যতদূর মনে হচ্ছে, খুব সম্ভবত ১৯২০ সালে 'বঙ্গে মুসলমান' নাটকটি আমাদের সেই ভেকেশান ক্লাব-এর প্রযোজনায় এবং আমার পরিচালনায় বালুরঘাটের ই-এস-ডি ক্লাব মঞ্চে অভিনীত হল। সেখানে যেমন আমার উত্তেজনা তেমনি উৎকণ্ঠা। বালুরঘাটে সাধারণত নাট্যাভিনয় হত রাত ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে। পঞ্চমাঙ্কনাটক অভিনয় হতে লাগতো চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা। আমার 'বঙ্গে মুসলমান' সুরু হল রাত দশটায়। পরদিন সূর্যোদয় হল কিন্তু আমার নাটক অস্ত গেল না। বলাবাহুল্য, সূর্য্য উঠতেই দর্শকেরা একে একে যে যার ঘরে ফিরে গেল, নাটকের শেষটায় আর কাউকে দেখা গেল না। বার বার দৃশ্য পরিবর্তন করতে গিয়েই এই বিপত্তি ঘটলো। লোকের সঙ্গে দেখা হতেই মন্তব্য শুনতে লাগলাম, নাট্যকার বটে, সূর্য উঠিয়ে ছেড়েছে। এই বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যটি আমার নাট্যজীবনে সত্য সত্যই সূর্যোদয় ঘটিয়েছে।

১৯২১ সালে ভারতব্যাপী অসহযোগ-আন্দোলন শুরু হল। একমাত্র পুত্র-সন্তান হওয়ায় একদা সংসারের দায়-দায়িত্ব আমাকে বহন করতে হবে বলে বাবার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না যে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ঐ বৎসর বি-এ পরীক্ষা বর্জন করি। বাবার অবাধ্য ছিলাম না কোনদিন। কিন্তু প্রথম দিন পরীক্ষা দিতে গিয়েই যখন দেখলাম সিনেট হাউস-এর সামনে অশ্বারোহী মিলিটারী সৈন্যরা মেয়ে-পিকেটারদের ওপর হামলা চালাচ্ছে, তখন বাবার নির্দেশ মান্য করা আমার পক্ষে আর সম্ভব হল না—পুঁথিপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' ধ্বনি তুলে পিকেটারদের সামিল হয়ে অসহযোগ-আন্দোলনে নেমে পড়লাম। মহাত্মাজীর প্রতিশ্রুতি স্বরাজ আসবার কথা ছিল ঐ বৎসরই ৩১ ডিসেম্বর-এর মধ্যে। পূর্ণোদ্যমে 'ভারত সেবক সংঘ'-এর সভ্যরূপে দেশ-এর কাজে আত্মনিয়োগ করে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর-এর মধ্যে গান্ধীজীর প্রতিশ্রুত স্বরাজ এল না। উপায়ান্তর না দেখে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ দেশনেতারা পরিচালিত 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন' থেকে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। বাবার নির্দেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ-ও পাশ করলাম ১৯২২ খৃঃ। এবং তার পরেই ভর্তি হয়ে গেলাম সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনমিকস নিয়ে এম-এ ক্লাশে। মানুষের জীবনটাই যে কতবড় নাটক হতে পারে জীবন-দেবতার সেই খেলা দেখলাম এখানে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্র ছিলাম। আমাদের প্রোভোষ্ট ছিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক এবং আইন-বিশারদ ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ ডি-এ। নাট্যচর্চার চেয়ে ক্রীড়াচর্চাই তখন আমার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি এ্যাথেলেটিক ক্লাব-এর সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি আমি। ঢাকা ইউনিভার্সিটি ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকও হয়েছিলাম আমি। জগন্নাথ হলের ছাত্রেরা থিয়েটার করবেন। প্রোভোষ্ট ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, 'তোমরা একটা নিয়ম কর—ছাত্রদের নিজেদের লেখা নাটক তোমরা করবে। যারা লিখতে পারো, তারা চেষ্টা করো।' প্রলোভন ত্যাগ করতে পারলাম না আমি। কিন্তু না, এবার আর বড় নাটক না। সূর্য ওঠে কিন্তু নাটক শেষ হয় না, এমন নাটক তো নিশ্চয় না। আর বিশেষ করে ঐ দৃশ্য-বদলের হাঙ্গামা এবার কখনই না। দিন সাতেক-এর মধ্যেই লিখে ফেললাম এমনই একটি নাটক—একটি মাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ—মাত্র দেড়ঘণ্টায় অভিনয়যোগ্য একখানি একাঙ্ক নাটক। বৌদ্ধযুগের পটভূমিকায় ক্ষুদ্র নাটকটি পড়ে ভারী খুশী হলেন আমার সতীর্থ বন্ধু পরিমল রায় [যিনি পরে পশ্চিমবঙ্গের ডি পি আই হয়েছিলেন]। এবং ক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরী [যিনি পরে পশ্চিমবঙ্গের এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল হয়েছিলেন]। এঁরা যখন প্রোভোষ্ট ডক্টর সেনগুপ্তকে জানালেন যে, আমি একটা 'সুন্দর' নাটক লিখেছি, ডক্টর সেনগুপ্ত তখন পরিহাস করে বলেছিলেন, 'ফুটবল-এর নাটক নাকি ? ও তো আমাদের এ্যাথলেটিক সেক্রেটারী। দিওতো, পড়ে দেখবো।'

পড়লেন তিনি। আমায় ডেকে বললেন, আমাকে চমকে দিয়েছো তুমি। অপূর্ব নাটক হয়েছে এটা। কিন্তু এ নাটকে তো ছাত্রদের চলবে না। মাত্র গোটা সাতেক চরিত্র, ছাত্রদের নাটকে চাই অন্ততঃ গোটা কুড়ি পঁচিশ চরিত্র। সবাই পার্ট করতে চায় যে। এ নাটক থাক। তুমি মন খারাপ কোরো না। আমি কলকাতায় যাচ্ছি, দেখি—এই নাটকটা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ছেপে দিতে পারি কি না!

বেশ কিছুটা উৎসাহ পেলাম। এর পরই চলে আসি বালুরঘাটে। ঐ ১৯২৩ সালেরই ৬ নভেম্বরের মধ্যে লিখে ফেললাম আর একখানি একাঙ্ক নাটক। একটি দৃশ্যে এক একটি অঙ্ক। নাম দিলাম 'দেবদাসী'। কবি কহলন প্রণীত 'রাজতরঙ্গিনী অবলম্বনে কাশ্মীরের যুবরাজ জয়াপীড়-এর সঙ্গে পৌণ্ড্রবর্ধনের দেবদাসী কমলার প্রণয়, রোমাঞ্চভিত্তিক একটি কাহিনী। ঢাকায় ফিরে গিয়ে এ নাটকটি যখন নাট্য কর্তৃপক্ষকে দেখালাম, তখন তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর-এর নাট্যরূপ অভিনয় করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলেও জগন্নাথ হলেরই ছাত্র রচিত নাটক বলে সেই সঙ্গে আমার দেবদাসীও অভিনয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ১৯২৩ সালের ২১ ডিসেম্বর এবং ২২ ডিসেম্বর জগন্নাথ হল ড্রামাটিক অ্যাসোসিয়েশন দেবদাসী এবং চন্দ্রশেখর অভিনয় করল। দেবদাসীতে আমি নিয়েছিলাম বিনয়াদিত্যের ভূমিকা।

অভিনয়কালে হঠাৎ আমরা খবর পেলাম, প্রোভোষ্ট ডক্টর সেনগুপ্ত সেইদিনই কলকাতা থেকে ঢাকা ফিরেছেন এবং আমাদের নাটক দেখতেও এসেছেন। শুনে আমার বুক দুরু দুরু করে কাঁপতে লাগলো। প্রথম অঙ্কের বিরতির পরেই দেখতে পেলাম গ্রীণরুমে এসে ঢুকেছেন ডক্টর সেনগুপ্ত। আমাকে দেখেই তিনি বললেন—'না হে, হোল না। ভারতবর্ষে তোমার নাটকটা ছাপা গেল না। তুমি মুষড়ে পড়লে যে! আমি তোমাকে ভাল খবরই দিচ্ছি।' আমি বোকার মত ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

'হ্যাঁ, ভাল খবর ছাড়া আর কি। তোমার নাটকটা আসছে বড়দিনে কলকাতার ষ্টার থিয়েটার প্লে করছে। আর সেই জন্যই নাটকটা ভারতবর্ষে ছাপা গেল না!'—আমার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে ডক্টর সেনগুপ্ত যখন আমাকে এই কথাগুলো বলছিলেন, তখন তাঁর কথা বিশ্বাস করতেই বাধছিল—এত অপ্রত্যাশিত সুখবর ছিল এটা। 'তুমি কাল সকালে আমার বাড়িতে এস, ষ্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষকে একটা অনুমতিপত্র কালই পাঠিয়ে দিতে হবে তোমাকে'—বলে তিনি নাটক দেখতে চলে গেলেন।

পরের দিন ভোরে যেন সূর্য আর উঠতেই চায় না, অথচ যেদিন 'বঙ্গে মুসলমান' আমরা অভিনয় করেছিলাম, সেদিন এত ভোরে সূর্য উঠে গেল যে, নাটক আর শেষ হল না।

ডক্টর সেনগুপ্ত-এর কাছে গিয়ে ঘটনাটা যা শুনলাম সেটা লিখছি। ভারতবর্ষ পত্রিকার কর্তা হচ্ছেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। তিনি আবার ষ্টার থিয়েটার-এর তদানীন্তন পরিচালক, আর্ট থিয়েটার লিমিটেড-এর অন্যতম ডিরেকটার। তিনি

আমার ঐ নাটকটা ডক্টর সেনগুপ্ত-এর কাছ থেকে পেয়ে নিজেই পড়েছেন এবং তাঁর কাছে নাটকটা সব দিক দিয়েই অভিনব মনে হয়েছে। বড়দিনের আসরে তিনি তাঁদের বিজয়-বৈজয়ন্তী কর্ণার্জুনের সঙ্গে আমার ঐ নাটকও মঞ্চস্থ করবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। সেইজন্যই নাটকটা এখন ভারতবর্ষে প্রকাশ করা হবে না। সিদ্ধান্ত হয়েছে। ডক্টর সেনগুপ্তকে তিনি অনুরোধ করেছেন নাট্যকার-এর অনুমতি-পত্র যেন অবিলম্বে তাঁকে পাঠানো হয়। নাটকটির আমার দেওয়া নাম ছিল 'অম্বা' তাঁরা নাককরণ করেছেন 'মুক্তির ডাক'। ডক্টর সেনগুপ্ত-এর খসড়া অনুযায়ী আমি অনুমতিপত্র লিখে সই করে তাঁর হাতে দিলাম। তিনি পত্রটি সেইদিনই ডাক-এ কলকাতার যথাস্থানে পাঠিয়ে দিলেন।

১৯২৩ সালের বড়দিনে মহাসমারোহে 'মুক্তির ডাক'-এর শুভ উদ্বোধন হল। বলাই বাহুল্য, উদ্বোধন উৎসবে আমি উপস্থিত ছিলাম। ষ্টার থিয়েটারের ডিরেক-টার হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ম্যানেজার প্রবোধচন্দ্র গুহ এবং 'মুক্তির ডাক'-এর পরিচালক অহীন্দ্র চৌধুরী ২৩ বৎসর বয়স্ক এই নাট্য-কারটিকে দেখে কিছুটা বাৎসল্যরসে স্নেহপরায়ণ হয়ে উঠলেন। বাংলা সাধারণ মঞ্চ-এর সঙ্গে আমি সর্বপ্রথম সংযুক্ত হলাম। দীর্ঘ নাটক লিখে যে সূর্যোদয়-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, সে সূর্য আমায় করেছিল ব্যঙ্গ। সেই ব্যঙ্গের ভয়ে এবার লিখলাম ক্ষুদ্র নাটক। এতেও হল সূর্যোদয়, হল আমার ভাগ্যের আকাশে। সেদিন সেটা বুঝিনি, বুঝেছিলাম পরে। যখন 'মুক্তির ডাক' নাট্য-ইতিহাসে বাংলা একাঙ্ক নাটক-এর প্রবর্তকরূপে সম্মানিত হল।

'মুক্তির ডাক' ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হল বটে কিন্তু জনপ্রিয় হল না। তদানীন্তন কালে অন্যতম শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী কৃষ্ণভামিনী প্রধান চরিত্র অম্বার ভূমিকায় অবতরণ করেছিলেন, পার্শ্বচরিত্রগুলিতেও সুদক্ষ নট-নটীর সম্মেলন ছিল। নবাগত নাট্যপ্রদীপ অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনা প্রতিভদীপ্তও ছিল, কিন্তু 'মুক্তির ডাক' জনপ্রিয় হল না। নাটকটি নাকি অশ্লীলতা দোষদুষ্ট এরূপ অপবাদও শোনা গেল। যদিও এই অপবাদের প্রতিবাদ করেছিলেন তৎকালে সাহিত্যের স্বাস্থ্য পরিদর্শক-রূপে আখ্যাত প্রবীণ সমালোচক সাহিত্যিক রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর। তিনি আমাকে এক পত্র লিখেও জানিয়েছিলেনঃ 'আপনার এই প্রথম উদ্যম সফল হইয়াছে। আপনার গ্রন্থরচনা সার্থক হইয়াছে।' তৎকালীন বহু প্রচারিত নাট্য পত্রিকা 'শিশির'—বঙ্গাব্দ ১৩৩০/১৩ পৌষ শনিবার সংখ্যায় লিখলেনঃ

'ছোট্ট একখানি ছবির মত বই! এক দৃশ্যে সম্পূর্ণ। ভারতবর্ষে বৌদ্ধপ্রভাত যখন অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, আপামরসাধারণ ভগবান বুদ্ধের শরণ লইয়া মুক্তিমার্গের সন্ধানে ছুটিয়াছিল—আখ্যায়িকাটি সেই সময়কার। একটা কুহেলিকাবৃত শ্রান্তির পথে চলিতে চলিতে যেদিন নাটিকার চারিটি নায়ক নায়িকা হঠাৎ যখন মেঘমুক্ত সূর্যের রূপ দেখিতে পাইল, তখন তাহাদের জীবনের গতি এক ভীষণ অভিশাপ-তরঙ্গে নিমজ্জিত হইয়া গেল। তখন বুদ্ধের মুক্তিমন্ত্র গ্রহণ করা

ছাড়া আর কাহারও কোন উপায় রহিল না। শেষ পর্যন্ত দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে এই নাটিকাখানি।'

নাটকটি জনপ্রিয় হচ্ছে না আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরে খানিকটা অবাকই হলাম। কারণ, নাটকটি দেখতে ঢাকা থেকে কলকাতায় এলে নাটকের শুভ উদ্বোধন-এর পূর্বে অত বড় ঔপন্যাসিক ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত-এর কাছ থেকে যে শুভেচ্ছাবাণী পেয়েছিলাম তাতে তিনিও লিখেছিলেনঃ 'মুক্তির ডাক' বাংলার নাট্য-সাহিত্যে একটা নূতন পথ ধরিয়াছে তাহা সবাই স্বীকার করিবে। অত ছোট একাঙ্ক এক-খানা নাটকের ভিতর ঘটনা ও বাক্যের সমাবেশ দ্বারা তুমি চরিত্রগুলি এমন সুন্দর-ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছ যে, ইহাতে অনেক পাকা পুরাতন সাহিত্যিক রীতিমত হিংসা করিতে পারেন। গল্প গাঁথিবার ক্ষমতা তুমি ভালোরূপেই দেখাইয়াছ।'

তবু দেখা গেল নাটকটা দর্শকরা নিচ্ছেন না। অভিনয় চমৎকার, সাজসজ্জা নিখুঁত, শুধু দর্শকদের সাড়া মিলছে না। অধিকাংশ দর্শকই বলছেন, এ আবার কি নাটক, এল—আর গেল!' স্পষ্ট বোঝা গেল, চার-পাঁচ ঘণ্টার নাটক দেখতে অভ্যস্ত দর্শকরা মাত্র দেড় ঘণ্টার এই নাটকটিতে আত্মস্থ হতে পারছেন না। ঘটনার স্রোত এত দ্রুত যে, দর্শকরা যেন তাল সামলাতে পারছেন না। ম্যানেজার প্রবোধ গুহ মহাশয় হরিদাস বাবুকে বললেন—'এ যুগের নাটক এটা নয়।' কিছুকাল পর নাটকটিকে ষ্টার মঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হল। শ্রদ্ধেয় হরিদাসবাবুর যেন মনে হল, এটা তাঁরই পরাজয়। চোখ-মুখ দেখে মনে হল, তিনি মনে বেশ ব্যথা পেয়েছেন। আমার তো কথাই নেই। হরিদাসবাবু আমাকে বললেন—'বইটা আমি ছেপে দিচ্ছি। পাঠকরা কি বলে দেখা যাক। আপনি একখানা পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখুন তো। আমি দেখাচ্ছি চলে কিনা।'

এই সহানুভূতি, এই মহানুভবতা যে কোন যুগে যে কোন দেশে বিরল। 'মুক্তির ডাক' শীঘ্রই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশ করলেন। ছোট্ট একখানি বই, দাম মাত্র ছয় আনা। আমার প্রথম মুদ্রিত নাটক—আমার নাট্যজীবনের প্রথম স্মরণীয় স্তম্ভ। হরিদাসবাবু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বইটি সমালোচনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। ফল হল যেমন অভাবনীয়, তেমনি বিস্ময়কর। বঙ্গাব্দ ১৩৩১ সালের আষাঢ় সংখ্যায় বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা প্রবর্তক লিখলেনঃ 'মুক্তির ডাক' নাটকখানি ক্ষুদ্র হইলেও প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। পড়িতে পড়িতে মেটারলিঙ্কের 'মনাভিনা'র কথা মনে পড়ে যায়। নাটকখানি ঠিক সেইরূপই। নাটকখানিতে পাকা হাতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে।'

কিন্তু সব চেয়ে যা আমাকে তখন অভিভূত করেছিল, শুধু তখনই বা কেন আমার সারাটি জীবন অভিভূত করে রেখেছে, তা হচ্ছে একখানি ছোট চিঠি। লিখেছিলেন তৎকালীন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক, বাংলা সাহিত্যে

স্বনামধন্য বীরবল তথা 'সবুজপত্র' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী। এবং এ চিঠি তিনি লিখেছেন সম্পূর্ণ অখ্যাত, অজ্ঞাত আমাকে প্রকাশক গুরুদাস চ্যাটার্জি এ্যাণ্ড সন্স-এর ঠিকানায় ঃ

২০, মে ফেয়ার
বালীগঞ্জ, ১৩।৭।২৪

সবিনয় নিবেদন,

আপনি শুনে খুসি হবেন যে, 'মুক্তির ডাক' আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনার নাটকখানির মহাগুণ এই যে এখানি যথার্থই একখানি ড্রামা। বাংলা সাহিত্যে ও জিনিষ একান্ত দুর্লভ। নাটককে আমরা দৃশ্যকাব্য বলি। কিন্তু যা যথার্থ নাটক তা শুধু দেখবার বস্তু নয়, পড়বারও জিনিষ। সত্য কথা বলতে গেলে পৃথিবীর অধিকাংশই নাটক আমরা পড়বার বই হিসাবেই জানি, অ্যাকটিং পিস হিসেবে জানিনে। আমরা চোখে না দেখলেও মানসচক্ষে সে সব নাটকের অভিনয় দেখতে পাই। 'মুক্তির ডাকের' অভিনয়ও আমি মানসচক্ষে দেখেছি এবং তাই দেখেই বলছি যে 'মুক্তির ডাক' একখানি যথার্থ ড্রামা।

বাংলা সাহিত্যে নাটক এক রকম নেই বল্লেই হয়। আশা করি আপনি আমাদের সাহিত্যের এ অভাব পূর্ণ করবেন। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরীর এই পত্রখানি শুধু আমার মনেই যে একটি প্রত্যয় সৃষ্টি করেছিল তা নয়, পুত্র সম্পর্কে আমার বাবার মনেও এনে দিয়েছিল পরম প্রতীতি। পুত্রের নাট্যচর্চার জন্য যে পিতা এতদিন ছিলেন বিরক্ত, তিনি এখন হলেন গর্বিত। চিঠিটা পড়ে আমাকে ডেকে বলেছিলেন—'তা-না-হ্যাঁ তুমি লিখে যাও।'

তা লিখতে লাগলাম। জগন্নাথ হল থেকে প্রকাশিত ছাত্রদের বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা 'বাসন্তিকা'। বঙ্গাব্দ ১৩৩২ সালের সংখ্যাটিতে প্রকাশিত হল আমার একাঙ্ক নাটক 'সেমিরেমিস'। এরও একটি দৃশ্যে এক একটি অঙ্ক। ইতিহাসের আদিমযুগে রাণী সেমিরেমিস ভারত-আক্রমণ করেছিলেন এই এক অস্পষ্ট ঐতিহাসিক কাহিনীকে কল্পনার রং-এ রাঙ্গিয়ে নাটকটা লিখি। এখন মনে হয় লেখকের প্রথম যৌবন যে রোমাণ্টিক রসে সাধারণতঃ আচ্ছন্ন থাকে এটা ছিল সেই উচ্ছ্বাস। কিন্তু এই নাটকটাও আমার কাছে আর এক অচিন্ত্যনীয়, অপ্রত্যাশিত সম্পদ হয়েছিল। যা আজও আমার নাট্যজীবনে অক্ষয় স্তম্ভ হয়ে রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৪ সালে এম-এ এবং ১৯২৫ সালে বি-এল পাশ করে ১৯২৬ সাল থেকে বালুরঘাট মহাকুমা শহরে আমার বাবার বাসনা পূর্ণ করে

ওকালতি পেশা নিয়েছি। যদিও নাটক লেখাটাই তখনও দারুণ নেশা হয়ে রয়েছে। হরিদাসবাবু আমাকে একটি পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক লিখে তাঁকে দিতে বলে ছিলেন একথা সর্বদা স্মরণে রয়েছে, কিন্তু পঞ্চাঙ্ক নাটকে বিশাল দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আমি তখনও ভীত এবং ত্রস্ত। কলকাতায় তদানীন্তন সাধারণ নাট্যশালায় যে সকল পঞ্চাঙ্ক নাটক আমি দেখেছিলাম তার মধ্যে ষ্টার থিয়েটারে অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' এবং নাট্যমন্দিরে যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' আমাকে অভিভূত করেছিল সত্য কিন্তু ঐ নাট্যসৃষ্টির প্রধান চমক ছিল ষ্টার-এর অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস এবং নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমার প্রমুখ নবাগত নাট্য-শিল্পীদের অভিনয়ের নবনাট্য-রীতির সমৃদ্ধি। সাহিত্যরস কিন্তু এই নবনাট্য-সৃষ্টিতে কিছুটা উপেক্ষিত আমার মনে হয়েছিল।

তদানীন্তন বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সাহিত্যরস-সমৃদ্ধ নাট্য-রচনা-সাধনায় একাঙ্ক নাটকই আমার কাছে বরণীয় মনে হওয়ায় হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সস্নেহ আহ্বান সত্ত্বেও আমি বঙ্গাব্দ ১৩৩২ থেকে বঙ্গাব্দ ১৩৩৪ সাল পর্যন্ত পুরো তিনটি বৎসর একাঙ্ক নাটক রচনার সাধনা করি, এবং তার ফলে তদানীন্তন বাসন্তিকা, সবুজপত্র, ভারতবর্ষ, কল্লোল এবং বিচিত্রা প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপত্রিকাগুলিতে আমার যে একাঙ্ক নাটকগুলি প্রকাশিত হয় তার মধ্যে ইলা (বাসন্তিকা। ১৩৩১) রাজপুরী (ভারতবর্ষ। ১৩৩২) মাধুরী (সবুজ পত্র। ১৩৩২) যজ্ঞফল (সবুজপত্র। ১৩৩২) কালরাত্রি (ভারতবর্ষ। ১৩৩২) লক্ষহীরা (ভারতবর্ষ। ১৩৩৩) অরূপ রতন (ভারতবর্ষ। ১৩৩৩), অজগরমণি (কল্লোল। ১৩৩৩), স্মৃতির ছায়া (বাসন্তিকা। ১৩৩৩), কাজলরেখা (শিশুসাথী। বার্ষিকী ১৩৩৩), বিদ্যুৎপর্ণা (ভারতবর্ষ। ১৩৩৩), রকা (কল্লোল। ১৩৩৪), উইল (ভারতবর্ষ ১৩৩৪), হ্যারিকেন (বিচিত্রা। ১৩৩৪), বহুরূপী (ভারতবর্ষ। ১৩৩৪), ভারতী (ভারতবর্ষ। ১৩৩৪), সাহিত্য-সমাজে উচ্চ প্রশংসিত এবং সমাদৃত হয়। এই সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্পাদকদের কাছ থেকে ঐরূপ নাট্য-রচনার জন্য আমার কাছে তাগিদপত্র আসতে থাকায় তার প্রমাণ মেলে।

আমার 'সেমিরেমিস' নাটক-এর কথায় ফিরে যাচ্ছি। তখন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম দেশ এবং জাতির চিত্ত জয় করে ফেলেছেন। তাঁর নাম তখন বাঙালীর ঘরে ঘরে প্রীতি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত। ৪।৭।২৭ তারিখে লেখা তাঁর একখানি চিঠি পেয়ে আমি ধন্য হয়ে গেলাম। এ চিঠিখানি তাঁর বহু জীবনী গ্রন্থে আদ্যপান্ত প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র একখানি চিঠি কোন একজন লেখককে কি পরিমাণ উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাতে পারে (যা আজ আমার এই চুয়াত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে রয়েছে) তা বোঝাতে হলে সেই পত্র থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা মার্জনীয় হবে বলে মনে করি ঃ

নন্দ চৌধুরী লেনের সেই সুশ্রী ছিপছিপে তরুণের চোখে অপ্রকাশ প্রতিভার যে আয়োজন দেখেছিলাম তার পরিপূর্ণ বিকাশের সমারোহ আজ আমাকে শুধু

বিস্মিত করেনি পুজারী করে তুলেছে। একবুক কাদা ভেঙ্গে পথ চলে এক দীঘি পদ্ম দেখলে দু'চোখে আনন্দ যেমন ধরে না তেমনি আনন্দ দু'চোখ পুরে পান করেছি আপনার লেখায়—এ বললে আপনি কী মনে করবেন জানি নে, তবে আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়ে ভালো করে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই বলে লজ্জা অনুভব করছি।......পবিত্রের [সাহিত্য-সারথি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়] মারফৎ আপনার প্রথম লেখা পড়ি—মুক্তির ডাক। পড়ে, আমার কেমন লাগে পবিত্র লিখতে বলেছিল। ইচ্ছা করেই লিখিনি। সূর্যকে অভিবাদন করতে পারি—কিন্তু তাকে উজ্জ্বলতর করে দেখানোর মতো আলো ও অভিমান আমার নেই। আজো আপনার শক্তিকে অন্তর দিয়ে নমস্কার জানাচ্ছি, তার প্রশংসা করিনি। আপনাকে প্রশংসা করার শক্তি আমার নেই।...সেমিরেমিস পড়ে কী যে আনন্দ পেয়েছি তা বলে উঠতে পারছিনে যতবার পড়ি ততবারই নতুন মনে হয়। আজ ইওরোপে জন্মালে আপনার প্রশংসায় দশদিক মুখরিত হয়ে উঠতো। ঈর্ষার এবং ততোধিক ঈর্ষাতুর সাহিত্যিকের দেশে আপনার যোগ্য আদর হয়নি দেখে বিস্মিত হইনি একটুও। দুঃখিত যতই হই।

ইলা'ও আমার বুকে কম দোলা দেয় নি—কিন্তু 'সেমিরেমিসে' আমি যেন তলিয়ে গেছি। এত বড় সৃষ্টি। দুঃসাহসের দিক থেকে বলছিনা—এর সৃষ্টির সার্থকতার ও পরিপুর্ণতার দিক দিয়ে বলছি—আমায় আর কারুর কোনো লেখা এত বিচলিত করেনি।

এই সময়ে আমার পরম শুভানুধ্যায়ী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় একখানি পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক লেখার জন্য আবার তাগিদ দিলেন। তাঁদের আর্ট থিয়েটার লিমিটেড তখন মনোমোহন থিয়েটার-এরও কর্তৃত্ব অর্জন করেছে। ঐ মনোমোহন থিয়েটারেই আমার নাটকটি প্রদর্শন তাঁর ইচ্ছা। বালুরঘাটে ওকালতি কাজে তখন আমি বেশ জড়িয়ে পড়েছি। তবু একটা পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক লিখতে উদ্যোগী হলাম।

এতকাল আমাদের পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরসের আধিক্য এবং প্রাবল্য দেখা গেছে। সুরটা বদলাতে ইচ্ছা হল। লৌকিক পুরাণ মনসামঙ্গল থেকে চাঁদসদাগর ও বেহুলার আখ্যানটি বেছে নিয়ে চাঁদসদাগরকে একটি বিদ্রোহী বাঙালীরূপে চিত্রিত করার সাধনা চলল। নাটকটির কাঠামো তৈরী করে চলে এলাম কোলকাতায়। উঠলাম আমার দাদামহাশয় ঐতিহাসিকপ্রবর পুজ্যপাদ রামপ্রাণ গুপ্তের স্নেহনীড়ে। তিনি লোকসাহিত্যেও ছিলেন পরম পণ্ডিত। 'বাঙালীর ব্রতকথা' নামক একটি গ্রন্থের লেখকও ছিলেন তিনি। মনসাপুজার রীতি নীতি তাঁর কাছেই পাওয়া গেল এক মাসের কম সময়েই নাটকটি লিখিত হয়। ১৯২৭ সালে ১৪ সেপ্টেম্বর বুধবার মহাসমারোহে মনোমোহন মুক্তিলাভ করল। চাঁদসদাগরের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী এবং বেহুলার ভূমিকায় সুশীলা নাটকটিকে প্রথম রাত্রেই এমন অপরিসীম জন-

প্রিয়তায় অভিষিক্ত করেছিলেন যাতে নাট্যকাররূপে আমার ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা অনেকটা অবধারিত হয়ে গেল, হ্যাঁ এই কথা বলেই যে লোকটি এতে সবচেয়ে সুখী হয়েছিলেন, নাট্যভবিষ্যৎদ্রষ্টা সেই হরিদাস চট্টোপাধ্যায় আমাকে অভিনন্দন জানালেন। চাঁদসদাগরের ভূমিকায় নাট্যপ্রদীপ অহীন্দ্র চৌধুরীর অপরূপ অভিনয় এবং অতুলনীয় রূপসজ্জা নাটকটিকে যেমন দিল এক অপূর্ব মর্যাদা, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সমালোচনা এক তরুণ নাট্যকার-এর পঞ্চাঙ্ক নাটক প্রণয়নের এই প্রথম প্রয়াসকে তেমনি দিল অকুণ্ঠ প্রশস্তি। নিম্নে উদ্ধৃত সমালোচনাগুলি অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে ঐ সময় নাট্যজগতে একটা নতুনত্বের চাহিদা জোরালো হয়েছিল। নাট্য গবেষকদের কাছে এই কয়েকটি উদ্ধৃতি প্রয়োজনীয় হতে পারে ঃ

নাচঘর—৬ই আশ্বিন, ১৩৩৪—নাটকখানি শুধু মনোমোহনেই নতুন নয়, নাট্যসাহিত্যেও নতুন। পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনায় তাঁর এই প্রথম চেষ্টাই এতটা জয়যুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে দেখে আশা হচ্ছে যে, বাঙলা দেশে অন্ততঃ একজন এমন নাট্যকার জন্মেছেন যিনি ভবিষ্যতের রঙ্গমঞ্চকে কু-নাটক অভিনয়ের দায় হতে রক্ষা করতে পারবেন।

কল্লোল—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪—বাংলার নাট্যসাহিত্যের অত্যন্ত দৈন্য। নাট্যসাহিত্যে নতুন প্রতিভার অত্যন্ত প্রয়োজন। সে প্রতিভা শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়-এর কাছে আশা করা যেতে পারে। তার কলমের কাজ শুধু সূক্ষ্ম নয় জোরালো ও রঙদার······নাটকটিতে শক্তির ছাপ আছে। ভবিষ্যতে তাঁর হাত থেকে অনেক কিছু আশা করা যায়।

আত্মশক্তি—৪ঠা কার্তিক, ১৩৩৪—নাটকখানি আমাদের ভাল লেগেছে নাট্যকারের চরিত্রাঙ্কণ ও ঘটনাসংস্থাপনের প্রশংসনীয় দক্ষতায়। আর আমাদের মুগ্ধ করেছে তার সৃষ্ট বেহুলার চারু চিত্রটি। পুরাণোল্লিখিত কল্পনার তুলিতে তিনি যে রঙ ফলিয়েছেন, তা বাস্তবিকই অনিন্দ্যনীয়।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'—২৬।৯।২৭—কি ভাষার দিক দিয়া, কি চরিত্রাঙ্কনে প্রকৃত শিল্পীর রসবোধের বহু পরিচয় তিনি দিয়াছেন। বাঙলার প্রাণের বেদনা-করুণা ও অশ্রুমাখা অতীত স্মৃতি এই 'চাঁদসদাগর' শত শত দর্শককে পরিতৃপ্ত করিবে সন্দেহ নাই।

"The Bengalee" in its issue of October 18th, 1917—Once in a while a play is produced which theatre-goers love to witness over and over again, which leaves the heaten track and carves out of a path of its own, which is hailed as something out of the ordinary—such a play is undoubtedly Mr. Manmatha Ray's 'CHANDSADAGAR'

যাক, সাধারণ নাট্যশালার নাট্যকাররূপে, এমনি করেই আমার জীবনদেবতা আমাকে চিহ্নিত করে দিলেন। আর তা যখন দিলেন তখন এ উপলব্ধিও আমার এল সাধারণ নাট্যশালার ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হতে হবে আমাকে। সে ঐতিহ্যটি কি ? নাটকের মাধ্যমে সমাজসংস্কার এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। শুধু স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামও নয়, অত্যাচার নিষ্পীড়ন, শোষণ এবং দুঃশাসন এর বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম। নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েই মনে হল, যে সুযোগ দিয়ে জীবন-দেবতা আমাকে চিহ্নিত করলেন তার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আমি প্রথমে ঐতিহাসিক নাটকের পথে না গিয়ে পৌরাণিক নাটকের আবরণে সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রকাশ করবার ব্রত গ্রহণ করলাম। আমার প্রথম দেশাত্ম-বোধক নাটক 'দেবাসুর' ঋগ্বেদে দেবাসুর সংগ্রামে যে সুপ্রচুর ইঙ্গিত রয়েছে তারই ভিত্তিতে পরিকল্পিত, দধীচির আত্মদান কাহিনী অবলম্বিত এই নাটক ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনয় করেন অপরাজেয় অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী।

দীর্ঘ এক সেতুপ্রান্তে বন্দীকৃত দেবগণের মুক্তিপণ নির্ধারণ করলো খেয়ালী বৃত্রাসুর, নদীস্নানার্থী দধীচির নিকট এই বলে ঐ পৌলমী যে দেবতার মুক্তি চেয়ে তার নাম উচ্চারণ করবেন, তিনি যদি, আপনি যতটুকু সময় নদীতে ডুব দিয়ে থাকবেন, সেই সময়টুকুর মধ্যে ঐ সেতুপথে নদীর পরপারে চলে যেতে পারেন, মুক্ত হবেন তিনি। আপনি ডুব দিয়ে ওঠার পর—আমাদের এপারে যে দেবতাকে পাব তৎক্ষণাৎ হত্যা করবো তাকে—সে ইন্দ্রই হোন আর যেই হোন। এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

দধীচি স্বীকৃত হলেন, নদীতীরে গিয়ে জলেনামতে নামতে বললেন, 'আমি ডুব দিলাম শচী। তুমি নাম উচ্চারণ কর, যদি পার অন্ততঃ একজন দেবতারও জীবন রক্ষা কর। আজ না হয়, এক যুগ পরে সেই দেবতার ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অসুরের অত্যাচার হতে দেবভূমিকে রক্ষা করে দেবভূমির শৃঙ্খলপাশ ছিন্ন করবে—সেই আশাতে আমি ডুব দিলাম—আমার জাতি অক্ষয় হোক—আমার জাতি অমর হোক—আমার জাতি জয়লাভ করুক।'

সব দেবতাই ক্রমে ক্রমে ওপারে চলে গেলেন। দধীচি সেই যে ডুব দিলেন, আর উঠলেন না। সে যাত্রায় দেবগণ এমনি করে রক্ষা পেলেন এবং এই দধিচীর অস্থি থেকে নির্মিত বজ্র-অস্ত্রেই দেবরাজ ইন্দ্র বধ করলেন বৃত্রাসুরকে। দেবতার হৃত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার হল।

১৩৩৫ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকা লেখেনঃ পরাধীন ভারতের মর্মকথা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নাটকের মধ্যে সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। বিশেষ-ভাবে আত্মত্যাগী দধীচির চরিত্র অতি মহান হইয়াছে। এই নাটকখানি বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৩৩৫ সালে পৌষ সংখ্যায় 'কল্লোল' লেখেনঃ—"নাটক প্লাবিত বঙ্গদেশে মাঝে মাঝে যে দুই একখানি নাটক স্বীয় বৈশিষ্ট্যে কলারসিকের মনোহরণ করে, 'দেবাসুর' তাহারই একখানি। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, সুললিত ভাষা গৌরব, অপূর্ব চরিত্রচিত্রণ নাটকখানিতে অপরূপ রূপদান করিয়াছে। শৃঙ্খলতা নির্যাতিতা দেশজননীর মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা কোনওখানে নাটককে ক্ষুণ্ন না করিয়া জাতিকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বৃত্রাসুর, বলাসুর, শচী এবং দধীচির চরিত্র চতুষ্টয় দর্শক ও পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করিবে। শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের নাটক লেখার নিজস্ব ভঙ্গী এই নাটকে বর্তমান। নাটকখানি মাত্র পাঁচখানি অঙ্কে সমাপ্ত।

আমার আর এক দেশাত্মবোধক পৌরাণিক নাটক 'কারাগার'-এর অভিনয় শুরু হয় মনমোহন থিয়েটারে ১৯৩০ সালের ২৪ ডিসেম্বর। দেশে তখন রাজশক্তির বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল। দলে দলে লোক কারাবরণ করছিল। মহাত্মাজীর নির্দেশও ছিল তাই। এই পটভূমিকায় মহাভারতে বর্ণিত কংস কারাগার-এর কথা আমার মনে এসেছিল। যে কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল সেই কারাগারেই—আজ উদিত হবে আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাধীনতা সূর্য। চল সব সেই মহাতীর্থে—এই ভাব থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল আমার এই কারাগার নাটক! কারাগার নাটক-এর সঙ্গে আমার অনেক অবিস্মরণীয় স্মৃতি জড়িত রয়েছে। তা নাটক-এর ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত করছি ঃ—

'গান রচনায় আমি অক্ষম। কিন্তু আমার এই অক্ষমতা সার্থক হইয়াছে সেই এক পুণ্য প্রভাতে যেদিন সারা বাঙলার কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমার হাত দুখানি পরম স্নেহে ধরিয়া বলিয়াছিলেন, 'আপনি আপনার নাটকের জন্য আমাকে দিয়া গান লেখাইয়া না লইলে আমার অভিমানের কারণ হইবে।' যে আন্তরিক স্নেহে তিনি আমার 'মহুয়া'র কণ্ঠে গান দিয়েছিলেন এবারও আমার 'কারাগারে'র জন্য তেমনি আন্তরিক স্নেহে তিনি গান রচনা করিয়াছেন। রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পূর্ব মূহুর্তেও তিনি 'কারাগারের জন্য শুধু গান রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরমোল্লাসে উহাতে স্বয়ং সুরযোজনা করিয়াছেন। আমার আরো সৌভাগ্য, বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার দরদী-কবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ও আমার প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহে এবং মমতায় 'কারাগারে'র জন্য কয়েকটি গান রচনা করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ মহা সৌভাগ্যে, আজ আমার শুধু এই প্রার্থনাই মনে জাগিতেছে, জন্মে জন্মে যেন গীত রচনা এই অক্ষমতা নিয়াই জন্মগ্রহণ করি, এবং জন্মে জন্মে যেন সে অক্ষমতা এমনিভাবেই সার্থক হয়।

সাজসজ্জা এবং রূপ-পরিকল্পনা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াই তৃপ্ত হইব, তাঁহাদের সম্যক পরিচয় দেবার শক্তি আমার নাই। তাঁহারা শ্রীযুক্ত চারু রায় এবং শ্রীযুক্ত যামিনী রায়। ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদের স্নেহের ঋণ শোধ করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যমিনী রায় পরবর্তী কালে বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পীর মর্যাদা লাভ করে সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন।

ঐ ভূমিকা থেকেই আর একটি উদ্ধৃতি ঃ

'মুগ্ধচিত্তে আর একজনের কথা স্মরণ করি, তিনি বাংলার নাট্য জগতের কলা-লক্ষ্মী-কল্প শ্রীযুক্তা নীহারবালা। মাতার মমতায়, ভগিনীর স্নেহে আমার এই নাটক তিনি আমাকে উৎসাহিত ও সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন। নাটকের নৃত্য-পরিকল্পনাও তাঁহার।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই নাট্যলক্ষ্মী পরবর্তী জীবনে পণ্ডিচেরীতে শ্রীশ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের স্নেহচ্ছায়া লাভ করে সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন।

আর একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি হল একটি উপাধি। কারাগার নাটক-এর ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর নাম উল্লেখ করতে গিয়ে আমি লিখেছিলাম—'নটসূর্য' শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। তাঁকে আমার দেওয়া এই নটসূর্য উপাধি সমগ্র দেশ স্বীকার করে নিয়েছে। সরকারী উপাধি প্রাপ্তির অভিনন্দন সভাতেও তিনি সেদিন বলেছেন—'যেদিন, আমি চিরবিদায় নিয়ে চলে যাব সেদিন যেন লোকে শুধু এই কথাটিই বলে—নটসূর্য অস্ত গেল।' তিনি শতায়ু হোন আজ সমগ্র জাতির এই কামনা।

এই প্রসঙ্গে আমাকে নানা ভাবে উৎসাহ দেওয়ার জন্য শিল্পী-সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীঅখিল নিয়োগীর নামও মুগ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

কংস-এর ভূমিকায় বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অবিস্মরনীয় অপরাজেয় ধ্রুপদী অভিনয় প্রতিভার উল্লেখ না করে তৃপ্ত হতে পারছি না। অমর এই মহান শিল্পীর উদ্দেশ্যে আজ আবার নতুন করে স্মৃতিতর্পণ করছি।

মনোমোহন থিয়েটারে 'কারাগার' নাট্যাভিনয়ে যে বিপুল উন্মাদনা সৃষ্টি হল, তা লক্ষ্য করে—পরবর্তী ১লা ফেব্রুয়ারী অষ্টাদশ অভিনয়ের পর বাংলা সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে 'কারাগারের' পুনরাভিনয় নিষিদ্ধ করেন। শুরু হয় দেশব্যাপী বিক্ষোভ। সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক ও আইনবিদ ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তখন ছিলেন বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বাংলা কাউন্সিলে ১৯৩১ সালের মার্চ অধিবেশনে Home member hon'ble Mr. W. D. R. Prentice ঘোষণা করেন—"The Government had prohibited the further performance of the mythological play "Karagar" as it was likely to excite feelings of disaffection towards Government. The Home member added that ostensibly the play did not relate to present day politics, but actually its bearing on present day politics was beyond doubt.'

কারাগার সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত তৎকালীন রাজনৈতিক আবহাওয়ারও নির্দেশক ঃ 'নবশক্তি'—১৭ই পৌষ, ১৩৩৭। শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় কুশলী শিল্পীর মতো কংসের কারাগারকে কেন্দ্র করে নিপীড়িত মানুষের মর্মভেদী আর্তনাদ ফুটিয়ে

তুলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অভয়ঙ্করের যে আগমনী তিনি গেয়েছেন, তা যুগপৎ আশা ও আনন্দের বাণী বহন করে এনেছে,...কংস চরিত্রে...নূতন আলোকপাত...অপূর্ব বর্ণবৈচিত্র্য...সূক্ষ্ম রসবোধ। Covention-কে অতিক্রম করে যে শিল্পী নিজের সৃষ্টিতে প্রাণ দিতে পারেন তিনি যথার্থ শক্তিমান। "কারাগারের" অনেক জায়গাতেই তাঁর এই শক্তির পরিচয় পেয়েছি।...'কারাগার' সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সংযোজন করতে পারবে।

'নাচঘর'—১৭ই পৌষ, ১৩৩৭। 'কারাগার' কেবল নাটকের দিক দিয়েই অপূর্ব হয়নি। রঙ্গালয়ের জীবন উৎসবকেই 'কারাগার' দিয়েছে একটা শ্রী, যার সাধনাই হচ্ছে রঙ্গালয়ের সত্যিকারের সাধনা।'

'দীপালী'—(শ্রীনরেন্দ্র দেব) ১লা মাঘ, ১৩৩৭। 'কাহিনী পুরাতন হলেও শক্তিমান নাট্যকারের হাতে পড়ে সে আখ্যায়িকা যেন সম্পূর্ণ নূতন হয়ে উঠেছে। কোন বিশেষ দেশ কাল পাত্রের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, কারাগারের যে ছবিটি মন্মথবাবু এঁকেছেন তা বিশ্বজনীন হয়ে দেখা দিয়েছে। এর চেয়ে ভাল একখানি পৌরাণিক নাটক বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত রচিত হয় নি।'

"Amrita Bazar Patrika'' 11th February. 1931, Dak.

The news that the well-known drama called "Karagar" from the pen of the well-known dramatist Sj. Manmatha Ray has been lately banned has surprised many people in the country. If germs of sedition can be discovered in this book then we believe very little in the ancient epics and Puranas of the Hindus can be considered safe by the authorities. Is it then the belief of the censoring authorities in Bengal that loyalty can be engendered in the mind of a people in this twentieth Century by excluding from it all that is great and noble ?

আমার অন্য দেশাত্মবোধক নাটক 'মীরকাশিম' সেন্সারের ছুরিতে ক্ষতবিক্ষত হলেও, নটসম্রাট ছবি বিশ্বাসের সুঅভিনয়ে জাতীয় উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়নি নাট্যনিকেতন মঞ্চে, ১৯৩৮ সালে।

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে মীরকাশিমের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের সেই আকুল আবেদন, সেই জেহাদ ঘোষণা আজও কানে বাজছে—

'কে আছ শহীদ, কে আছ গাজী, কে আছ খোদার নফর, বিদেশী অত্যাচার অবসানের এই পুণ্য জেহাদে যোগ দিয়ে পলাশীর পাপ প্রক্ষালনের জন্য প্রস্তুত হও। পাটনায়, মুঙ্গেরে, বাংলায়, বিহারে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত সব কুঠি অবরোধ কর। সমগ্র ইংরেজ ব্যবসায়ীকে বন্দী করে শাঠ্যের সমুচিত শাস্তি দিয়ে পলাশীতে অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।'

নামভূমিকায় নটসম্রাট ছবি বিশ্বাসের ঐন্দ্রজালিক অভিনয়ে এবং নটশেখর নরেশ মিত্র কর্তৃক খোজা পিদ্রুস-এর অপূর্ব চরিত্র চিত্রণে এবং সামগ্রিক প্রযোজনায় মীরকাশিম নাট্যাভিনয় যে দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাঁর নিদর্শন রয়ে গেছে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে ঃ

'বর্তমান যুগে এই নাটকখানি বিশেষ আদর পাইবে আশা করি।'—ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার।

'আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, নাটকখানি দেশপ্রাণ বাঙালী নরনারীর চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হইবে।'—দেশ

'প্রত্যেকটি বাঙালীর এই মীরকাশিম দেখা অবশ্য কর্তব্য। মীরকাশিম নাটকে মৃতসঞ্জীবনীর মন্ত্র রহিয়াছে।'—যুগান্তর

'ঐতিহাসিক সত্য অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় অনবদ্য নাটক সৃষ্টি করিয়াছেন।'—আনন্দবাজার পত্রিকা

আমার উপরোক্ত নাটকগুলি বাদে সাধারণ মঞ্চে আমার যে কটি নাটক সর্বসম্মত-রূপে সমাদৃত হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখ করছি ঃ—

প্রথম পর্ব

(১৯২৩-১৯৩৮)

মহুয়া (মনোমোহন থিয়েটার, ১৯২৯), সাবিত্রী (নাট্যনিকেতন, ১৯৩১), অশোক (রঙমহল, ১৯৩৩), খনা (নাট্যনিকেতন, ১৯৩৫), বিদ্যুৎপর্ণা (সি. এ. পি ফার্ষ্ট এম্পায়ার, ১৯৩৭), রাজনটী (সি. এ. পি ফার্ষ্ট এম্পায়ার, ১৯৩৭), রূপকথা (সি. এ. পি ফার্ষ্ট এম্পারার, ১৯৩৮)।

দ্বিতীয় পর্ব

মহাভারতী (লোকরঞ্জন, ১৯৫২) মমতাময়ী হাসপাতাল (১৯৫২), জীবনটাই নাটক (মিনার্ভা থিয়েটার ১৯৫৩), ধর্মঘট (বহুরূপী ১৯৫৩), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৯৫৮) অমৃত অতীত (গন্ধর্ব ১৯৫৯), মহাপ্রেম (১৯৫৯)

এই তালিকা আমার রচিত পূর্ণাঙ্গ নাটকাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা নয়, শুধু মাত্র সাধারণ মঞ্চে অভিনীত নাটকগুলির তালিকা। উপরোক্ত তালিকা থেকে সাধারণ মঞ্চে অভিনীত কয়েকটি নাটকের মাত্র একটি সমালোচনা উদ্ধৃত করে আমার নাট্যজীবনের প্রথমপর্ব শেষ করছি।

প্রথম পর্ব ঃ মহুয়া (মনোমোহন থিয়েটার) নদের চাঁদ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হুমরো বেদে—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মহুয়া—সরযূবালা।

পালাগানের মহুয়া এই নাটকের মধ্যে এমন অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে যে তাকে ওদেশের জগৎপ্রসিদ্ধ কারমেনের সঙ্গে তুলনা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না। (নবশক্তি ১ম বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যায় 'চন্দ্রশেখর'—শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ।)

সাবিত্রী (নাট্যনিকেতন) অশ্বপতি—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দ্যুমৎ সেন—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সাবিত্রী—নীহারবালা।

'সর্বপ্রকার বাহুল্য বিবর্জিত সহজ সরল এবং বর্ণাঢ্য ভাষায় রচিত এই নাটকখানি বাংলার নাট্য-সাহিত্যে একটি বিশেষ সম্পদরূপে গৃহীত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। নাট্যনিকেতন এই সর্বাঙ্গসুন্দর নাটকখানির সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করলেন, যথার্থ শ্রেষ্ঠ অভিনয় ব্যতীত তা অর্জন করা সম্ভব নয়।'

নাচঘর, প্রসিদ্ধ নাট্যকার—শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

অশোক (রঙমহল) অশোক—রবি রায়, বীতশোক—ভূমেন রায়, খল্লাতক—নরেশ মিত্র, উপগুপ্ত—যোগেশ চৌধুরী, তিষ্যরক্ষিতা—শান্তি গুপ্তা, কুনাল—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঞ্চনমালা—রেণুবালা। 'নাট্যকারের মুন্সিয়ানা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। অশোকে জীবনে যে দুটি পরস্পর-বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ চলেছে এবং পশুশক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে পরিশেষে যেভাবে অশোকের মগ্নচৈতন্যের আত্মবিকাশ ঘটেছে, তা সম্পূর্ণভাবে উচ্চাঙ্গের ড্রামার বিষয়বস্তু। নাট্যকার যেভাবে কুনালের প্রতি তিষ্যরক্ষিতার প্রেমের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন তা একমাত্র প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্ট-এর তুলির কাজের সঙ্গে তুলনীয়। নাট্যকারের ভাষানৈপুণ্যে এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে নাটকের গল্পটি দর্শক সাধারণের চিত্তাকর্ষক হবে।—

(দীপালীতে চন্দ্রশেখর—শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ।)

খনা—পঞ্চাঙ্ক নাটক। (নাট্য-নিকেতন) বরাহ—অহীন্দ্র চৌধুরী, মিহির—জীবন গাঙ্গুলী, কামন্দক—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, খনা—সরযূবালা, ধরণী—চারুশীলা। "নাট্য-কৃতিত্বের চরম উৎকর্ষতা।"—আনন্দবাজার পত্রিকা

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে এই নাটক যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।—দেশ

বিদ্যুৎপর্ণা (সি. এ. পি ফার্স্ট এম্পায়ার) বিদ্যুৎপর্ণা—সাধনা বসু, মোহান্ত—অহীন্দ্র চৌধুরী। . 'গ্রন্থকারের অপূর্ব সৃষ্টি। নাটকীয় ঘটনা সংস্থাপনায় সংলাপ ও কল্পনার মনোহারিত্বে অভিনব।'—যুগান্তর

রাজনটী (সি. এ. পি ফার্স্ট এম্পায়ার) রাজনটী মধুচ্ছন্দা—সাধনা বসু, কাশীশ্বর—অহীন্দ্র চৌধুরী, চন্দ্রকীর্তি—মধু বসু।

'ঘটনাবহুল বা বৈচিত্র্যময় নহে, একটি শান্ত সুন্দর ঘটনা লইয়া রচিত এই ক্ষুদ্র নাটকখানি শান্তরসে ভরপুর। রাজনটী ও যুবরাজের প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া সঙ্গীতে, রূপে, ছন্দে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র সুলিখিত নাটকখানি এক অপূর্ব সৌন্দর্যে বিকশিত। বাংলার নাট্য-সাহিত্যে মন্মথ রায় নব নব রস পরিবেশন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। রাজনটী তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।' আনন্দবাজার পত্রিকা—[৬ই মার্চ ১৯৩৮]

রূপকথা (সি. এ. পি ফার্স্ট এম্পায়ার) যক্ষ—অহীন্দ্র চৌধুরী, রাজকন্যা—সাধনা বসু, রাজকুমার—প্রীতিকুমার মজুমদার।

"Manmatha Ray the noted playright of the modern Bengali school has given it an exquisite dramatic shape mostly on the line of the European pantomime'—N. K. G. in Amritabazar Patrika.

সাধারণ মঞ্চে আমার নাট্য-জীবনের প্রথম পর্ব ১৯৩৮ সালে ছেদ পড়ল সুদীর্ঘ ১৪ বৎসরের জন্য। দ্বিতীয় পর্বটা অনেকটা সাম্প্রতিক যুগের কথা। এবং দ্বিতীয় পর্বে, এই সাম্প্রতিক যুগে, সাধারণ মঞ্চে আমার যে যোগাযোগ— সেই সম্বন্ধে কিছু লিখছি। প্রথম পর্ব [১৯২৩—১৯৩৮]-এর কথা একটু সবিস্তারে লিখতে হল এই জন্য যে ওটা অতীত যুগের কথা। সে যুগের মানুষ বিরল হয়ে এসেছে, অনেক কিছু বিস্মৃতির অতলতলে ডুবে গেছে ও যাচ্ছে এবং নাট্য-ইতিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে তা আমি বর্তমানের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি।

এ পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আমার যেসব নাটক অভিনীত হয়, তার কোনটিই সামাজিক নাটক ছিল না। ১৯৫২ সালে আমি পুনরায় নাটক লিখতে মনস্থ করে ঐ বৎসরেরই এপ্রিল মাসে 'মহাভারতী' রচনা করি। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জন্য লিখিত আমার নাটকগুলির মধ্যে মহাভারতীই প্রথম সামাজিক নাটক। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ, ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০-৩১ আইন অমান্য ও লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ১৯৪২ সালে আগস্ট বিপ্লব এবং ১৯৪৬ সালে বৃটিশ কর্তৃক ভারতের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ এই রাজনৈতিক ঘটনাগুলি এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের বিষয়বস্তু। মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রকুলবর্তী একটি গ্রামে মহাভারত মাইতি নামক এক মধ্যবিত্ত কৃষক এবং তাহার পরিজনবর্গকে কেন্দ্র করে এই রাজনীতিক নাটকটি পরিকল্পিত হয়েছে। চরিত্রগুলি সমস্তই কাল্পনিক এবং অতি সাধারণ মানুষ। স্বাধীনতা-সংগ্রামে জনসাধারণ যে ইতিহাস রচনা করেছিল এ নাটকটি তারই ইতিহাস। এই নাটকটি জহর গাঙ্গুলীর পরিচালনায় রঙমহলে

মঞ্চস্থ হবার জন্য রিহার্সালে পড়েছিল। এমনি সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার প্রযোজক। ডক্টর রায় বললেন, কল্যাণীতে জাতীয় কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশন সর্বভারতীয় প্রতিনিধিদের মনোরঞ্জনের জন্য কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করো। তদনুযায়ী রঙমহল থেকে তুলে আনা হল মহাভারতী। এবং জহর গাঙ্গুলীর পরিচালনাতেই সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য পঙ্কজ মল্লিক এবং আমার প্রযোজনায় নবগঠিত সরকারী নাট্য সংস্থা লোকরঞ্জন শাখা আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে 'মহাভারতী' পরিবেশন করলেন কল্যাণী কংগ্রেসের ১৯৫৪ সালের ২২শে জানুয়ারী জাতীয় মহসভা 'কংগ্রেস নাট্যমঞ্চে'। অভিনয় শেষ হওয়া মাত্র মঞ্চে ছুটে এলেন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু এবং মাইক-এর সামনে গিয়ে তিনি দুটি কথা বললেন—

"Only Bengal could do it—and Bengal has done it"

এই প্রসঙ্গে লোকরঞ্জন শাখা সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে একটা কথা জেনেছিলাম থিয়েটারের নট-নটীরা দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে। দর্শকরাও তাদের গুণমুগ্ধ হয় কিন্তু নট-নটীদের সামাজিক স্বীকৃতি বা মর্যাদা ছিলনা। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার প্রমুখ শিক্ষিত নাট্যশিল্পিরা যখন মঞ্চে যোগ দিলেন, তখন দেখেছিলাম এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে হল বলে মনে হল না। পঙ্কজকে নিয়ে আমি ডক্টর রায়-এর কাছে ১৯৫৩ সালের ১ অক্টোবর সাময়িকভাবে গঠিত লোকরঞ্জন শাখাকে সরকারী নাট্য প্রতিষ্ঠানরূপে পাকা করতে আবেদন জানালাম। ডক্টর রায় সানন্দে সম্মত হলেন। পঙ্কজ মল্লিককে উপদেষ্টা এবং প্রচার-প্রযোজক আমাকে প্রশাসন আধি-কারিকের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে স্থায়ীভাবে গড়ে উঠলো বর্তমান লোকরঞ্জন শাখা। ভারতে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি পেল লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীবর্গ সরকারী কর্মচারীরূপে। শিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা উচ্চতর হল। 'মহাভারতী' লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক বাংলার পল্লীতে পল্লীতে অভিনীত হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ১৮৫৭ সিপাই বিদ্রোহ শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসবে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোকরঞ্জন শাখা ২৪শে এবং ২৫শে আগষ্ট (১৯৫৭) এই মহাভারতী নাটক হিন্দী ভাষায় অভিনয় করেন।

১৯৩৮ সালে নাট্যনিকেতনে আমার 'মীরকাশিম' নাটকের নামভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করে ছবি বিশ্বাস রাতারাতি সুবিখ্যাত হন। পনেরো বৎসর পর ১৯৫৩ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে যখন তিনি আমার 'জীবনটাই নাটক' খোলেন তখন তিনি চিত্র ও মঞ্চজগতে নট-সম্রাট। নাট্যশিল্পীদের আর্থিক দৈন্য ও দুরবস্থা এবং এক নটবধুর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এক চমকপ্রদ সংগ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল নাটকটি। ছবি বিশ্বাসের প্রতিভাদীপ্ত পরিচালনা এবং অভিনয়ে নাটকটি সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় পর্বে আমার পরবর্তী নাটকগুলি রাজনৈতিক এবং সামাজিক ভাবধারার

সঙ্গে অধিকতর সংযুক্ত না হয়ে পারেনি, কারণ যুগমানসকে উপেক্ষা করা নাট্যকারের ধর্ম নয়। আমার পরবর্তী নাটকগুলি ধর্মঘট (১৯৫৩) সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৯৫৮) অমৃত অতীত (১৯৫৯) এবং দেশাত্মবোধক মহাপ্রেম (১৯৫৯) স্বর্ণ কীট এবং জওয়ান (১৯৪৭) এই ভাবধারাই দ্যোতক। আনন্দবাজার পত্রিকা (৫ই মে ১৯৫৭ তারিখে) এই প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ—'বর্তমান যুগচিন্তা সাহিত্যের কাছে যে দাবী করে চলেছে, মন্মথ রায় নাট্যকাররূপে সেই অব্যক্ত বিক্ষোভ এবং মানবমনের সত্যানুভূতিকে বাণীরূপ দান করে এক মহান কর্তব্য সাধিত করে চলেছেন।'

কিন্তু যুগচিন্তারূপ মহান কর্তব্য সাধনে বিপদও আছে। ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'প্রচার প্রযোজক'এর গেজেটেড পদে নিযুক্ত হই আমি। কিছুদিন পরেই প্রচার অধিকর্তার এক হুকুম পেলাম—বাইরের জন্য আমি যা লিখব প্রকাশের পূর্বে প্রচার অধিকর্তার অনুমতি ও অনুমোদন চাই। সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগপত্র দাখিল করি আমি। তখন কংগ্রেস নেতা স্বর্গত কিরণশঙ্কর রায় স্বরাষ্ট্র প্রচার মন্ত্রী। প্রচার অধিকর্তার হুকুম তিনি বাতিল করে দেন। আর এতেই সম্ভব হয়েছিল আমার পক্ষে চাকুরি করেও লিখতে রাজনৈতিক নাটক 'ধর্মঘট' 'আজব দেশ' 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' 'অমৃত অতীত'।

ইউক্রেন পল্লীবাসী চিত্রশিল্পী ও লোককবি 'তারাশ শেভচেঙ্কো' একদা ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেন গোটা রাশিয়ায়। জার-এর শাসনে নিপীড়িত নিষ্পেশিত এই জীবনশিল্পীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা তিরোহিত হত্যে বাধ্য হয়। এই মহান নাটকীয় জীবন অবলম্বনে আমি একটি মৌলিক নাটক প্রণয়ন করি—'তারাশ শেভচেঙ্কো'। রুশ-ভারতী পত্রিকায় নাটকটি প্রকাশিত হয়। দশরূপক নাটকটি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করে। এই নাটকটি প্রণয়ন-এর জন্য ১৯৪৭ সালে আমি আন্তর্জাতিক 'সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহরু সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত হই। অনন্যনাট্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিজ্ঞাপক বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'বিশ্বরূপা স্বর্ণপদক' দ্বারা ১৯৪৭ সালে সম্মানিত হওয়ার পর এই আমার প্রথম বৃহৎ সম্মান। তারপরও আর যে তিনটি সম্মান পেয়েছি তা হল— সাহিত্য বাসর উল্টোরথ পুরস্কার (১৯৪৭)। ন্যাশনাল সঙ্গীত নাটক আকাদমি শ্রেষ্ঠ নাট্য রচনা পুরস্কার (১৯৪৭)। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট সঙ্গীত নাটক চারুকলা আকাদমি শ্রেষ্ঠ নাট্য রচনা পুরস্কার (১৯৪৭)।

আমার নাট্য সাধনার ব্যাপ্তিকাল অর্ধশতাব্দীতে দাঁড়িয়েছে। অনেক কিছু কোলাহল করে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে-চিন্তা জাগে এই দীর্ঘ সাধনায় কি ফসল ফললো। সমসাময়িক নাট্য ইতিহাসে দেখেছি আমার নাট্য সাধনা সম্পর্কে লেখা হয়েছে ঃ—

'পৌরাণিক নাটক লিখিয়া যাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে মন্মথ রায়ের নাম করিতে হয়। শুধু পৌরাণিক নাটক নহে সর্বপ্রকার নাটক

আলোচনার কালে ইহাকে আধুনিক সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলা চলে। নাটকের মধ্যে ইনি এক অনাবিষ্কৃত রহস্য এবং এক অনাস্বাদিত রস বিকাশ করিয়া দেখাইলেন। নাটকে এরূপ সুতীব্র ভাবাবেগ এবং সুপ্রখর ক্রিয়াময়তা সৃষ্টি করিতে খুব কম নাট্যকারই পারিয়াছেন। সূক্ষ্মতম অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিটি পর্দা ইনি অতি সুনিপুণ হস্তে স্পর্শ করিয়াছেন। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবিরাম সংঘাতে ইঁহার নাটকের উদ্বেলিত ভাবতরঙ্গ ঘূর্ণ্যমান আবর্তের মধ্যে লীলা করিয়া অমোঘ অবস্থার কঠিন শিলায় নিরূপায়ভাবে আর্তনাদ করিয়া মরিয়াছে। ইহঁার নাটক দর্শনকালে চরম উত্তেজনায় মন নাচিতে থাকে, নিশ্বাস রূদ্ধ হইয়া যায়, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া পড়ে।'

বাংলা নাটকের ইতিহাস

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ

'তাঁহার নাটকের ঘটনাসমূহ সাধারণতঃ রোমাঞ্চকর—দৃশ্যের পর দৃশ্যের ভিতর দিয়ে পাঠককে রুদ্ধশ্বাসে অগ্রসর হইতে হয়। অতি আধুনিক যুগে বাহ্যনাট্যিক ক্রিয়া অপেক্ষা যে অন্তর্দ্বন্দ্বের উপর জোর দেওয়া হইয়া থাকে—তাঁহার নাটক তাহা হইতেও বঞ্চিত নহে। রোমাঞ্চকর ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে নাটকীয় চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ তাঁহার নাটকের একটি প্রধান গুণ। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে একমাত্র তাঁহার মধ্য দিয়াই এই যুগে, আধুনিক যুগের সঙ্গে অতি আধুনিক যুগের সংযোগ রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া মনে হইবে।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

কিন্তু প্রকৃত মূল্যায়ন-এর কর্তা মহাকাল। এমন দিন হয়তো এসে গেছে অথবা এসে যাবে যেদিন কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে আমার এই পঞ্চাশ বৎসর এর ফসল মূল্যহীন প্রমাণিত হবে। কিন্তু তাতে আনন্দও আছে এই জন্য যে, আমি যা দিয়েছি তার মূল্যের চেয়ে, যেটা আসছে বা এসেছে তার মূল্য কালের কষ্টিপাথরে অনেক বেশী। আর সান্ত্বনাও থাকবে এই জন্য যে, একে একে যে সোপান শ্রেণী আমরা রচনা করে দিয়েছি সেই সোপানই উত্তীর্ণ হয়ে তবেই হবে সেই মহা উত্তরণ। এবং আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি আমার সোপান অতিক্রম করে আমাদের নাট্যসাহিত্য সেই মহা-উত্তরণ-এর পথে এগিয়ে যাক। বিশ্ব নাট্য-সাহিত্যের আসরে এক মহান আসন অর্জন করুক।

স্বাধীনতাসংগ্রামী অতীতকে নমস্কার করছি। স্বাধীনতা উদ্ভাসিত বর্তমানকে বরণ করছি। সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎকে অগ্রিম প্রণাম জানাচ্ছি। জয়হিন্দ।